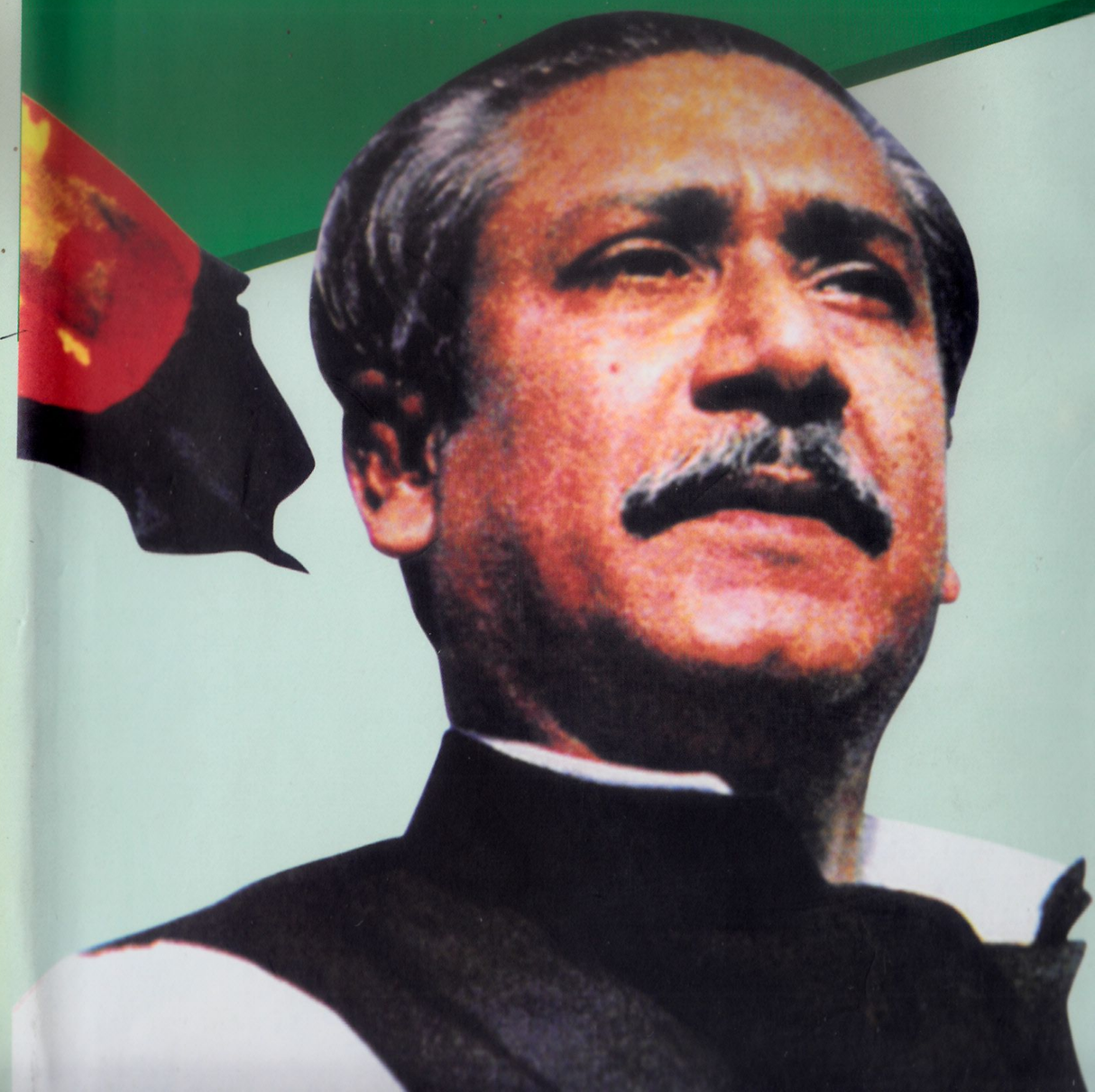
জাতির জনক বঙ্গবন্ধু

শেখ মুজিবুর রহমান

সিরাজ উদ্‌দীন আহমেদ



জাতির জনক বঙ্গবন্ধু
শেখ মুজিবুর রহমান
সিরাজ উদ্‌দীন আহমেদ

ভাস্কর প্রকাশনী

জাতির জনক বঙ্গবন্ধু
শেখ মুজিবুর রহমান

জাতির জনক বঙ্গবন্ধু
শেখ মুজিবুর রহমান

বঙ্গবন্ধুর অসমাপ্ত আত্মজীবনীর ভিত্তিতে রচিত

জাতির জনক বঙ্গবন্ধু
শেখ মুজিবুর রহমান

সিরাজ উদ্‌দীন আহমেদ

ভাস্কর প্রকাশনী
ঢাকা, বরিশাল

782

জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান

সিরাজ উদ্‌দীন আহমেদ

দশম সংস্করণ	:	২১ ফেব্রুয়ারি ২০১৭ খ্রি.
নবম সংস্করণ	:	১৬ ডিসেম্বর ২০১৬ খ্রি.
অষ্টম সংস্করণ	:	১৫ আগস্ট ২০১৬ খ্রি.
সপ্তম সংস্করণ	:	১৫ জানুয়ারি ২০১৬ খ্রি.
ষষ্ঠ সংস্করণ	:	১৫ আগস্ট ২০১৫ খ্রি., ৩১ শ্রাবণ ১৪২২ বাংলা
পঞ্চম সংস্করণ	:	১৬ ডিসেম্বর ২০১৪ খ্রি., ২ পৌষ ১৪২১ বাংলা
চতুর্থ সংস্করণ	:	১৬ ডিসেম্বর ২০১৩ খ্রি., ২ পৌষ ১৪২০ বাংলা
তৃতীয় সংস্করণ	:	২৬ মার্চ ২০১৩ খ্রি., ১২ চৈত্র ১৪১৯ বাংলা
দ্বিতীয় সংস্করণ	:	৩০ সেপ্টেম্বর ২০১২ খ্রি., ১৫ আশ্বিন ১৪১৯ বাংলা
প্রথম প্রকাশ	:	১৬ ডিসেম্বর ২০১১ খ্রি., ২ পৌষ ১৪১৮ বাংলা
প্রকাশক	:	**ভাস্কর প্রকাশনী** ছায়াবৃতা, ৪/এ, ২০/১ দিলু রোড, নিউ ইস্কাটন, ঢাকা-১০০০। ফোন : ৯৩৪৫১৫৫, ০১৭১৩২১৩২৪০
প্রচ্ছদ	:	**মোমেন্টাম,** সোনারতরী টাওয়ার ১৩ তলা ১২, সোনারগাঁও রোড, বাংলা মোটর, ঢাকা।
মুদ্রণে	:	**কমলা প্রিন্টার্স** ৪১ তোপখানা রোড, ঢাকা-১০০০।
কম্পিউটার গ্রাফিকস	:	**কে.এম. মোকতাদার হাসান চন্দন** বন্ধু কম্পিউটার্স ২৮/সি-২ টয়েনবি সার্কুলার রোড, মতিঝিল, ঢাকা। ফোন : ৯৫৫০১০৭, ০১৯১১৩৩৫৬৮২
পরিবেশনায়	:	**পাঠক সমাবেশ,** আজিজ সুপার মার্কেট, শাহবাগ, ঢাকা। **অভীক প্রকাশ,** আজিজ সুপার মার্কেট, শাহবাগ, ঢাকা। **সাহিত্য প্রকাশ,** তোপখানা রোড, ঢাকা। **বুক ভিলা,** সদর রোড, বরিশাল। **বুক ভিউ,** নিউ মার্কেট, ঢাকা।

মূল্য : ৫০০ টাকা

ISBN : 978-984-33-4561-5

Jatir Janak Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman, by Sirajuddin Ahmed, Chhayabrita, 20/1 Dilu Road, New Eskaton, Dhaka-1000. Price : $25

উৎসর্গ—

আমার পরম শ্রদ্ধেয় পিতা
মরহুম জাহানউদ্দিন ফকির
এবং মাতা
লাইলী বেগম

লেখকের অন্যান্য গ্রন্থ

	প্রকাশ কাল
বরিশাল বিভাগের ইতিহাস, ১ম খণ্ড	২০০৩
বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান	২০০১, ২০১০
জননেত্রী শেখ হাসিনা	২০০০
Sheikh Hasina Prime Minister of Bangladesh	১৯৯৮
হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী	১৯৯৬
শেরে বাংলা এ কে ফজলুল হক	১৯৯৭
মজলুম জননেতা মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী	২০০৩
স্বাধীনতা ঘোষণা– বিজয় অতঃপর	২০০৫
একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধ– স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয়	২০০৪
বাংলাদেশ গড়লেন যারা	২০০২
হাশেম আলী খান	২০০৫
আগা বাকের	১৯৮০
মাদারীপুর জেলার ইতিহাস	২০০৬
বরিশালের ইতিহাস দ্বিতীয় খণ্ড	১৯৮৫
সংগ্রামের অপর নাম—অধ্যাপক রফিকুল ইসলাম	২০১০
প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দিন আহমদ	২০০৮
জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি	২০১২
ভারত বিভাগ– ঐতিহাসিক ভুল	২০১২
জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান	২০১২

সূচিপত্র

অধ্যায়		বিষয়	পৃষ্ঠা নং
অধ্যায় ১	:	টুঙ্গিপাড়ার শেখ বংশ	১৭
অধ্যায় ২	:	কলকাতা ইসলামিয়া কলেজ ১৯৪২-৪৭	৪২
অধ্যায় ৩	:	পাকিস্তান সৃষ্টি	৫৯
অধ্যায় ৪	:	আওয়ামী লীগের জন্ম	৭১
অধ্যায় ৫	:	কারাজীবন	৮০
অধ্যায় ৬	:	১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলন	৮৬
অধ্যায় ৭	:	যুক্তফ্রন্টের নির্বাচন-১৯৫৪	১০৩
অধ্যায় ৮	:	প্রধানমন্ত্রী পদে হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী	১১৭
অধ্যায় ৯	:	কাগমারী সম্মেলন	১২১
অধ্যায় ১০	:	আইয়ুব খানের সামরিক শাসন	১২৬
অধ্যায় ১১	:	গণতন্ত্র পুনরুদ্ধারের সংগ্রাম	১২৯
অধ্যায় ১২	:	ছয় দফা আন্দোলন	১৩৮
অধ্যায় ১৩	:	আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা–১৯৬৮-৬৯	১৪৫
অধ্যায় ১৪	:	ঊনসত্তরের গণঅভ্যুত্থান	১৫১
অধ্যায় ১৫	:	১৯৭০ সালের নির্বাচন	১৬৩
অধ্যায় ১৬	:	অসহযোগ আন্দোলন	১৭০
অধ্যায় ১৭	:	২৬ মার্চ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বাধীনতা ঘোষণা	১৮৪
অধ্যায় ১৮	:	স্বাধীন বাংলাদেশ সরকার গঠন	১৯৫
অধ্যায় ১৯	:	মুক্তিযুদ্ধ– সেক্টর ও আঞ্চলিক কাউন্সিল গঠন	২০২
অধ্যায় ২০	:	পাকিস্তান সেনাবাহিনীর গণহত্যা	২১৭
অধ্যায় ২১	:	বাংলাদেশ সরকারের কার্যাবলি	২২৩
অধ্যায় ২২	:	মুক্তিযুদ্ধে ভারত, রাশিয়া, চীন ও আমেরিকার ভূমিকা	২৩০
অধ্যায় ২৩	:	মুক্তিযুদ্ধকালে বঙ্গবন্ধুর পরিবার	২৩৫
অধ্যায় ২৪	:	পৃথিবী কাঁপানো তেরো দিনের যুদ্ধ	২৩৮

অধ্যায় ২৫ : পাকবাহিনীর আত্মসমর্পণ ২৫১
অধ্যায় ২৬ : পাকিস্তান কারাগার থেকে মুক্তি লাভ ২৬২
অধ্যায় ২৭ : বঙ্গবন্ধুর উন্নয়ন ভাবনা ২৬৮
অধ্যায় ২৮ : পররাষ্ট্রনীতি ২৭২
অধ্যায় ২৯ : শেখ মুজিবুর রহমানের শাসনের সাড়ে তিন বছর ২৭৬
অধ্যায় ৩০ : বাংলাদেশ কৃষক শ্রমিক আওয়ামী লীগ গঠন ২৬৩
অধ্যায় ৩১ : বঙ্গবন্ধু ও তাঁর পরিবারের হত্যাকাণ্ড ২৮৭
অধ্যায় ৩২ : কেন্দ্রীয় কারাগারে জাতীয় চার নেতার হত্যা ২৯৩
অধ্যায় ৩৩ : বঙ্গবন্ধু ও তার পরিবারের হত্যার বিচার ২৯৬
অধ্যায় ৩৪ : বঙ্গবন্ধুকন্যা শেখ হাসিনার রাজনীতিতে প্রবেশ ৩০০
অধ্যায় ৩৫ : পারিবারিক জীবন ৩০৫
অধ্যায় ৩৬ : বঙ্গবন্ধুর চরিত্র ও কৃতিত্ব ৩১৪
অধ্যায় ৩৭ : সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি ৩৩০
গ্রন্থপুঞ্জি ৩৩৬
নির্ঘণ্ট ৩৩৭

লেখকের কথা

আমি বঙ্গবন্ধুকে দেখেছি। ছাত্র জীবনে ছাত্রলীগের কর্মী ছিলাম। তাঁর সান্নিধ্যে যাওয়ার সৌভাগ্য হয়েছে। আমি শেরেবাংলা একে ফজলুল হক, হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী এবং মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানীকে দেখেছি। তাঁদের রাজনীতি নিয়ে গবেষণা করেছি।'বঙ্গবন্ধুর আহ্বানে মুক্তিযুদ্ধে সংগঠন করেছি। ১৯৬৯-৭২ সাল পর্যন্ত আমি বরগুনার ম্যাজিস্ট্রেট ছিলাম। ১৯৭৩-১৯৭৫ সালে আমি বরগুনা মহকুমা প্রশাসক ছিলাম। বরগুনা-জীবনে আমি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিখ্যাত ছাত্রলীগ নেতা আসমত আলী সিকদারকে নিয়ে বরগুনায় ছাত্রলীগ ও আওয়ামী লীগকে সংগঠিত করেছি। বরগুনার উন্নয়নের জন্য কাজ করেছি। এ কারণে বরগুনার গণমানুষের সাথে আমার ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল। বরগুনার সংসদ সদস্য আসমত আলী সিকদার, শাহজাদা আবদুল মালেক খান ও নিজাম উদ্দিন আহমদকে নিয়ে আমরা স্বাধীনতার পর বরগুনার উন্নয়নে কাজ করেছি। বঙ্গবন্ধুর নির্দেশে বরগুনার ছাত্র-জনতা বাকশাল কর্মসূচি বাস্তবায়নে এগিয়ে আসে। ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট সকাল ৭টায় বরগুনার ছাত্রলীগ নেতা আবদুল মোতালেব আমার সরকারি বাসভবনে এসে চিৎকার দিয়ে বলে—'স্যার, বঙ্গবন্ধু নেই!' আমি রেডিও খুলে মেজর ডালিমের কণ্ঠ শুনতে পাই। তৎক্ষণাৎ সিদ্ধান্ত নিলাম, আমি এই হত্যার প্রতিবাদ ও প্রতিরোধ করব। আমি বরগুনা ও পটুয়াখালীর রক্ষীবাহিনীকে জেলার নিয়ন্ত্রণ নিতে বলি। আমার আহ্বানে বরগুনার রক্ষী বাহিনী রাস্তায় বেরিয়ে আসে। পুলিশ বাহিনী থানায় নীরবতা পালন করে। বরগুনা মহকুমা বর্তমানে জেলা। আমি সামরিক আইন ও কারফিউ জারি করিনি। খুনীদের সরকারকে সমর্থন না করে বঙ্গবন্ধুর নামে বরগুনার প্রশাসন আমার দখলে রাখি। বরগুনার ছাত্র-জনতা, বাকশালের নেতৃবৃন্দ রাস্তায় বেরিয়ে আসে। আমার বাসভবনে সভা হলো। বাংলাদেশে অন্য জেলা থেকে আমরা প্রতিরোধের খবর না পেয়ে হতাশ হলাম। ১৬ আগস্ট আমার বাসায় শোকসভা করি। এক সপ্তাহের মধ্যে আমাদের প্রতিরোধ ভেঙে পড়ে।

পটুয়াখালী সেনাবাহিনী এসেছে, আমাকে গ্রেফতার করা হবে—যশোর সেনানিবাসের জিওসি ব্রিগেডিয়ার মীর শওকত আলী আমার মৃতদেহ নেয়ার নির্দেশ দেয়। খুলনার কমিশনারের হস্তক্ষেপে আমার বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেয়া হয়নি। ইতোমধ্যে সামরিক শাসক মেজর জেনারেল জিয়াউর রহমান রক্ষী বাহিনীকে অস্ত্র জেলা প্রশাসক ও এসপির নিকট জমা দিতে হবে। পটুয়াখালীর রক্ষীবাহিনীকে অস্ত্র জমা দিতে বলা হলে তারা ডিসি-এসপিকে জানিয়ে দেয় যে, বরগুনা মহকুমার এসডিও সিরাজউদ্‌দীন আহমেদের নির্দেশ ব্যতীত অস্ত্র জমা দেবে না। ডিসি আবদুস সাত্তার আমাকে বলেন যে, আমি যেন রক্ষীবাহিনীকে পটুয়াখালীর এসপির নিকট অস্ত্র জমা দিতে বলি। আমি পটুয়াখালী ও বরগুনার রক্ষীবাহিনীকে পরামর্শ দিলাম তারা যেন অস্ত্র পটুয়াখালীতে জমা না দিয়ে অস্ত্র নিয়ে ঢাকায় যায়। অস্ত্র জমা দিলে হয়ত তাদের মেরে ফেলতে পারে। আমার পরামর্শে রক্ষীবাহিনী পটুয়াখালীতে অস্ত্র জমা না দিয়ে ঢাকায় চলে যায়। পরে তারা সকলে সেনাবাহিনীর অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায়।

এদিকে বঙ্গবন্ধু হত্যার প্রতিবাদে বাংলাদেশে তেমন কোনো প্রতিরোধ হয়নি। খন্দকার মোশতাক আহমেদ ও জেনারেল জিয়াউর রহমান ক্ষমতা দখল করে নেয়। বরগুনায় যারা আমার আহ্বানে সেনা অভ্যুত্থানের বিরুদ্ধে রাস্তায় বেরিয়ে এসে প্রতিরোধ ও প্রতিবাদ করে তাদের গ্রেফতার শুরু করে। বিভিন্ন সময় এমপি নিজামউদ্দিন আহমদসহ ৩০ জনকে গ্রেফতার করা হয়। তারা দীর্ঘদিন কারাবাস করে। তাদের মধ্যে অনেকেই আজ জীবিত নেই– আমি তাঁদের শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করি। ১৫ আগস্ট আগস্ট সকালে বরগুনার যেসব রক্ষীবাহিনীর ভাইয়েরা আমার আহ্বানে হাতে অস্ত্র নিয়ে বঙ্গবন্ধুর পক্ষে বরগুনা নিয়ন্ত্রণ করেছিল আমি তাদের প্রতি কৃতজ্ঞ। ১৫ আগস্টের পর আমাকে চাকরিচ্যুত করা হয়। ১৯৭৫ সালের ৩ নভেম্বর মেজর জেনারেল খালেদ মোশাররফের নেতৃত্বে সেনা অভ্যুত্থান হয়। জেলহত্যার প্রতিবাদে ৬ নভেম্বর আমার আহ্বানে বরগুনা শহরে হরতাল পালিত হয়। বাংলাদেশে একমাত্র বরগুনায় বঙ্গবন্ধু হত্যা ও জেলহত্যার প্রতিবাদ করা হয়। আমি প্রায় দু'বছর চাকরিচ্যুত ছিলাম। আমার বিরুদ্ধে কয়েকটি মামলা দায়ের করা হয়। আমার বিরুদ্ধে দুর্নীতি মামলা প্রমাণিত হয়নি। ১৫ আগস্ট বঙ্গবন্ধু হত্যার প্রতিবাদ করায় আমাকে সংস্থাপন মন্ত্রণালয় ক্ষমা চাইতে বলেন। আমি উত্তরে বলেছিলাম, আমি বঙ্গবন্ধু হত্যার প্রতিবাদ করে গর্বিত– আমি ক্ষমা চাইতে পারি না। পরে সরকার আমার বিরুদ্ধে অভিযোগ প্রত্যাহার করে চাকরিতে পুনর্বহাল করে। আমি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলাম যে, অস্ত্র দিয়ে বঙ্গবন্ধু হত্যার প্রতিবাদ করে ব্যর্থ হয়েছি। এখন

মসির যুদ্ধ চালাব। বঙ্গবন্ধুর জীবনী লেখার জন্য তথ্য সংগ্রহ করতে থাকি। বাংলার ইতিহাস নিয়ে গবেষণা করতে হয়। কিন্তু আমাকে পিতার পূর্বে হঠাৎ কন্যার জীবনী লিখতে হলো। ১৯৯৭ সালে দিল্লির UBS পাবলিশার্স শেখ হাসিনার জীবনী লিখতে বলে। বঙ্গবন্ধুর কন্যা প্রধানমন্ত্রী, দলের সভানেত্রী—পৃথিবীর অনেকে তাঁর সম্পর্কে জানতে চায়। আমার লেখা 'Sheikh Hasina Prime Minister of Bangladesh' দিল্লির UBS পাবলিশার্স প্রকাশ করে। আমি বঙ্গবন্ধুর জীবনী ইংরেজি ভাষায় লেখার জন্য পাণ্ডুলিপি তৈরি করি। তা প্রকাশ করা সম্ভব হয়নি। বাংলায় লেখা বঙ্গবন্ধুর জীবনী ২০০১ সালে ভাস্কর প্রকাশনী প্রকাশ করে। ২০০১ সালে বিএনপি-জামায়াত জোট সরকার ক্ষমতায় আসায় বঙ্গবন্ধুর জীবনী গ্রন্থ নিয়ে আমাকে বিপাকে পড়তে হয়। এ সময় সরকার আমাদের বিরুদ্ধে 'জনতার মঞ্চ' গঠনের অভিযোগে রাষ্ট্রদ্রোহী মামলা দায়ের করে। আমার সাথে যারা মামলার আসামি ছিলেন তারা হলেন—সচিব ড. মহীউদ্দীন খান আলমগীর, সচিব সফিউর রহমান, সহকারী আইজি পুলিশ সৈয়দ বি. করিম, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সাবেক একান্ত সচিব মুক্তাদির চৌধুরী, সহকারী সচিব আবু আলম শহীদ খান, মহিউদ্দিন চৌধুরী। আমাদের বিরুদ্ধে এ মামলা সাত বছর চলে। মহাজোট সরকার ক্ষমতায় এসে মামলা থেকে অব্যাহতি দেয়। আমাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ ছিল, মেয়র মোহাম্মদ হানিফের সাথে জনতার মঞ্চ করে আমরা ১৯৯৬ সালে বিএনপি সরকারকে ক্ষমতাচ্যুত করেছি। ১৯৯৬ সালের ১৫ ফেব্রুয়ারি ভোটারবিহীন নির্বাচন করে বিএনপি ক্ষমতায় এসেছিল। সে সময় বাংলাদেশে সকল কর্মকর্তা-কর্মচারী বেআইনি সরকারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছিল। আমাদের উদ্দেশ্য ছিল মুক্তিযুদ্ধের পক্ষের সরকার প্রতিষ্ঠা করা।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে নিয়ে কয়েকশ' গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে। বিশ্বে কোনো নেতাকে নিয়ে এত লেখালেখি হয়েছে বলে আমার জানা নেই। আমার লেখা 'বঙ্গবন্ধু' গ্রন্থ ইসলামিক ফাউন্ডেশন প্রকাশ করেছে। যে মহান নেতার হত্যার প্রতিবাদ করায় আমাকে চাকরিচ্যুত করা হয়, পদোন্নতি বঞ্চিত করা হয়– সেই নেতার জীবনীগ্রন্থ লেখার সৌভাগ্য আমার হয়েছে। আমরা গর্বিত যে আজ বঙ্গবন্ধু বাংলাদেশে সুপ্রতিষ্ঠিত। আমি আশা করি, তাঁর কন্যা শেখ হাসিনা তাঁর পিতার আদর্শ প্রতিষ্ঠা করতে পারবেন।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জীবন আদর্শ—গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্র, জাতীয়তাবাদ, ধর্মনিরপেক্ষতা। তিনি চেয়েছিলেন শোষণহীন সমাজব্যবস্থা। তাঁর স্বপ্ন আজো বাস্তবায়িত হয়নি। তাঁর কন্যা শেখ হাসিনা দু'বার প্রধানমন্ত্রী

হয়েছেন। তিনি অনেক ক্ষেত্রে সফলতা অর্জন করেছেন; তবে ব্যর্থতাও কম নয়।

আমরা আশা করি, বাংলাদেশ ক্ষুধা, দুর্নীতি, সন্ত্রাস ও দারিদ্র্যমুক্ত হবে—বাংলাদেশ সমৃদ্ধশালী হলে বঙ্গবন্ধু জনগণের মাঝে বেঁচে থাকবেন।

১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট বঙ্গবন্ধু সপরিবারে নিহত হবার পর বঙ্গবন্ধু ও মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস মুছে ফেলার অপচেষ্টা চলে। দেশে লেখক-সমাজ বঙ্গবন্ধু ও মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস সংরক্ষণে অবিরাম সংগ্রাম করেছে। বঙ্গবন্ধু আজ প্রতিষ্ঠিত। স্বাধীনতাবিরোধীদের চক্রান্ত চলছে– সুতরাং তাঁর কন্যা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে ঐকমত্যের ভিত্তিতে দেশ পরিচালনা করতে হবে। মনে রাখতে হবে, ইতিহাসে একবার ভুল হলে জাতিকে চরম মূল্য দিতে হয়।

'বঙ্গবন্ধু' গ্রন্থ এক হাজার পৃষ্ঠার বেশি বিশাল গ্রন্থ। সবার পক্ষে পড়া সম্ভব নয়—বিশেষ করে ছাত্র-যুবক ও সাধারণ পাঠকের জন্য সংক্ষিপ্ত গ্রন্থ প্রয়োজন—এ কারণে আমি বঙ্গবন্ধুর জীবনী গ্রন্থ ৩শ' পৃষ্ঠায় প্রকাশ করছি। আমি দীর্ঘ ৩৫ বছর ধরে বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে গবেষণা করছি—তাঁর সম্পর্কে লিখছি। আমার বিশ্বাস বঙ্গবন্ধু পরপার থেকে আমাকে আশীর্বাদ করছেন। ২০১১ সালের মার্চ মাসে আমি স্বপ্নে দেখি বঙ্গবন্ধু আমার বাবুগঞ্জের বাসভবনে বসে আছেন। আমি তাঁকে দেখে বললাম—'বঙ্গবন্ধু, আপনাকে যেদিন হত্যা করা হয়, সেদিন আমি ব্যতীত কেউ সশস্ত্র প্রতিরোধ করেনি।' আমার কথা শুনে তিনি কাঁদলেন।

আমি বঙ্গবন্ধু, তাঁর পরিবারের সদস্য ও জাতীয় চারনেতার আত্মার শান্তি কামনা করছি।

জয় বাংলা।

জয় বঙ্গবন্ধু।

ডিসেম্বর ২০১১

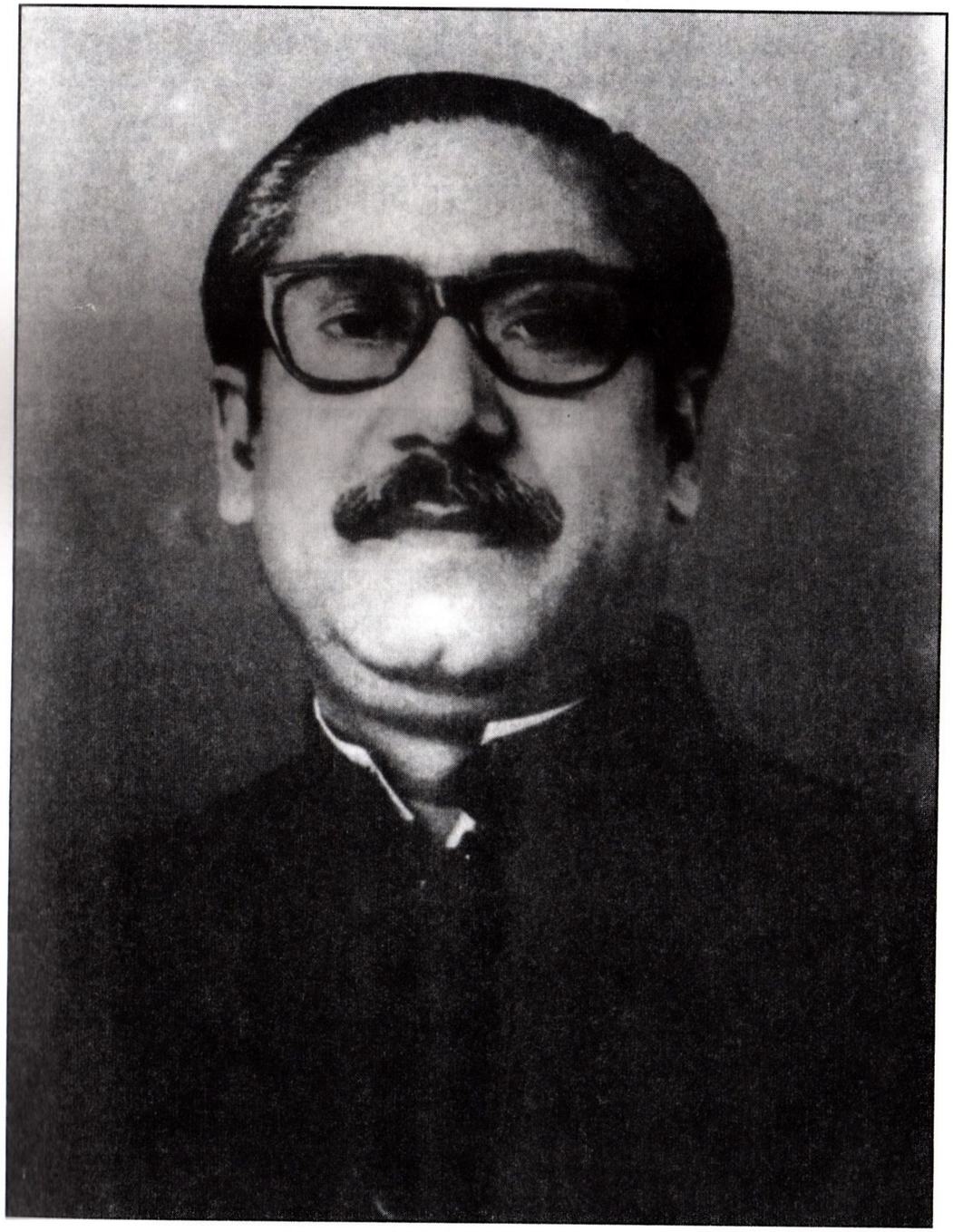
৬২৫, বড় মগবাজার, ঢাকা-১২১৭

পঞ্চম সংস্করণ

২০১২ সালে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সাড়া জাগানো 'অসমাপ্ত আত্মজীবনী' প্রকাশিত হয়েছে। তাঁর অসমাপ্ত আত্মজীবনী এবং অন্যান্য তথ্যের ভিত্তিতে আমার লেখা জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান গ্রন্থটির পঞ্চম সংস্করণ প্রকাশিত হলো। এই গ্রন্থ লেখার প্রধান সহায়তাকারী আমার স্ত্রী প্রফেসর বেগম ফিরোজা ২০১৩ সালের ২৬ ফেব্রুয়ারি ইন্তেকাল করেছেন। তার মৃত্যু আমার জীবনে অপূরণীয় ক্ষতি।

–লেখক

১৬ ডিসেম্বর ২০১৪



জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান

অধ্যায় ১

টুঙ্গিপাড়ার শেখ বংশ

শেখ মুজিবুর রহমানের বাল্যজীবন

"শোনো, একটি মুজিবরের কণ্ঠ থেকে
লক্ষ মুজিবরের কণ্ঠস্বরের ধ্বনি, প্রতিধ্বনি
আকাশে বাতাসে ওঠে রণি–
বাংলাদেশ, আমার বাংলাদেশ।"

বাঙালি জাতির জনক, স্বাধীন বাংলাদেশের প্রতিষ্ঠাতা, বাঙালি জাতির মহাবিদ্রোহের মহানায়ক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বাঙালি জাতির হাজার বছরের সর্বশ্রেষ্ঠ সন্তান। বাঙালি জাতির আত্মপ্রতিষ্ঠা ও জাতীয় ঐক্য গঠনের যে বিরামহীন সংগ্রাম প্রাগৈতিহাসিক যুগ থেকে শুরু হয়েছে, সেই সংগ্রাম বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে ১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর জয়লাভ করে। বাঙালি জাতি বিশ্বের বুকে মহান স্বাধীন জাতি হিসেবে স্বীকৃতি পায়। মানব ইতিহাসে বাঙালি জাতির অভ্যুদয় এক যুগান্তকারী ঘটনা। এ যুগান্তকারী ইতিহাসের স্রষ্টা মহান জাতির মহান নেতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান।

শেখ বংশ

বৃহত্তর ফরিদপুরের গোপালগঞ্জ জেলার টুঙ্গিপাড়ার শেখ বংশ বাংলাদেশের একটি ঐতিহাসিক পরিবার। শেখ বংশ ইসলাম ধর্ম প্রচার, সমাজ উন্নয়ন, স্বাধীন বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠায় বিশেষ ভূমিকা পালন করেছে। জাতির জনক শেখ মুজিবুর রহমান এবং গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার আপোসহীন সংগ্রামী জননেত্রী শেখ হাসিনা গোপালগঞ্জ শেখ পরিবারের গর্বিত সন্তান।

প্রায় তিন শ' বছর পূর্বে ইসলাম ধর্ম প্রচারের জন্য শেখ বংশের আদিপুরুষ শেখ আউয়াল ইরাক থেকে চট্টগ্রাম আসেন। কথিত আছে যে, তিনি হযরত বায়েজিদ বোস্তামীর শিষ্যদের সাথে চট্টগ্রাম এসেছিলেন। কিন্তু এ কথা সঠিক

নয়। হযরত বায়েজিদ বোস্তামী চতুর্দশ শতকে চট্টগ্রাম আসেন। হযরত শেখ আউয়াল অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথম দিকে চট্টগ্রামে আসেন। হযরত শেখ আউয়াল ইরাকের রাজধানী বাগদাদের হাসনাবাদ নামক স্থানে জন্মগ্রহণ করেন। হযরত শেখ আউয়াল চট্টগ্রামে কয়েক বছর ধর্ম প্রচারের পর ঢাকার সোনারগাঁওয়ে ধর্ম প্রচারের জন্য আগমন করেন। সোনারগাঁও গৌড়ের সুলতানের রাজধানী ও সামুদ্রিক নদী বন্দর ছিল। তিনি স্থানীয় এক মহিলাকে বিয়ে করে সোনারগাঁওয়ে বসতি স্থাপন করেন। বাংলার প্রাকৃতিক সৌন্দর্য ও সম্পদ তাঁকে মোহিত করে। শেখ আউয়ালের পুত্র শেখ জহিরুদ্দিন ধর্ম প্রচারের সাথে জীবিকা নির্বাহের জন্য ব্যবসা শুরু করেন। তিনি কলকাতায় ব্যবসা করতেন। ব্যবসা উপলক্ষে বাংলার বিভিন্ন অঞ্চলের সাথে তাঁর পরিচয় ছিল।

আঠার শতকের প্রথম ভাগে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি বাংলার বাণিজ্য দখল করে নেয়। কলকাতা ছিল ইংরেজদের বাণিজ্য কেন্দ্র। আঠার ও উনিশ শতকে বাংলার কয়েকটি বাঙালি পরিবার ব্যবসা ক্ষেত্রে এগিয়ে আসে। শেখ পরিবার মুসলমানদের মধ্যে ব্যবসা ক্ষেত্রে অগ্রণী ভূমিকা পালন করে। শেখ জহিরুদ্দিন ফরিদপুরের কান্দিরপাড়ের খন্দকার পরিবারে বিয়ে করেন। তিনি কান্দিরপাড়ে কিছুদিন বসবাস করেন। কিন্তু ব্যবসার কারণে তিনি কলকাতায় স্থায়িভাবে বাস করতেন। তিনি কলকাতাতেই মৃত্যুবরণ করেন। তাঁর সাথে জমিদার রানী রাশমনির বিরোধ ছিল। শেখ জহিরুদ্দিনের পুত্র জান মাহমুদ। জান মাহমুদ ব্যবসা উপলক্ষে পূর্ব বাংলায় আসেন এবং পাটগাতিতে ব্যবসা করতেন। 'মধুমতি' নদীর তীরে টুঙ্গিপাড়া গ্রাম তাকে আকৃষ্ট করে। তিনি টুঙ্গিপাড়ার বাইগার নদীর তীরে বসতি স্থাপন করেন। উনিশ শতকে শেখ পরিবার ইংরেজি শিক্ষা গ্রহণে এগিয়ে আসেন। আরবী, ফার্সী ও ইংরেজী ভাষায় শেখ পরিবার অভিজ্ঞ ছিল।

শেখ জান মাহমুদের পুত্র শেখ বোরহানউদ্দিন। শেখ বোরহানউদ্দিন টুঙ্গিপাড়ার কাজী পরিবারে বিয়ে করেন। শেখ পরিবারের অনেকে পূর্ববঙ্গে চলে আসেন এবং কয়েকজন কলকাতায় থেকে যান। শেখ পরিবার কলকাতা থেকে রাজমিস্ত্রী, ইট, সুরকি এনে ১৮৫৪ সালে টুঙ্গিপাড়ায় পাকা ভবন নির্মাণ করে। বাড়িতে কয়েকটি পাকা ভবন ছিল। ১৯৭১ সালে পাকবাহিনী দুটো পাকা ভবনসহ অনেক ঘর ধ্বংস করে ফেলে।

শেখ কুদরত উল্লাহ্ ওরফে কদু শেখ-এর অনেক সওদাগরী বড় বড় নৌকা ছিল। এ নৌকাগুলো খুলনা জেলার আঠার বাকী নদী হয়ে ও দেশের বিভিন্ন এলাকায় পণ্যের ব্যবসা করতো। আঠার বাকী নদীর তীরে রেনী সাহেবের

নীল চাষের খামার ছিল। তিনি নৌকার মাঝিদের দিয়ে বিনামূল্যে নীল চাষ ও জঙ্গল পরিষ্কার করাতো। রেনী সাহেব কুদরত উল্লাহর অনেক নৌকা আটক করে টোল আদায় করতে চায়। কুদরত উল্লাহ এ বেআইনী কাজের প্রতিবাদ জানায়। কিন্তু রেলী সাহেব তার কথায় কর্ণপাত করেনি। বাধ্য হয়ে শেখ কুদরত উল্লাহ কোলকাতায় হাইকোর্টে মামলা দায়ের করে। কোর্ট কুদরত উল্লাহকে ক্ষতিপূরণের জন্য কত টাকা চায়, তা জানতে চায়। তখন তিনি বলেন, আমার যথেষ্ট টাকা আছে, আমি ক্ষতিপূরণ চাই না। রেনী সাহেবকে আধা পয়সা জরিমানা করলে আমি খুশি। বিচারক রেনী সাহেবকে আধা পয়সা জরিমাণা করেন। এই অপমাণজনক রায়ে রেনী সাহেব নীল চাষ ফেলে ইংল্যান্ডে চলে যান। শেখ পরিবার ১৯ শতকে অত্যন্ত প্রতাপশালী ও ধনাঢ্য পরিবার ছিল।

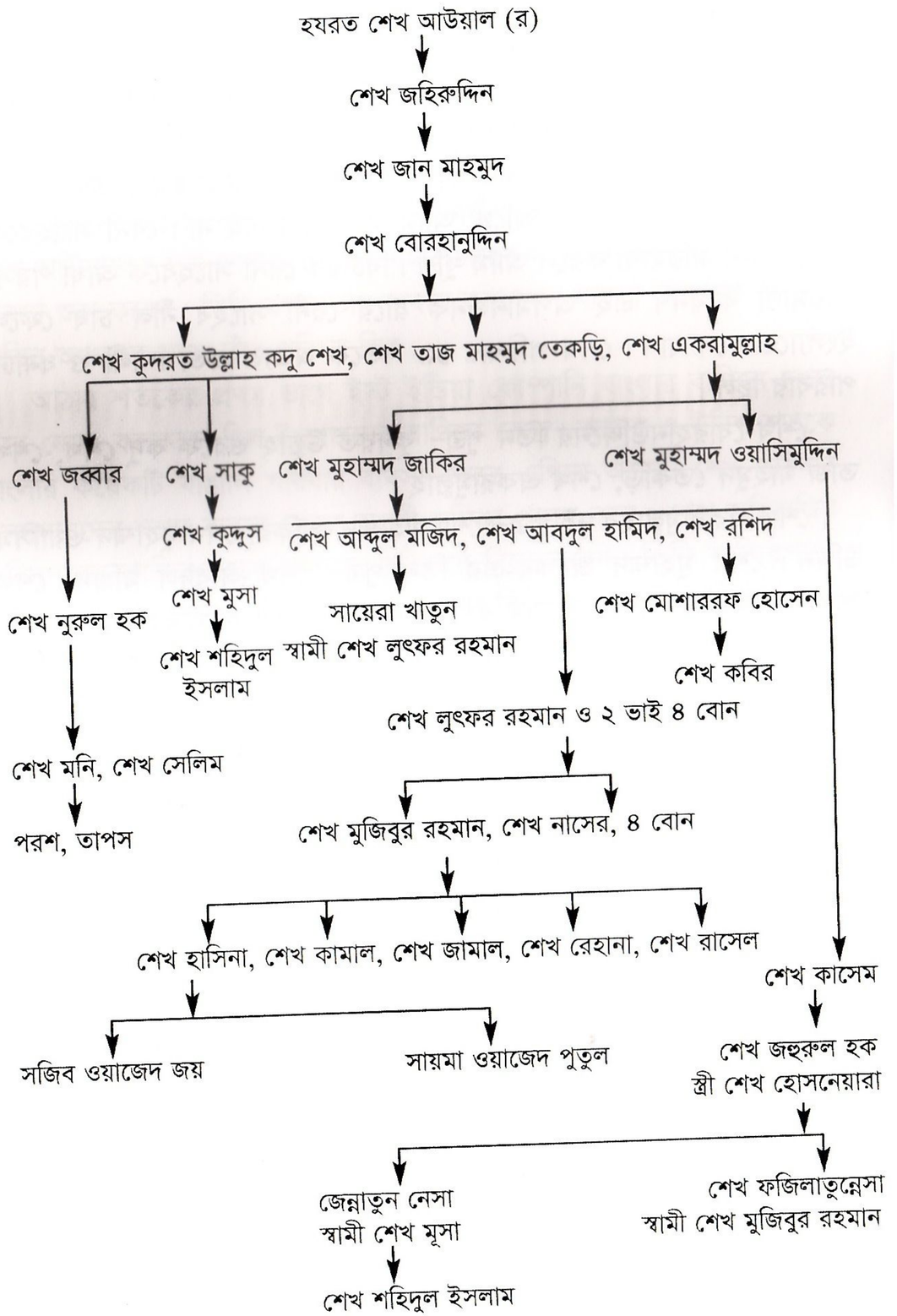
শেখ বোরহানউদ্দিনের তিন পুত্র– কুদরত উল্লাহ ওরফে কদু শেখ, শেখ তাজ মাহমুদ তেকড়ি, শেখ একরামুল্লাহ।

শেখ একরামুল্লাহর দুই পুত্র– শেখ মুহাম্মদ জাকির, শেখ মুহাম্মদ ওয়াসিম উদ্দিন। শেখ মুহাম্মদ জাকির-এর তিন পুত্র– শেখ আবদুল মজিদ, শেখ আবদুল হামিদ ও শেখ আবদুর রশীদ। শেখ আবদুল হামিদের ৩ পুত্র শেখ লুৎফর রহমান, শেখ শফিউর রহমান, শেখ হাবিবুর রহমান এবং ৪ কন্যা। শেখ লুৎফর রহমান-এর পুত্র শেখ মুজিবুর রহমান।

শেখ হামিদের চার কন্যার মধ্যে প্রথম কন্যা সাজু খাতুনের বিয়ে হয় ফরিদপুরের হারু কান্দি খন্দকার মাহমুদ হোসেনের সাথে। মাহমুদ হোসেনের পুত্র খোন্দকার নুরুল হোসেন মিয়া। খোন্দকার নুরুল হোসেন মিয়ার পুত্র ইঞ্জিনিয়ার মোশারফ হোসেন। তার পুত্রের সাথে শেখ হাসিনার কন্যা পুতুলের বিয়ে হয়েছে। শেখ হামিদের দ্বিতীয় কন্যার বিয়ে হয় বরিশালে। তৃতীয় কন্যার বিয়ে হয় ফরিদপুরের ভাঙার বজলুল হকের সাথে। তাদের পুত্র মমিনুল হক খোকা। চতুর্থ কন্যা ছুটুর বিয়ে হয় মাদারীপুরে। তার পুত্র রাজা মিয়া। রাজা মিয়ার পুত্র বাহাউদ্দিন নাসিম। শেখ ওয়াসিম উদ্দিনের পুত্র শেখ কাসেম।

শেখ কাশেমের পুত্র শেখ জহিরুল হক। পিতার জীবিতকালে শেখ জহিরুল হকের মৃত্যু হয় তখন তার দু'কন্যা জিন্নাতুন্নেসার বয়স ছিল ৫ এবং ফজিলাতুন্নেসার বয়স ছিল ৩। দাদা শেখ কাসেম একই পরিবারের শেখ মুহাম্মদ মূসা ও শেখ মুজিবুর রহমানের সাথে দুই নাতনীর বিয়ে দেন। তার সম্পত্তি দুই নাতনীকে লিখে দেন। বড় কন্যা জিন্নাতুন্নেসার পুত্র শেখ শহীদ।

শেখ পরিবারের বংশলতিকা



শেখ কুদরত উল্লাহর পুত্র শেখ আবদুল জব্বার। তার পুত্র শেখ নুরুল হক। তার পুত্র শেখ ফজলুল হক মণি ও শেখ সেলিম। শেখ মণির পুত্র পরশ ও ব্যারিস্টার ফজলে নূর তাপস। শেখ কুদরত উল্লার আর এক ছেলে শেখ সাকু, শেখ সাকুর পুত্র শেখ কুদ্দুস, তার পুত্র শেখ মুসা, শেখ মুসার পুত্র ছাত্রলীগের সাবেক সভাপতি এবং মন্ত্রী শেখ শহিদুল ইসলাম।

শৈশবকাল

শেখ লুৎফর রহমান বিয়ে করেন চাচাত বোন শেখ আবদুল মজিদের কন্যা সায়েরা খাতুনকে। শেখ লুৎফর রহমান ও সায়েরা খাতুনের চার কন্যা ফাতেমা বেগম, আছিয়া বেগম, আমেনা বেগম হেলেন, খোদেজা বেগম লিলি এবং দু'পুত্র শেখ মুজিবুর রহমান এবং শেখ নাসের। দুই বোনের পর শেখ মুজিবুর রহমানের জন্ম। শেখ মুজিবুর রহমান ১৯২০ সালের ১৭ মার্চ বাংলা ১৩২৭ সালের ২০ চৈত্র মঙ্গলবার রাত ৮ ঘটিকায় টুঙ্গিপাড়ার শেখ বাড়িতে জন্মগ্রহণ করেন। পিতা-মাতা তাঁকে আদর করে খোকা বলে ডাকতেন। নানা শেখ আব্দুল মজিদ খোকনের নাম রাখেন শেখ মুজিবুর রহমান। তিনি ছিপছিপে, শ্যামলা, সুশ্রী ও লম্বা ছিলেন। পিতা-মাতা ছিলেন আদর্শবান ও ধার্মিক। তাঁরা খোকাকে আদর্শ সন্তান হিসেবে গড়ে তোলেন। শেখ মুজিবুর রহমানের বাল্যকাল টুঙ্গিপাড়া গ্রামেই কাটে। টুঙ্গিপাড়া প্রথমে কোটালীপাড়া ও পরে গোপালগঞ্জ থানার অন্তর্গত ছিল। স্বাধীনতার পর টুঙ্গিপাড়াকে পৃথক থানা ঘোষণা করা হয়। ষষ্ঠ শতকে কোটালীপাড়াকে কেন্দ্র করে দক্ষিণ বাংলায় একটি স্বাধীন রাজ্য গড়ে ওঠে। কে জানত এই দক্ষিণ বাংলার আর একজন বীরসন্তান স্বাধীন বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠা করবেন।

টুঙ্গিপাড়া গ্রামেই শেখ মুজিবুর রহমান শৈশবে রূপসী বাংলাকে দেখেছেন। তিনি আবহমান বাংলার আলো-বাতাসে লালিত ও বর্ধিত হয়েছেন। তিনি শাশ্বত গ্রামীণ সমাজের সুখ-দুঃখ, হাসি-কান্না ছেলেবেলা থেকে গভীরভাবে প্রত্যক্ষ করেছেন। গ্রামের মাটি আর মানুষ তাঁকে প্রবলভাবে আকর্ষণ করতো। শৈশব থেকে তৎকালীন সমাজজীবনে তিনি জমিদার, তালুকদার ও মহাজনদের অত্যাচার, শোষণ ও প্রজা পীড়ন দেখেছেন। শিশুকালে তিনি চঞ্চল ও অন্যায়ের প্রতি আপোসহীন ছিলেন। সমাজ ও পরিবেশ তাঁকে বাল্যকাল থেকেই অন্যায়ের প্রতিবাদ করতে শিখিয়েছে। তাই পরবর্তী জীবনে তিনি কোন শক্তির কাছে, সে যত বড়ই হোক আত্মসমর্পণ করেননি। শেখ মুজিবুর রহমান পিতা-মাতার প্রথম পুত্র। তাই পরিবারে তাঁর আদর ছিল বেশি। তিনি ছিলেন স্বল্পভোজী, নিরামিষ বেশি খেতেন। বেতাগা, ডুমুর, কাঁচা কলা ও মাছ ভালবাসতেন। কৈ, শিং, চিংড়ি ছিল তাঁর প্রিয় মাছ। খাওয়া-দাওয়ার চাইতে খেলা নিয়েই ব্যস্ত থাকতেন বেশি।

বোনদের সাথে শেখ মুজিবুর রহমানের বাল্যশিক্ষা বাড়িতেই শুরু হয়। তাঁর

গৃহশিক্ষক ছিলেন পন্ডিত সাখাওয়াতুল্লাহ। শেখ মুজিবুর রহমান টুঙ্গিপাড়ার গিমাডাঙ্গা ও টুঙ্গিপাড়া প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভর্তি হন। গিমাডাঙ্গা বিদ্যালয়ে তিনি তৃতীয় শ্রেণী পর্যন্ত পড়েন। তাঁর দাদা শেখ আবদুর রশিদ গিমাডাঙ্গা প্রাথমিক বিদ্যালয়কে এম.ই. স্কুলে উন্নীত করেন।

১৯৩৩ সালে শেখ মুজিবুর রহমানের সাথে ফজিলাতুন্নেসার বিয়ে হয়। এ সময় শেখ মুজিবুর রহমানের বয়স ১৩ বছর এবং ফজিলাতুন্নেসার বয়স ৩ বছর। ফজিলাতুন্নেসা ১৯৩০ সালের ৮ আগস্ট টুঙ্গিপাড়া শেখ পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তার পিতা শেখ জহিরুল হক এবং মাতা হোসনে আরা। ফজিলাতুন্নেসার বড় বোন জিন্নাতুন নেসার বিয়ে হয় শেখ মুসার সাথে। তাদের পুত্র সাবেক ছাত্রলীগ নেতা মন্ত্রী শেখ শহিদুল ইসলাম। ফজিলাতুন্নেসা ৭ বছরের মধ্যে পিতা-মাতাকে হারান। শেখ মুজিবের মাতা তাঁকে লালন-পালন করেন। পরে ১৯৩৯ সালে আনুষ্ঠানিক বিয়ে হয়। এ সময় শেখ মুজিবুর রহমানের বয়স ছিল ১৯ বছর এবং ফজিলাতুন্নেসার বয়স ৯ বছর। বঙ্গবন্ধু তাঁর বিয়ে সম্পর্কে বলেন : "যদিও আমাদের বিবাহ হয়েছে ছোট বেলায়। ১৯৪২ সালে আমাদের ফুলসজ্জা হয়।" তাঁদের এ বিয়ে ছিল পরম সুখের। শত দুঃখের মধ্যেও ফজিলাতুন্নেসা ধৈর্য ও সাহস হারাননি। শেখ মুজিবুর রহমানের সাফল্যের পিছনে ছিল তাঁর সীমাহীন অবদান।

শেখ লুৎফর রহমান গোপালগঞ্জ দেওয়ানী আদালতের সেরেস্তাদার ছিলেন। গোপালগঞ্জে তাঁর বাসভবন ছিল। শেখ মুজিবুর রহমানকে গোপালগঞ্জ পাবলিক স্কুলে ভর্তি করা হয়। ১৯৩৪ সালে তিনি ৭ম শ্রেণীতে পড়ার সময় বেরিবেরি রোগে আক্রান্ত হন। তার হৃদযন্ত্র দুর্বল হয়ে পড়ে। তার পিতা তাকে কলকাতা চিকিৎসার জন্য নিয়ে যান। ডাঃ শিব পদ ভট্টাচার্য ও একে রায় চৌধুরী তার চিকিৎসা করেন। এভাবে তার দু'বছর চলে। ১৯৩৬ সালে তার পিতা মাদারীপুরে সেরেস্তাদার হয়ে বদলি হন। তিনি মাদারীপুর হাইস্কুলে ৭ম শ্রেণীতে ভর্তি হন। এ সময় তার চোখ খারাপ হয়ে পড়ে। গ্লোকমা নামে একটি রোগ হয়। চিকিৎসার জন্য তার পিতা তাকে কলকাতা নিয়ে যান। ডাঃ টি আহম্মেদ তার চক্ষু অপারেশন করেন। ভাল হয়ে তিনি ১৯৩৬ সাল থেকে চশমা পড়া শুরু করেন।

১৯৩৭ সালে তিনি গোপালগঞ্জ মিশন স্কুলে ৭ম শ্রেণীতে ভর্তি হন। তার পিতা কাজী আবদুল হামিদ এম.এস.সি কে তার গৃহশিক্ষক নিয়োগ করেন। শেখ মুজিব হামিদ মাস্টারের নিকট বিপ্লবীদের কথা শুনেছেন; ইংরেজবিরোধী সশস্ত্র আন্দোলন ও ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের কাহিনী শুনে রাজনীতিতে অংশগ্রহণে অনুপ্রাণিত হন। চট্টগ্রামে অস্ত্রাগার লুণ্ঠন ও মাস্টারদার ঘটনা তখন যুব সমাজকে স্বাধীনতা সংগ্রামে অনুপ্রাণিত করেছে। শেখ মুজিব ত্রিশের দশকে

তাঁর গৃহশিক্ষক আব্দুল হামিদ মাস্টার দ্বারা বিশেষভাবে প্রভাবিত হয়েছিলেন এবং তাঁর নিকট শেখ মুজিব রাজনীতির প্রাথমিক শিক্ষা লাভ করেন। পরবর্তী জীবনে শেখ মুজিব রাজনৈতিক কারণে যখনই গ্রেফতার হয়েছেন তখনই তাঁর মা হামিদ মাস্টারের নাম উচ্চারণ করে কাঁদতেন। তাহলে বোঝা যায় যে, শেখ মুজিব হামিদ মাস্টারের প্রভাবে রাজনীতিতে অংশ নিয়েছেন। সমাজ সেবায়ও তিনি শিক্ষকের নিকট অনুপ্রেরণা পেয়েছেন। তাঁর শিক্ষক একটি সংগঠন গড়ে তোলেন এবং তার মাধ্যমে বাড়ি বাড়ি থেকে চাল, ধান সংগ্রহ করে ধর্মগোলা প্রতিষ্ঠা করেন। ধর্মগোলা থেকে চাল ও অর্থ দিয়ে তিনি গরীবকে সাহায্য করতেন। মানুষের সেবা করার প্রশিক্ষণ তিনি শৈশবেই পেয়েছেন।

মিশন স্কুলটি খ্রিস্টানদের দ্বারা পরিচালিত হতো। জাতিভেদ প্রথার জন্য তখন মিশন স্কুলে ভর্তি ও সামনের বেঞ্চে বসা মুসলমান ছাত্রদের জন্য কঠিন ব্যাপার ছিল। শেখ মুজিব ছোটবেলা থেকে ভীষণ জেদী ও সাম্প্রদায়িকতা-বিরোধী ছিলেন। তিনি জেদ করে মিশন স্কুলে ভর্তি হন ও সামনের বেঞ্চে বসেন। হেড মাস্টার ছিলেন শ্রী গিরিশ বাবু। হেডমাস্টার তাঁকে খুব ভালবাসতেন। ইতিহাস ছিল তাঁর প্রিয় বিষয়। তাঁর প্রিয় খেলা ছিল ফুটবল ও ভলিবল। তিনি ছিলেন ডানপিটে। ভয় তাঁর ছিল না। ছাত্ররা স্কুলে তাঁকে মুজিব ভাই বলে ডাকতো। স্কুলে পড়া অবস্থায় তাঁর মধ্যে নেতৃত্বের বিকাশ ঘটতে থাকে।

মিশন স্কুলে থাকাকালে তার জীবনে কয়েকটি ঘটনা ঘটে। তিনি ভবিষ্যতে যে, জাতীয় নেতা হবেন তার পূর্বাভাস পাওয়া যায়। মিশন স্কুলের প্রধান শিক্ষক ছিলেন গিরিশ বাবু। তিনি ছিলেন আদর্শবান শিক্ষক। শেখ মুজিব তাকে খুব শ্রদ্ধা করতেন।

একবার টুঙ্গি পাড়ায় দুর্ভিক্ষ দেখা দেয়। গ্রামের মানুষ না খেয়ে আছে। এ দৃশ্য দেখে শেখ মুজিব তাদের ঘরের গোলার ধান গরীবদের মধ্যে বিলিয়ে দেন। পিতা বাড়ি এসে পুত্রের মানবিক গুণ দেখে মুগ্ধ। ছেলে খোকাকে ভর্ৎসনা না করে প্রশংসা করেন।

টুঙ্গীপাড়ায় শেখ পরিবার প্রভাবশালী, তাদের না জানিয়ে এখানকার কয়েক ব্যক্তি পাটগাতি বাজারে একটি হাইস্কুল প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ নেয়। এলাকার তরুণদের নিয়ে সভাস্থলে যায়। শেখ পরিবারের নেতা ইউনিয়ন পরিষদের প্রেসিডেন্ট শেখ আব্দুর রশিদকে সমালোচনা করছে। শেখ মুজিব সোজা মঞ্চে উঠে বলেন– যে সভায় গুরুজনদের গালি দেয়া হয়, সে সভায় থাকা যায় না। তিনি দলকে সভা ত্যাগ করতে বলেন। হৈ চৈ করে সভা ত্যাগ করে। সভা ভেঙ্গে যায়। পরে শেখ পরিবারের উদ্যোগেই স্কুলটি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

১৯৩৭ সালে নির্বাচনে এ কে ফজলুল হক বিজয় লাভ করেন। তিনি মুসলিম

লীগের সাথে যুক্ত মন্ত্রিসভা গঠন করেন। ১৯৩৮ সালের ১৬ জানুয়ারি বাংলার প্রধানমন্ত্রী ফজলুল হক, তাঁর বাণিজ্য ও পল্লী উন্নয়ন মন্ত্রী হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী, মৌলবী তমিজ উদ্দিন খান, খাজা সাহাবুদ্দিন, মুকুন্দ মল্লিক গোপালগঞ্জ পরিদর্শনে আসেন। তারা গোপালগঞ্জের টাউন মাঠে এক বিরাট কৃষি মেলা প্রদর্শনী উদ্বোধন করেন। তাঁদের আগমনে কৃষক-প্রজা পার্টি ও মুসলিম লীগ তাঁদের সংবর্ধনার আয়োজন করে। অন্যদিকে কংগ্রেস মন্ত্রীদের আগমনে বাধার সৃষ্টি করে। শেখ মুজিবুর রহমান ছাত্রদের নিয়ে সংবর্ধনার পক্ষে কাজ করেন। তাঁর সাহসিকতা দেখে কংগ্রেস পিছিয়ে যায়। ফজলুল হক গোপালগঞ্জ পাবলিক হল এবং হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী পরিদর্শন করেন। বিদায়কালে শেখ মুজিবুর রহমান তাঁদের সামনে দাঁড়ান। স্কুলের ছাত্রাবাস সংস্কারের জন্য তিনি দাবি জানান। ফজলুল হক স্কুল পুনর্নির্মাণের জন্য ১২০০ টাকা বরাদ্দ করেন।

বাংলার দু'মহান নেতার সাথে শেখ মুজিবুর রহমানের এটাই ছিল প্রথম সাক্ষাত। প্রথম সাক্ষাতে তাঁরা শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতিভার পরিচয় পান। তাঁদের এ পরিচয় পরবর্তীকালে আরো ঘনিষ্ঠ হয়, বিশেষ করে হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী তাঁকে আপন করে নেন এবং তাঁকে নেতা হিসেবে গড়ে তোলেন। মন্ত্রীদের চলে যাবার পর কংগ্রেস কর্মীদের অভিযোগে শেখ মুজিবুর রহমান বন্দী হন। সাত দিন হাজতবাসের পর তিনি মুক্তি লাভ করেন। ১৮ বছর বয়সে তাঁর বন্দী জীবনের অভিজ্ঞতা হয়। জেলের প্রথম অভিজ্ঞতা সম্পর্কে তিনি বলেছেন, "আমার যে দিন প্রথম জেল হয়, সে দিন থেকেই আমার নাবালকত্ব ঘুচেছে বোধ হয়।" গোপালগঞ্জে কংগ্রেস শক্তিশালী ছিল। কংগ্রেসের নেতৃত্বে ছিলেন– নীলকান্ত ঘোষ, রায় বাহাদুর শরৎচন্দ্র বল, রমেশ চন্দ্র সেন, গোপাল চন্দ্র মুখার্জী, যতীন্দ্র নাথ বাগচী, শতীস চন্দ্র হীরা। কংগ্রেসের পাশাপাশি মুসলিম লীগ শক্তিশালী ছিল না। গোপালগঞ্জে মুসলমানদের প্রথম নেতৃত্বে আসেন আবদুল কাদের মোক্তার, আবদুল লতীফ মোক্তার, উকিল খোন্দকার সামুদ্দিন আহমেদ। শেখ মুজিবুর রহমান স্কুল জীবনেই গোপালগঞ্জে মুসলিম লীগের নেতৃত্বের সংস্পর্শে আসেন।

১৯৩৮ সালের মার্চ এপ্রিল মাসে গোপালগঞ্জে হিন্দু-মুসলমানের বিরোধ দেখা দেয়। শেখ মুজিবুর রহমানের সহপাঠী আবদুল মালেককে হিন্দু মহাসভা সভাপতি সুরেন ব্যানার্জির বাড়িতে নিয়ে মারপিট করেছে। শেখ মুজিব তার দলীয় ছাত্রদের নিয়ে মালেককে উদ্ধার করতে যায়। রমাপদ শেখ মুজিবকে দেখে লাঠি দিয়ে আঘাত করতে যায়। শেখ মুজিব পাল্টা আঘাত করে রমাপদের মাথা ফাটিয়ে দেন এবং মালেককে কেড়ে নিয়ে চলে আসে। রাতে কংগ্রেস নেতারা খন্দকার শামসুল হক মোক্তার শেখ মুজিব, মালেকের বিরুদ্ধে ফৌজদারি মামলা

করে, তাদের সকলকে জিজ্ঞাসা করে থানায় এবং পরে জেলে পাঠিয়ে দেয়। দুই পক্ষ আলোচনান্তে মামলা প্রত্যাহারের সিদ্ধান্ত হয়– ক্ষতিপূরণ দিতে হবে পনরশ টাকা, দশদিনের মধ্যে সকলে জামিন পায়, "এই আমার জীবনে প্রথম জেল।"

তিনি নবম শ্রেণীর ছাত্র। স্কুলের শিক্ষক রসরঞ্জন সেনগুপ্তের বাসায় প্রাইভেট পড়তেন। একদিন তার বাসা থেকে ফেরার পথে দেখেন এক বালক খালি গায়ে শীতে কষ্ট পাচ্ছে। শেখ মুজিব নিজের শার্ট তাকে দিয়ে তিনি চাদর গায়ে বাসায় ফেরেন। পিতা পুত্রের অসহায় মানুষের প্রতি দরদ দেখে বিস্মিত হলেন। নবম শ্রেণীর ছাত্র থাকাকালে তার জীবনে আর একটি ঘটনায় তাঁর নেতৃত্বের প্রমাণ পাওয়া যায়।

শেখ মুজিব ১৯৩৯ সালে কলকাতা বেড়াতে যান এবং শহীদ সোহরাওয়ার্দীর সাথে দেখা করেন। তিনি গোপালগঞ্জে মুসলিম লীগ ও ছাত্রলীগ গঠন করার কথা বলেন। খন্দকার শামসুদ্দিন এমএলএ সাহেব ছাত্রলীগের সভাপতি ও শেখ মুজিব সম্পাদক হলেন। মুসলিম লীগ গঠিত হল কিন্তু সংগঠনের কাজ চালাতেন শেখ মুজিব। মুসলিম লীগ ডিফেন্স কমিটি গঠন করে শেখ মুজিবকে সম্পাদক করে। "আমি আস্তে আস্তে রাজনীতির মধ্যে প্রবেশ করলাম। আব্বা আমাকে বাধা দিতেন না, শুধু বলতেন, লেখাপড়ার দিকে নজর দেবে।" শেখ মুজিব মিশন স্কুলের ক্যাপ্টেন ছিলেন। তার ফুটবল খেলার টীম ছিল। তার পিতা অফিসার্স ক্লাবের সম্পাদক ছিলেন। তারও টীম ছিল। ১৯৪০ সালে স্কুলের টীমের কাছে অফিসার্স ক্লাব প্রাই হের যেত।

১৯৪০ সাল। শেখ মুজিবুর রহমান দশম শ্রেণীর ছাত্র। স্কুলের প্রধান শিক্ষক বিলাস বাবু। স্কুলের মাঠে ছাত্রদের সভা হবে। তখন গোপালগঞ্জে রাজনৈতিক নেতা ছিলেন খন্দকার শামসুদ্দীন আহমদ এমএলএ ও তাঁর জামাতা অহিদুজ্জামান ঠাণ্ডা মিয়া। অহিদুজ্জামানের পিতা আবদুল কাদের মোক্তার ছাত্রসভা হতে দেবেন না। তিনি এসডিও-কে দিয়ে সভা বন্ধ করান। ছাত্ররা মসজিদের কাছে সভা করে। শেখ মুজিবুর রহমান ছাত্রদের উদ্দেশে ভাষণ দিচ্ছেন। এ সময় পুলিশ তাঁকে গ্রেফতার করে নিয়ে যায়। ছাত্রদের দাবির প্রেক্ষিতে কোর্ট থেকে তিনি মুক্তি লাভ করেন।

আর একবার হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী ও মুসলিম লীগের সম্পাদক আবুল হাশিম গোপালগঞ্জে জনসভা করেন। তখন একটি গোলযোগের অভিযোগে আবদুল কাদের মোক্তার শেখ মুজিবুর রহমানসহ কয়েকজন ছাত্রকে গ্রেফতার করান। পরে তিনি মুক্তি লাভ করেন। স্কুল জীবনে শেখ মুজিবুর রহমান গোপালগঞ্জ ওয়ান্ডারার্স ফুটবল টিমে খেলতেন। একজন খেলোয়াড় হিসেবে তাঁর

দলীয় ছবি আছে। তিনি গুরুসদয় দত্ত প্রবর্তিত ব্রতচারী প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন। তিনি স্কুলে ছাত্র ও পাড়া-প্রতিবেশী ছেলেদের নিয়ে ব্রতচারী নাচ-গান করতেন। তাঁর কণ্ঠে ধ্বনিত হতো–

"ও আমার বাংলাদেশের মাটি
তোমায় রাখব পরিপাটি"

গরিব ছাত্র ও গরিবদের জন্য তিনি সহপাঠীদের নিয়ে মুষ্টি সংগ্রহ করতেন। তাঁর চাচা খান সাহেব শেখ আব্দুর রশিদ নসু মিয়া এবং তাঁর পুত্র খান সাহেব শেখ মোশারেফ হোসেন শেখ মুজিবুর রহমানকে স্নেহ করতেন। তাঁরা উভয়েই পাটগাতি ইউনিয়ন বোর্ডের প্রেসিডেন্ট ছিলেন। শেখ মুজিবুর রহমান তাঁদের সমাজসেবামূলক কাজের দ্বারা অনুপ্রাণিত হন।

স্কুল জীবনে শেখ মুজিবুর রহমান একজন প্রগতিশীল রাজনৈতিক কর্মী হিসেবে গড়ে ওঠেন। ১৯৪০ সালে তিনি নিখিল ভারত মুসলিম ছাত্র ফেডারেশনে যোগ দেন। তিনি বঙ্গীয় মুসলিম লীগের কাউন্সিলর নির্বাচিত হন। তিনি গোপালগঞ্জ মুসলিম ডিফেন্স কমিটিরও সেক্রেটারি নিযুক্ত হন। তিনি গোপালগঞ্জ মুসলিম সেবক সংঘ প্রতিষ্ঠা করেন।

সুভাষচন্দ্র বসুর নেতৃত্বে ১৯৪০ সালের জুন-জুলাই মাসে হলওয়েল মনুমেন্ট অপসারণ আন্দোলনে গোপালগঞ্জ ছাত্রদের সাথে শেখ মুজিবুর রহমান অংশগ্রহণ করেন। নবাব সিরাজউদ্দৌলার নাম কলঙ্কিত করার জন্য মি. হলওয়েল ১৭৫৬ সালে ১৫৬ জন ইংরেজ বন্দীর মৃত্যুর স্মরণে কলকাতায় স্মৃতিস্তম্ভ নির্মাণ করেন এবং সে স্মৃতিস্তম্ভ হলওয়েল মনুমেন্ট নামে পরিচিত ছিল। হলওয়েল মনুমেন্ট জাতীয় পরাধীনতার চিহ্নস্বরূপ। তাই সুভাষচন্দ্র বসু হলওয়েল মনুমেন্ট সরিয়ে নেয়ার জন্য সারা বাংলায় তীব্র আন্দোলন গড়ে তোলেন। পরে বাংলার প্রধানমন্ত্রী এ কে ফজলুল হক হলওয়েল মনুমেন্ট অপসারণ করেন।

১৯৪২ সালের ১২ ফেব্রুয়ারি সিরাজগঞ্জে প্রাদেশিক মুসলিম লীগের সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। মুহাম্মদ আলী জিন্নাহ সম্মেলনে সভাপতিত্ব করেন। শেখ মুজিবুর রহমান ফরিদপুর থেকে এক কর্মী বাহিনী নিয়ে সম্মেলনে যোগদেন। সম্মেলনে তিনি সবসময় মুসলিম লীগের সম্পাদক হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর সাথে ছিলেন। তিনি সিরাজগঞ্জ ও বগুড়ায় মুসলিম ছাত্রলীগ সম্মেলনে নেতৃত্ব দেন। ছাত্রলীগের দু'টি দল ছিল। একদলের নেতা চট্টগ্রামের ফজলুল কাদের চৌধুরী এবং অপরদলের নেতা ওয়াসেফ। ছাত্রনেতাদের মধ্যে ছিলেন সাদেকুর রহমান, আনোয়ার হোসেন, জহিরুদ্দিন, নুরুদ্দিন আহমেদ প্রমুখ। ফরিদপুরে ছাত্রলীগের মধ্যে দ্বন্দ্ব ছিল। ১৯৪২ সালে তিনি ফরিদপুর ছাত্রলীগকে সুসংগঠিত করেন।

১৯৪২ সালে ফরিদপুরে ছাত্রলীগের সম্মেলন অনুষ্ঠিত হবে। কিন্তু সরকার ১৪৪ ধারা জারী করায় সম্মেলন হতে পারে নি। সম্মেলনের প্রধান অতিথি ছিলেন কবি কাজী নজরুল ইসলাম। হুমায়ুন কবীরের বাসভবনে কাজী নজরুল ইসলাম গান পরিবেশন করেন এ সময় শেখ মুজিবুর রহমান সেখানে উপস্থিত ছিলেন। তখন ফরিদপুর জেলা মুসলিম লীগের সভাপতি ছিলেন মোহন মিয়া এবং সম্পাদক ছিলেন সালাম খান।

শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৩৯ সালে নবম ও ১৯৪০ সালে দশম শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হন। গোপালগঞ্জ শহরের রসরঞ্জন সেনগুপ্ত শেখ মুজিবুর রহমানের প্রাইভেট শিক্ষক ছিলেন। শেখ মুজিবুর রহমান তাঁর বাড়ি গিয়ে পড়তেন। ১৯৪২ সালে শেখ মুজিবুর রহমান ২য় বিভাগে ম্যাট্রিক পাস করেন। একদিকে বেশি বয়সে স্কুলে ভর্তি, অন্যদিকে বেরিবেরি রোগে ৩ বছর পড়া বন্ধ থাকায় তিনি ২২ বছর বয়সে ম্যাট্রিক পাস করেন।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান লিখিত অসমাপ্ত আত্মজীবনীতে তাঁর শৈশবকাল সম্পর্কে যে বিবরণ দেন তা নিম্নে উদ্ধৃত হলো :

"আমার জন্ম হয় ফরিদপুর জেলার গোপালগঞ্জ মহকুমার টুঙ্গিপাড়া গ্রামে। আমার ইউনিয়ন হল ফরিদপুর জেলার দক্ষিণ অঞ্চলের সর্বশেষ ইউনিয়ন। এই ইউনিয়নের পাশেই মধুমতি নদী। মধুমতি খুলনা ও ফরিদপুর জেলাকে ভাগ করে রেখেছে।

টুঙ্গিপাড়ার শেখ বংশের নাম কিছুটা এতদঞ্চলে পরিচিত। শেখ পরিবারকে একটা মধ্যবিত্ত পরিবার বলা যেতে পারে। বাড়ির বৃদ্ধ ও দেশের গণ্যমান্য প্রবীণ লোকদের কাছ থেকে এই বংশের কিছু কিছু ঘটনা জানা যায়।

আমার জন্ম হয় এই টুঙ্গিপাড়া শেখ বংশে। শেখ বোরহানউদ্দিন নামে এক ধার্মিক পুরুষ এই বংশের গোড়াপত্তন করেছেন বহুদিন পূর্বে। শেখ বংশের যে একদিন সুদিন ছিল তার প্রমাণস্বরূপ মোগল আমলের ছোট ছোট ইটের দ্বারা তৈরি চকমিলান দালানগুলি আজও আমাদের বাড়ির শ্রীবৃদ্ধি করে আছে। বাড়ির চার ভিটায় চারটা দালান। বাড়ির ভিতরে প্রবেশের একটা মাত্র দরজা, যা আমরাও ছোটসময় দেখেছি বিরাট একটা কাঠের কপাট দিয়ে বন্ধ করা যেত। একটা দালানে আমার এক দাদা থাকতেন। এক দালানে আমার এক মামা আজও কোনোমতে দিন কাটাচ্ছেন। আর একটা দালান ভেঙে পড়েছে, যেখানে বিষাক্ত সর্পকুল দয়া করে আশ্রয় নিয়েছে। এই সকল দালান চুনকাম করার ক্ষমতা আজ তাদের অনেকেরই নাই। এই বংশের অনেকেই এখন এ বাড়ির চারপাশে টিনের

ঘরে বাস করেন। আমি এই টিনের ঘরের এক ঘরেই জন্মগ্রহণ করি।

শেখ বংশ কেমন করে বিরাট সম্পত্তির মালিক থেকে আস্তে আস্তে ধ্বংসের দিকে গিয়েছিল তার কিছু কিছু ঘটনা বাড়ির মুরুব্বিদের কাছ থেকে এবং আমাদের দেশের চারণ কবিদের গান থেকে আমি জেনেছি। এর অধিকাংশ যে সত্য ঘটনা এ সম্বন্ধে আমার কোন সন্দেহ নাই। শেখ বংশের সব গেছে, শুধু আজও তারা পুরাতন স্মৃতি ও পুরানো ইতিহাস বলে গর্ব করে থাকে।

শেখ বোরহানউদ্দিন কোথা থেকে কিভাবে এই মধুমতির তীরে এসে বসবাস করেছিলেন কেউই তা বলতে পারে না। আমাদের বাড়ির দালানগুলির বয়স দুইশত বৎসরেরও বেশি হবে। শেখ বোরহানউদ্দিনের পরে তিন চার পুরুষের কোনো ইতিহাস পাওয়া যায় না। তবে শেখ বোরহারউদ্দিনের ছেলের ছেলে অথবা দু'এক পুরুষ পরে দুই ভাইয়ের ইতিহাস পাওয়া যায়। এঁদের সম্বন্ধে অনেক গল্প আজও শোনা যায়। এক ভাইয়ের নাম শেখ কুদরতউল্লাহ্, আর এক ভাইয়ের নাম শেখ একরামউল্লাহ্। আমরা এখন যারা আছি তারা এই দুই ভাইয়ের বংশধর। এই দুই ভাইয়ের সময়েও শেখ বংশ যথেষ্ট অর্থ ও সম্পদের অধিকারী ছিল। জমিদারির সাথে সাথে তাদের বিরাট ব্যবসাও ছিল। শেখ কুদরতউল্লাহ্ ছিলেন সংসারী ও ব্যবসায়ী; আর শেখ একরামউল্লাহ্ ছিলেন দেশের সরদার, আচার-বিচার তিনিই করতেন।

শেখ কুদরতউল্লাহ্ ছিলেন বড় ভাই। এই সময় ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী বাংলাদেশ দখল করে এবং কলকাতা বন্দর গড়ে তোলে। ইংরেজ কুঠিয়াল সাহেবরা এই দেশে এসে নীল চাষ শুরু করে। শেখ কুদরতউল্লাহ্ সম্বন্ধে একটা গল্প আজও অনেকে বলাবলি করে থাকে এবং গল্পটা সত্য। খুলনা জেলার আলাইপুরে মি. রাইন নামে একজন ইংরেজ কুঠিয়াল সাহেব নীল চাষ করে এবং একটা কুঠি তৈরি করে। আজও সে কুঠিটা আছে। শেখদের নৌকার বহর ছিল। সেইসব নৌকা মাল নিয়ে কলকাতায় যেত। মি. বাইন নৌকা আটক করে মাঝিদের দিয়ে কাজ করাত এবং অনেক দিন পর্যন্ত আটক রাখত। শুধু শেখদের নৌকাই নয় অনেকের নৌকাই আটক রাখত। কেউ বাধা দিলে অকথ্য অত্যাচার করত। তখনকার দিনের ইংরেজের অত্যাচারের কাহিনী প্রায় সকলেরই জানা আছে। শেখরা তখন ও দুর্বল হয়ে পড়ে নাই। রাইনের লোকদের সাথে কয়েক দফা দাঙ্গাহাঙ্গামা হল এবং কোর্টে মামলা দায়ের হল। মামলায় প্রমাণ হল রাইন অন্যায় করেছে। কোর্ট শেখ কুদরতউল্লাহ্কে বলল, যত টাকা ক্ষতি হয়েছে জরিমানা করুন, রাইন দিতে বাধ্য। ঐ যুগে এইভাবেই বিচার হত। শেখ কুদরতউল্লাহ রাইনকে অপমান করার জন্য 'আধা পয়সা' জরিমানা করল। রাইন

বলেছিল, "যত টাকা চান দিতে রাজি আছি, আমাকে অপমান করবেন না। তাহলে ইংরেজ সমাজ আমাকে গ্রহণ করবে না; কারণ, 'কালা আদমি' আধা পয়সা জরিমানা করেছে।" কুদরতউল্লাহ্ শেখ উত্তর করেছিল বলে কথিত আছে, "টাকা আমি গুনি না, মেপে রাখি। টাকার আমার দরকার নাই। তুমি আমার লোকের উপর অত্যাচার করেছ; আমি প্রতিশোধ নিলাম।" কুদরতউল্লাহ্ শেখকে লোকে 'কদু শেখ' বলে ডাকত। আজও খুলনা ও ফরিদপুরের বৃদ্ধ মানুষ বলে থাকে এই গল্পটা মুখে মুখে। 'কুদরতউল্লাহ্ শেখের আধা পয়সা জরিমানার', দু-একটা গানও আছে। আমি একবার মিটিং করতে যাই বাগেরহাট, আমার সাথে জিল্লুর রহমান এডভোকেট ছিল। ট্রেনের মধ্যে আমার পরিচয় পেয়ে এক বৃদ্ধ এই গল্পটা আমাকে বলেছিলেন। খুলনা জেলায় গল্পটা বেশি পরিচিত।

শেখ কুদরতউল্লাহ্ ও একরামউল্লাহ্ শেখের মৃত্যুর দুই এক পুরুষ পর থেকেই শেখ বাড়ির পতন শুরু হয়। পর পর কয়েকটা ঘটনার পরেই শেখদের আভিজাত্যটাই থাকল, অর্থ ও সম্পদ শেষ হয়ে গেল।

ইংরেজরা মুসলমানদের ভাল চোখে দেখত না। প্রথম ঘটনা, রাণী রাসমণি হঠাৎ জমিদার হয়ে শেখদের সাথে লড়তে শুরু করলেন, ইংরেজও তাঁকে সাহায্য করল। কলকাতার একটা সম্পত্তি ও উল্টাডাঙ্গার আড়ত শেখদের সম্পত্তি ছিল। এই সম্পত্তি দেখাশোনা করতেন শেখ অছিমুদ্দিন। আবার জমিদারি নিয়েও রাসমণির স্টেটের সাথে দাঙ্গাহাঙ্গামা লেগেই ছিল। শেখ বাড়ি থেকে তিন মাইল দূরে শ্রীরামকান্দি গ্রামে তমিজুদ্দিন নামে এক দুর্ধর্ষ লোক বাস করত। সে রাসমণি স্টেটের পক্ষ অবলম্বন করেছিল। সে ভাল যোদ্ধা ছিল। একবার দুইপক্ষে খুব মারামারি হয়। এতে রাণী রাসমণির লোক পরাজিত হয়। শেখদের লোকেদের হাতে তমিজুদ্দিন আহত আবস্থায় পড়ে এবং শোনা যায় যে, পরে মৃত্যুবরণ করে। মামলা শুরু হয়। শেখদের সকলেই গ্রেফতার হয়ে যায়। পরে বহু অর্থ খরচ করে হাইকোর্ট থেকে মুক্তি পায়।

এরপরই আর একটা ঘটনা হয়। টুঙ্গিপাড়া শেখ বাড়ির পাশেই আরেকটি পুরানা বংশ আছে, যারা কাজী বংশ নামে পরিচিত। এদের সাথে শেখদের আত্মীয়তাও আছে। আত্মীয়তা থাকলেও রেষারেষি কোনোদিন যায় নাই। কাজীরা অর্থ-সম্পদ ও শক্তিতে শেখদের সাথে টিকতে পারে নাই, কিন্তু লড়ে গেছে বহুকাল। যে কাজীদের সাথে আমাদের আত্মীয়তা ও ঘনিষ্ঠতা ছিল তারা শেখদের সমর্থন করত। কাজীদের আর একটা দল রাণী রাসমণির সাথে যোগদান করে। তারা কিছুতেই শেখদের আধিপত্য সহ্য করতে পারছিল না। তাই তারা এক জঘন্য কাজের আশ্রয় নিল শেষ পর্যন্ত। অধিকাংশ কাজী শেখদের

সাথে মিশে গিয়েছিল। একটা দল কিছুতেই শেখদের শেষ না করে ছাড়বে না ঠিক করেছিল। বৃদ্ধ এক কাজী, নাম সেরাজতুল্লা কাজী। তার তিন ছেলে ও এক মেয়ে ছিল। ছেলেরা এক ষড়যন্ত্র করে এবং অর্থের লোভে বৃদ্ধ পিতাকে গলা টিপে হত্যা করে শেখ বাড়ির গরুর ঘরের চালের উপরে রেখে যায়। এই ঘটনা শুধু তিন ভাই এবং তাদের বোনটা জানত। বোনকে ভয় দেখিয়ে চুপ করিয়ে রেখেছিল। শেখ বাড়িতে লাশ রেখে রাতাতাতিই থানায় যেয়ে খবর দেয় এবং পুলিশ সাথে নিয়ে এসে লাশ বের করে দেয় এবং বাড়ির সকলকে গ্রেফতার করিয়ে দেয়। এতে শেখদের ভীষণ অবস্থার সম্মুখীন হতে হয়।

আমার দাদার চাচা এবং রেণুর দাদার বাবা কলকাতা থেকে নিজেকে দেউলিয়া ঘোষণা করে চলে আসেন বাড়িতে। কলকাতার সম্পত্তি শেষ হয়ে যায়। তারপর যখন সকলে গ্রেফতার হয়ে গেছে, কেউই দেখার নাই– বড় বড় ব্যবসায়ী, মাঝি ও ব্যাপারীরা নৌকা ডুবিয়ে দিয়ে উধাও হতে শুরু করল। এর পূর্বে তমিজুদ্দিনের খুনে যথেষ্ট টাকা খরচ হয়ে গেছে। জমিদারিও নিলাম হয়ে প্রায় সবই চলে যেতে গেল। বহুদিন পর্যন্ত মামলা চল। নিচের কোর্টে সকলেরই জেল হয়ে গেল। শেষ পর্যন্ত কলকাতা হাইকোর্টে মামলা শুরু হলো। আমাদের এডভোকেট হাইকোর্টে দরখাস্ত করল সিআইডি দ্বারা মামলা আবার ইনকোয়ারি করাতে। কারণ, এ মামরা ষড়যন্ত্রমূলক। হাইকোর্ট মামলা দেখে সন্দেহ হলে আবার ইনকোয়ারি শুরু হল। একজন অফিসার পাগল সেজে আমাদের গ্রামে যায় আর খোঁজ খবর নেয়।

একদিন রাতে সেরাজতুল্লাহ্ কাজীর তিন ছেলের মধ্যে কি নিয়ে ঝগড়া হয় এবং কথায় কথায় এক ভাই অন্য ভাইকে বলে, "বলেছিলাম না শেখদের কিছু ঝগড়া হয় এবং কথায় কথায় এক ভাই অন্য ভাইকে বলে, "বলেছিলাম না শেখদের কিছু হবে না, বাবাকে অমনভাবে মারা উচিত হবে না।" অন্য ভাই বলে, "তুই তো গলা টিপে ধরেছিলি তাই তো বাবা মারা গেল।" বোনটা বলল, "বাবা একটু পানি চেয়েছিল, তুই তো তাও দিতে দিলি না।" সিআইডি এই কথা শুনতে পেল ওদের বাড়ির পিছনে পালিয়ে থেকে। তার কয়েকদিন পরেই তিন ভাই ও বোন গ্রেফতার হল এবং স্বীকার করতে বাধ্য হল তারাই তাদের বাবাকে হত্যা করেছে।

শেখরা মুক্তি পেল আর ওদের যাবজ্জীবন জেল হল। শেখরা মামলা থেকে বাঁচল, কিন্তু সর্বস্বান্ত হয়েই বাঁচল। ব্যবসা নাই, জমিদারী শেষ, সামান্য তালুক ও খাস জমি, শেখ বংশ বেঁচে রইল শুধু খাস জমির জন্য। এদের বেশ কিছু খাস জমি ছিল। আর বাড়ির আশপাশ দিয়ে কিছু জমি নিষ্কর ছিল। খেয়ে পরার কষ্ট

ছিল না বলে বাড়িতে বসে আমার দাদার বাবা চাচারা পাশা খেলে দিন কাটাতেন। সকলেই দিনভর দাবা আর পাশা খেলতেন, খাওয়া ও শোয়া এই ছিল কাজ। এরা ফার্সি ভাষা জানতেন এবং বাংলা ভাষার উপরও দখল ছিল। রেণুর দাদা আমার দাদার চাচাতো ভাই, তিনি তাঁর জীবনী লিখে রেখে গিয়েছিলেন সুন্দর বাংলা ভাষায়। রেণুও তার কয়েকটা পাতা পেয়েছিল যখন তার দাদা সমস্ত সম্পত্তি রেণও তার বোনকে লিখে দিয়ে যান তখন। রেণুর বাবার মানে আমার শ্বশুর ও চাচা তাঁর বাবার সামনেই মারা যান। মুসলিম আইন অনুযায়ী রেণু তার সম্পত্তি পায় না। রেণুর কোনো চাচা না থাকার জন্য তার দাদা সম্পত্তি লিখে দিয়ে যান। আমাদের বংশের অনেক ইতিহাস পাওয়া যেত যদি তাঁর জীবনীটা পেতাম। কিন্তু কে বা কারা সেটা গায়েব করেছে বলতে পারব না, কারণ অনেক কথা বের হয়ে যেতে পারে। রেণু অনেক খুঁজেছে, পায় নাই। এ রকম আরও অনেক ছোটখাটো গল্প আছে, কতটা সত্য আর কতটা মিথ্যা বলতে পারি না।

যাহোক, শেখদের দুর্দিন আসলেও তারা ইংরেজেদের সহ্য করতে পারত না। ইংরেজকে গ্রহণ করতে না পারায় এবং ইংরেজি না পড়ায় তারা অনেক পেছনে পড়ে গেল। মুসলমানদের সম্পত্তি ভাগ হয় অনেক বেশি। বংশ বাড়তে লাগল, সম্পত্তি ভাগ হতে শুরু করল, দিন দিন আর্থিক অবস্থায় খারাপের দিকে চল। তবে বঙশের মধ্যে দুই একজনের অবস্থা ভালই ছিল।

আমার দাদাদের আমল থেকে শেখ পরিবার ইংরেজি লেখাপড়া শুরু করল। আমার দাদার অবস্থা খুব ভাল ছিল না। কারণ দাদারা তিন ভাই ছিলেন, পরে আলাদা আলাদা হয়ে যান। আমার দাদার বড় ভাই খুব বিচক্ষণ লোক ছিলেন; তিনি দেশের বিচার-আচার করতেন। আমার দাদা হঠাৎ মৃত্যুবরণ করেন। আমার বড় চাচা এন্ট্রান্স পাস করে মারা যান। আমার আব্বা তখন এন্ট্রান্স পড়েন। ছোট্ট ছোট্ট ভাইবোন নিয়ে আমার আব্বা মহাবিপদের সম্মুখীন হন। আমার দাদার বড় ভাইয়ের কোনো ছেলে ছিল না। চার মেয়ে ছিল। আমার বাবার সাথে তাঁর ছোট মেয়ের বিবাহ দেন এবং সমস্ত সম্পত্তি আমার মাকে লিখে দেন।

আমার নানার নাম ছিল শেখ আবদুল মজিদ। আমার দাদার নাম শেখ আবদুল হামিদ। আর ছোট দাদার নাম শেখ আবদুর রশিদ। তিনি পরে ইংরেজের দেয়া 'খান সাহেব' উপাধি পান। জনসাধারণ তাঁকে খাঁন সাহেব বলেই জানতেন। আমার আব্বার অবস্থা কিছুটা পরিবর্তন হলেও দুই চাচার লেখাপড়া, ফুফুদের বিবাহ সমস্ত কিছুই তাঁর মাথার উপর এসে পড়ল। বাধ্য হয়ে তিনি লেখাপড়া ছেড়ে দিয়ে চাকরির অন্বেষণে বের হলেন। মুসলমানদের তখনকার দিনে চাকরি পাওয়া দুষ্কর ছিল। শেষ পর্যন্ত দিওয়ানি আদালতে একটা

চাকরি পান, পরে তিনি সেরেস্তাদার হয়েছিলেন। যেদিন আমি ম্যাট্রিক পাস করে কলকাতায় ইসলামিয়া কলেজে পড়তে যাই আমার আব্বাও সেইদিন পেনশন নিয়ে বাড়ি চলে যান।

একটা ঘটনা লেখা দরকার, নিশ্চয়ই অনেকে আশ্চর্য হবেন। আমার যখন বিবাহ হয় তখন আমার বয়স বার তের বছর হতে পারে। রেণুর বাবা মারা যাবার পরে ওর দাদা আমার আব্বাকে ডেকে বললেন, "তোমার বড় ছেলের সাথে আমার এক নাতনীর বিবাহ দিতে হবে। কারণ আমি সমস্ত সম্পত্তি ওদের দুই বোনকে লিখে দিয়ে যাব।" রেণুর দাদা আমার আব্বার চাচা। মুরব্বির হুকুম মানার জন্যই রেণুর সাথে আমার বিবাহ রেজিস্ট্রি করে ফেলা হল। আমি শুনলাম আমার বিবাহ হয়েছে। তখন কিছুই বুঝতাম না, রেণুর বয়স তখন বোধ হয় তিন বছর হবে। রেণুর যখন পাঁচ বছর বয়স তখন তার মা মারা যান। একমাত্র রইল তার দাদা। দাদাও রেণুর সাত বয়সে মারা যান। তারপর, সে আমার মা'র কাছে চলে আসে। আমার ভাইবোনদের সাথেই রেণু বড় হয়। রেণুর বড়বোনেরও আমার আর এক চাচাতো ভাইয়ের সাথে বিবাহ হয়। এরা আমার শ্বশুরবাড়িতে থাকল, কারণ আমার ও রেণুর বাড়ির দরকার নাই। রেণুদের ঘর আমাদের ঘর পাশাপাশি ছিল, মধ্যে মাত্র দুই হাত ব্যবধান। অন্যান্য ঘটনা আমার জীবনের ঘটনার মধ্যেই পাওয়া যাবে।

আমার জন্ম হয় ১৯২০ সালের ১৭ই মার্চ তারিখে। আমার আব্বার নাম শেখ লুৎফর রহমান। আমার ছোট দাদা খান সাহেব শেখ আবদুর রশিদ একটা এম ই স্কুল প্রতিষ্ঠা করেন। আমাদের অঞ্চলের মধ্যে সেকালে এই একটা মাত্র ইংরেজি স্কুল ছিল, পরে এটা হাইস্কুল হয়, সেটি আজও আছে। আমি তৃতীয় শ্রেণী পর্যন্ত এই স্কুলে লেখাপড়া করে আমার আব্বার কাছে চলে যাই এবং চতুর্থ শ্রেণীতে গোপালগঞ্জ পাবলিক স্কুলে ভর্তি হই। আমার মায়ের নাম সায়েরা খাতুন। তিনি কোনোদিন আমার আব্বার সাথে শহরে থাকতেন না। তিনি সমস্ত সম্পত্তি দেখাশোনা করতেন আর বলতেন, "আমার বাবা আমাকে সম্পত্তি দিয়ে গেছেন যাতে তাঁর বাড়িতে আমি থাকি। শহরে চলে গেলে ঘরে আলো জ্বলবে না, বাবা অভিশাপ দেবে।"

আমরা আমার নানার ঘরেই থাকতাম, দাদার ও নানার ঘর পাশাপাশি। আব্বার কাছে থেকেই আমি লেখাপড়া করি। আব্বার কাছেই আমি ঘুমাতাম। তাঁর গলা ধরে রাতে না ঘুমালে আমার ঘুম আসত না। আমি বংশের বড় ছেলে, তাই সমস্ত আদর আমারই ছিল। আমার মেজো চাচারও কোনো ছেলেমেয়ে ছিল না। আমার ছোট দাদারও একমাত্র ছেলে আছে। তিনিও 'খান সাহেব' খেতাব

পান। এখন আইয়ুব সাহেবের আমলে প্রাদেশিক আইনসভার সদস্য আছেন। ডিস্ট্রিক্ট বোর্ডের সভ্যও ছিলেন, নাম শেখ মোশাররফ হোসেন।

১৯৩৪ সালে যখন আমি সপ্তম শ্রেণীতে পড়ি তখন ভীষণভাবে অসুস্থ হয়ে পড়ি। ছোট্ট সময়ে আমি খুব দুষ্ট প্রকৃতির ছিলাম। খেলাধুলা করতাম, গান গাইতাম এবং খুব ভাল ব্রতচারী করতে পারতাম। হঠাৎ বেরিবেরি রোগে আক্রান্ত হয়ে আমার হার্ট দুর্বল হয়ে পড়ে। আব্বা আমাকে নিয়ে কলকাতায় চিকিৎসা করাতে যান। কলকাতার বড় বড় ডাক্তার শিবপদ ভট্টাচার্য, এ কে রায় চৌধুরী আরও অনেককেই দেখান এবং চিকিৎসা করাতে থাকেন। প্রায় দুই বছর আমার এইভাবে চলল।

১৯৩৬ সালে আব্বা মাদারীপুর মহকুমায় সেরেস্তাদার হয়ে বদলি হয়ে যান। আমার অসুস্থতার জন্য মাকেও সেখানে নিয়ে আসেন। ১৯৩৬ সালে আবার আমার চক্ষু খারাপ হয়ে পড়ে। গ্লুকোমা নামে একটা রোগ হয়। ডাক্তারদের পরামর্শে আব্বা আমাকে নিয়ে আবার কলকাতা রওয়ানা হলেন চিকিৎসার জন্য। এই সময় আমি মাদারীপুর হাইস্কুলে সপ্তম শ্রেণীতে ভর্তি হয়েছিলাম লেখাপড়া করার জন্য। কলকাতা যেয়ে ডাক্তার টি. আহমেদ সাহেবকে দেখালাম। আমার বোন কলকাতায় থাকত, কারণ ভগ্নিপতি এজিবিতে চাকরি করতেন। তিনি আমার মেজোবোন শেখ ফজলুল হক মণির মা। মণির বাবা পূর্বে সম্পর্কে আমার দাদা হতেন। তিনিও শেখ বংশের লোক। বোনের কাছেই থাকতাম। কোন অসুবিধা হত না। ডাক্তার সাহেব আমার চক্ষু অপারেশন করতে বললেন। দেরি করলে আমি অন্ধ হয়ে যেতে পারি। আমাকে কলকাতা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করে দিলেন। ভোর ন'টায় অপারেশন হবে। আমি ভয় পেয়ে পালাতে চেষ্টা করতে লাগলাম, কিন্তু পারলাম না। আমাকে অপারেশন ঘরে নিয়ে যাওয়া হল। দশ দিনের মধ্যে দুইটা চক্ষুই অপারেশন করা হল। আমি ভাল হলাম। তবে কিছুদিন লেখাপড়া বন্ধ রাখতে হবে, চশমা পরতে হবে। তাই ১৯৩৬ সাল থেকেই চশমা পরছি।

চোখের চিকিৎসার পর মাদারীপুরে ফিরে এলাম, কোন কাজ নেই। লেখাপড়া নেই, খেলাধুলা নেই, শুধু একটা মাত্র কাজ, বিকালে সভায় যাওয়া। তখন স্বদেশী আন্দোলনের যুগ। মাদারীপুরের পূর্ণ দাস তখন ইংরেজের আতঙ্ক। স্বদেশী আন্দোলন তখন মাদারীপুর ও গোপালগঞ্জের ঘরে ঘরে। আমার মনে হত, মাদারীপুরে সুভাষ বোসের দলই শক্তিশালী ছিল। পনের-ষোল বছরের ছেলেদের স্বদেশীরা দলে ভেড়াত। আমাকে রোজ সভায় বসে থাকতে দেখে আমার উপর কিছু যুবকের নজর পড়ল। ইংরেজদের বিরুদ্ধেও আমার মনে বিরূপ ধারণা সৃষ্টি

হল। ইংরেজদের এদেশে থাকার অধিকার নাই। স্বাধীনতা আনতে হবে। আমিও সুভাষ বাবুর ভক্ত হতে শুরু করলাম। এই সভায় যোগদান করতে মাঝে মাঝে গোপালগঞ্জ, মাদারীপুর যাওয়া-আসা করতাম। আর স্বদেশী আন্দোলনের লোকদের সাথেই মেলামেশা করতাম। গোপালগঞ্জের সেই সময়ের এসডিও, আমার দাদা খান সাহেবকে একদিন হুঁশিয়ার করে দিয়েছিলেন, এ গল্প আমি পরে শুনেছি।

১৯৩৭ সালে আবার আমি লেখাপড়া শুরু করলাম। এবার আর পুরানো স্কুলে পড়ব না, কারণ আমার সহপাঠীরা আমাকে পিছনে ফেলে গেছে। আমার আব্বা আমাকে গোপালগঞ্জ মিশন স্কুলে ভর্তি করিয়ে দিলেন। আমার আব্বাও আবার গোপালগঞ্জ ফিরে এলেন। এই সময় আব্বা কাজী আবদুল হামিদ এমএসসি মাস্টার সাহেবকে আমাকে পড়াবার জন্য বাসায় রাখলেন। তাঁর জন্য একটা আলাদা ঘরও করে দিলেন। গোপালগঞ্জের বাড়িটা আমার আব্বাই করেছিলেন। মাস্টার সাহেব গোপালগঞ্জে একটা 'মুসলিম সেবা সমিতি' গঠন করেন, যার দ্বারা গরিব ছেলেদের সাহায্য করতেন। মুষ্টি ভিক্ষার চাল উঠাতেন সকল মুসলমান বাড়ি থেকে। প্রত্যেক রবিবার আমরা থলি নিয়ে বাড়ি বাড়ি থেকে চাউল উঠিয়ে আনতাম এবং এই চাল বিক্রি করে তিনি গরিব ছেলেদের বই এবং পরীক্ষার ও অন্যান্য খরচ দিতেন। ঘুরে ঘুরে জায়গিরও ঠিক করে দিতেন। আমাকেই অনেক কাজ করতে হত তাঁর সাথে। হঠাৎ যক্ষ্মা রোগে আক্রান্ত হয়ে তিনি মারা যান। তখন আমি এই সেবা সমিরি ভার নেই এবং অনেক দিন পরিচালনা করি। আর একজন মুসলমান মাস্টার সাহেবের কাছেই টাকা পয়সা জমা রাখা হত। তিনি সভাপতি ছিলেন আর আমি ছিলাম সম্পাদক। যদি কোন মুসলমান চাউল না দিত আমার দলবল নিয়ে তার উপর জোর কতাম। দরকার হলে তার বাড়িতে রাতে ইট মারা হত। এজন্য আমার আব্বার কাছে অনেক সময় শাস্তি পেতে হত। আমার আব্বা আমাকে বাধা দিতেন না।

আমি খেলাধুলাও করতাম। ফুটবল, ভলিবল ও হকি খেলতাম। খুব ভাল খেলোয়াড় ছিলাম না, তবুও স্কুলের টিমের মধ্যে ভাল অবস্থান ছিল। এই সময় আমার রাজনীতির খেয়াল তত ছিল না।

আমার আব্বা খবরের কাগজ রাখতেন। *আনন্দবাজার, বসুমতী, আজাদ, মাসিক মোহাম্মদী ও সওগাত।* ছোটকাল থেকে আমি সকল কাগজই পড়তাম। স্কুলে ছেলেদের মধ্যে আমার বয়স একটু বেশি হয়েছে, কারণ প্রায় চার বৎসর আমি লেখাপড়া করতে পারি নাই। আমি ভীষণ একগুঁয়ে ছিলাম। আমার একটা দল ছিল। কেউ কিছু বললে আর রক্ষা ছিল না। মারপিট করতাম। আমার দলের

ছেলেদের কেউ কিছু বললে একসাথে ঝাঁপিয়ে পড়তাম। আমার আব্বা মাঝে মাঝে অতিষ্ঠ হয়ে উঠতেন। কারণ ছোট শহর, নালিশ হত, আমার আব্বাকে আমি খুব ভয় করতাম। আর একজন ভদ্রলোককে ভয় করতাম, তিনি আবদুল হাকিম মিয়া। তিনি আমার আব্বার অন্তরঙ্গ বন্ধু ছিলেন। একসঙ্গে চাকরি করতেন, আমকে কোথাও দেখলেই আব্বাকে বলে দিতেন, অথবা নিজেই ধমকিয়ে দিতেন। যদিও আব্বাকে ফাঁকি দিতে পারতাম, তাঁকে ফাঁকি দিতে পারতাম না। আব্বা থাকতেন শহরের একদিকে, আর তিনি থাকতেন অন্যদিকে। হামিক সাহেব বেঁচে নাই, তাঁর ছেলেরা লেখাপড়া শিখে মানুষ হয়েছে। একজন কেন্দ্রীয় সরকারের অধীনে বড় চাকরি করেন, আর একজন সিএসপি হয়েছে। তখন গোপালগঞ্জে এমএলএ ছিলেন খন্দকার শামসুদ্দীন আহমেদ সাহেব। তিনি নামকরা উকিলও ছিলেন। তাঁর বড় ছেলে খন্দকার মাহবুব উদ্দিন ওরফে ফিরোজ আমার বন্ধু ছিল। দুইজনের মধ্যে ভীষণ ভাব ছিল। ফিরোজ এখন হাইকোর্টের এডভোকেট। দুই বন্ধুর মধ্যে এত মিল ছিল, কেউ কাউকে না দেখলে ভাল লাগত না। খন্দকার শামসুদ্দীন সাহেবের সঙ্গে আমার আব্বার বন্ধুত্ব ছিল। অমায়িক ব্যবহার তাঁর। জনসাধারণ তাঁকে শ্রদ্ধা করত ও ভালবাসত। তিনি মরহুম শেরে বাংলা এ. কে. ফজলুল হক সাহেবের কৃষক শ্রমিক পার্টির সদস্য ছিলেন। যখন হক সাহেব বাংলার প্রধানমন্ত্রী হলেন এবং মুসলিম লীগে যোগদান করলেন, খন্দকার সাহেবও তখন মুসলিম লীগে যোগদান করেন। যদিও কোনো দলেরই কোনো সংগঠন ছিল না। ব্যক্তিগত জনপ্রিয়তার উপরই সবাই নির্ভর করত। মুসলিম লীগ তো তখন শুধু কাগজে-পত্রে ছিল।

১৯৩৮ সালের ঘটনা। শেরেবাংলা তখন বাংলার প্রধানমন্ত্রী এবং সোহরাওয়ার্দী শ্রমমন্ত্রী। তাঁরা গোপালগঞ্জে আসবেন। বিরাট সভার আয়োজন করা হয়েছে। এগজিবিশন হবে ঠিক হয়েছে। বাংলার এই দুই নেতা একসাথে গোপালগঞ্জে আসবেন। মুসলমানদের মধ্যে বিরাট আলোড়নের সৃষ্টি হল। স্কুলের ছাত্র আমরা তখন আগেই বলেছি আমার বয়স একটু বয়স, তাই স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী করার ভার পড়ল আমার উপর। আমি স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী করলাম দলমত নির্বিশেষে সবাইকে নিয়ে। পরে দেখা গেল, হিন্দু ছাত্ররা স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী থেকে সরে পড়তে লাগল। ব্যাপারে কি বুঝতে পারছি না। এক বন্ধুকে জিজ্ঞাসা করলাম, সেও ছাত্র, সে আমাকে বলল, কংগ্রেস থেকে নিষেধ করেছে আমাদের যোগদান করতে। যাতে বিরূপ সম্বর্ধনা হয় তারও চেষ্টা করা হবে। এগজিবিশনে যাতে দোকানপাট না বসে তাও বলে দেওয়া হয়েছি। তখনকার দিনে শতকরা আশিটি দোকান হিন্দুদের ছিল। আমি এ খবর শুনে আশ্চর্য হলাম।

কারণ, আমার কাছে তখন হিন্দু মুসলমান বলে কোন জিনিস ছিল না। হিন্দু ছেলেদের সাথে আমার খুব বন্ধুত্ব ছিল। একসাথে গান বাজনা, খেলাধুলা, বেড়ান– সবই চলত।

আমাদের নেতারা বললেন, হক সাহেব মুসলিম লীগের সাথে মন্ত্রিসভা গঠন করেছেন বলে হিন্দুরা ক্ষেপে গিয়েছে। এতে আমার মনে বেশ একটা রেখাপাত করল। হক সাহেব ও শহীদ সাহেবকে সম্বর্ধনা দেয়া হবে। তার জন্য যা কিছু প্রয়োজন আমাদের করতে হবে। আমি মুসলমান ছেলেদের নিয়েই স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী করলাম, তবে কিছু সংখ্যক নমশূদ্র শ্রেণীর হিন্দু যোগদান করল। কারণ, মুকুন্দবিহারী মল্লিক তখন মন্ত্রী ছিলেন এবং তিনিও হক সাহেবের সাথে আসবেন। শহরে হিন্দুরা সংখ্যায় খুবই বেশি, গ্রাম থেকে যথেষ্ট লোক এল, বিশেষ করে নানা রকম অস্ত্র নিয়ে, যদি কেউ বাধা দেয়! যা কিছু হয়, হবে। সাম্প্রদায়িক দাঙ্গাও হতে পারে।

হক সাহেব ও শহীদ সাহেব এলেন, সভা হল। এগজিবিশন উদ্বোধন করলেন। শান্তিপূর্ণভাবে সকল কিছু হয়ে গেল। হক সাহেব পাবলিক হল দেখতে গেলেন। আর শহীদ সাহেব গেলেন মিশন স্কুল দেখতে। আমি মিশন স্কুলের ছাত্র। তাই তাঁকে সম্বর্ধনা দিলাম। তিনি স্কুল পরিদর্শন করে হাঁটতে হাঁটতে লঞ্চের দিকে চললেন, আমিও সাথে সাথে চললাম। তিনি ভাঙা ভাঙা বাংলায় আমাকে কিছু জিজ্ঞাসা করছিলেন, আর আমি উত্তর দিচ্ছিলাম। আমার দিকে চেয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, আমার নাম এবং বাড়ি কোথায়। একজন সরকারী কর্মচারী আমার বংশের কথা বলে আমাকে পরিচয় করিয়ে দিলেন। তিনি আমাকে ডেকে নিলেন খুব কাছে, আদর করলেন এবং বললেন, "তোমাদের এখানে মুসলিম লীগ করা হয় নাই?" বললাম, "কোনো প্রতিষ্ঠান নাই। মুসলিম ছাত্রলীগও নাই।" তিনি আর কিছুই বললেন না, শুধু নোটবুক বের করে আমার নাম ও ঠিকানা লিখে নিলেন। কিছুদিন পরে আমি একটা চিঠি পেলাম, তাতে তিনি আমাকে ধন্যবাদ দিয়েছেন এবং লিখেছেন কলকাতা গেলে যেন তাঁর সঙ্গে দেখা করি। আমিও তাঁর চিঠির উত্তর দিলাম। এইভাবে মাঝে মাঝে চিঠিও দিতাম।

এই সময় একটা ঘটনা হয়ে গেল। হিন্দু মুসলমানদের মধ্যে একটু আড়াআড়ি চলছিল। গোপালগঞ্জ শহরের আশপাশেও হিন্দু গ্রাম ছিল। দু'একজন মুসলমানের উপর অত্যাচারও হল। আবদুল মালেক নামে আমার এক সহপাঠী ছিল। সে খন্দকার শামসুদ্দীন সাহেবের আত্মীয় হত। একদিন সন্ধ্যায়, আমার মনে হয় মার্চ বা এপ্রিল মাস হবে, আমি ফুটবল মাঠ থেকে খেলে বাড়িতে

এসেছি। আমাকে খন্দকার শামসুল হক ওরফে বাসু মিয়া মোক্তার সাহেব (পরে মহকুমা আওয়ামী লীগের সভাপতি ছিলেন) ডেকে বললেন, "মালেককে হিন্দু মহাসভা সভাপতি সুরেন ব্যানার্জির বাড়িতে ধরে নিয়ে মারপিট করছে। যদি পার একবার যাও। তোমার সাথে ওদের বন্ধুত্ব আছে বলে তাকে ছাড়িয়ে নিয়ে আস।" আমি আর দেরি না করে কয়েকজন ছাত্র ডেকে নিয়ে ওদের ওখানে যাই এবং অনুরোধ করি ওকে ছেড়ে দিতে। রমাপদ দত্ত নামে এক ভদ্রলোক আমাকে দেকেই গাল দিয়ে বসল। আমিও তার কথার প্রতিবাদ করলাম এবং আমার দলের চেলেদের খবর দিতে বললাম। এর মধ্যে রমাপদ থানায় খবর দিয়েছে। তিনজন পুলিশ এসে হাজির হয়ে গিয়েছে। আমি বললাম, "ওকে ছেড়ে দিতে হবে, নাহলে কেড়ে নেব।" আমার মামা শেখ সিরাজুল হক (একই বংশের) তখন হোস্টেলে থেকে লেখাপড়া করতেন। তিনি আমার মা ও বাবার চাচাতো ভাই। নারায়ণগঞ্জে আমার এক মামা ব্যবসা করেন, তার নাম শেখ জাফর সাদেক। তার বড় ভাই ম্যাট্রিক পাস করেই মারা যান। আমি খবর দিয়েছি শুনে দলবল নিয়ে ছুটে এসেছেন। এর মধ্যেই আমাদের সাথে মারপিট শুরু হয়ে গেছে। দুই পক্ষে ভীষণ মারপিট হয়। আমরা দরজা ভেঙে মালেককে কেড়ে নিয়ে চলে আসি।

শহরে খুব উত্তেজনা। আমাকে কেউ কিছু বলতে সাহস পায় না। সেদিন রবিবার। আব্বা বাড়ি গিয়েছিলেন। পরদিন ভোরবেলায় আব্বা আসবেন। বাড়ি গোপালগঞ্জ থেকে চৌদ্দ মাইল দূরে। আব্বা শনিবার বাড়ি যেতেন আর সোমবার ফিরে আসতেন, নিজেরই নৌকা ছিল। হিন্দু নেতারা রাতে বসে হিন্দু অফিসারদের সাথে পরামর্শ করে একটা মামলা দায়ের করল। হিন্দু নেতারা থানায় বসে এজাহার ঠিক করে দিলেন। তাতে খন্দকার শামসুল হক মোক্তার সাহেব হুকুমের আসামি। আমি খুন করার চেষ্টা করেছি, লুটপাট দাঙ্গাহাঙ্গামা লাগিয়ে দিয়েছি। ভোরবেলায় আমার মামা, মোক্তার সাহেব, খন্দকার শামসুদ্দীন আহমেদ এমএলএ সাহেবের মুহুরী জহুর শেখ, আমার বাড়ির কাছের বিশেষ বন্ধু শেখ নুরুল হক ওরফে মানিক মিয়া, সৈয়দ আলী খন্দকার, আমার সহপাঠী আবদুল মালেক এবং অনেক ছাত্রের নাম এজাহারে দেয়া হয়েছিল। কোনো গণ্যমান্য লোকের ছেলেদের বাকি রাখে নাই। সকাল ন'টায় খবর পেলাম আমার মামা ও আরও অনেককে গ্রেফতার করে ফেলেছে। আমাদের বাড়িতে কি করে আসবে– থানার দারোগা সাহেবদের একটু লজ্জা করছিল! প্রায় দশটার সময় টাউন হল মাঠের ভিতর দাঁড়িয়ে দারোগা আলাপ করছে, তার উদ্দেশ্য হল আমি যেন সরে যাই। টাউন হলের মাঠের পাশেই আমার বাড়ি। আমার ফুফাতো ভাই, মাদারীপুর বাড়ি। আব্বার কাছে থেকেই লেখাপড়া করত, সে আমাকে বলে,

"মিয়াভাই, পাশের বাসায় একটু সরে যাও না।" বললাম, ''যাব না, আমি পালাব না। লোকে বলবে, আমি ভয় পেয়েছি।"

এই সময় আব্বা বাড়ি থেকে ফিরে এসেছেন। দারোগা সাহেবও তাঁর পিছে পিছে বাড়িয়ে ঢুকে পড়েছেন। আব্বার কাছে বসে আস্তে আস্তে সকল কথা বললেন। আমার গ্রেফতারি পরোয়ানা দেখালেন। আব্বা বললেন, "নিয়ে যান।" দারোগা বাবু বললেন, "ও খেয়েদেয়ে আসুক, আমি একজন সিপাহী রেখ যেতেছি, এগারটার মধ্যে যেন থানায় পৌঁছে যায়। কারণ, দেরি হলে জামিন পেতে অসুবিধা হবে।" আব্বা জিজ্ঞাসা করলেন, "মারামারি করেছ?" আমি চুপ করে থাকলাম, যার অর্থ "করেছি?"

আমি খাওয়া-দাওয়া করে থানায় চলে এলাম। দেখি আমার মামা, মানিক, সৈয়দ আরও সাত-আটজন হবে, তাদেরকে পূর্বেই গ্রেফতার করে থানায় নিয়ে এসেছে। আমার পৌঁছার সাথে সাথে কোর্টে পাঠিয়ে দিল। হাতকড়া দেয় নাই, তবে সামনেও পুলিশ পিছনেও পুলিশ। কোর্ট দারোগা হিন্দু ছিলেন, কোর্টে পৌঁছার সাথে সাথে আমাদের কোর্ট হাজতের ছোট কামরার মধ্যে বন্ধ করে রাখলেন। কোর্ট দারোগার রুমের পাশেই কোর্ট হাজত। আমাকে বললেন, "মজিবর খুব ভয়ানক ছেলে। ছোরা মেরেছিল রমাপদকে। কিছুতেই জামিন দেওয়া যেতে পারে না।" আমি বললাম, "বাজে কথা বলবেন না, ভাল হবে না।" যারা দারোগা সাহেবের সামনে বসেছিলেন, তাদের বললেন, "দেখ ছেলের সাহস!" আমাকে অন্য সকলে কথা বলতে নিষেধ করল। পরে শুনলাম, আমার নামে এজাহার দিয়েছে এই কথা বলে যে, আমি ছোরা দিয়ে রমাপদকে হত্যা করার আঘাত করেছি। তার অবস্থা ভয়ানক খারাপ, হাসপাতালে ভর্তি হয়ে আছে। প্রকৃতপক্ষে রমাপদের সাথে আমার মারামারি হয় একটা লাঠি দিয়ে, ও আমাকে লাঠি দিয়ে আঘাত করতে চেষ্টা করলে আমিও লাঠি দিয়ে প্রত্যাঘাত করি। যার জন্য ওর মাথা ফেটে যায়। মুসলমান উকিল মোক্তার সাহেবরা কোর্টে আমাদের জামিনের আবেদন পেশ করল। একমাত্র মোক্তার সাহেবকে টাউন জামিন দেয়া হল। আমাদের জেল হাজতে পাঠানোর হুকুম হল। এসডিও হিন্দু ছিল, জামিন দিল না। কোর্ট দারোগা আমাদের হাতকড়া পরাতে হুকুম দিল। আমি রুখে দাঁড়ালাম, সকলে আমাকে বাধা দিল, জেলে এলাম। সাবজেল, একটা মাত্র ঘর। একপাশে মেয়েদের থাকার জায়গা, কোনো মেয়ে আসামি না থাকার জন্য মেয়েদের ওয়ার্ডে রাখল। বাড়ি থেকে বিছানা, কাপড় এবং খাবার দেবার অনুমতি দেয়া হল। শেষ পর্যন্ত সাতদিন পরে আমি প্রথম জামিন পেলাম। দশ দিনের মধ্যে আর সকলেই জামিন পেয়ে গেল।

হক সাহেব ও সোহরাওয়ার্দী সাহেবের কাছে টেলিগ্রাম করা হল। লোকও চলে গেল কলকাতায়। গোপালগঞ্জে ভীষণ উত্তেজনা চলছিল। হিন্দু উকিলদের সাথে আব্বার বন্ধুত্ব ছিল। সকলেই আমার আব্বাকে সম্মান করতেন। দুই পক্ষের মধ্যে অনেক আলোচনা হয়ে ঠিক হল মামলা তারা চালাবে না। আমাদের ক্ষতিপূরণ দিতে হবে পনের শত টাকা। সকলে মিলে সেই টাকা দিয়ে দেওয়া হল। আমার আব্বাকেই বেশি দিতে হয়েছিল। এই আমার জীবনের প্রথম জেল।

১৯৩৯ সালে কলকাতা যাই বেড়াতে। শহীদ সাহেবের সাথে দেখা করি। আবদুল ওয়াসেক সাহেব আমাদের ছাত্রদের নেতা ছিলেন। তাঁর সাথেও আলাপ করে তাঁকে গোপালগঞ্জ আসতে অনুরোধ করি। শহীদ সাহেবকে বললাম, গোপালগঞ্জে মুসলিম ছাত্রলীগ গঠন করব এবং মুসলিম লীগও গঠন করব। খন্দকার শামসুদ্দীন সাহেব এমএলএ তখন মুসলিম মুসলিম লীগে যোগদান করেছেন। তিনি সভাপতি হলেন ছাত্রলীগের। আমি হলাম সম্পাদক। মুসলিম লীগ গঠন হল। একজন মোক্তার সাহেব সেক্রেটারি হলেন, অবশ্য আমিই কাজ করতাম। মুসলিম লীগ ডিফেন্স কমিটি একটা গঠন করা হল। আমাকে তার সেক্রেটারি করা হল। আমি আস্তে আস্তে রাজনীতির মধ্যে প্রবেশ করলাম। আব্বা আমাকে বাধা দিতেন না, শুধু বলতেন, লেখাপড়ার দিকে নজর দেবে। লেখাপড়ায় আমার একটু আগ্রহও তখন হয়েছে। কারণ, কয়েক বৎসর অসুস্থতার জন্য নষ্ট করেছি। স্কুলেও আমি ক্যাপ্টেন ছিলাম। খেলাধুলার দিকে আমার খুব ঝোঁক ছিল। আব্বা আমাকে বেশি খেলতে দিতে চাইতেন না। কারণ আমার হার্টের ব্যারাম হয়েছিল। আমার আব্বাও ভাল খেলোয়াড় ছিলেন। আব্বার টিম ও আমার টিমে যখন খেলা হত তখন জনসাধারণ খুব উপভোগ করত। আমাদের স্কুল টিম খুব ভাল ছিল। মহকুমায় যারা ভাল খেলোয়াড় ছিল, তাদের এনে ভর্তি করতাম এবং বেতন ফ্রি করে দিতাম।

১৯৪০ সালে আব্বার টিমকে আমার স্কুল টিম প্রায় সকল খেলায় পরাজিত করল। অফিসার্স ক্লাবের টাকার অভাব ছিল না। খেলোয়াড়দের বাইরে থেকে আনত। সবই নামকরা খেলোয়াড়। বৎসরের শেষ খেলায় আব্বার টিমের সাথে আমার টিমের পাঁচদিন ড্র হয়। আমরা তো ছাত্র; এগারজনই রোজ খেলতাম, আর অফিসার্স ক্লাব নতুন নতুন প্লেয়ার আনত। আমরা খুব ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলাম। আব্বা বললেন, "কাল সকালেই খেলতে হবে। বাইরের খেলোয়াড় আর রাখা যাবে না, অনেক খরচ।" আমি বললাম, "আগামীকাল সকালে আমরা খেলতে পারব না, আমাদের পরীক্ষা।" গোপালগঞ্জ ফুটবল ক্লাবের সেক্রেটারি একবার আমার আব্বার কাছে আর একবার আমার কাছে কয়েকবার হাঁটাহাঁটি

করে বললেন, "তোমাদের বাপ ব্যাটার ব্যাপার, আমি বাবা আর হাঁটতে পারি না।" আমাদের হেডমাস্টার তখন ছিলেন বাবু রসরঞ্জন সেনগুপ্ত। আমাকে তিনি প্রাইভেটও পড়াতেন। আব্বা হেডমাস্টার বাবুকে খবর দিয়ে আনলেন। আমি আমার দলবল নিয়ে এক গোলপোস্টে আর আব্বা তার দলবল নিয়ে অন্য গোলপোস্টে। হেডমাস্টার বাবু বললেন, "মুজিব, তোমার বাবার কাছে হার মান। আগামীকাল সকালে খেল, তাদের অসুবিধা হবে।" আমি বললাম "স্যার, আমাদের সকলেই ক্লান্ত, এগারজনই সারা বছর খেলেছি। সকলের পায়ে ব্যাথা, দুই-চারদিন বিশ্রাম দরকার। নতুবা হেরে যাব।" এ বছর তো একটা খেলায়ও আমরা হারি না, আর 'এ জেড খান শিল্ডের' এই শেষ ফাইনাল খেলা। এ. জেড. খান এসডিও ছিলেন। গোপালগঞ্জে মারা যান। তাঁর ছেলেদের মধ্যে আমির ও আহমদ আমার বাল্যবন্ধু ও সাথী। আমির ও আমি খুব বন্ধু ছিলাম। আমিরুজ্জামান খান এখন রেডিও পাকিস্তানে চাকরি করেন। ওর বাবা মারা যাবার পরে যখন গোপালগঞ্জ থেকে চলে আসে তখন ওর জন্য আমি খুব আঘাত পেয়েছিলাম। হেডমাস্টার বাবুর কথা মানতে হল। পরের দিন সকালে খেলা হল। আমার টিম আব্বার টিমের কাছে এক গোলে পরাজিত হল।

১৯৪১ সালে আমি ম্যাট্রিক পরীক্ষা দেব। পরীক্ষায় পাস আমি নিশ্চয়ই করব, সন্দেহ ছিল না। রসরঞ্জন বাবু ইংরেজির শিক্ষক, আমাকে ইংরেজি পড়াতেন। আর মনোরঞ্জন বাবু অঙ্কের শিক্ষক, আমকে অঙ্ক করাতেন। অঙ্ককে আমার ভয় ছিল। কারণ ভুল করে ফেলতাম। অঙ্কের জন্যই বোধহয় প্রথম বিভাগ পাব না। পরীক্ষার একদিন পূর্বে আমার ভীষণ জ্বর হল এবং মামস হয়ে গলা ফুলে গেল। একশ' চার ডিগ্রি জ্বর উঠেছে। আব্বা রাতভর আমার কাছে বসে রইলেন। গোপালগঞ্জ টাউনের সকল ডাক্তারই আনালেন। জ্বর পরছে না। আব্বা মাকে পরীক্ষা দিতে নিষেধ করলেন। আমি বলরাম, যা পারি শুয়ে শুয়ে দেব। আমার জন্য বিছানা দিতে বলেন। প্রথম দিনে বাংলা পরীক্ষা। সকালের পরীক্ষায় মাথাই তুলতে পারলাম না, তবুও কিছু কিছু লিখলাম। বিকালে জ্বর কম হল। অন্য পরীক্ষা ভালই হল। কিন্তু দেখা গেল বাংলায় আমি কম মার্কস পেয়েছি। অন্যান্য বিষয়ে দ্বিতীয় বিভাগের মার্কস পেয়েছি। মন ভেঙে গেল।

তখন রাজনীতি শুরু করেছি ভীষণভাবে। সভা করি, বক্তৃতা করি। খেলার দিকে আর নজর নাই। শুধু মুসলিম লীগ, আর ছাত্র লীগ। পাকিস্তান আনতেই হবে, নতুবা মুসলমানদের বাঁচার উপায় নাই। খবরের কাগজ 'আজাদ' যা লেখে তাই সত্য বলে মনে হয়।

পরীক্ষা দিয়ে কলকাতায় যাই। সভা-সমাবেশে যোগদান করি। মাদারীপুর

যেয়ে মুসলিম ছাত্রলীগ গঠিন করি। আবার পড়তে শুরু করলাম। পাস তো আমার করতে হবে। শহীদ সাহেবের কাছে এখন প্রায়ই যাই। তিনিও আমাকে স্নেহ করতেন। মুসলিম লীগ বললেই গোপালগঞ্জ আমাকে বোঝাত। যুদ্ধের সময় দেশের ভয়াবহ। এই সময় ফজলুল হক সাহেবের সাথে জিন্নাহ সাহেবের মনোমালিন্য হয়। হক সাহেব জিন্নাহ সাহেবের হুকুম মানতে রাজি না হওয়ায় তিনি মুসলিম লীগ ত্যাগ করে নয়া মন্ত্রিসভা গঠন করলেন শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জির সাথে। মুসলিম লীগ ও ছাত্রকর্মীরা তাঁর বিরুদ্ধে আন্দোলন শুরু করল। আমিও ঝাঁপিয়ে পড়লাম। এই বৎসর আমি দ্বিতীয় বিভাগে পাস করে কলকাতায় ইসলামিয়া কলেজে ভর্তি হয়ে বেকার হোস্টেলে থাকতাম। নাটোর ও বালুরঘাটে হক সাহেবের দলের সাথে মুসলিম লীগের মনোনীত প্রার্থীদের দুইটা উপনির্বাচন হয়। আমিও দলবল নিয়ে সেখানে হাজির হলাম এবং অক্লান্ত পরিশ্রম করলাম, শহীদ সাহেবের হুকুম মত।"

অধ্যায় ২

কলকাতা ইসলামিয়া কলেজ ১৯৪২-৪৭

১৯৪২ সালে শেখ মুজিবুর রহমান কলকাতা ইসলামিয়া কলেজে আইএ ক্লাসে ভর্তি হন। তিনি বেকার হোস্টেলে থাকতেন। হলওয়েল মনুমেন্ট আন্দোলনকালে শেখ মুজিবুর রহমান সুভাষচন্দ্র বসুর ভক্ত হয়ে ওঠেন। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধকালে সুভাষ বসুর বীরত্ব তাকে আরো প্রভাবিত করে। ১৯৪২ সালের ২৮ জানুয়ারি জাপান রেঙ্গুন আক্রমণ করে। সুভাষ বসু রেঙ্গুনে আজাদ হিন্দ ফৌজ গঠন করে আসাম আক্রমণ করেন।

১৯৪২ সালের ৮ আগস্ট গান্ধীর নেতৃত্বে কংগ্রেস ভারত ছাড় আন্দোলন শুরু করে। ইংরেজ সরকার হাজার হাজার কংগ্রেস নেতাকর্মী গ্রেফতার করে। অনেকে পুলিশের গুলিতে নিহত হয়। এ সময় এ কে ফজলুল হক বাংলার প্রধানমন্ত্রী। তিনি কংগ্রেসের স্বাধীনতা আন্দোলন ও সুভাষ বসুর প্রতি সহানভূতিশীল ছিলেন। মুসলিম লীগ নেতা হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী ও আবুল হাশিমের নেতৃত্বে বাংলার মুসলমান যুব ও ছাত্রসমাজ ঐক্যবদ্ধ হয়। ১৯৪৩ সালের ২৯ মার্চ এ কে ফজলুল হকের মন্ত্রিসভার পতন হয়। খাজা নাজিমউদ্দিন প্রধানমন্ত্রী নিযুক্ত হন। কলকাতায় ছাত্র জীবনে শেখ মুজিবুর রহমান একে ফজলুল হক ও সোহরাওয়ার্দীর একান্ত সান্নিধ্যে আসার সুযোগ হয়। ১৯৪৩ সালে তিনি বাংলায় দুর্ভিক্ষপীড়িত মানুষের সেবা করেছেন। টুঙ্গীপাড়ায় তিনি নিজের বাড়ির গোলার ধান গরিবের মধ্যে বিলিয়ে দেন। তিনি ফুড কমিটি ও ধর্মগোলা প্রতিষ্ঠা করে ক্ষুধার্ত মানুষকে মৃত্যুর হাত থেকে বাঁচিয়েছেন।

শেখ মুজিবুর রহমান তাঁর কলকাতার রাজনীতি সম্পর্কে বলেন :

"এই সময় ইসলামিয়া কলেজে আমি খুবই জনপ্রিয়তা অর্জন করেছি। অফিসিয়াল ছাত্রলীগের বিরুদ্ধে প্রার্থী দাঁড় করিয়ে তাদের পরাজিত করালাম। ইসলামিয়া কলেজই ছিল বাংলাদেশের ছাত্র আন্দোলনের প্রাণকেন্দ্র। পরের বছরও ১৯৪৩ সালে ইলেকশনে আনোয়ার সাহেবের অফিসিয়াল ছাত্রলীগ হল।

তারপর আর তিন বৎসর কেউই আমার মনোনীত প্রার্থীর বিরুদ্ধে ইলেকশন করে নাই। বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় কলেজ ছাত্র ইউনিয়নের ইলেকশন হত। আমি ছাত্রনেতাদের নিয়ে আলোচনা করে যাদের ঠিক করে দিতাম তারাই নমিনেশন দাখিল করত, আর কেউ করত না। কারণ জানত, আমার মতের বিরুদ্ধে কারও জিতবার সম্ভাবনা ছিল না। জহিরুদ্দিন আমাকে সাহায্য করত। সে কলকাতার বাসিন্দা, ছাত্রদের উপর তার যথেষ্ট প্রভাব ছিল।"

শেখ মুজিবুর রহমান ছাত্র রাজনীতি ও মুসলিম লীগের দলীয় কাজে সম্পৃক্ত ছিলেন। তিনি মুসলিম লীগের কাউন্সিলর ছিলেন। মুসলিম লীগের অফিস ছিল কলকাতা ৩ নম্বর ওয়েলেসলি ফার্স্ট লেনের বাড়িতে। হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী গ্রাম বাংলায় মুসলিম লীগের ভিত্তি শক্তিশালী করেন। তিনি ছিলেন একজন প্রতিভাবান সংগঠক। তিনি একজন সাহসী যুবক নেতার সন্ধানে ছিলেন। ১৯৩৭-১৯৪৪ সাল পর্যন্ত সোহরাওয়ার্দী অনেক যুবনেতাদের পরীক্ষা করেছেন। এদের মধ্যে ছিলেন সবুর খান, নুরুল হুদা, আনোয়ার হোসেন, ফজলুল কাদের চৌধুরী, শমসের আলী, শাহ আজিজুর রহমান, নুরুদ্দীন। অবশেষে তিনি পেলেন শেখ মুজিবুর রহমানকে। সোহরাওয়ার্দী মন্ত্রী হয়ে ৪০ নম্বর থিয়েটার রোডে বাস করতেন। এ বাড়িটি ছিল বাংলার রাজনৈতিক কেন্দ্র। ১৯৪৩ সালে মুসলিম লীগের কেন্দ্রীয় কমিটি প্রস্তাব করে যে যারা মন্ত্রী হবেন তারা দলের কোনো পদে থাকতে পারবেন না। মুসলিম লীগের নির্দেশে মন্ত্রী হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী বঙ্গীয় মুসলিম লীগের সম্পাদক পদে ইস্তফা দেন। সম্পাদক পদে শেখ মুজিবুর রহমানসহ যুবকদের প্রার্থী হলেন আবুল হাশিম এমএলএ। ১৯৪৩ সালের ৭ নভেম্বর আবুল হাশিম বঙ্গীয় মুসলিম লীগের সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হন। হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী ও আবুল হাশিম যুব নেতাদের নিয়ে মুসলিম লীগকে নবাব ও খান বাহাদুরদের বৈঠকখানা থেকে তৃণমূল পর্যায়ে প্রতিষ্ঠা করেন। তারা মুসলিম লীগ ঢাকার আহসান মঞ্জিলের নেতৃত্ব, প্রচারে দৈনিক আজাদ ও অর্থে ইসপাহানী থেকে মুক্ত করেন। ১৯৪৪ সালে বাংলার মুসলিম লীগের সদস্য সংখ্যা দাঁড়ায় পাঁচ লাখের বেশি।

১৯৪৩ সালের দুর্ভিক্ষ

১৯৪৩ সালের ২৪ এপ্রিল মুসলিম লীগের খাজা নাযিমউদ্দিন বাংলার প্রধানমন্ত্রী নিযুক্ত হন। এ মন্ত্রিসভায় হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী খাদ্যমন্ত্রীর দায়িত্ব গ্রহণ করেন। ইংরেজদের পোড়ামাটি নীতির ফলে বাংলায় দুর্ভিক্ষ দেখা দেয় এবং না খেয়ে ৫০ লক্ষ লোক মৃত্যুবরণ করে। ১৯৪৩ সালে দুর্ভিক্ষকালে তিনি কলকাতায়

দুর্ভিক্ষপীড়িত মানুষের সেবা করেছেন। দুর্ভিক্ষের সময় তিনি কলকাতা আলিয়া মাদরাসায় একটি রিলিফ ক্যাম্প পরিচালনা করেন। তাঁর নেতা হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর সাথে শেখ মুজিবের কাজ করার সুযোগ হয়েছে। দুর্ভিক্ষের সময় টাঙ্গাইলের আরপি সাহার সাথে সোহরাওয়ার্দী ও শেখ মুজিবের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক গড়ে ওঠে। আরপি সাহা ব্যবসা করে প্রচুর অর্থ উপার্জন করেন এবং তা জনসেবায় ব্যয় করেন। শেখ মুজিব ১৯৪৩ সালে দুর্ভিক্ষের সময় গোপালগঞ্জ ও টুঙ্গিপাড়ায় এসে জনগণের সেবা করেছেন। তিনি নিজের বাড়ির গোলার ধান ও চাল স্থানীয় জনগণের মধ্যে বিলিয়ে দেন। তিনি ফুড কমিটি গঠন ও ধর্মগোলা করে ক্ষুধার্ত মানুষকে মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা করেছেন। ১৯৪৩ সালে শেখ মুজিব কলকাতায় বাংলার মানুষের অসহায় অবস্থা ও ইংরেজ শাসকদের নির্যাতন শাসন শোষণ দেখেছেন। ১৯৪৩ সালের দুর্ভিক্ষ বাঙালিদের ইতিহাসে এক কলঙ্কময় অধ্যায়। শিল্পী জয়নুল আবেদিন ১৯৪৩ সালের বাংলার দুর্ভিক্ষের ছবি এঁকে খ্যাতি অর্জন করেছেন। বাঙালি জাতি কত অসহায় তা তিনি প্রত্যক্ষ করেছেন বৃটিশ শাসনামলে।

১৯৪৩ সালের দুর্ভিক্ষ বা পঞ্চাশের মন্বন্তর সম্পর্কে শেখ মুজিবুর রহমান তাঁর আত্মজীবনীতে বলেছেন :

"১৯৪৩ সালে ভয়াবহ দুর্ভিক্ষ আরম্ভ হয়েছে। লক্ষ লক্ষ লোক মারা যাচ্ছে। এই সময় আমি প্রাদেশিক মুসলিম কাউন্সিলের সদস্য হই। জনাব আবুল হাশিম সাহেব মুসলিম লীগের সম্পাদক হন। তিনি সোহরাওয়ার্দী সাহেবের মনোনীত ছিলেন। আর খাজা নাজিমুদ্দিন সাহেবের মনোনীত ছিলেন খুলনার আবুল কাশেম সাহেব। আবুল হাশিম সাহেব তাকে পরাজিত করে সাধারণ সম্পাদক হন। এরপূর্বে সোহরাওয়ার্দী সাহেবই সাধারণ সম্পাদক ছিলেন। এ সময় থেকে মুসলিম লীগের মধ্যে দুই দল মাথা চাড়া দিয়ে উঠে। একটা প্রগতিশীল দল, আর একটা প্রতিক্রিয়াশীল। শহীদ সাহেবের নেতৃত্বে আমরা বাংলার মধ্যবিত্ত শ্রেণীর লোকেরা মুসলিম লীগকে জনগণের লীগে পরিণত করতে চাই। জনগণের প্রতিষ্ঠান করতে চাই। মুসলিম লীগ তখন পর্যন্ত জনগণের প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয় নাই। জমিদার জোতদার ও খান বাহাদুরদের প্রতিষ্ঠান ছিল। কাউকেই লীগে আসতে দিত না। জেলায় জেলায় খান বাহাদুরের দলেরাই লীগকে পকেট করে রেখেছিল।"

"খাজা নাজিমুদ্দীন সাহেবের নেতৃত্বে ১৯৩৭ সালের নির্বাচনে ঢাকার এক খাজা বংশের থেকেই এগারজন এম এল এ হয়েছিল। ১৯৪৩ সালে, খাজা নাজিমুদ্দীন সাহেব যখন প্রধানমন্ত্রী হলেন তিনি তাঁর ছোট ভাই খাজা শাহাবুদ্দীন

সাহেবকে শিল্পমন্ত্রী করলেন। আমরা বাধা দিলাম, তিনি শুনলেন না। শহীদ সাহেবের কাছে আমরা যেয়ে প্রতিবাদ করলাম, তিনিও কিছু বললেন না। সোহরাওয়ার্দী সাহেব সিভিল সাপ্লাই মন্ত্রী হলেন। দুর্ভিক্ষ শুরু হয়েছে। গ্রাম থেকে লাখ লাখ লোক শহরের দিকে ছুটেছে স্ত্রী-পুত্রের হাত ধরে। খাবার নাই, কাপড় নাই। ইংরেজ যুদ্ধের জন্য সমস্ত নৌকা বাজেয়াপ্ত করে নিয়েছে। ধান, চাল সৈন্যদের খাওয়াবার জন্য গুদাম জব্দ করেছে। যা কিছু ছিল ব্যবসায়ীরা গুদামজাত করেছে। ফলে এক ভয়াবহ অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে। ব্যবসায়ীরা দশ টাকা মণের চাউল চল্লিশ পঞ্চাশ টাকায় বিক্রি করছে। এমন দিন নাই রাস্তায় লোকে মরে পড়ে থাকতে দেখা যায় না। আমরা কয়েকজন ছাত্র শহীদ সাহেবের কাছে যেয়ে বললাম, 'কিছুতেই জনসাধারণকে বাঁচাতে পারবেন না, মিছামিছি বদনাম নেবেন।" তিনি বললেন, "দেখি চেষ্টা করে কিছু করা যায় কি না, কিছু লোক তো বাঁচাতে চেষ্টা করব।"

"সোহরাওয়ার্দী সিভিল সাপ্লাই বিভাগ গড়ে তুলেন, কন্টোল দোকান খোলার বন্দোবস্ত করেন, গ্রামে গ্রামে নঙ্গরখানা করার হুকুম দিলেন– "আমিও লেখাপড়া ছেড়ে দুর্ভিক্ষপীড়িতদের সেবায় ঝাপিয়ে পড়লাম। অনেকগুলি নঙ্গরখানা খুললাম, দিনে একবার করে খাবার দিতাম।"

১৯৪৩ সালে ত্রাণকাজে বঙ্গবন্ধু গোপালগঞ্জ গেলেন। অধিক ত্রাণ পাওয়ার লক্ষ্যে তিনি দক্ষিণ বাংলায় পাকিস্তান কনফারেন্স আয়োজন করেন। তিনি ছিলেন অভ্যর্থনা কমিটির চেয়ারম্যান। হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীসহ অনেক বড় নেতাদের সভায় যোগদানের জন্য অনুরোধ জানান হয়। ব্যস্ততার জন্য সোহরাওয়ার্দী আসতে পারেন নি। খাজা শাহাবুদ্দিন, মওলানা তর্কবাগীস, লাল মিয়া ও তমিজউদ্দিন খান কনফারেন্সে যোগদেন। অনেক বাধাবিপত্তির মধ্যে কনফারেন্স হল। ঝড়ে বাদাম ছিড়ে যায়, শেখ মুজিব অসুস্থ হয়ে পড়েন। লেখাপড়া হচ্ছে না, তিনি রিলিফের কাজ নিয়ে ব্যস্ত। তার পিতা এ সময় একটি কথা বলেন, "বাবা রাজনীতি কর আপত্তি করব না; তবে লেখাপড়া করতে ভুলিও না লেখাপড়া না শিখলে মানুষ হতে পারবে না। আর একটা কথা মনে রেখ, Sincerity of purpose and honesty of purpose থাকলে জীবনে পরাজিত হবে না। একথা কোনটা আমি ভুলি নাই।"

"একদিনের কথা মনে আছে, আব্বা ও আমি রাত দু'টা পর্যন্ত রাজনীতির আলোচনা করি। আব্বা আমার আলোচনা শুনে খুশি হলেন। শুধু বললেন, শেরে বাংলা একে ফজলুল হক সাহেবের বিরুদ্ধে কোন ব্যক্তিগত আক্রমণ না করতে। একদিন আমার মাও আমাকে বলেছিলেন, ''বাবা যায়ই কর, হক সাহেবের

বিরুদ্ধে কিছুই বলিও না। শেরে বাংলা মিছামিছিই 'শেরেবাংলা' হন নাই। বাংলার মাটিও তাঁকে ভালবেসে ফেলেছিল। যখনই হক সাহেবের বিরুদ্ধে কিছু বলতে গেছি, তখনই বাধা পেয়েছি।"

অল ইন্ডিয়া মুসলিম লীগ সম্মেলন-১৯৪৩

১৯৪৩ সালের এপ্রিল মাসে দিল্লীর এ্যাংলো এ্যারাবিয়ান কলেজ প্রাঙ্গনে অল ইন্ডিয়া মুসলিম লীগ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সম্মেলনের সভাপতি মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ। বাংলা থেকে হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীসহ ছাত্রলীগ নেতৃবৃন্দ সম্মেলনে যোগদেন। ছাত্রলীগ নেতাদের মধ্যে ছিলেন ইসলামিয়া কলেজ ইউনিয়নের সেক্রেটারী মীর আশরাফউদ্দিন, আনোয়ার হোসেন, খলিলুর রহমান, বরিশালের নুরুদ্দিন, শেখ মুজিবুর রহমান প্রমুখ। শেখ মুজিবুর রহমান ও তার দলের সাথে আনোয়ার হোসেনের দ্বন্দ্ব ছিল। সভাশেষে জিন্নাহকে হাতীর পিঠে চড়িয়ে দিল্লীর রাস্তায় মিছিল করা হয়। মিছিলে শেখ মুজিব যোগদেন। শেখ মুজিব দিল্লীতে প্রথম এসেছেন। তিনি দিল্লীর ঐতিহাসিক স্থান পরিদর্শন করেন।

বঙ্গীয় মুসলিম ছাত্রলীগের মধ্যে দু'টি উপদল ছিল। একটির নেতা ছিলেন আনোয়ার হোসেন। অপরটির নেতা শেখ মুজিবুর রহমান। তারা উভয়েই হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর ভক্ত ছিলেন। সোহরাওয়ার্দী আনোয়ার হোসেনকে একটি পদ দিতে বলেন। শেখ মুজিবুর রহমান রাজী হলেন না। তিনি বলেন, আনোয়ার হোসেন দলের মধ্যে কোটারী সৃষ্টি করেছে, হিসাব দেয় না। হঠাৎ সোহরাওয়ার্দী রাগ হয়ে বলেন, ''Who are you? You are nobody?" শেখ মুজিবুর রহমান প্রতিবাদ করে বলেন, "If I am nobody, why you have invited me? You have no right to insult me. I will prove that I am somebody. Thank you sir, I will never come to you again. এই কথা বলে তিনি চীৎকার করে বের হয়ে যান। তৎক্ষণাত সোহরাওয়ার্দী ছাত্রনেতা নুরুলহুদাকে শেখ মুজিবকে নিয়ে আসার জন্য প্রেরণ করেন। সোহরাওয়ার্দী শেখ মুজিবকে শান্ত করেন। তিনি তাকে খুব ভালবাসতেন। সোহরাওয়ার্দীর ভালবাসা সম্পর্কে শেখ মুজিব বলেন : "সেই দিন থেকে আমার জীবনের প্রত্যেক দিনই তার স্নেহ পেয়েছি। এই দীর্ঘদিন আমাকে তার কাছ থেকে কেউই ছিনিয়ে নিতে পারে নাই এবং তার স্নেহ থেকে কেউই আমাকে বঞ্চিত করতে পারে নাই।"

১৯৪৪ সালে কুষ্টিয়ায় ছাত্রলীগের কাউন্সিল অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। কুষ্টিয়ার কৃষ্ণনগরে একটি সিনেমা হলে কাউন্সিল অধিবেশন বসে। অলইন্ডিয়া মুসলিম ছাত্রলীগ ফেডারেশনের পক্ষে সভাপতিত্ব করেন হামিদুর রহমান। ছাত্ররা দু'ভাগ

হয়ে যায়। আবুল হাশিম ও শেখ মুজিবুর রহমানের দলে ছিলেন নুরুদ্দিন আহমেদ, একরাম, শরফুদ্দিন, খোন্দকার নুরুল আলম, চট্টগ্রামের ফজলুল কাদের চৌধুরী, এম এ আজিজ, জহুর আহমেদ চৌধুরী, আজিজুর রহমান, বরিশালের কাজী বাহাউদ্দিন আহমেদ, পিরোজপুরের সালেহ আহমেদ, সিলেটের মোয়াজ্জেম হোসেন চৌধুরী প্রমুখ। অন্যদলের নেতা ছিলেন আনোয়ার হোসেন, শাহ আজিজুর রহমান, শামসুল হুদা চৌধুরী। শাহ আজিজুর রহমান অছাত্রদের কাউন্সিলর বানিয়ে কাউন্সিলে যোগ দেয়। শেখ মুজিবুর রহমান ও তার দলীয় নেতারা সভাপতির নিকট প্রতিবাদ জানায়। সভাপতি তাদের অভিযোগ বাতিল করে দেয়। শেখ মুজিব তার দলীয় নেতা কর্মীদের নিয়ে কাউন্সিল সভা ত্যাগ করেন। এই সুযোগ ষড়যন্ত্র করে শামসুল হুদা চৌধুরীকে সভাপতি ও শাহ-আজিজুর রহমানকে সম্পাদক করে কমিটি ঘোষণা দেয়া হয়। শেখ মুজিবুর রহমান ও তার দল শাহ আজিজুর রহমানের কমিটিকে কোন দিন স্বীকার করেন নি। তিনি কলকাতার ছাত্রলীগকে ঐক্যবদ্ধ করেন। "এই সময় আমি বাধ্য হয়ে কিছু দিনের জন্য ইসলামিয়া কলেজের ছাত্র ইউনিয়নের সাধারণ সম্পাদক পদে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত হই।" ইসলামিয়া কলেজে নির্বাচন নিয়ে দু'টি গ্রুপ সৃষ্টি হয়েছিল। তাই তাকে সম্পাদকের দায়িত্ব গ্রহণ করতে হয়েছে।

মুসলিম লীগের পত্রিকা দৈনিক আজাদ ও মর্নিং নিউজ মুসলিম লীগের সোহরাওয়ার্দী ও আবুল হাশিম গ্রুপের মতবাদ তেমন ছাপত না। শেখ মুজিবুর রহমান ও নুরুদ্দিন হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী ও আবুল হাশিমকে অনুরোধ করে মিল্লাত পত্রিকা প্রকাশের ব্যবস্থা করেন। সম্পাদন হলেন আবুল হাশিম। মুসলিম লীগে অফিসের নীচে সাপ্তাহিক মিল্লাতের অফিস ছিল। ১৯৪৫ সালে ১৫ নভেম্বর সাপ্তাহিক মিল্লাত পত্রিকা প্রকাশিত হয়। এ সময় শেখ মুজিবুর রহমানের সাথে ঘনিষ্ঠ ছাত্রনেতারা ছিলেন– নুরুদ্দিন, একরাম, নুরুল আলম, শরফুদ্দিন, জহির, ফজলুল কাদের চৌধুরী।

বঙ্গবন্ধু বিশ্বাস করতেন লাহোর প্রস্তাবের ভিত্তিতে দু'টি পাকিস্তান হবে। একটি পশ্চিম পাকিস্তান আর একটি বাংলা আসাম। তিনি হাবিবুল্লাহ বাহারের লেখা পাকিস্তান এবং মুজিবুর রহমান খার লেখা পাকিস্তান বই বিস্তৃতভাবে পড়েছেন। তিনি হিন্দুদের মুসলমানদের প্রতি ঘৃণা, অস্পৃশ্যতা পছন্দ করতেন না। তিনি হিন্দু মহাজন ও জমিদারদের অত্যাচারের সমালোচনা করতেন।

মিল্লাত প্রকাশিত হওয়ায় আকরম খাঁর আজাদ পত্রিকা একচেটিয়া প্রচারের সমাপ্তি হলো। এভাবে সোহরাওয়ার্দী ও আবুল হাশিম মুসলিম লীগের নেতৃত্বে ঢাকার আহসান মঞ্জিল থেকে, প্রচারে আজাদ থেকে এবং অর্থে মির্জা আহসান

ইস্পাহানির কবল থেকে দলকে মুক্ত করেন। এক্ষেত্রে শেখ মুজিবুর রহমানসহ যুব নেতৃবৃন্দ উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করেন। তারা মুসলিম লীগকে জনগণের দলে উন্নীত করেন। ১৯৪৫ সালের ১৫ থেকে ২০ নভেম্বর হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী ও আবুল হাশিম প্রত্যেক জেলায় নির্বাচনী অফিস প্রতিষ্ঠা এবং একজন সম্পাদক নিয়োগ করেন।

১৯৪৪ সালের ১৭ নভেম্বর মুসলিম লীগের বার্ষিক কাউন্সিল সভা কলকাতায় অনুষ্ঠিত হয়। অধিবেশনের এক সংকটময় মুহূর্তে শেখ মুজিবুর রহমানের ভাষণ শুনে সোহরাওয়ার্দী মুগ্ধ হন। সেখানে সোহরাওয়ার্দী শেখ মুজিবকে বেছে নিলেন তার উত্তরাধিকার হিসেবে। সভায় মওলানা আকরম খাঁ সভাপতি এবং আবুল হাশিম সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হন। ১৯৪৪-৪৫ সালে সোহরাওয়ার্দী ও আবুল হাশিম যুবকর্মীদের নিয়ে ২৭ জেলায় মুসলিম লীগ কমিটি গঠন করে। মুসলিম লীগকে ঢাকার আহসান মনজিল থেকে মুক্ত করে জনগণের সংগঠন হিসেবে পরিণত হয়। খাজা পরিবারকে বাদ দিয়ে মুসলিম লীগ কমিটি গঠন করা হয়। ফরিদপুরে কমিটি গঠন নিয়ে বিরোধ শুরু হয়। শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী সভাপতিত্বে গোপালগঞ্জ মুসলিম লীগের সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় নেতৃত্ব নিয়ে সংঘর্ষ হয়। একদিকে শেখ মুজিবুর রহমান অন্যদিকে ইউসুফ আলী চৌধুরী, সালাম খান, অহিদুজ্জামান ঠাণ্ডা মিয়া ও তার পিতা। উভয় দল অস্ত্র নিয়ে মারমুখী। সোহরাওয়ার্দী উভয় দলকে শান্ত করেন। মুজিব প্রথম মহকুমা ও জেলা কমিটিতে নির্বাচিত হন। ১৯৪৪ সালে শেখমুজিবুর রহমান ফরিদপুরের অপ্রতিদ্বন্দ্বী নেতা হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করেন।

১৯৪৪ সালে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে জার্মান ও জাপানের পরাজয় হলে ১৯৪৫ সালে আগস্ট মাসে সুভাষ বসু রেঙ্গুন থেকে টোকিও যাওয়ার সময় বিমান দুর্ঘটনায় নিহত হন। ভারতে সুভাষ বসুর আইএনএ বাহিনীর বিচার হয়। ক্যাপ্টেন রশীদ আলীর ৭ বছরের সাজা হয়। কলকাতায় রশীদ আলী দিবস পালিত হয়। রশীদ আলী দিবসে হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর সাথে শেখ মুজিব নেতৃত্ব দেন।

১৯৪৬ সালে সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। ১৯৪৫ সালে সেপ্টেম্বর মাসে মুসলিম লীগ পার্লামেন্টারি বোর্ড গঠিত হবে। নির্বাচনে সোহরাওয়ার্দী গ্রুপ ও খাজা নাজিমউদ্দিন গ্রুপের মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা হয়। শেখ মুজিবুর রহমান ও তার দলীয় ছাত্রনেতাদের চেষ্টায় কাউন্সিলরদের ভোটে সোহরাওয়ার্দী সম্পাদক নির্বাচিত হন। এই নির্বাচনের পর সোহরাওয়ার্দীর রাজনৈতিক জীবনের উত্থান ঘটে।

১৯৪৫-৪৬ সালে নির্বাচন উপলক্ষে হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী ও আবুল হাশিম গোপালগঞ্জে জনসভা করেন। তাদের সংবর্ধনা নিয়ে আবদুস সালাম খান ও শেখ মুজিবুর রহমানের দলের মধ্যে বিরোধ সৃষ্টি হয়। শেখ মুজিব বলেন, "আমি গোপালগঞ্জ আওয়ামী লীগের জন্মদাতা।" দুই পক্ষে গোলমাল শুরু হলো তাদের হাতে ঢাল, লাঠি, তলোয়ার। শহীদ সোহরাওয়ার্দী সভামঞ্চ থেকে ছুটে গেলেন দু'দলের ভিতরে। তার সাহসিকতায় কোনো সংঘর্ষ হলো না।

সোহরাওয়ার্দী ও আবুল হাশিম প্রত্যেক জেলায় নির্বাচনী অফিস প্রতিষ্ঠা করেন এবং অফিসের সম্পাদক নির্বাচন করা হয়।

নির্বাচনী অফিসের সম্পাদকগণ

কামরুদ্দিন আহমদ	ঢাকা জেলা
শামসুল হক	ময়মনসিংহ
শেখ মুজিবুর রহমান	ফরিদপুর
আবদুর রহমান চৌধুরী	বরিশাল
শেখ আবদুল আজিজ	খুলনা
ফজলুল কাদের চৌধুরী	চট্টগ্রাম

এভাবে ২৭ জেলায় ২৭ জন সম্পাদক নির্বাচিত হয়। ১৯৪৫ সালে ১০ ও ১২ ডিসেম্বর কেন্দ্রীয় আইন সভার নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। তার মধ্যে মুসলমানের আসন ছিল ৩২।

"এই সময় আমাদের উপর মুসলিম লীগ থেকে হুকুম হল, জেলায় জেলায় চলে গিয়ে ইলেকশন অফিসের ভার নিতে। প্রত্যেক জেলায় ও মহকুমায় ইলেকশন অফিস ও কর্মী শিবির খোলা হবে। জেলায় জেলায় ভাল ভাল কর্মীদের কর্মী শিবিরের চার্জ নিতে হবে। আমার কয়েকটা জেলার কথা মনে আছে। কামরুদ্দিন সাহেব ঢাকা জেলা, শামসুল হক সাহেব ময়মনসিংহ, খোন্দকার মোশতাক আহমদ কুমিল্লা, একরামুল হক খুলনা এবং আমাকে ফরিদপুর জেলার ভার দেয়া হয়েছিল।"

শহীদ সোহরাওয়ার্দীর লোক হয়েও ফরিদপুরে লালমিয়া তার ভাই মোহন মিয়াকে সমর্থন করেন। তাদের সম্পর্কে শেখ মুজিব বলেন : "লাল মিয়া ও মোহন মিয়া সকল সময়ই ভিন্ন দলে থাকতেন। প্রথমে লাল মিয়া সাহেব কংগ্রেস করতেন, মোহন মিয়া সাহেব মুসলিম লীগ করতেন। আবার মুসলিম লীগে যখন যোগদান করলেন, এক ভাই রইলেন শহীদ সাহেবের দলে, আরেক ভাই খাজা নাজিমুদ্দীনের দলে। আবার পাকিস্তান আমলে আইয়ুবের মার্শাল 'ল আমলে, এক ভাই আইয়ুব খান সাহেবের দলে, আর এক ভাই বিরোধী দলে। যে দলই ক্ষমতায়

থাকুক না কেন, তাঁদের ক্ষমতা ঠিকই থাকে। এই অপূর্ব খেলা আমরা দেখেছি জীবনভর! রাতেরবেলা দুই ভাই এক, নিজেদের স্বার্থের বেলায় মুহূর্তের মধ্যেই এক হয়ে যান।"

হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর মহানুভবতা ও উদারতা সম্পর্কে শেখ মুজিব বলেন : "শহীদ সাহেব ছিলেন উদার, নীচতা ছিল না, দল মত দেখতেন না, কোটারি করতে জানতেন না, গ্রুপ করারও চেষ্টা করতেন না। উপর্যুক্ত হলেই তাকে পছন্দ করেন এবং বিশ্বাস করতেন। কারণ তাঁর আত্মবিশ্বাস ছিল অসীম। তাঁর সাধুতা, নীতি, কর্মশক্তি ও দক্ষতা দিয়ে মানুষের মন জয় করতে চাইতেন। এজন্য তাঁকে বার বার অপমানিত ও পরাজয়বরণ করতে হয়েছে। উদারতা দরকার, কিন্তু নীচ অন্তঃকরণের ব্যক্তিদের সাথে উদারতা দেখালে ভবিষ্যতে ভালর থেকে মন্দই বেশি হয়, দেশের ও জনগণের ক্ষতি হয়।

আমাদের বাঙালির মধ্যে দুইটা দিক আছে। একটা হল 'আমরা মুসলমান, আর একটা হল, আমরা বাঙালি।' পরশ্রীকাতরতা এবং বিশ্বাসঘাতকতা আমাদের রক্তের মধ্যে রয়েছে। বোধহয় দুনিয়ার কোন ভাষায়ই এই কথাটা পাওয়া যাবে না, 'পরশ্রীকাতরতা'। পরের শ্রী দেখে যে কাতর হয়, তাকে 'পরশ্রীকাতর' বলে। ঈর্ষা, দ্বেষ সকল ভাষায়ই পাবেন, সকল জাতির মধ্যেই কিছু কিছু আছে, কিন্তু বাঙালিদের মধ্যে আছে পরশ্রীকাতরতা। ভাই, ভাইয়ের উন্নতি দেখলে খুশি হয় না। এই জন্যই বাঙালি জাতির সকল রকম গুণ থাকা সত্ত্বেও জীবনভর অন্যের অত্যাচার সহ্য করতে হয়েছে। সুজলা, সুফলা বাংলাদেশ সম্পদে ভর্তি। এমন উর্বর জমি দুনিয়ায় খুব অল্প দেশেই আছে। তবুও এরা গরিব। কারণ, যুগ যুগ ধরে এরা শোষিত হয়েছে নিজের দোষে। নিজেকে এরা চেনে না, আর যতদিন চিনবে না এবং বুঝবে না ততদিন এদের মুক্তি আসবে না।" (অসমাপ্ত আত্মজীবনী, শেখ মুজিবুর রহমান)

১৯৪৬ সালের ১৯ থেকে ২২ মার্চ প্রাদেশিক আইন পরিষদের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। বঙ্গীয় আইনসভার ২৫০টি আসনের মধ্যে মুসলমানের আসন ছিল ১১৯। নির্বাচনে মুসলিম লীগ ১১৪টি এবং শেরে বাংলার কৃষক প্রজা পার্টি ৬টি আসন লাভ করে। নির্বাচনে শেখ মুজিব বিশেষ ভূমিকা পালন করেন। নির্বাচনে বাংলায় মুসলিম লীগের বিশাল বিজয় লাভ করে। অন্য কোনো প্রদেশে মুসলিম লীগ সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করতে পারেনি।

দিল্লী কনভেনশন ৯ এপ্রিল ১৯৪৬

মহম্মদ আলী জিন্নাহ নবনির্বাচিত মুসলিম লীগ সদস্যদের দিল্লিতে কনভেনশন

াহ্বান করেন। ৫৫০ জনের মধ্যে ৪৮১ জন সদস্য উপস্থিত হন। শেখ মুজিবুর হমান হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর সাথে দিল্লি কনভেনশনে যোগদান করেন। সলিম লীগ সভাপতি জিন্নাহ এবং সম্পাদক লিয়াকত আলী খান লাহোর স্তাবের স্টেটস-States-এর s বাদ দিয়ে State সংশোধন করা হয়। লাহোর স্তাবে একাধিক রাষ্ট্রের পরিবর্তে এক রাষ্ট্র– পাকিস্তান অন্তর্ভুক্ত করা হয়। এ স্তাব 'দিল্লি কনভেনশন' নামে খ্যাত। ১৯৪৬ সালের ৯ এপ্রিল জিন্নাহ াহরাওয়ার্দীকে দিয়ে দিল্লি কনভেনশন পাঠ করান।

হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী প্রথমে কংগ্রেসের সাথে যুক্ত মন্ত্রিসভা ঠনের প্রস্তাব দেন। কিন্তু কংগ্রেস রাজি না হওয়ায় ১৯৪৬ সালের ২৪ এপ্রিল াসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী বাংলার মন্ত্রিসভা গঠন করেন। তার মন্ত্রিসভায় লেন–

এইচ এস সোহরাওয়ার্দী	প্রধানমন্ত্রী, স্বরাষ্ট্র
আহমদ হোসেন	কৃষি
খান বাহাদুর আবদুল গোফরান	বেসামরিক সিভিল সাপ্লাই
খান বাহাদুর মোয়াজ্জেম হোসেন	শিক্ষা
খান বাহাদুর এ এফ এম আবদুর রহমান	সমবায়, সেচ
খান বাহাদুর মোহাম্মদ আলী	জনস্বাস্থ্য, স্থানীয় সরকার
শামসুদ্দীন আহমদ	বাণিজ্য, শ্রম ও শিল্প
যোগেন্দ্র নাথ মণ্ডল	বিচার ও পূর্ত
তারকানাথ মুখার্জি	অর্থ
নগেন্দ্র নারায়ণ রায়	
দ্বারকানাথ বাড়ৈ	
ফজলুর রহমান	

কেবিনেট মিশন

কংগ্রেস অখণ্ড ভারতের স্বাধীনতা চায়। মুসলিম লীগ ভারত বিভাগ করে পাকিস্তান দাবি করছে। বৃটিশ সরকারও অবিভক্ত ভারত রাখতে চায়। ভারতের সমস্যা সমাধানের জন্য বৃটিশ সরকার ১৯৪৬ সালের ২৪ মার্চ মন্ত্রিপরিষদ মিশন প্রেরণ করে। মন্ত্রি পরিষদে ছিলেন ভারত সচিব স্যার প্যাথিক লরেন্স, নৌবাহিনীর মন্ত্রী এ বি আলেকজান্ডার, বৃটিশ বাণিজ্যমন্ত্রী স্যার স্টাফোর্ড ক্রিপস। কেবিনেট মিশন কংগ্রেস ও মুসলিম লীগ নেতাদের সঙ্গে আলোচনা করেন। মহাত্মা গান্ধী অখণ্ড ভারত দাবি করেন। জিন্নাহ পাকিস্তান দাবি করছেন। ঐক্যবদ্ধ সমঝোতা

হয়নি। ভারতীয় নেতাদের সাথে আলোচনা করে মন্ত্রিপরিষদ মিশন বৃটিশ পার্লামেন্টে তাদের সুপারিশ পেশ করেন। তারা স্বাধীন ভারতে একটি যুক্ত রাষ্ট্র গঠনের সুপারিশ করে। তারা ভারতের প্রদেশগুলোকে তিনটি গ্রুপে বিভক্ত করার প্রস্তাব করেন।

গ্রুপ-A
পাঞ্জাব প্রদেশ
সিন্ধু প্রদেশ
উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ
বেলুচিস্তান
গ্রুপ B
বাংলা প্রদেশ
আসাম প্রদেশ
গ্রুপ C
ভারতের অবশিষ্ট প্রদেশ-বিহার, উড়িষ্যা, যুক্ত প্রদেশ, বোম্বে, মাদ্রাজ, দিল্লি, আজমীর, মধ্যপ্রদেশ।

তিনটি গ্রুপ স্বায়ত্তশাসন পাবে। ১৯৪৬ সালের ১৫ মে কেবিনেট মিশন তাদের পরিকল্পনা পেশ করলে মুসলিম লীগ কেবিনেট মিশন পরিকল্পনা গ্রহণ করে। কারণ তারা এ পরিকল্পনায় পাকিস্তানের দাবি অন্তর্ভুক্ত দেখতে পায়। গ্রুপ A ও B মুসলিম অধ্যুষিত প্রদেশ নিয়ে গঠিত হবে। কংগ্রেস কেবিনেট মিশন প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে। পরে কংগ্রেস কেবিনেট মিশনের প্রস্তাব গ্রহণ করে। তখন মুসলিম লীগ আবার কেবিনেট মিশন প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে। ভারতের সমস্যা গভীর সঙ্কটে পতিত হয়। ভারতের ভাইসরয় কংগ্রেস ও মুসলিম লীগকে যুক্ত রাষ্ট্র সরকারে যোগদানে আহ্বান জানায়। মুসলিম লীগ যোগ দিতে অস্বীকার করে। কংগ্রেসের জওয়াহের লাল নেহরুর নেতৃত্বে অন্তবর্তীকালীন সরকার গঠিত হয়। মুসলিম লীগ আন্দোলনের ডাক দেয়। তারা ১৯৪৬ সালের ১৬ আগস্ট প্রত্যক্ষ দিবস পালন করে। এদিন কলকাতায় দাঙ্গা হয় এবং কয়েক হাজার লোক নিহত হয়।

কলকাতা দাঙ্গা-১৬ আগস্ট ১৯৪৬

১৯৪৬ সালের ৬ জুন মুসলিম লীগ কেবিনেট মিশনের প্রস্তাব গ্রহণ করে। কারণ কেবিনেট মিশনে লাহোর প্রস্তাবের স্বীকৃতি আছে। কংগ্রেস কেবিনেট মিশন প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে।

১৯৪৬ সালের ২৬ এপ্রিল মাওলানা আবুল কালাম আজাদের স্থলে জওহর লাল নেহরু কংগ্রেসের সভাপতি নির্বাচিত হন। ১৯৪৬ সালের ১০ জুলাই কংগ্রেস সভাপতি পণ্ডিত জওহর লাল নেহরু ঘোষণা দেন যে, যেহেতু আইন সভায় কংগ্রেস সংখ্যাগুরু তাই কংগ্রেস কেবিনেট মিশনের প্রস্তাব পরিবর্তন করতে পারবে। মুসলিম লীগ নেহরুর ভাষণে শঙ্কিত হয়ে পড়ে। জিন্নাহ ১৯৪৬ সালের ২৮ জুলাই বোম্বে শহরে মুসলিম লীগের কাউন্সিল সভা আহ্বান করে। সভায় ১৬ আগস্ট Direct Action Day- প্রত্যক্ষ দিবস পালনের ঘোষণা দেয়। ২৪ আগস্ট নেহরু মুসলিম লীগকে বাদ দিয়ে মন্ত্রিসভা গঠন করেন। প্রত্যক্ষ দিবস পালনের জন্য ভারতের মুসলিম সম্প্রদায় প্রস্তুতি গ্রহণ করে। বাংলার প্রধানমন্ত্রী হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী ১৬ আগস্ট ছুটির দিন ঘোষণা করেন। কলকাতায় অকটারলনি মনুমেন্টের পাদদেশে মুসলিম লীগ জনসভা আয়োজন করে। জনসভা আয়োজনে শেখ মুজিবুর রহমান অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন। হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী সভার সভাপতিত্ব করেন। সভা চলাকালে কলকাতা শহরে হিন্দু-মুসলিম দাঙ্গা শুরু হয়। ১৬ আগস্ট থেকে ২০ আগস্ট দাঙ্গা চলে। দাঙ্গায় চার হাজার লোক নিহত হয়। হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী দাঙ্গা দমনে সাহসী ভূমিকা পালন করেন। দাঙ্গা দমনে শেখ মুজিবুর রহমান ছাত্রদের নিয়ে দিনরাত পরিশ্রম করেন। নিজের হাতে বাঁশ নিয়ে মুসলিম দাঙ্গাকারীদের প্রতিহত করে এক হিন্দুকে বাঁচিয়েছেন।

১৬ আগস্ট সম্পর্কে শেখ মুজিবুর রহমান বলেন :

"আমরা রওয়ানা হলাম গড়ের মাঠের দিকে, এমনিই আমাদের দেরি হয়ে গেছে। লাখ লাখ লোক সভায় উপস্থিত। কালীঘাট, ভবানীপুর, হ্যারিসন রোড, বড়বাজার সকল জায়গায় শোভা যাত্রার উপর আক্রমণ হয়েছে। শহীদ সাহেব বক্তৃতা করলেন এবং তাড়াতাড়ি সকলকে বাড়ি ফিরে যেতে হুকুম দিলেন। কিন্তু যাদের বাড়ি বা মহল্লা হিন্দু এরিয়ার মধ্যে তারা কোথায় যাবে?"

মুসলিম লীগ অফিস ক্যাম্পে পরিণত হয়েছে। বেকার হোস্টেল, ইলিয়ট হোস্টেল ভরে গেছে। চার দিক থেকে টেলিফোন আসছে, "আমাদের বাঁচাও, আমরা আটকা পড়ে আছি।" শেখ মুজিবুর রহমান, নুরুউদ্দিনসহ ছাত্রনেতারা আটকা পড়া হিন্দু-মুসলমানদের উদ্ধার করে নিরাপদ স্থানে পৌঁছে দেন। সোহরাওয়ার্দী কলকাতার মুসলিমলীগ অফিসে ছাত্রলীগ নেতারা জীবনের ঝুঁকি নিয়ে বঙ্গবন্ধু উদ্ধার কাজ করেন। তিনি বেকার হোস্টেলের পাশের হিন্দু পরিবার উদ্ধার করে সুরেন ব্যানার্জি রোডে পৌঁছে দেন। বঙ্গবন্ধু নিজে চিন্তিত। তার ৬ ভাইবোনের মধ্যে ৫ জন কলকাতায়। তার মেজবোন বনিয়াপুরে আছে, সেখানে

একবোন বেড়াতে এসেছেন। এক বোন শ্রীরাম পুরে ছিল, একমাত্র শেখ নাসেরকে নিয়ে চিন্তিত। তিনি মেট্রিক পরীক্ষা দিয়ে কলকাতা এসেছেন তিনিও নিরাপদে আছেন।

তিনি লিখেছেন : "কলকাতা শহরে শুধু মরা মানুষের লাশ বিক্ষিপ্তভাবে পড়ে আছে। মহল্লার পর মহল্লা আগুনে পুড়ে গিয়েছে। এক ভয়াবহ দৃশ্য। মানুষ মানুষকে এইভাবে হত্যা করতে পারে চিন্তা করতেও ভয় হয়।" প্রধানমন্ত্রী শহীদ সোহরাওয়ার্দীর নির্দেশে শেখ মুজিব, নুরুদ্দিন, নুরুল হুদা ঠেলা গাড়ীতে সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজ থেকে চাল সংগ্রহ করে বেকার হোস্টেল ও ইলিয়ট হোস্টেল পৌঁছে দেন। তারা কারমাইকেল কলেজে চাল পৌঁছে দেন। শিয়ালদহ ষ্টেশনে সেখানকার হিন্দু-মুসলমানদের আলাদা রাখা হয় শেখ মুজিব স্বেচ্ছাসেবকদের নিয়ে তাদের পাহাড়া দিতেন। কলকাতায় মুসলমান পুলিশ কম থাকায় প্রধানমন্ত্রী পাঞ্জাব থেকে সদ্যফেরত সিপাহীদের পুলিশে ভর্তি করে পাহাড়ার ব্যবস্থা করেন।

বিহারে দেড়মাস ত্রাণ কাজ করে অসুস্থ অবস্থায় শেখ মুজিবুর রহমান কলকাতা ফিরে আসেন। নির্বাচন ও দাঙ্গার কাজ করার কারণে তার লেখাপড়া বন্ধ। পরীক্ষার টেস্ট হয়েছে। অধ্যক্ষ ড. জুবেরীর নিকট পরীক্ষা দেয়ার অনুমতি চাইলেন। তিনি বলেন, "তুমি যথেষ্ট কাজ করেছে পাকিস্তান অর্জনের জন্য। তোমাকে আমি বাধা দিতে চাই না। তুমি যদি ওয়াদা কর যে এই কয় মাস লেখাপড়া করবা এবং কলকাতা ছেড়ে বাইরে কোথাও চলে যাবা এবং ফাইনাল পরীক্ষার পূর্বেই এসে পরীক্ষা দিবা। তাহলে তোমাকে আমি অনুমতি দিব।" কলেজের অধ্যাপক তাহের জামিল, সাইদুর রহমান এবং নাজির আহমদের সামনে তিনি ওয়াদা দেন। তিনি বই নিয়ে বাল্যবন্ধু ও সহপাঠী শেখ শাহাদাত হোসেনের নিকট উল্টোডাঙ্গায় চলে যান, শাহাদাত ১৯৪৬ সালে বিএ পাস করেছেন। পরীক্ষার পূর্বে পাক-সার্কাসে ছোট বোনের স্বামী আবদুর রব সেরনিয়াবাতের বাসায় উঠেন। শেখ মুজিবুর রহমান বেকার হোস্টেল ছেড়ে দিয়েছেন। স্ত্রী ফজিলাতুন্নেসা কলকাতায় এসেছেন– "রেনুর ধারণা পরীক্ষার সময় আমার কাছে থাকলে আমি নিশ্চয়ই পাস করব। বিএ পরীক্ষা দিয়ে পাস করলাম।"

কলকাতা দাঙ্গার পর নোয়াখালী ও বিহারে দাঙ্গা ছড়িয়ে পড়লে শেখ মুজিবুর রহমান একদল স্বেচ্ছাসেবী নিয়ে বিহার গমন করেন এবং দাঙ্গায় ক্ষতবিক্ষত মুসলমানদের সেবা করেন। দাঙ্গায় ক্ষতিগ্রস্তদের সেবা ও রাজনীতি নিয়ে ব্যস্ত থাকায় শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৪৬ সালে বিএ পরীক্ষা দিতে পারেননি। অবশেষে মুসলিম লীগ ১৯৪৬ সালের ২৪ অক্টোবর অন্তর্বর্তী সরকারে যোগদান করে। ভারতের ১০ কোটি মুসলমানের মধ্যে ৪ কোটি বাংলায় বাস

করে। কিন্তু বাংলা থেকে উল্লেখযোগ্য নেতারা মন্ত্রিসভায় স্থান পায়নি। মুসলিম লীগ হতে লিয়াকত আলী খান, রাজা গজনফর আলী খাঁ, আইআই চুন্দ্রিগড়, আবদুর রব নিশতার ও বাংলা থেকে যোগেন্দ্র লাল মণ্ডল মন্ত্রী নিযুক্ত হন।

প্রধানমন্ত্রী হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী ১৯৪৬ সালের ১৯ ডিসেম্বর দৈনিক ইত্তেহাদ পত্রিকা প্রকাশ করেন। পত্রিকার সম্পাদক হলেন আবুল মনসুর আহমদ এবং অফিস সুপারিনটেনডেন্ট হলেন তফাজ্জল হোসেন মানিক মিয়া।

১৯৪৭ সালের জানুয়ারি মাসে মুসলিম লীগের সভাপতি মাওলানা আকরম খাঁ পদত্যাগ করেন। ১৯৪৭ সালের ৯ ফেব্রুয়ারি কাউন্সিল অধিবেশন আহ্বান করা হয়। এ কে ফজলুল হক ও আবুল হাশিম সভাপতি পদে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন। হাজার হাজার মুসলিম লীগ নেতাকর্মী কলকাতায় সমবেত হয়েছেন। এ কে ফজলুল হক সমর্থক বেশি। রাস্তায় বিক্ষোভকারীরা আবুল হাশিমের ওপর আক্রমণ চালায়। ঠিক এ সময় শেখ মুজিবুর রহমান একাই আক্রমণকারীদের প্রতিহত করে আবুল হাশিমকে রক্ষা করেন। শেখ মুজিবুর রহমান আবুল হাশিমের সমর্থক ছিলেন। মওলানা আকরম খাঁ পদত্যাগপত্র প্রত্যাহার করলে নির্বাচন বন্ধ হয়ে যায়।

স্বাধীন সার্বভৌম বৃহত্তর বাংলা

১৯৪৭ সালের ২০ ফেব্রুয়ারি ভারতের ভাইসরয় লর্ড ওয়াভেল ঘোষণা করেন যে ১৯৪৮ সালের জুন মাসের মধ্যে শাসন ক্ষমতা ভারতীয়দের হাতে অর্পণ করা হবে। ১৯৪৭ সালের ২১ মার্চ লর্ড মাউন্টব্যাটেন গভর্নর জেনারেলের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। তিনি প্রথমে ভারত বিভাগের পক্ষে ছিলেন না। তিনি বলেন, Partition is sheer madness. ভারত বিভক্ত পাগলামি ছাড়া কিছু না। মাউন্টব্যাটেন কংগ্রেস ও মুসলিম লীগ নেতাদের সাথে আলোচনা করেও ভারত বিভক্ত ঠেকাতে পারেননি। পরিশেষে ভারত বিভক্ত ও জিন্নাহর পাকিস্তান দাবি মেনে নিতে হয়।

বাংলার প্রধানমন্ত্রী হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী ভারত বিভক্ত সমর্থন করেননি। তার দাবি ছিল যদি ভারত বিভক্ত হয় তাহলে স্বাধীন বাংলার দাবি মেনে নিতে হবে। তিনি ১৯৪৭ সালের ২৭ এপ্রিল ভারতের রাজধানী দিল্লিতে সাংবাদিক সম্মেলনে ডমিনিয়ন মর্যাদায় বৃহত্তর বাংলা দাবি করে বিবৃতি দেন। তিনি বিবৃতিতে বলেন, "এবার আসুন ভেবে দেখি বাংলা অবিভক্ত থাকলে তার অবস্থান কী হবে? বাংলা হবে একটি মহান দেশ। ভারতের মধ্যে সবচাইতে ধনাঢ্য ও সমৃদ্ধিশালী রাষ্ট্র। যে রাষ্ট্র তার অঙ্গে লালিত জনগণকে দিতে পারবে এক সমুন্নত জীবনযাত্রার মান।"

"আমি বরাবরই ভবিষ্যতে বাংলাকে একটি স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে কল্পনা করে এসেছি। ভারতের যুক্ত রাষ্ট্রের অঙ্গ হিসেবে নয়। বাংলা যদি মহান হতে চায় তার যে শুধু নিজের পায়ে দাঁড়িয়েই তা হতে পারবে। তাকেই নিজের সম্পদের অধিকারী ও নিজের ভাগ্যের নিয়ন্তা হতে হবে। বাংলার ওপর অন্যের শোষণের উচ্ছেদ হবে। ভারতের স্বার্থের যূপকাষ্ঠে বাংলাকে বলি দেয়া আর চলবে না।"

১৯৪৭ সালের ২০ মে কংগ্রেস নেতা সুভাষ চন্দ্র বসুর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা শরৎ চন্দ্র বসুর বাসভবনে মুসলিম লীগ ও কংগ্রেস নেতাদের বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। সভায় উপস্থিত ছিলেন–

হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী	প্রধানমন্ত্রী
আবুল হাশিম	সম্পাদক মুসলিম লীগ
মুহাম্মদ আলী	মন্ত্রী
এ এম মালেক	শ্রমিক নেতা
শরৎ চন্দ্র বসু	কংগ্রেস নেতা
কিরণ শংকর রায়	কংগ্রেস নেতা
সত্য রঞ্জন বকশী	নেতাজী সুভাষ চন্দ্র বসুর একান্ত সচিব

সভায় আলোচনান্তে স্বাধীন বৃহত্তর বাংলা চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। স্বাক্ষর করেন আবুল হাশিম ও শরৎ চন্দ্র বসু। চুক্তির মূল বিষয় ছিল–

- বাংলা হবে একটি স্বাধীন রাষ্ট্র। ১৬ জন মুসলমান ও ১৪ জন অমুসলমান নিয়ে ৩০ সদস্যের সংবিধান সভা নির্বাচিত হবে।
- সমান সংখ্যক হিন্দু-মুসলমান সদস্যদের নিয়ে একটি অন্তর্বর্তী মন্ত্রিপরিষদ গঠন করা হবে। মন্ত্রিপরিষদের প্রধানমন্ত্রী হবে একজন মুসলমান এবং স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী হবে হিন্দু।
- স্বাধীন বাংলার সংবিধানে হিন্দু-মুসলমান জনসংখ্যা অনুসারে আসন সংরক্ষণসহ যুক্ত নির্বাচকমণ্ডলী এবং বয়স্ক ভোটাধিকারের ভিত্তিতে বঙ্গীয় আইনসভার নির্বাচনের ব্যবস্থা হবে। চাকরি ক্ষেত্রে সমতা রক্ষা করা হবে।

প্রথমে ভাইসরয় মাউন্টব্যাটেন, গভর্নর বারোজ, জিন্নাহ স্বাধীন বাংলার প্রতি সমর্থন দেন। কিন্তু কংগ্রেস স্বাধীন বাংলা প্রত্যাখ্যান করে। সোহরাওয়ার্দী-শরৎ চন্দ্র বসুর প্রস্তাব ব্যর্থ হয়ে যায়।

১৯৪৭ সালের ১ জুন মুসলিম লীগ ও কংগ্রেস ভারত বিভক্ত রোয়েদাদ গ্রহণ করে। ৩ জুন লর্ড মাউন্ট ব্যাটেন, পণ্ডিত জওহর লাল নেহরু, মুহাম্মদ আলী

জিন্নাহ ভারত, পাকিস্তান স্বাধীন রাষ্ট্র, বাংলা ও পাঞ্জাব বিভক্তিকে সমর্থন করে দিল্লি বেতার থেকে ভাষণ দেন।

১৯৪৭ সালের ২০ জুন বঙ্গীয় আইন পরিষদ বাংলা ভাগ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। ১৯৪৭ সালের ৫ আগস্ট পূর্ববঙ্গ আইনসভার নির্বাচন হবে। অর্থ ও পদের বিনিময়ে অনেক এমএলএ খাজা নাজিমউদ্দিনকে নেতা নির্বাচন করে। সোহরাওয়ার্দী দুর্নীতি ও ষড়যন্ত্রের পথে নেতা হতে রাজি হননি। শেখ মুজিবুর রহমান এমএলএদের বিক্রি হতে দেখে ব্যথিত হন। তিনি খাজা নাজিমউদ্দিন ও এমএলএদের সমালোচনা করেন। ১৩ আগস্ট সোহরাওয়ার্দী মুখ্যমন্ত্রীর দায়িত্ব পশ্চিম বাংলার প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ ও পূর্ব পাকিস্তানের খাজা নাজিমউদ্দিনের নিকট হস্তান্তর করেন।

১৯৪৭ সালের ১৪ আগস্ট ভারত ভাগ হয়ে পাকিস্তান সৃষ্টি হয়। বাংলা ভাগ হয়ে পূর্ব বাংলা পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত হয়।

প্রধানমন্ত্রী সোহরাওয়ার্দী সিলেটের গণভোট পরিচালনার দায়িত্ব পালন করেন। তিনি শেখ মুজিবসহ দলের নেতা কর্মীদের সিলেটে প্রেরণ করেন।" মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী, মওলানা তর্কবাগীশ, মানিক মিয়া, ফজলুল হক এবং শেখ মুজিবুর রহমান কর্মীবাহিনী নিয়ে সিলেটে গণভোটে কাজ করেন। শেখ মুজিব সিলেটের গণভোটে নেতৃত্ব দেন। শেখ মুজিব বলেন, ''পাঁচশ কর্মী নিয়ে সিলেট গমন করলাম। শামসুল হক ঢাকা থেকে কর্মী নিয়ে এসেছেন। সোহরাওয়ার্দীর অনুরোধে আরপি সাহা গণভোটের জন্য কয়েকখানা লঞ্চ প্রেরণ করেন। প্রধানমন্ত্রী সোহরাওয়ার্দী আসামের করিমগঞ্জের জনসভায় ভাষণ দেন।" শেখ মুজিবও এ সভায় বক্তৃতা করেন। গণভোটে জয়লাভ করে শেখ মুজিব কলকাতায় পৌঁছেন।

সোহরাওয়ার্দী সংবাদপত্রে বলেন, "স্বাধীন-সার্বভৌম বাংলা রাষ্ট্রের আদর্শের পৃষ্ঠে ছুরিকাঘাত করা হয়েছে।"

বাংলা বিভক্ত হয়ে পূর্ব বাংলা পাকিস্তানভুক্ত প্রদেশ হলো। রাজধানী হলো ঢাকায়।

শান্তি মিশন

১৯৪৭ সালের ১৪ আগস্ট পাকিস্তানের গভর্নর জেনারেল মহম্মদ আলী জিন্নাহ করাচিতে পাকিস্তানের পতাকা উত্তোলন করেন। ১৫ আগস্ট জওহর লাল নেহরু দিল্লিতে ভারতের পতাকা উত্তোলন করেন। ভারত বিভক্তের সাথে সাথে ভারতের পূর্ব পাঞ্জাব, বিহার, দিল্লি, যুক্ত প্রদেশ ও পাকিস্তানের পশ্চিম পাঞ্জাবে সাম্প্রদায়িক

দাঙ্গা ছড়িয়ে পড়ে। লক্ষ লক্ষ হিন্দু-মুসলিম নিহত এবং হাজার হাজার নারী ধর্ষিত হয়। এক কোটি লোক বাস্তুহারা হয়।

১৯৪৭ সালের ১৪ আগস্ট মহাত্মা গান্ধী কলকাতার সোদপুরে হায়দরী ম্যানশনে সাম্প্রদায়িক শান্তির জন্য চেষ্টা চালাচ্ছেন। হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী জীবনের ঝুঁকি নিয়ে হায়দরী ম্যানশনে গান্ধীর সাথে শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য কাজ করছেন। ১৭ আগস্ট র‍্যাডক্লিফের রোয়েদাদ ঘোষণার পর পূর্ব পাঞ্জাবে শিখরা মুসলমানদের ওপর আক্রমণ এবং পশ্চিম পাঞ্জাবে মুসলমানরা হিন্দু ও শিখদের ওপর আক্রমণ চালায়। পাঞ্জাবের দাঙ্গায় ৫ লাখ লোক নিহত হয়। ১ কোটি ৪০ লাখ লোক তাদের ভিটামাটি থেকে বিতাড়িত হয়। এক লাখ যুবতী অপহৃত হয়। একমাত্র বাংলায় গান্ধী ও সোহরাওয়ার্দীর চেষ্টায় কোনো দাঙ্গা হয়নি। শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৪৭ সালের ১৪ আগস্ট হতে নভেম্বর পর্যন্ত কলকাতায় হায়দরী ম্যানশনে গান্ধী ও সোহরাওয়ার্দীদের সাথে শান্তি মিশনে কাজ করেন। কলকাতা দাঙ্গা তার রাজনৈতিক জীবন প্রভাবিত করে। তিনি সাম্প্রদায়িক রাজনীতি পরিত্যাগ করে অসাম্প্রদায়িক রাজনীতি দীক্ষা গ্রহণ করেন।

অধ্যায় ৩

পাকিস্তানের সৃষ্টি

ছাত্রলীগের জন্ম

মুহাম্মদ আলী জিন্নাহ পাকিস্তানের গভর্নর জেনারেলের দায়িত্ব গ্রহণের জন্য ১৯৪৭ সালের ৭ আগস্ট করাচীর উদ্দেশে দিল্লি ত্যাগ করেন। ভারতের ভাইসরয় লর্ড মাউন্ট ব্যাটেন ১৩ আগস্ট করাচি পৌঁছেন। ১৯৪৭ সালের ১৪ আগস্ট বৃটিশ ইউনিয়ন জ্যাক পতাকার পরিবর্তে অর্ধ চাঁদ ও তারকা খচিত পাকিস্তানি পতাকা উত্তোলনের মাধ্যমে পাকিস্তানের স্বাধীনতা ঘোষণা হয়। ১৫ আগস্ট ভারতের স্বাধীনতা ঘোষণা করা হয়। ভারতের প্রথম গভর্নর জেনারেল লর্ড মাউন্ট ব্যাটেন এবং প্রধানমন্ত্রী নিযুক্ত হন পণ্ডিত জওহর লাল নেহরু। এভাবে লক্ষ লক্ষ হিন্দু-মুসলমানের রক্তের ওপর দিয়ে ভারত বিভক্ত হয়।

পাকিস্তান সরকার গঠনে পূর্ব বাংলাকে প্রথম থেকে বঞ্চিত করা হয়। পূর্ব বাংলা থেকে মাত্র দুজন মন্ত্রী নিযুক্ত হন। ১৯৪৭ সালের ১৪ আগস্ট গঠিত পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভা–

মুহাম্মদ আলী জিন্নাহ	গভর্নর জেনারেল
লিয়াকত আলী খান	প্রধানমন্ত্রী
আই আই চুন্দ্রিগড়	বাণিজ্য, শিল্প
গোলাম মুহাম্মদ	অর্থ
সরদার আবদুর রব নিশতার	যাতায়াত
রাজা গজনফর আলী খান	খাদ্য ও কৃষি
স্যার মুহাম্মদ জাফরুল্লাহ	পররাষ্ট্র
যোগেন্দ্র নাথ মণ্ডল	আইন, শ্রম ও পূর্ত
ফজলুর রহমান	শিক্ষা

পূর্ব বাংলা থেকে নির্বাচিত গণপরিষদ সদস্য মৌলভী তমিজ উদ্দিন খান পাকিস্তান গণপরিষদের স্পীকার নির্বাচিত হন। ১৯৪৭ সালের ১৪ আগস্ট গঠিত হয় পূর্ব বাংলার মন্ত্রিসভা।

পূর্ব বাংলা মন্ত্রিসভা

স্যার ফ্রেডারিক বোর্ন	গভর্নর
খাজা নাজিমউদ্দিন	মুখ্যমন্ত্রী, স্বরাষ্ট্র, পরিকল্পনা
নুরুল আমিন	বেসামরিক সরবরাহ, বাণিজ্য, শ্রম ও শিল্প দফতর
আবদুল হামিদ	শিক্ষা
সৈয়দ মোহাম্মদ আফজাল	কৃষি, সমবায় ও ত্রাণ
হামিদুল হক চৌধুরী	অর্থ, রাজস্ব
মুহাম্মদ হাবিবুল্লাহ বাহার চৌধুরী	স্বাস্থ্য, স্থানীয় সরকার
মফিজউদ্দিন আহমদ	

পূর্ব বাংলা আইন সভার স্পিকার ও ডেপুটি স্পিকার নির্বাচিত হন আবদুল করিম ও নাজমুল হুদা।

১৯৪৭ সালে দেশ বিভাগ হয়। পাকিস্তানের মোট জনসংখ্যার ৫৬ ভাগ বাস করতো পূর্ব বাংলায়। তখন বাঙালিদের কোনো নেতা ছিল না। শেরে বাংলা এ কে ফজলুল হক ও হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী পাকিস্তানে। মুসলিম লীগ সরকার উভয় নেতাকে ক্ষমতা থেকে দূরে রেখেছে।

১৯৪৭ সালে পূর্ব বাংলার জনসংখ্যার ৩৩ ভাগ ছিল হিন্দু। অথচ হিন্দু সম্প্রদায় থেকে পূর্ব বাংলার মন্ত্রিসভায় একজন সংখ্যালঘু নেয়া হয়নি।

১৯৪৭ সালে ১৪ আগস্ট ভারত বিভাগকালে মহাত্মা গান্ধী কলকাতায় হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীকে নিয়ে শান্তি প্রতিষ্ঠায় নিয়োজিত ছিলেন। শেখ মুজিবুর রহমান ১৪ আগস্ট ঢাকায় না এসে শান্তি মিশনের কর্মী হিসেবে মহাত্মা গান্ধী ও সোহরাওয়ার্দীর সাথে কলকাতায় অবস্থান করেন।

১৯৪৭ সালের ২৮ সেপ্টেম্বর শেখ মুজিবুর রহমান ও বেগম ফজিলাতুন্নেসার প্রথম সন্তান শেখ হাসিনার জন্ম হয়। শেখ মুজিব ইসলামিয়া কলেজ থেকে বিএ পরীক্ষার্থী ছিলেন। তাই ১৯৪৭ সালে পরীক্ষার পর টুঙ্গিপাড়ায় এসে কন্যা সন্তানকে দেখেছেন।

মুহাম্মদ আলী জিন্নাহ ও মন্ত্রীদের দেশ পরিচালনায় অভিজ্ঞতা না থাকায় তারা আমলানির্ভরশীল হয়ে পড়েন। পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় সরকারের সেক্রেটারি জেনারেল ছিলেন চৌধুরী মহম্মদ আলী। পূর্ব বাংলার মুখ্য সচিব ছিলেন আজিজ আহমদ। পাকিস্তান সৃষ্টির পর থেকে আঞ্চলিক বৈষম্য শুরু হয়। পূর্ব বাংলার লোকসংখ্যা ছিল ৫ কোটি এবং পশ্চিম পাকিস্তানের লোকসংখ্যা ছিল ৪ কোটি ৫০ লাখ। পাকিস্তানের লোকসংখ্যা ছিল ৯ কোটি ৫০ লাখ। মুসলিম লীগ সরকার

শুরু থেকে বাংলা ভাষার প্রতি বৈষম্য সৃষ্টি করে। দ্বিজাতি তত্ত্বের ভিত্তিতে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠিত। তাই দেশ বিভক্তির পর মুসলিম লীগ সরকারের কোনো মূলনীতি ছিল না। তারা ইসলাম ধর্মভিত্তিক রাজনীতি শুরু করে।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শেখ মুজিবুর রহমান

১৯৪৭ সালের ১৪ আগস্ট কলকাতা ইসলামিয়া কলেজে ও সিরাজউদ্দৌলা হলে এক গোপন সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় শেখ মুজিবুর রহমান বলেন, পূর্ব বাংলায় মুসলিম লীগ সরকারের অধীনে সত্যিকার স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠিত হবে না। তাই পূর্ব বাংলায় একটি নতুন রাজনৈতিক দল গঠন করতে হবে।

১৯৪৭ সালে তিনি ইতিহাস ও রাষ্ট্রবিজ্ঞান নিয়ে বিএ পাস করেন। তিনি ১৯৪৭ সালে ডিসেম্বর মাসে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আইন বিভাগে ভর্তি হন। তার রোল নম্বর ছিল ১৬৫ এসএম হল। কলকাতা থেকে ঢাকায় এসে তিনি ঢাকা কোর্টের পিছনে খাজে দেওয়ান লেনে মোল্লা জালাল উদ্দিন ও আবদুল হামিদ চৌধুরীর সাথে বসবাস শুরু করেন।

১৫০ মোগলটুলির ওয়ার্কার্স ক্যাম্প

১৯৪৪ সালের ১ এপ্রিল ঢাকার মোগলটুলিতে মুসলিম লীগের ওয়ার্কার্স ক্যাম্প প্রতিষ্ঠিত হয়। এ ক্যাম্পের সক্রিয় সদস্য ছিলেন কামরুদ্দিন আহমদ, শামসুল হক, মোহাম্মদ তোয়াহা, অলি আহাদ, তাজউদ্দীন আহমদ, শওকত আলী প্রমুখ। শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৪৭ সালের নভেম্বর মাসের শেষে এ ক্যাম্পে যোগ দেন। মোগলটুলির ওয়ার্কার্স কাম্প কেন্দ্র করে হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী ও আবুল হাশিমের কর্মী বাহিনী একটি দল গঠনে এগিয়ে আসেন। শেখ মুজিবুর ঢাকায় এসে টাঙ্গাইলের শামসুল হকের সাথে যুবকদের নিয়ে পাকিস্তান ডেমোক্রেটিক লীগ গঠন করেন। আইন বিভাগে পড়ার সময় শেখ মুজিবুর রহমান রাজনৈতিক দল গঠনে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন। ঢাকার মুসলিম লীগ নেতা কামরুদ্দিন আহমদ ১৯৪৭ সালের জুলাই মাসে গণতান্ত্রিক যুবলীগ গঠন করে। শেখ মুজিবুর রহমান কামরুদ্দিন আহমদের সাথে দেখা করে তার দলে যোগ দেন। এ সময় কামরুদ্দিন আহমদ পিপলস ফ্রিডম লীগ গঠন করেন।

হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী দলের নেতারা মুসলিম লীগ মন্ত্রিসভা থেকে বাদ পড়েছেন। তারা একটি বিরোধী উপদল গঠন করেন। ১৯৪৭ সালের ২০ ডিসেম্বর ঢাকার বলিয়াদি হাউজে পূর্ব বাংলার আইন সভার উপদলের সভা

অনুষ্ঠিত হয়। এ সভা আয়োজনে শেখ মুজিবুর রহমান মুখ্য ভূমিকা পালন করেন। মুসলিম লীগের দরজা সোহরাওয়ার্দীর অনুসারীদের জন্য নিষিদ্ধ হয়। শেখ মুজিবুর রহমান ছাত্র সংগঠন নিখিল পূর্ব পাকিস্তান ছাত্রলীগ দল গঠনের প্রস্তুতি গ্রহণ করেন।

শেরে বাংলা এ কে ফজলুল হক দেশ ভাগের পর ঢাকায় চলে আসেন। খাজা নাজিমউদ্দিন তার ঢাকা আগমনকে সুনজরে দেখেনি। ফজলুল হকের উদ্যোগে ১৯৪৭ সালের ৭ ডিসেম্বর ঢাকার সিরাজউদ্দৌলা পার্কে এক সভা আহ্বান করা হয়। কিন্তু খাজা নাজিমউদ্দিনের লোকেরা সভা পণ্ড করে দেয় এবং মঞ্চ পুড়িয়ে ফেলে। শেরে বাংলা আত্মরক্ষার জন্য কাদের সর্দারের বাসায় আশ্রয় নেন।

মুসলিম ছাত্রলীগ গঠন

শেখ মুজিবুর রহমান, শামসুল হক, আবদুর রহমান চৌধুরী, নঈমুদ্দিন আহমদ, কাজী আহমদ কামাল, কাজী গোলাম মাহবুব, নুরুদ্দিন আহমদ, মুহাম্মদ তোয়াহা, অলি আহাদ, খালেক নেওয়াজ, আবদুস সামাদ আজাদ, তাজউদ্দীন আহমদ, শেখ আবদুল আজিজ প্রমুখ ১৫০ নম্বর মোগলটুলি ওয়ার্কার্স ক্যাম্পে মিলিত হয়ে মুসলিম লীগ বিরোধী দল গঠনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সলিমুল্লাহ মুসলিম হল, ফজলুল হক হলে কয়েকটি সভার পর ১৯৪৮ সালের ৪ জানুয়ারি ফজলুল হক মিলনায়তনে অধ্যাপক নজমুল করিমের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভায় পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম ছাত্রলীগ প্রতিষ্ঠার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

মুসলিম ছাত্রলীগের প্রথম আহ্বায়ক কমিটির সদস্যগণ ছিলেন–

নাম	এলাকা	পদ
নইমুদ্দিন আহমদ	রাজশাহী	আহ্বায়ক
আবদুর রহমান চৌধুরী	বরিশাল	সদস্য
শেখ মুজিবুর রহমান	ফরিদপুর	সদস্য
অলি আহাদ	কুমিল্লা	সদস্য
শেখ আবুল আজিজ	খুলনা	সদস্য
শামসুল হক	ঢাকা	সদস্য
খালেক নেওয়াজ	ময়মনসিংহ	সদস্য
আবদুল মতিন	পাবনা	সদস্য
আজিজ আহমদ	নোয়াখালী	সদস্য

মফিজুর রহমান	রংপুর	সদস্য
নওয়াব আলী	ঢাকা	সদস্য
নুরুল কবির	ঢাকা শহর	সদস্য
আবদুল আজিজ	কুষ্টিয়া	সদস্য
সৈয়দ নুরুল আলম	ময়মনসিংহ	সদস্য
আবদুল কুদ্দুস চৌধুরী	চট্টগ্রাম	সদস্য

শেখ মুজিবুর রহমান মূলত এককভাবে ছাত্রলীগের সাংগঠনিক দায়িত্ব পালন করতেন।

পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম ছাত্রলীগ বাংলা ভাষা আন্দোলন ও বাঙালিদের স্বাধীনতা সংগ্রামে অগ্রণী ভূমিকা পালন করে।

১৯৪৭ সালের ১ সেপ্টেম্বর ঢাকায় তমদ্দুন মজলিস প্রতিষ্ঠিত হয়। সংগঠনের সভাপতি ছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক আবুল কাসেম। তমদ্দুন মজলিস প্রথম বাংলাকে পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষা করার দাবি পেশ করেন। বাংলা হবে পূর্ব পাকিস্তানের শিক্ষার মাধ্যম।

মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানীর জন্ম সিরাজগঞ্জে। তিনি আসামে মুসলিম লীগ সভাপতি ও আইন সভার সদস্য ছিলেন। দেশ ভাগের পর তিনি টাঙ্গাইলের সন্তোষে বসতি স্থাপন করেন। তিনি ১৯৪৮ সালের জানুয়ারি মাসে টাঙ্গাইল হতে আইনসভার সদস্য নির্বাচিত হয়। পরে মুখ্যমন্ত্রী খাজা নাজিমউদ্দিন তার সদস্য পদ বাতিল করে দেয়।

১৯৪৮ সালের ভাষা আন্দোলন

পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় সরকারের দাপ্তরিক ভাষা ছিল ইংরেজি ও উর্দু। এমন কি গণপরিষদের ভাষা ছিল ইংরেজি ও উর্দু। বাংলা ভাষার কোনো স্থান কেন্দ্রে ছিল না। ১৯৪৮ সালের ২৫ ফেব্রুয়ারি কুমিল্লা থেকে নির্বাচিত কংগ্রেস নেতা ধীরেন্দ্র নাথ দত্ত গণপরিষদে উর্দু ও ইংরেজি ভাষার সাথে বাংলা ভাষা অন্তর্ভুক্তির জন্য সংশোধনী প্রস্তাব উত্থাপন করে বলেন–

The state language of the state should be language which is used by the majority people of the state and for that I consider that Bengali language is a lingua franca of our state.

I know that I voice the sentiment of the vast millions of our state.

It shuld be treated as the language of state and therefore, Sir I

suggest that after the word English, the word Bengali be inserted in rule 29.

ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত গণপরিষদে বলেন, মাননীয় স্পিকার, আমি প্রস্তাব করছি যে ২৯ নম্বর বিধির ১ নম্বর উপবিধির দ্বিতীয় লাইনে ইংরেজি শব্দের পর বাংলা শব্দটি অন্তর্ভুক্ত হবে। বাংলা ভাষা দেশের অধিকাংশ লোকের ভাষা। এ রাষ্ট্রের ৬ কোটি ৯০ লাখ লোকের মধ্যে ৪ কোটি ৪০ লক্ষ লোক বাংলা ভাষায় কথা বলে। সুতরাং রাষ্ট্রের রাষ্ট্র ভাষা হবে যে ভাষা রাষ্ট্রের অধিকাংশ লোক ব্যবহার করে। আমি মনে করি বাংলা রাষ্ট্রে প্রধান ভাষা– রাষ্ট্রভাষা। আমি জানি রাষ্ট্রের অধিকাংশ লোকের মনোভাব আমার কণ্ঠে ধ্বনিত হচ্ছে।

এ ভাষাকে রাষ্ট্রের ভাষা হিসেবে গ্রহণ করতে হবে। সুতরাং মহোদয়, আমি সুপারিশ করছি যে ইংরেজি শব্দের পর বাংলা শব্দটি অন্তর্ভুক্ত করা হোক।"

মহোদয়, ইংরেজি ভাষা যদি ২৯ বিধিতে সম্মানজনক স্থানে থাকে এবং ইংরেজি বা উর্দু ভাষায় যদি সংসদ পরিচালিত হতে পারে তাহলে ৪ কোটি ৪০ লক্ষ লোকের ভাষা কেন ২৯ বিধিতে মর্যাদার স্থানে থাকবে না। এ ভাষাকে রাষ্ট্রভাষা হিসেবে গ্রহণ করা উচিত।" কংগ্রেস নেতা প্রেমহরি বর্মা, ভূপেন কুমার দত্ত, গিরিশ চন্দ্র চট্টপাধ্যায় বাংলা ভাষার সমর্থনে ভাষণ দেন। সেদিন পূর্ব বাংলার মুসলমান সদস্যগণ বাংলার পক্ষে কথা বলেননি। পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী লিয়াকত আলী খান ধীরেন্দ্রনাথ দত্তের প্রস্তাব বাতিল করে দেন। গণপরিষদের সিদ্ধান্তের খবর ঢাকায় পৌঁছলে ছাত্র ও বুদ্ধিজীবীরা তীব্র প্রতিবাদ জানাতে থাকেন।

পাকিস্তান সরকার বাংলা ভাষাকে গণপরিষদের অন্যতম ভাষা হিসেবে গ্রহণ না করার প্রতিবাদে ২৬ ফেব্রুয়ারি ঢাকায় ধর্মঘট পালিত হয়। ছাত্ররা মিছিল করে শহর প্রদক্ষিণ করে। বিকেলে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রতিবাদ সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন অধ্যাপক আবুল কাসেম।

ভাষা আন্দোলন পরিচালনার জন্য ১৯৪৮ সালের ২৭ ফেব্রুয়ারি সংগ্রাম পরিষদ গঠন করা হয়। নিম্নলিখিতভাবে কমিটি গঠন করা হয়–

গণআজাদী লীগ	২ জন প্রতিনিধি
তমদ্দুন মজলিস	একজন প্রতিনিধি
সলিমুল্লাহ হল	২ জন প্রতিনিধি
মুসলিম ছাত্রলীগ	২ জন প্রতিনিধি

শামসুল আলমকে সংগ্রাম কমিটির আহ্বায়ক নির্বাচিত করা হয়। ১৯৪৮ সালের ভাষা আন্দোলনে তমদ্দুন মজলিস ও ছাত্রলীগ নেতৃত্ব প্রদান করে। ২ মার্চ ফজলুল

হক হলে সংগ্রাম কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হয়। শামসুল আলম অনুপস্থিত থাকায় কামরুদ্দিন আহমদকে আহ্বায়ক করা হয়। সভায় উপস্থিত ছিলেন শেখ মুজিবুর রহমান, শামসুল হক, মুহাম্মদ তোয়াহা, অলি আহাদ, আবুল কাসেম, রণেশ দাশগুপ্ত, শামসুল হক, অজিত গুহ প্রমুখ। সভায় রাষ্ট্রভাষার দাবিতে ১১ মার্চ সারা দেশে হরতাল পালনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। ছাত্রলীগ, ছাত্র ফেডারেশন, কমিউনিস্ট পার্টি হরতাল পালনের আয়োজনে অগ্রণী ভূমিকা পালন করে। ১০ মার্চ ফজলুল হক হলে সংগ্রাম কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হয়। ১১ মার্চ হরতাল পালনে শেখ মুজিবুর রহমান নেতৃত্ব দেন।

১৯৪৮ সালে ভাষা আন্দোলন সম্পর্কে শেখ মুজিবুর রহমান বলেন, "৮ ফেব্রুয়ারি, ১৯৪৮, করাচী। গণপরিষদের অধিবেশনে কুমিল্লার কংগ্রেস সদস্য ধীরেন্দ্র নাথ দত্ত উর্দূর পাশাপাশি বাংলাকে রাষ্ট্র ভাষা করার দাবি করেন। মুসলিম লীগ সদস্যরা রাজী নয়– "আমরা দেখলাম, বিরাট ষড়যন্ত্র চলছে বাংলাকে বাদ দিয়ে রাষ্ট্র ভাষা উর্দু করার। পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম ছাত্রলীগ ও তমদ্দুন মজলিস এর প্রতিবাদ করল এবং দাবি করল, বাংলা ও উর্দু দুই ভাষাকেই রাষ্ট্র ভাষা করতে হবে। আমরা সভা করে প্রতিবাদ শুরু করলাম। ছাত্রলীগ ও তমদ্দুন মজলিস রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ গঠন করে। সভায় ১৯৪৮ সালের ১১ মার্চকে বাংলা দাবি দিবস ঘোষণা করা হল। "আমি ফরিদপুর, যশোর হয়ে দৌলতপুর, খুলনা ও বরিশালে ছাত্রসভা করে ঐ তারিখের তিন দিন পূর্বে ঢাকায় ফিরে এলাম।... বরিশালের জনাব মহিউদ্দিন আহমদ তখন নিখিল পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম ছাত্রলীগের সদস্য। মুসলিমলীগ ও সরকারের পুরো সমর্থক। কাজী বাহাউদ্দিন আহমদ আমাদের দলের নেতা ছিলেন। আমি কলেজেই সভা করেছিলাম। মহিউদ্দিন সাহেব বাধা দিতে চেষ্টা করেন নাই। ঢাকায় ফিরে এলাম।" ঢাকায় এসে শেখ মুজিব পিকেটিং করতে কে কোথায় থাকবে তা বণ্টন করে দেন। শতকরা ৯০ ভাগ ছাত্র হরতালের পক্ষে "মুসলিম লীগ ভাড়াটিয়া গুণ্ডা লেলিয়ে দিল আমাদের উপর। অধিকাংশ লোককে আমাদের বিরুদ্ধে করে ফেলল। পুরান ঢাকার কয়েকটি জায়গায় ছাত্রদের মারপিটও করল। আর আমরা পাকিস্তান ধ্বংস করতে চাই এই কথা বুঝাবার চেষ্টা করল।"

১৯৪৮ সালের ১১ মার্চ সকালে শেখ মুজিবুর রহমান একদল যুবক ও ছাত্র নিয়ে সচিবালয়ে হরতালের সমর্থনে বক্তৃতা ও পিকেটিং শুরু করেন। এ সময় মেজর জেনারেল আইয়ুব খান পূর্ব পাকিস্তানের জিওসি ছিলেন। সরকার ভাষা আন্দোলন দমন করার জন্য সেনাবাহিনী ও পুলিশ নিয়োগ করে। সচিবালয়ে পিকেটিংরত অবস্থায় ছাত্রদের ওপর পুলিশ লাঠিচার্জ করে। পুলিশ শেখ

মুজিবুর রহমান, সর্দার ফজলুল করিম, অলি আহাদ, তোয়াহাসহ ৩০০ ছাত্রকে গ্রেফতার করে। ছাত্রদের অনেককে ছেড়ে দেয়া হয়। পুলিশ শেখ মুজিবুর রহমানসহ ছাত্রদের প্রথমে কোতোয়ালি থানায় এবং পরে ঢাকা জেলে স্থানান্তরিত করে। ১১ মার্চ সারাদেশে হরতাল পালিত হয়। জিওসি আইয়ুব খান মুখ্যমন্ত্রী খাজা নাজিমউদ্দিনের নিরাপত্তার জন্য আইন সভার দিকে যান। পুলিশ ছাত্রদের লাঠি চার্জ করছে। তা দেখে এ কে ফজলুল হক একদল আইনজীবী নিয়ে ছাত্রদের উদ্ধারের জন্য অগ্রসর হন। এ সময় পুলিশের লাঠির আঘাতে তিনি হাঁটুতে ব্যথা পান। আইনজীবীরা তাকে মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে যায় এবং চিকিৎসার পর তাকে বাসায় পাঠিয়ে দেন। ১৩, ১৪, ১৫ মার্চ ছাত্র ধর্মঘট চলে।

"১১ই মার্চ ভোরবেলা শত শত ছাত্রকর্মী ইডেন বিল্ডিং, জেনারেল পোস্ট অফিস ও অন্যান্য জায়গায় পিকেটিং শুরু করল। বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজে কোনো পিকেটিংয়ের দরকার হয় নাই। সমস্ত ঢাকা শহর পোস্টারে ভরে ফেলা হল। অনেক দোকানপাট বন্ধ ছিল, কিছু খোলাও ছিল। পুরান ঢাকা শহরে পুরাপুরি হরতাল পালন করে নাই। সকাল আটটায় জেনারেল পোস্ট অফিসের সামনে ছাত্রদের উপর ভীষণভাবে লাঠিচার্জ হল। একদল মার খেয়ে স্থান ত্যাগ করার পর আরেকদল হাজির হতে লাগল। ফজলুল হলে আমাদের রিজার্ভ কর্মী ছিল। এইভাবে গোলমাল, মারপিট চলল অনেকক্ষণ। নয়টায় ইডেন বিল্ডিংয়ের সামনের দরজায় লাঠিচার্জ হল। খালেক নেওয়াজ খান, বখতিয়ার (এখন নওগাঁও এডভোকেট), শহর ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক এম. এ. ওয়াদুদ গুরুতররূপে আহত হল। তোপখানা রোডে কাজী গোলাম মাহাবুব, শওকত মিয়া ও আর ও অনেক ছাত্র আহত হল। আবদুল গনি রোডের দরজায় তখন আর ছাত্ররা অত্যাচার ও লাঠির আঘাত সহ্য করতে পারছে না। অনেক কর্মী আহত হয়ে গেছে এবং সরে পড়ছে। আমি জেনারেল পোস্ট অফিসের দিক থেকে নতুন কর্মী নিয়ে ইডেন বিল্ডিংয়ের দিকে ছুটেছি, এর মধ্যে শামসুল হক সাহেবকে ইডেন বিল্ডিংয়ের সামনে পুলিশ ঘিরে ফেলেছে। গেট খালি হয়ে গেছে। তখন আমার কাছে সাইকেল। আমাকে গ্রেফতার করার জন্য সিটি এসপি জিপ নিয়ে বার বার তাড়া করছে, ধরতে পারছে না। এবার দেখলাম উপায় নাই। একজন সহকর্মী দাঁড়ান ছিল তার কাছে সাইকেল দিয়ে চার পাঁচজন ছাত্র নিয়ে আবার ইডেন বিল্ডিংয়ের দরজায় আমরা বসে পড়লাম এবং সাইকেল যাকে দিলাম তাকে বললাম, শীঘ্রই আরও কিছু ছাত্র পাঠাতে। আমরা খুব অল্প, টিকতে পারব না। আমাদের দেখাদেখি আরও কিছু ছাত্র ছুটে এসে আমাদের পাশে বসে পড়ল।

আমাদের উপর কিছু উত্তম মাধ্যম পড়ল এবং ধরে নিয়ে জিপে তুলল। হক (শামসুল) সাহেবকে পূর্বেই জিপে তুলে ফেলেছে। বহু ছাত্র গ্রেফতার ও জখম হল। কিছু সংখ্যক ছাত্রকে গাড়ি করে ত্রিশ-চল্লিশ মাইল দূরে জঙ্গলের মধ্যে ফেলে আসল। কয়েকজন ছাত্রীও মার খেয়েছিল। অলি আহাদও গ্রেফতার হয়ে গেছে। তাজউদ্দীন, তোয়াহা ও অনেককে গ্রেফতার করতে পারে নাই। আমাদের প্রায় সত্তর-পঁচাত্তরজনকে বেঁধে নিয়ে জেলে পাঠিয়ে দিল সন্ধ্যায় সময়। ফলে আন্দোলন দানা বেঁধে উঠল। জনগণের সমর্থনও আমরা পেলাম।"

ইতোমধ্যে সংবাদ আসে পাকিস্তানের গভর্নর জেনারেল মহম্মদ আলী জিন্নাহ ঢাকায় আসবেন। মুখ্যমন্ত্রী খাজা নাজিমউদ্দিন ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের সাথে আলোচনা হয় এবং ৮ দফার ভিত্তিতে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়।

১. ২৯ ফেব্রুয়ারি হতে গ্রেফতারকৃতদের মুক্তি দান;
২. পুলিশের অত্যাচার মুখ্যমন্ত্রী ব্যবস্থা করবেন;
৩. পূর্ব পাকিস্তান আইন পরিষদে বাংলাকে অন্যতম রাষ্ট্রভাষা করার এক বিশেষ প্রস্তাব উত্থাপন করা হবে;
৪. প্রদেশে সরকারী ভাষা হিসেবে স্বীকৃতি প্রদানের জন্য আগামী এপ্রিলে আইন পরিষদে প্রস্তাব উত্থাপন করা হবে; শিক্ষার মাধ্যম হবে বাংলা;
৫. ভাষা আন্দোলনকারীদের বিরুদ্ধে কোনো ব্যবস্থা গ্রহণ করা যাবে না;
৬. সংবাদপত্রের ওপর নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করা হবে;
৭. ১৪৪ ধারা প্রত্যাহার করা হবে;
৮. ভাষা আন্দোলন রাষ্ট্রের দুশমনদের দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়নি।

এ চুক্তিতে সরকার পক্ষে স্বাক্ষর করেন খাজা নাজিমউদ্দিন এবং সংগ্রাম পরিষদের পক্ষে কামরুদ্দিন আহমদ।

১৫ মার্চ শেখ মুজিবুর রহমানসহ সব বন্দীকে মুক্তি দেয়া হয়।

১৬ মার্চ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গণে সংগ্রাম পরিষদের সভা অনুষ্ঠিত হয়। শেখ মুজিবুর রহমান সভায় সভাপতিত্ব করেন। সভা শেষে তিনি ছাত্রদের মিছিল নিয়ে আইন সভার দিকে অগ্রসর হন। পুলিশ তাদের বাধা দান করে। শওকতসহ অনেকে আহত হয়।

১৯৪৮ সালের ১৯ মার্চ বিকেলে পাকিস্তানের গভর্নর জেনারেল মুহাম্মদ আলী জিন্নাহ ও তার বোন মিস ফাতেমা জিন্নাহ বিমানে ঢাকা পৌঁছেন। এ ছিল ঢাকায় জিন্নাহর প্রথম সফর। ২১ মার্চ রমনা রেসকোর্স ময়দানে জিন্নাহ ভাষণ দেন। জিন্নাহ তার ভাষণে বলেন, Urdu and Urdu shall be the only state language of Pakistan. একমাত্র উর্দুই হবে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা। সভায়

উপস্থিত ছাত্ররা না না বলে প্রতিবাদ করে। ২৪ মার্চ ঢাকার কার্জন হলে সমাবর্তন অনুষ্ঠানে জিন্নাহ পুনরায় বলেন, একমাত্র উর্দুই হবে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা। সভায় উপস্থিত ছাত্ররা জিন্নাহর ঘোষণার প্রতিবাদ করে। জিন্নাহ ছাত্র নেতাদের সাথে কয়েক দফা আলোচনা করেন। জিন্নাহর ঢাকা আগমন সম্পর্কে শেখ মুজিব লিখেছেন– "জিন্নাহ পূর্ব পাকিস্তান এসে ঘোড়দৌড় মাঠে বিরাট সভায় ঘোষণা করলেন, 'উর্দুই পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্র ভাষা হবে।' আমরা প্রায় চার পাঁচশত ছাত্র এক জায়গায় ছিলাম সেই সভায়, অনেকে হাত তুলে দাঁড়িয়ে জানিয়ে দিল 'মানিনা'। তারপর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কনভোকেশনে বক্তৃতা করতে উঠে তিনি যখন আবার বললেন, "উর্দুই পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্রভাষা হবে"– তখন ছাত্ররা তার সামনেই বসে চিৎকার করে বলল, 'না, না, না।' জিন্নাহ প্রায় পাঁচ মিনিট চুপ করেছিলেন। তারপর বক্তৃতা করেছিলেন। আমার মনে হয় এই প্রথম তাঁর মুখের উপর তার কথায় প্রতিবাদ করল বাংলার ছাত্ররা। এরপর জিন্নাহ যতদিন বেঁচেছিলেন আর কোনোদিন বলেন নাই, উর্দুই একমাত্র রাষ্ট্র হবে।"

১৯৪৮ সালের ১১ সেপ্টেম্বর গভর্নর জেনারেল মহম্মদ আলী জিন্নাহ ইন্তেকাল করেন। তার স্থলে পূর্ব পাকিস্তানের মুখ্যমন্ত্রী খাজা নাজিমউদ্দিন পাকিস্তানের গভর্নর জেনারেল নিযুক্ত হন। ১৯৪৮ সালের ১৮ নভেম্বর পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী লিয়াকত আলী খান ও তার স্ত্রী ঢাকা আগমন করেন। ২৭ নভেম্বর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় খেলার মাঠে লিয়াকত আলী খানকে সংবর্ধনা দেয়া হয়। ছাত্রলীগের নেতা আবদুর রহমান চৌধুরী ছাত্রদের পক্ষে শ্রদ্ধাঞ্জলি লেখেন। তাতে পাকিস্তানের শতকরা ৬২ ভাগ লোকের মাতৃভাষা বাংলাকে উর্দুর পাশাপাশি পাকিস্তানের রাষ্ট্র ভাষা হিসেবে স্বীকৃতি দেয়ার দাবি জানানো হয়।

গোপালগঞ্জ কলেজ প্রতিষ্ঠার গোড়ার কথা

এ সময় আরেকটি অত্যাচার মহামারীরূপে শুরু হয়েছিল। জিন্নাহ ফান্ড নামে সরকার একটি ফান্ড খুলে। পাকিস্তানের গভর্নর জেনারেল খাজা নাজিমউদিদন গোপালগঞ্জ আগমন করবেন। মহকুমা ম্যাজিস্ট্রেট ও মুসলিম লীগ জিন্নাহ ফান্ডে ৩ লক্ষ টাকা সংগ্রহ করেছেন। জিন্নাহ ফান্ডের নামে গোপালগঞ্জের মানুষের উপর নির্যাতন চলছে। এ সংবাদ পেয়ে শেখ মুজিবুর রহমান গোপালগঞ্জ এসে তার কর্মীদের নিয়ে সভা করেন। "আমরা সিদ্ধান্ত নিলাম, এ টাকা নিতে দেওয়া হবে না। তার অভ্যর্থনায় যা ব্যয় হয় তা বাদে বাকি টাকা মসজিদ আর গোপালগঞ্জ কলেজের জন্য রেখে দিতে হবে। এর ব্যতিক্রম হলে আমরা বাধা দেব।" পরের দিন শেখ মুজিব খাজা নাজিমউদ্দিনের সাথে দেখা করেন। তিনি শেখ মুজিবের

দাবি মেনে নেন। গভর্নর জেনারেল টাকা নেননি।" কলেজের জন্য দিয়ে গিয়েছিলেন।। জিন্নাহ ফান্ডের নামে টাকা তোলা হয়েছিল বলেই মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ নামে কলেজ হয়েছিল। আজও কলেজটি আছে ভালোভাবে চলছে।" স্বাধীনতার পরে কলেজের নামকরণ করা হয় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কলেজ। সেদিন বঙ্গবন্ধুর প্রস্তাবই খাজা নাযিম উদ্দিন গোপালগঞ্জ কলেজ প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ নিয়েছিলেন।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারীদের ধর্মঘট

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের নিম্ন বেতনভুক চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারীরা ১৯৪৯ সালের ৩ মার্চ ধর্মঘট আহ্বান করে। পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম ছাত্রলীগ চতুর্থ শ্রেণী কর্মচারীদের সমর্থনে ৫ মার্চ থেকে ধর্মঘট শুরু করে। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ বিশ্ববিদ্যালয় অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ ঘোষণা করে। ২৯ মার্চ বিশ্ববিদ্যালয়ের নির্বাহী কাউন্সিল ও মুসলিম লীগ সরকার ২৭ জন ছাত্রদের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করে।

- ৬ জন ছাত্রকে ৪ বছরের জন্য বহিষ্কার;
- ১৫ জনকে সাময়িকভাবে বহিষ্কার;
- ৬ ছাত্রকে জরিমানা করা হয়;

যাদের **জরিমানা করা হয় তারা হলেন–**

১. শেখ মুজিবুর রহমান, দ্বিতীয় বর্ষ আইন, রোল-১৬৬ এস এম হল;
২. কল্যাণ চন্দ্র দাশগুপ্ত, এমএ, ঢাকা হল;
৩. নৈমুদ্দিন আহমদ, দ্বিতীয় বর্ষ আইন, এস এম হল;
৪. নাদেরা বেগম, প্রথম বর্ষ, এস এম হল;
৫. মুহাম্মদ আবদুল ওয়াদুদ, প্রথম বর্ষ বিএ, এফ এইচ হল।

ছাত্রদের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা প্রত্যাহার ও বিশ্ববিদ্যালয় খোলার দাবিতে দেশব্যাপী ধর্মঘট পালিত হয়। ১৯ এপ্রিল অবস্থান ধর্মঘটের সময় শেখ মুজিবুর রহমানসহ কয়েকজন ছাত্র নেতাকে গ্রেফতার করা হয়।

১৭ এপ্রিল বিশ্ববিদ্যালয় খুলবে। ১৫০ নম্বর মোগলটুলীতে সভায় সিদ্ধান্ত হয় ১৭ এপ্রিল থেকে প্রতিবাদ দিবস পালন করা হবে। এদিকে টাঙ্গাইলের উপনির্বাচনে শামসুল হক প্রার্থী হয়েছেন ছাত্রলীগ কর্মীরা অনেকে টাঙ্গাইলের নির্বাচনী প্রচারে চলে গেছেন। ১৬ এপ্রিল ছাত্রলীগের কনভেনর নঈম উদ্দিন আহমেদ, ছাত্রলীগ নেতা আবদুর রহমান চৌধুরী ভিপি সলিমুল্লাহ হক, দেওয়ান মাহবুব আলী ও আরো অনেকে গোপনে বন্ড দিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র থেকে

যায়। শেখ মুজিব উদ্যোগ নিয়ে ছাত্রলীগের সভা করে তাদের বহিষ্কার করেন। কাজী গোলাম মাহবুবকে জয়েন্ট কাউন্সিলর করা হয়। ১৭ তারিখ ধর্মঘট শুরু হয়েছে। ১৮ এপ্রিল শেখ মুজিব শোভাযাত্রা করে ছাত্রদের নিয়ে ভিসির বাসভবনের সামনে অবস্থান ধর্মঘট করেন। ১৯ এপ্রিল জেলা ম্যাজিস্ট্রেট, এসপি, পুলিশ নিয়ে হাজির হন। ছাত্ররা চলে যায়, মাত্র শেখ মুজিবসহ ৮ জন থেকে যায়। ছাত্র প্রতিনিধিদের সিদ্ধান্ত হল– শেখ মুজিব গ্রেফতার হলে আন্দোলন চলবে, পাঁচ মিনিট পরে জেলা ম্যাজিস্ট্রেট আমাদের গ্রেফতারের হুকুম দিলেন "আমাদের গাড়িতে তুলে একদম জেলগেটে নিয়ে আসল। পরের দিন আন্দোলন শুরু হল। কিন্তু ছাত্র নেতাদের গ্রেফতার করে সরকার আন্দোলন স্তিমিত করে দেয়– খালেক নেওয়াজ, কাজী গোলাম মাহবুব, কে. জি. মোস্তফা, বাহাউদ্দিন চৌধুরী ও আরো অনেকে গ্রেফতার হয়।

শেখ মুজিবুর রহমান জরিমানা দিতে অস্বীকার করেন। তাকে বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বহিষ্কার করা হয়। তিনি আত্মসমর্পণ করে বিশ্ববিদ্যালয়ে ফিরে আসেননি। তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ে এসেছেন প্রধানমন্ত্রী হয়ে।

অধ্যায় ৪

আওয়ামী লীগের জন্ম
২৩ জুন ১৯৪৯

১৯৪৭ সালের ডিসেম্বর মাসে শেখ মুজিবুর রহমান কলকাতা থেকে ঢাকা আগমন করেন। তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আইন বিভাগে ভর্তি হন। ১৯৪৮ সালে মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী আসাম থেকে এসে টাঙ্গাইলের সন্তোষে বসতি স্থাপন করেন। ১৯৪৯ সালের ৫ মার্চ অবিভক্ত বাংলার প্রধানমন্ত্রী হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী কলকাতা থেকে করাচী চলে আসেন। তিনি পশ্চিম পাকিস্তানে আইন ব্যবসা শুরু করেন।

পাকিস্তানের গভর্নর জেনারেল খাজা নাজিমউদ্দিন এবং প্রধানমন্ত্রী লিয়াকত আলী খান। পূর্ব বাংলার মুখ্যমন্ত্রী নুরুল আমিনও মুসলিম লীগ নেতা। দেশে কোনো বিরোধী দল নেই বললেই চলে। কংগ্রেস বিরোধী দলের ভূমিকা পালন করলেও মুসলিম লীগ সোহরাওয়ার্দীকে ভয় করত। তিনি পাকিস্তানের স্থায়ী নাগরিক নয়– এ অজুহাতে ১৯৪৯ সালের ১ মার্চ মুসলিম লীগ সরকার সোহরাওয়ার্দীর গণপরিষদের আসন শূন্য ঘোষণা করে।

১৯৪৮ সালের মার্চ মাসে মওলানা ভাসানী টাঙ্গাইল আসন থেকে এমএলএ নির্বাচিত হন। মুখ্যমন্ত্রী খাজা নাজিমউদ্দিন মওলানা ভাসানীর আসন শূন্য ঘোষণা করেন। ১৯৪৯ সালের ২৫ এপ্রিল শূন্য আসনে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। বিরোধী দলের শামসুল হক প্রার্থী হন। শেখ মুজিবুর রহমান ১৫০ নম্বর মোগলটুলি লেনে কর্মী শিবিরের নেতাকর্মীদের নিয়ে শামসুল হকের পক্ষে প্রচার চালান। শামসুল হক বিপুল ভোটে মুসলিম লীগ প্রার্থী টাঙ্গাইলের জমিদার কে কে পন্নীকে পরাজিত করেন। এ নির্বাচনের পর মুসলিম লীগ আর উপনির্বাচন দেয়নি। শামসুল হকের বিজয়ে সারা পাকিস্তানকে প্রবল ধাক্কা দেয়। মুসলিম লীগ বিরোধী রাজনীতি শক্তিশালী হয়। সরকার বিরোধী দল দমনের জন্য কঠোর পদক্ষেপ নেয়। ১৯৪৯ সালের ২৪ এপ্রিল সরকার শেখ মুজিবুর রহমানকে গ্রেফতার করে এবং ২৭ জুলাইর পূর্বে মুক্তি দেয়।

হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী ১৯৪৯ সালের এপ্রিল মাসে ঢাকা আসেন। মওলানা ভাসানীসহ বিরোধী দলের সাথে গোপন আলোচনায় বসেন। তিনি মওলানা ভাসানীকে সভাপতি ও শামসুল হককে সম্পাদক করে পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী মুসলিম লীগ গঠন করার নির্দেশ দেন।

১৯৪৯ সালের ২৩ জুন ঢাকার রোজ গার্ডেনে আওয়ামী মুসলিম লীগ গঠন

মুসলিম লীগবিরোধী রাজনৈতিক দল গঠনের জন্য ঢাকার স্বামীবাগে রোজ গার্ডেনে কাজী মোহাম্মদ বশির হুমায়ুনের (১৯২১-১৯৮২) বাসভবনে ১৯৪৯ সালের ২৩ ও ২৪ জুন সভা আহ্বান করা হয়। মওলানা ভাসানীকে আহ্বায়ক ও ইয়ার মোহাম্মদ খানকে সম্পাদক করে একটি প্রস্তুতি কমিটি গঠন করা হয়। সভায় ৩০০ ডেলিগেট যোগ দেয়। সভায় উপস্থিত ছিলেন শেরে বাংলা এ কে ফজলুল হক, আবদুল হামিদ খান ভাসানী, মওলানা আবদুর রশীদ তর্কবাগীশ, কামরুদ্দিন আহমদ, মাওলানা রাগীব হাসান, আতাউর রহমান খান, শামসুল হক, ইয়ার মোহাম্মদ খান, খান সাহেব ওসমান, খয়রাত হোসেন এমএলএ, আনোয়ারা বেগম এমএলএ, কাজী গোলাম মাহবুব, অলি আহাদ, এম মনসুর আলী, সালাম খান, তাজউদ্দীন আহমদ, আরিফ হোসেন চৌধুরী এমএলএ, আবদুল জব্বার খদ্দর, কামাল উদ্দিন চৌধুরী প্রমুখ। সভার মূল ব্যক্তি ছিলেন টাঙ্গাইলের সামসুল হক। তিনি ১৫০ নম্বর মোগলটুলি ওয়ার্কার্স ক্যাম্পের সকল কর্মী ও মওলানা ভাসানীকে নিয়ে সভায় উপস্থিত হন। সভায় সকলে সংক্ষিপ্ত ভাষণ দেন। সভাপতিত্ব করেন মাওলানা রাগীব হাসান। সভায় পূর্বে পাকিস্তান আওয়ামী মুসলিম লীগ নামে রাজনৈতিক দল গঠনের সিদ্ধান্ত হয়। এ সময় শেখ মুজিবুর রহমান ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে। নতুন দল গঠনে তার সম্মতি ছিল। মওলানা ভাসানীকে সভাপতি, শামসুল হককে সম্পাদক এবং শেখ মুজিবুর রহমানকে যুগ্ম সম্পাদক করে ৪০ সদস্যবিশিষ্ট আওয়ামী মুসলিম লীগের কার্যকরী কমিটি গঠন করা হয়।

আওয়ামী মুসলিম লীগ গঠন সম্পর্কে শেখ মুজিব তাঁর আত্মজীবনীতে লিখেছেন, কর্মী সম্মেলনের জন্য খুব তোড়জোড় চলছিল। আমরা জেলে বসেই সে খবর পাই। ১৫০ নম্বর মোগলটুলীতে অফিস হয়েছে। শওকত মিয়া সকলের খাওয়া ও থাকার বন্দোবস্ত করত। সে ছাড়া ঢাকা শহরে কেইবা করবে? আর একজন ঢাকার পুরানা লীগকর্মী ইয়ার মোহাম্মদ খান সহযোগিতা করছিলেন। ইয়ার মোহাম্মদ খানের অর্থবল ও জনবল দুইই ছিল। এডভোকেট আতাউর রহমান খান, আলী আমজাদ খান এবং আনোয়ারা খাতুন এমএলএ সহযোগিতা

করছিলেন। আমরা সম্মেলনের ফলাফল সম্বন্ধে খুবই চিন্তায় দিন কাটাচ্ছিল। আমার সাথে যোগাযোগ করা হয়েছিল, আমার মত নেওয়ার জন্য। আমি খবর দিয়েছিলাম, আর মুসলিম লীগের পিছনে ঘুরে লাভ নাই, এ প্রতিষ্ঠান এখন গণবিচ্ছিন্ন সরকারি প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়েছে। এরা আমাদের মুসলিম লীগে নিতে চাইলে ও যাওয়া উচিত হবে না। কারণ এরা কোটারি করে ফেলেছে। একে আর জনগণের প্রতিষ্ঠান বলা চলে না। এদের কোনো কর্মপন্থাও নাই।" আমাকে আরও জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল, আমি ছাত্র প্রতিষ্ঠান করব, না রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান গঠন হলে তাতে যোগদান করব? আমি উত্তর পাঠিয়েছিলাম, ছাত্র রাজনীতি আমি আর করব না, রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানই করব। কারণ বিরোধী দল সৃষ্টি করতে না পারলে এ দেশে একনায়কত্ব চলবে।

কিছুদিন পূর্বে জনাব কামরুদ্দিন সাহেব। 'গণআজাদী লীগ' নাম দিয়ে একটা প্রতিষ্ঠান করেছিলেন, কিন্তু তা কাগজ পত্রেই শেষ। যাহোক, কোথায়ও হল বা জায়গা না পেয়ে শেষ পর্যন্ত হুমায়ুন সাহেবের রোজ গার্ডেন বাড়িতে সম্মেলনের কাজ শুরু হয়েছিল। শুধু কর্মীরা না, অনেক রাজনৈতিক নেতাও সেই সম্মেলনে যোগদান করেন। শেরেবাংলা এ. কে. ফজলুল হক, মওলানা আব্দুল হামিদ খান ভাসানী, আল্লামা মওলানা রাগীব আহসান, এমএলএদের ভিতর থেকে জনাব খয়রাত হোসেন, বেগম আনোয়ার খাতুন, আলী আহমাদ খান ও হাবিবুর রহমান চৌধুরী ওরফে ধনু মিয়া এবং বিভিন্ন জেলার অনেক প্রবীণ নেতাও যোগদান করেছিলেন। সকলেই একমত হয়ে নতুন রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান গঠন করলেন; তার নাম দেওয়া হল, 'পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী মুসলিম লীগ।' মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী সভাপতি, জনাব শামসুল হক সাধারণ সম্পাদক এবং আমাকে করা হল জয়েন্ট সেক্রেটারি। খবরের কাগজে দেখলাম, আমার নামের পাশে লেখা আছে 'নিরাপত্তা বন্দি'। আমি মনে করেছিলাম, পাকিস্তান হয়ে গেছে সাম্প্রদায়িক রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানের দরকার নাই। একটা অসাম্প্রদায়িক রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান হবে, যার একটা সুষ্ঠু ম্যানিফেস্টো থাকবে। ভাবলাম, সময় এখনও আসে নাই, তাই যারা বাইরে আছেন তারা চিন্তাভাবনা করেই করেছেন।"

"আওয়ামী মুসলিম লীগ গঠন হওয়ার কয়েকদিন পরেই আমার ও বাহাউদ্দিনের মুক্তির আদেশ এল। বাইরে থেকে আমার সহকর্মীরা নিশ্চয়ই খবর পেয়েছিল। জেলগেটে গিয়ে দেখি বিরাট জনতা আমাদের অভ্যর্থনা করার জন্য এসেছে মওলানা ভাসানী সাহেবের নেতৃত্বে।"

পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী মুসলিম লীগের সদস্য ছিলেন

মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী	সভাপতি
আতাউর রহমান খান	সহ-সভাপতি
আলী আহমদ খান এমএলএ	সহসভাপতি
আলী আমজাদ খান	সহসভাপতি
সাখাওয়াত হোসেন	সহ-সভাপতি
আবদুস সালাম খান	সহ-সভাপতি
শামসুল হক	সাধারণ সম্পাদক
শেখ মুজিবুর রহমান	যুগ্ম সম্পাদক
খন্দকার মোশতাক আহমদ	সহ-সম্পাদক
একেএম রফিকুল ইসলাম	সহ-সম্পাদক
ইয়ার মোহাম্মদ খান	কোষাধ্যক্ষ

১৯৪৯ সালের ২৩ জুন শামসুল হক প্রণীত আওয়ামী মুসলিম লীগের ১২ দফা কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়।

১. পাকিস্তান স্বাধীন ও জনকল্যাণমুখী করতে হবে।
২. রাষ্ট্রে দুটি আঞ্চলিক ইউনিট থাকবে। পূর্ব পাকিস্তান ও পশ্চিম পাকিস্তান।
৩. অঞ্চলগুলো লাহোর প্রস্তাবের ভিত্তিতে স্বায়ত্তশাসন ভোগ করবে। প্রতিরক্ষা, পররাষ্ট্র ও মুদ্রা কেন্দ্রের হাতে থাকবে। অবশিষ্ট বিষয় ইউনিটগুলোর হাতে ন্যস্ত থাকবে।
৪. সরকারি পদাধিকারী ব্যক্তিরা কোনো বিশেষ সুবিধা পাবে না।
৫. সরকারি কর্মচারীরা সমালোচিত হবেন। আইনের চোখে তাদের প্রতি পক্ষপাত প্রদর্শন করা হবে না।
৬. সকল নাগরিক জাতি ধর্ম নির্বিশেষে সমান অধিকার ভোগ করবে।
৭. সকল নাগরিক যোগ্যতা অনুসারে সমান অধিকার পাবে।
৮. সকল নারী-পুরুষের জন্য শিক্ষা বাধ্যতামূলক হবে।
৯. প্রতিরক্ষা বাহিনীতে সকল নাগরিকের যোগদানের অধিকার থাকবে। একটি বয়স সীমা পর্যন্ত সামরিক শিক্ষা বাধ্যতামূলক হবে।
১০. পূর্ব পাকিস্তানে স্থল, বিমান ও নৌ ইউনিট থাকবে।
১১. বিনা খেসারতে জমিদারি ও অন্য মধ্যস্বত্ব বিলোপ করা হবে।
১২. সকল জমি জাতীয়করণ করতে হবে।

১৯৪৯ সালের ২৪ জুন নারায়ণগঞ্জের খান সাহেব ওসমানের বাসভবনে ৪০ সদস্যবিশিষ্ট কার্যনির্বাহী কমিটি ঘোষণা করা হয়।

১৯৪৯ সালের ২৪ জুন আরমানিটোলা মাঠে আওয়ামী মুসলিম লীগের প্রথম জনসভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন মওলানা ভাসানী।

জেল থেকে মুক্তি পেয়ে শেখ মুজিবুর রহমান মওলানা ভাসানী ও শামসুল হকের সাথে জেলা ও মহকুমা সফর করে নতুন কমিটি গঠন করেন।

১৯৪৯ সালে জেল থেকে মুক্তির পরে শেখ মুজিব গোপালগঞ্জ গমন করেন। তিনি সালাম সাহেবকে নিয়ে গোপালগঞ্জ আওয়ামী মুসলিম লীগ গঠন করেন। তিনি আর আইন পড়বেন না শুনে পিতা দুঃখ পেলেন। পিতা তাকে ব্যারিস্টারী পড়াতে চান। শেখ মুজিব যাবেন না। তিনি মুসলিম লীগের অন্যায় নির্যাতন, দুর্নীতি ও বৈষম্যের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করবেন। তিনি ছাত্রলীগ ও আওয়ামী লীগকে শক্তিশালী করতে আত্মনিয়োগ করেন।

ঢাকায় এসে ছাত্রলীগের বার্ষিক সম্মেলন যাতে তাড়াতাড়ি হয় তার ব্যবস্থা করলাম। এরপূর্বে আর কাউন্সিল সভা হয় নাই। নির্বাচন হওয়া দরকার আর আমিও বিদায় নিতে চাই। ঢাকার তাজমহল হলে ১৯৪৯ সালের সেপ্টেম্বর মাসে কনফারেন্স হল আমার সভাপতিত্বে। আমি আমার বক্তৃতায় বললাম, "আজ থেকে আমি আর আপনাদের প্রতিষ্ঠানের সভ্য থাকব না। ছাত্র প্রতিষ্ঠানের সাথে জড়িত থাকার আর আমার কোনো অধিকার নাই। আমি আমাদের কাছ থেকে বিদায় নিচ্ছি। কারণ আমি আর ছাত্র নই।" নির্বাচনে দবিরুল ইসলাম সভাপতি এবং খালেক নেওয়াজ খানকে সাধারণ সম্পাদক করা হয়েছিল। শেখ মুজিবুর রহমান সর্বদা পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম লীগকে পরামর্শ দিতেন। এরাই আমাকে ছাত্রলীগের প্রতিষ্ঠাতা হিসাবে শ্রদ্ধা করেছে। আমরা প্রতিষ্ঠানের কাজে আত্মনিয়োগ করলাম। মওলানা সাহেব, শামসুল হক সাহেব ও আমি ময়মনসিংহ জেলার জামালপুর মহকুমার প্রথম সভা করতে যাই।"

ইত্তেফাক পত্রিকা

ঢাকা থেকে প্রকাশিত দৈনিক আজাদসহ সকল পত্রিকা মুসলিম লীগ সরকারের সমর্থক ছিল। সাধারণ মানুষ ও বৈষম্যের বিরুদ্ধে কথা বলার কোনো পত্রিকা ছিল না। আওয়ামী মুসলিম লীগ সিদ্ধান্ত নেয় যে তারা সাপ্তাহিক ইত্তেফাক নামে একটি পত্রিকা প্রকাশ করবে। মওলানা ভাসানী, ইয়ার মোহাম্মদ খান ও তফাজ্জল হোসেন মানিক মিয়ার নামে ইত্তেফাক প্রকাশের অনুমতি লাভ করে। আসগর হোসেন এমএলএর ঢাকার ৭৭ নম্বর মালিটোলার বাসভবনে অবস্থিত ছাপাখানা

থেকে সাপ্তাহিক ইত্তেফাক ১৯৪৯ সালের ১৫ আগস্ট প্রথম প্রকাশিত হয়। সাপ্তাহিক পত্রিকার সভাপতি মওলানা ভাসানী, সম্পাদক তফাজ্জল হোসেন মানিক মিয়া এবং প্রকাশক ইয়ার মোহাম্মদ খান। সাপ্তাহিক ইত্তেফাক ঢাকার ৯ নম্বর হাটখোলা রোডে অবস্থিত প্যারামাউন্ট থেকে মুদ্রিত ও ৯৪ নম্বর নবাবপুর থেকে প্রকাশিত হতে থাকে। আওয়ামী লীগ নেতা-কর্মীরা ইত্তেফাক পত্রিকা প্রকাশক ও প্রচারে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন। হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী নিজ অর্থ দিয়ে ঢাকার হাটখোলায় ভবন নির্মাণের জন্য জমি ও প্রেস ক্রয় করে দেন।

শেখ মুজিবুর রহমান গ্রেফতার

১৯৪৯ সালের ১১ অক্টোবর আরমানিটোলার জনসভার পর মওলানা ভাসানী, শামসুল হক ও শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে শোভা যাত্রা বের হল– নাজিরা বাজারে পুলিশ মিছিলে আক্রমণ করে। পুলিশ শামসুল হককে গ্রেফতার করে। পুলিশের লাঠির আঘাতে শেখ মুজিবুর রহমান গুরুতর আহত হন। "আমার উপরও অনেক আঘাত পড়ল। এক সময় প্রায় বেহুশ হয়ে একপাশে নর্দমায় পড়ে গেলাম। কাজী গোলাম মাহবুবও আহত হয়েছেন তবে তার হুশ ছিল। আমাকে কয়েকজন ধরে রিকশায় উঠিয়ে মোগলটুলী নিয়ে আসল। আমার পা দিয়ে খুব রক্ত পরছিল। তিনি আহত অবস্থায় ১৫০ নম্বর মোগলটুলী পার্টির অফিসে ছিলেন। পুলিশ তাকে গ্রেফতারের জন্য ভবনে প্রবেশ করে। জীবনের ঝুঁকি নিয়ে শেখ মুজিব লাফিয়ে তার পাশের ভবনে পড়েন। সেখান থেকে পুলিশকে এড়িয়ে ফুটবল খেলোয়াড় ক্যাপ্টেন শাহজাহানের বাসায় ওঠেন। তার স্ত্রী নূরজাহান তার যত্ন নেন। এখানেও পুলিশের হামলা। তিনি পুলিশকে ফাঁকি দিয়ে ইয়ার মুহাম্মদ খানের বাসায় মওলানা ভাসানীর সাথে দেখা করে বলেন, "তার সাথে আমার দেখা করা দরকার, তিনি কেন আমাকে গ্রেফতার হতে নিষেধ করেছেন? আমি পালিয়ে থাকার রাজনীতি বিশ্বাস করি না।" কারণ আমি গোপন রাজনীতি পছন্দ করি না, আর বিশ্বাসও করি না।" মওলানা সাহেব আমাকে বলেন, তুমি লাহোর যাও। কারণ, সোহরাওয়ার্দী সাহেব লাহোরে আছেন। তার এবং মিয়া ইফতিখার উদ্দিনের সাথে সাক্ষাত কর। তাদের বল, একটি নিখিল পাকিস্তান পার্টি হওয়ার দরকার। পীর মানকি শরীফের সাথে আলোচনা করে সোহরাওয়ার্দী সাহেবের নেতৃত্বে আওয়ামী লীগকে পাকিস্তানের প্রতিষ্ঠানে করতে পারলে ভাল হয়। সোহরাওয়ার্দী সাহেব ছাড়া আর কেউ এর নেতৃত্ব দিতে পারবে না।

মওলানা ভাসানী তাকে লাহোর যেতে বলেন, সোহরাওয়ার্দীকে সারা পাকিস্তান আওয়ামী লীগের নেতৃত্ব গ্রহণ করতে হবে। আমি অনেক কষ্টে লাহোর

পৌঁছলাম।" তিনি প্রায় লাহোর ছিলেন– হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী ও পশ্চিম পাকিস্তানের নেতাদের সাথে আলোচনা হয়। তিনি পশ্চিম পাকিস্তানের নবাব মামাদাত, খান মোহম্মদ খান লুন্দখোর ও পীর সাহউদ্দিন শহীদ সাহেব প্রমুখের কাছে পূর্ব বাংলার রাজনীতি ও পুলিশি নির্যাতনের কথা অবহিত করেন। তিনি আরো বলেন এখন নির্বাচন হলে মুসলিম লীগ শোচনীয় পরাজয় হবে। ঢাকায় তাকে পুলিশ খুজিতেছে। তিনি লাহোর ত্যাগ করেন। বিমানে দিল্লী আসেন দিল্লি থেকে ট্রেনে কলকাতা-খুলনা হয়ে ঢাকা আসেন। তিনি খাজা দেওয়ান রোডে আলী আসগার খানের বাসায় অবস্থান করেন– ডিসেম্বরের শেষ দিন। পুলিশ তাকে গ্রেফতার করে ঢাকা জেলে পাঠিয়ে দেয়। জেলে মওলানা ভাসানী, শামসুল হক বন্দী আছে। তারা এক সাথে থাকতেন। শামসুল হক মাত্র দেড় মাস হয় বিয়ে করেছেন। তার স্ত্রী আফিয়া ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়তেন, একে অন্যকে ভালবেসে বিয়ে করেছেন।

সাঁওতাল বিদ্রোহ

রাজশাহীর চাঁপাইনবাবগঞ্জে কমিউনিস্ট নেত্রী ইলা মিত্রের নেতৃত্বে ১৯৫০ সালের জানুয়ারি মাসে সাঁওতাল বিদ্রোহ হয়। ১৯৫০ সালের ৫ জানুয়ারি বিদ্রোহী সাঁওতাল আন্দোলনকারীরা নাচোল থানার ৩ জন পুলিশকে হত্যা করে। ৭ জানুয়ারি পুলিশ ইলা মিত্রকে রোহনপুর রেলস্টেশনে গ্রেফতার করে। তাকে রাজশাহী জেলে রাখা হয়। পুলিশ তার উপর পাশবিক নির্যাতন চালায়।

১৯৫০ সালের দাঙ্গা

কলকাতা ও বিহারে মুসলিম হত্যার প্রতিবাদে মুসলিম লীগের উদ্যোগে পূর্ব পাকিস্তানে ফেব্রুয়ারি মাসে দাঙ্গা শুরু হয়। বরিশালে দাঙ্গায় হিন্দুরা বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়। বরিশালের আগরপুর নিবাসী আলতাফউদ্দিন মিয়া হিন্দুদের বাঁচাতে গিয়ে নিহত হন। অসাম্প্রদায়িক রাজনীতি প্রতিষ্ঠায় তিনি পূর্ব বাংলার প্রথম শহীদ।

স্বায়ত্তশাসন আন্দোলন

কমরেড মণি সিংহ, ত্রৈলক্যনাথ প্রমুখের নেতৃত্বে তেভাগা আন্দোলন কৃষকদের জনপ্রিয়তা লাভ করে। ১৯৪৮-৫০ সাল মুসলিম লীগ সরকারের নির্যাতনের ফলে পূর্ব বাংলা থেকে হাজার হাজার কমিউনিস্ট পশ্চিম বাংলায় পালিয়ে যায় এবং অনেক গ্রেফতার হন। রাজবন্দীরা সরকারের নির্যাতনের প্রতিবাদ জানাতে থাকে। ১৯৫০ সালের ২৪ এপ্রিল রাজশাহী জেলের খাপড়া ওয়ার্ডে পুলিশ গুলি চালিয়ে

কমিউনিস্ট নেতা হালিম শেখ, আনোয়ার হোসেন, সুমেন ভট্টাচার্য, দেলওয়ার, সুধীন ধর, বিজন সেন ও কম্প রায় সিংহকে হত্যা করে এবং অনেকে আহত হন। এ নির্মম হত্যাকাণ্ড পূর্ববাংলায় আলোড়ন সৃষ্টি করে। বিরোধী দল শক্তিশালী হতে থাকে। হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর আহ্বানে ১৯৫০ সালের ১৮ ও ১৯ মার্চ লাহোরে মুসলিম লীগ ওয়ার্কার্স কনভেনশন অনুষ্ঠিত হয়। সভায় তিনি মুসলিম লীগের দুঃশাসন তুলে ধরেন এবং একটি নতুন রাজনৈতিক দল গঠনের প্রস্তাব করেন। ১৯৫১ সালের ১৯ মার্চ হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীকে সভাপতি এবং সিন্ধুর মাহমুদুল হক ওসমানীকে সম্পাদক করে পাকিস্তান আওয়ামী মুসলিম লীগ গঠন করা হয়।

স্বাধীনতার পর ভারত ১৯৪৯ সালে সংবিধান প্রণয়ন করে। কিন্তু পাকিস্তানের সংবিধান প্রণয়নের অগ্রগতি নেই। ১৯৫০ সালে প্রধানমন্ত্রী লিয়াকত আলী খান পাকিস্তান গণপরিষদে মূল কমিটির রিপোর্ট পেশ করেন। বিপিসির রিপোর্টটি বাঙালিদের স্বার্থবিরোধী ছিল। আওয়ামী মুসলিম লীগ বিপিসির বিরোধিতা করে। এ সময় শেখ মুজিবুর রহমান বন্দী। ১৯৫১ সালের জানুয়ারি মাসে ঢাকায় গ্রান্ড ন্যাশনাল কনভেনশন অনুষ্ঠিত হয় এবং বিপিসি রিপোর্টের সংশোধনী প্রস্তাব করে। ১৯৫১ সালের ১৬ অক্টোবর পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী লিয়াকত আলী খান রাওয়াল পিন্ডিতে আততায়ীর হাতে নিহত হন। তার স্থলে খাজা নাজিমউদ্দিন পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী নিযুক্ত হন। এসব শেখ মুজিবুর রহমান কারাবন্দী ছিলেন।

যুবলীগ গঠন ১৯৫১

১৯৫১ সালের ২৭ মার্চ প্রগতিশীল শক্তি পূর্ব পাকিস্তান যুবলীগ গঠন করে। কমিটির সদস্যরা ছিলেন–

মাহমুদ আলী	সভাপতি
খাজা আহমেদ	সহ-সভাপতি
ইয়ার মোহাম্মদ খান	সহ-সভাপতি
শামসুজ্জোহা	সহ-সভাপতি
আবদুল মজিদ	সহ-সভাপতি
মিসেস দৌলাতুন্নেসা	সহ-সভাপতি
অলি আহাদ	সাধারণ সম্পাদক
আবদুল মতিন	যুগ্ম সম্পাদক
তোসাদ্দক আহমদ চৌধুরী	কোষাধ্যক্ষ

মুসলিম লীগের নতুন মন্ত্রিসভা ১৯৫১

১৯৫১ সালের ১৬ অক্টোবর প্রধানমন্ত্রী লিয়াকত আলী খানের হত্যার পর গণপরিষদের অনুমোদন না নিয়ে অর্থমন্ত্রী গোলাম মুহাম্মদকে পাকিস্তানের গভর্নর জেনারেল এবং খাজা নাজিমউদ্দিনকে প্রধানমন্ত্রী নিযুক্ত করা হয়। ১৯৫১ সালের ১৯ অক্টোবর নতুন মন্ত্রিসভা শপথ গ্রহণ করে।

খাজা নাজিমউদ্দিন	প্রধানমন্ত্রী
জাফর উল্লাহ খান	পররাষ্ট্র
ফজলুর রহমান	বাণিজ্য, শিক্ষা
চৌধুরী মোহাম্মদ আলী	অর্থ
আবদুস সাত্তার পীরজাদা	খাদ্য, কৃষি ও আইন
খাজা শাহাবুদ্দিন	স্বরাষ্ট্র, তথ্য ও বেতার
এম এ গুরমানি	সীমান্ত, দেশীয় রাজ্য
সর্দার বাহাদুর খান	যোগাযোগ
ডা. এ এম মালেক	শ্রম, স্বাস্থ্য, পূর্ত
সর্দার আবদুর রব নিসতার	শিল্প
ডা. মোহাম্মদ হোসেন	কাশ্মীর
ড. আই এইচ কোরেশী মোহাম্মদ	মোহাজের পুনর্বাসন

১৯৪৮-১৯৫১ সালে পূর্ব পাকিস্তানে পাকিস্তান সরকারের বিরুদ্ধে শক্তিশালী বিরোধী দলের জন্ম হয় এবং তারাই পরবর্তীতে বাংলাদেশের ইতিহাস রচনা করে।

অধ্যায় ৫

কারাজীবন

১৯৫০-১৯৫২

পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের রাষ্ট্রনায়কের ন্যায় শেখ মুজিবুর রহমানকেও রাজনৈতিক কারণে ১২ বছর কারাগারে জীবন কাটাতে হয়েছে। উপমহাদেশের রাজনীতিবিদদের মধ্যে মহাত্মা গান্ধী, মওলানা মুহাম্মদ আলী, মওলানা আবুল কালাম আজাদ, পণ্ডিত জওহর লাল নেহেরু, নেতাজী সুভাষ চন্দ্র বসু প্রমুখ ব্রিটিশবিরোধী আন্দোলনে কারাবরণ করেছেন। শেখ মুজিবুর রহমান পাকিস্তানি আমলের শাসন ও শোষণের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে কারাবরণ করেছেন। তার প্রথম কারাজীবন শুরু হয় গোপালগঞ্জে স্কুল ছাত্র থাকাকালে।

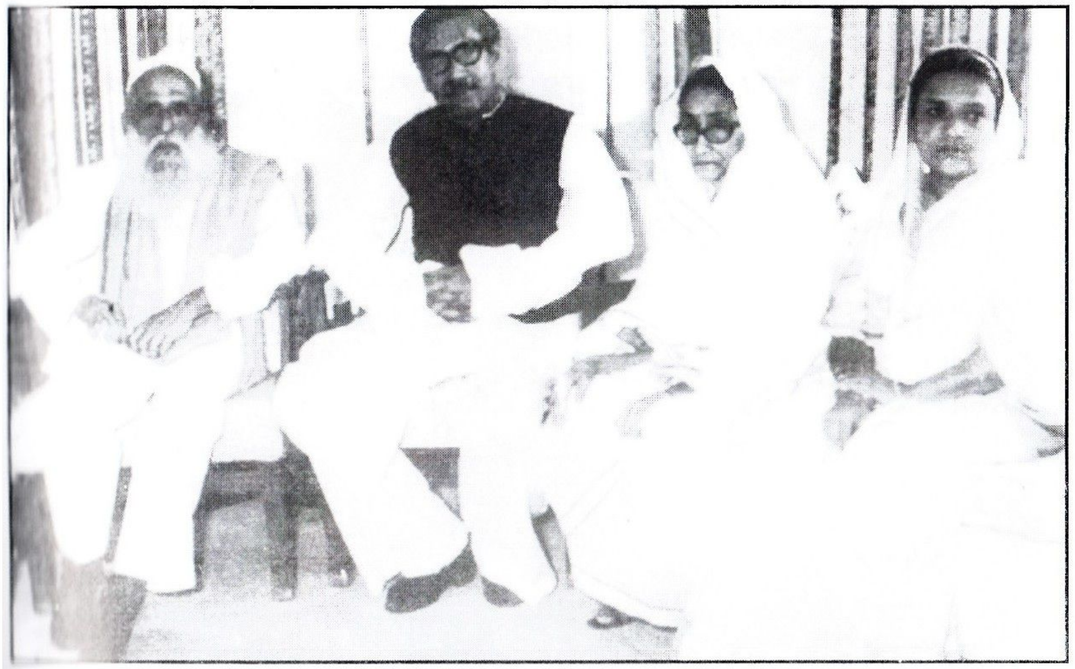
১৯৩৮ সালের ১৬ জানুয়ারি বাংলার প্রধানমন্ত্রী একে ফজলুল হক এবং শ্রম ও পল্লী উন্নয়নমন্ত্রী হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী গোপালগঞ্জ পরিদর্শনে আসেন। মুসলিম লীগ মন্ত্রীদের সংবর্ধনার আয়োজন করে। কংগ্রেস মন্ত্রীদের আগমনে বাধা দেয়। শেখ মুজিব ছাত্রদের নিয়ে মন্ত্রীদের সংবর্ধনায় যোগ দেন। ফজলুল হকের চলে যাবার পর কংগ্রেসের অভিযোগের সুযোগে পুলিশ শেখ মুজিবুর রহমানকে গ্রেফতার করে। কয়েকদিন হাজতবাসের পর তিনি মুক্তি লাভ করেন। দ্বিতীয়বার তিনি গ্রেফতার হন ১৯৩৯ সালে। একটি মেলার আয়োজনকে কেন্দ্র করে দাঙ্গার উপক্রম হয়। শেখ মুজিবুর রহমানের বিরুদ্ধে মিথ্যা মামলা করে। মামলায় তার ৭ দিনের শাস্তি হয়।

তার প্রথম কারাজীবন সম্পর্কে তিনি বলেন, 'আমার যেদিন প্রথম জেল হয় সেদিন আমার নাবালকত্ব ঘুচেছে বোধ হয়।'

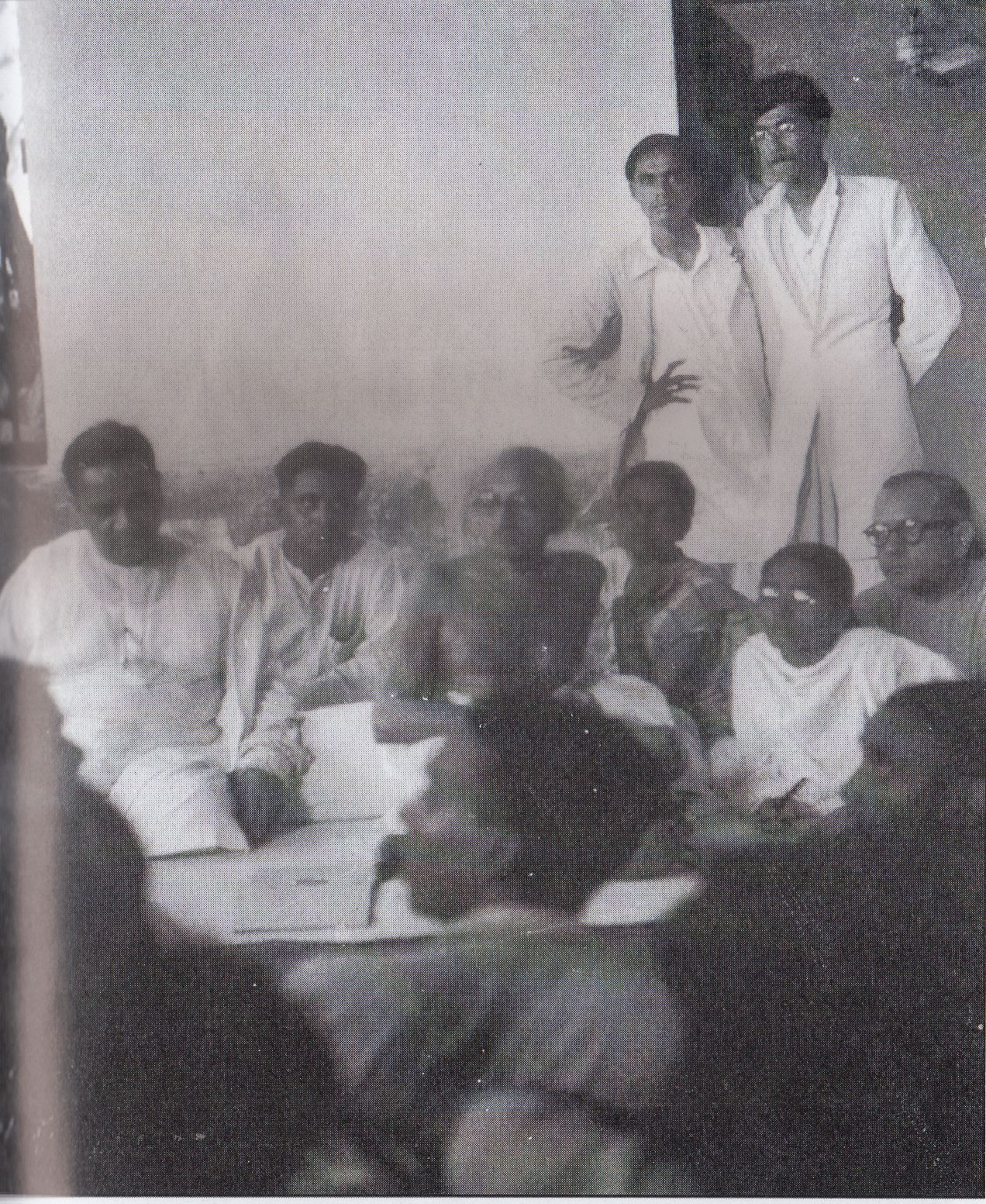
শেখ মুজিবুর রহমান তৃতীয়বার গ্রেফতার হন ১৯৪৮ সালের ১১ মার্চ ভাষা আন্দোলনকালে সচিবালয়ে পিকেটিংয়ের সময় পুলিশ তাঁকে গ্রেফতার করে কেন্দ্রীয় কারাগারে প্রেরণ করে। ১৩ ও ১৪ মার্চ বন্দিদের মুক্তি দাবিতে হরতাল পালিত হয়। ১৫ মার্চ তিনি মুক্তিলাভ করেন। স্বাধীন পাকিস্তানে তিনি প্রথম কারাবরণ করেন।



পিতা শেখ লুৎফুর রহমান এবং মাতা সায়েরা খাতুনের সাথে শেখ মুজিবুর রহমান



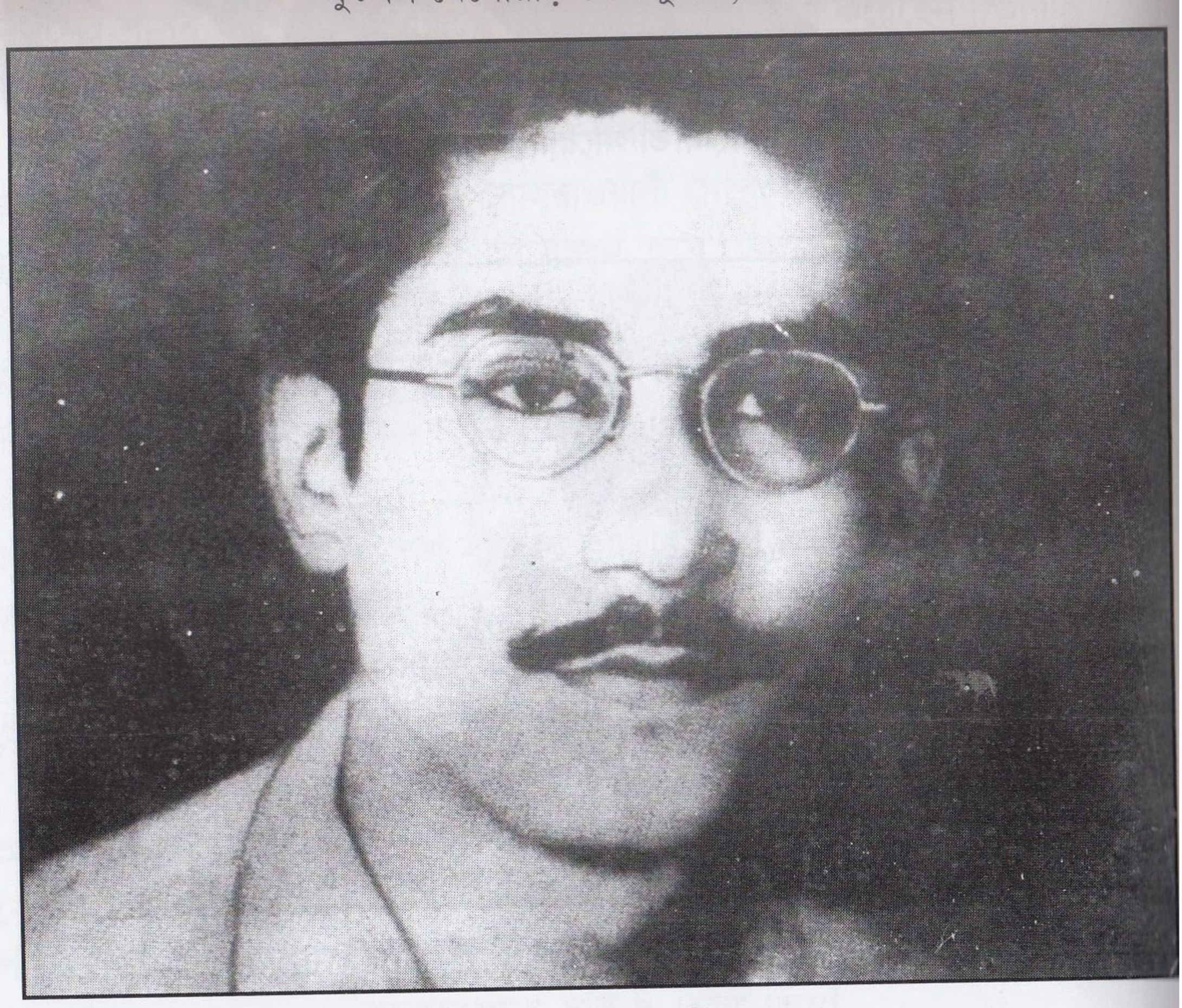
পিতা-মাতা ও স্ত্রীর সাথে বঙ্গবন্ধু



মহাত্মা গান্ধী ও হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর সাথে শেখ মুজিবুর রহমান (দন্ডায়মান ডানে চশমা পড়া), সোদপুর, হায়দারি ম্যানসন, কলকাতা, ১৯৪৭।



ফুটবল খেলোয়াড় শেখ মুজিব, ১৯৪০



ইসলামিয়া কলেজের ছাত্র শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৪২



শেখ মুজিবুর রহমান এবং স্ত্রী ফজিলাতুন্নেছা, টুঙ্গিপাড়া, ১৯৪৭



১৯৪৯, হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর সাথে যুবক শেখ মুজিব

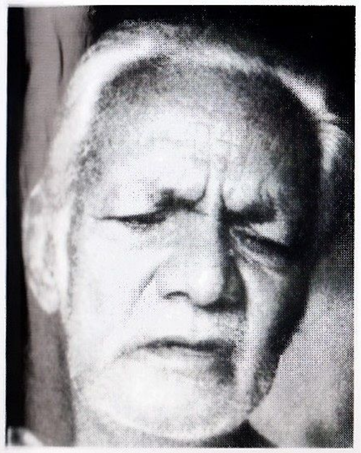


মাও সেতুংয়ের সাথে শেখ মুজিবুর রহমান, বেইজিং-১৯৫২

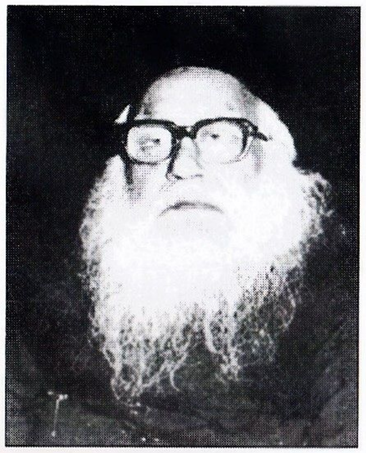


২১ ফেব্রুয়ারি ১৯৫৩, মওলানা ভাসানীসহ প্রভাতফেরিতে শেখ মুজিব

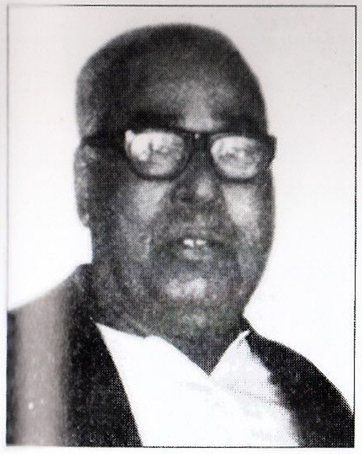
বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ঘনিষ্ঠ রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ



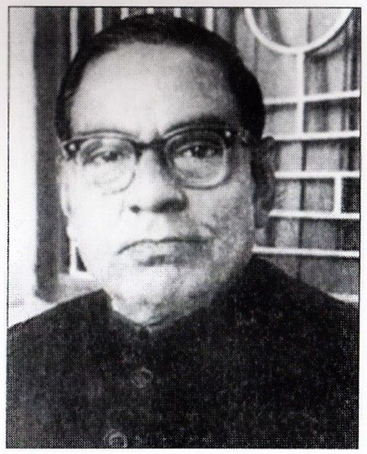
আবুল হাশিম
সাধারণ সম্পাদক, বঙ্গীয় মুসলিম লীগ
১৯৪৪-৪৭



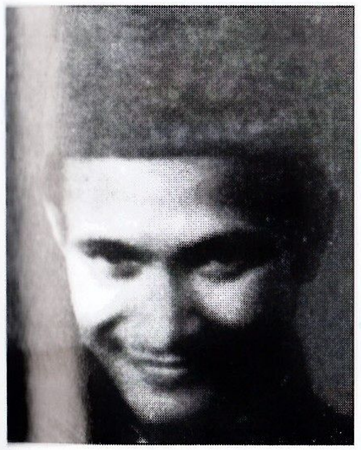
মওলানা আবদুর রশিদ তর্কবাগীশ
এম এল এ
আওয়ামী মুসলিম লীগের সহ-সভাপতি



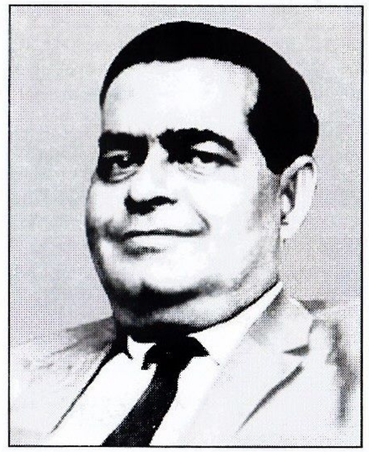
আতাউর রাহমান খান
মুখ্যমন্ত্রী, পূর্বপাকিস্তান, ১৯৫৬-৫৭



আবুল মনসুর আহমদ
যুক্ত ফ্রন্টের ২১ দফা প্রনেতা



শামসুল হক
আওয়ামী মুসলিম লীগের প্রতিষ্ঠাতা
সাধারণ সম্পাদক



তফাজ্জল হোসেন মানিক মিয়া
প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক, দৈনিক ইত্তেফাক



নঈমউদ্দিন আহমদ
ছাত্রলীগের আহ্বায়ক '৪৮



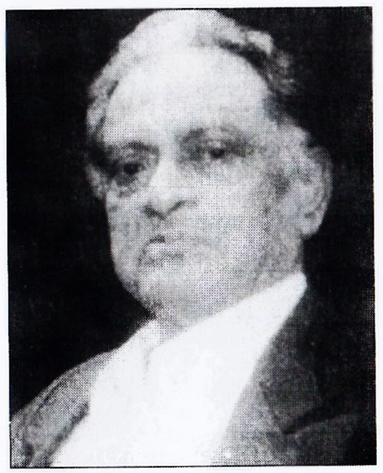
অলি আহাদ
আওয়ামী লীগের সাংগঠনিক সম্পাদক



শওকত আলী
ভাষা সৈনিক
১৫০ নম্বর মোগলটুলী
পার্টি হাউজের স্বত্বাধিকারী



ইয়ার মোহাম্মদ খান
আওয়ামী লীগের প্রতিষ্ঠাতা কোষাধ্যক্ষ



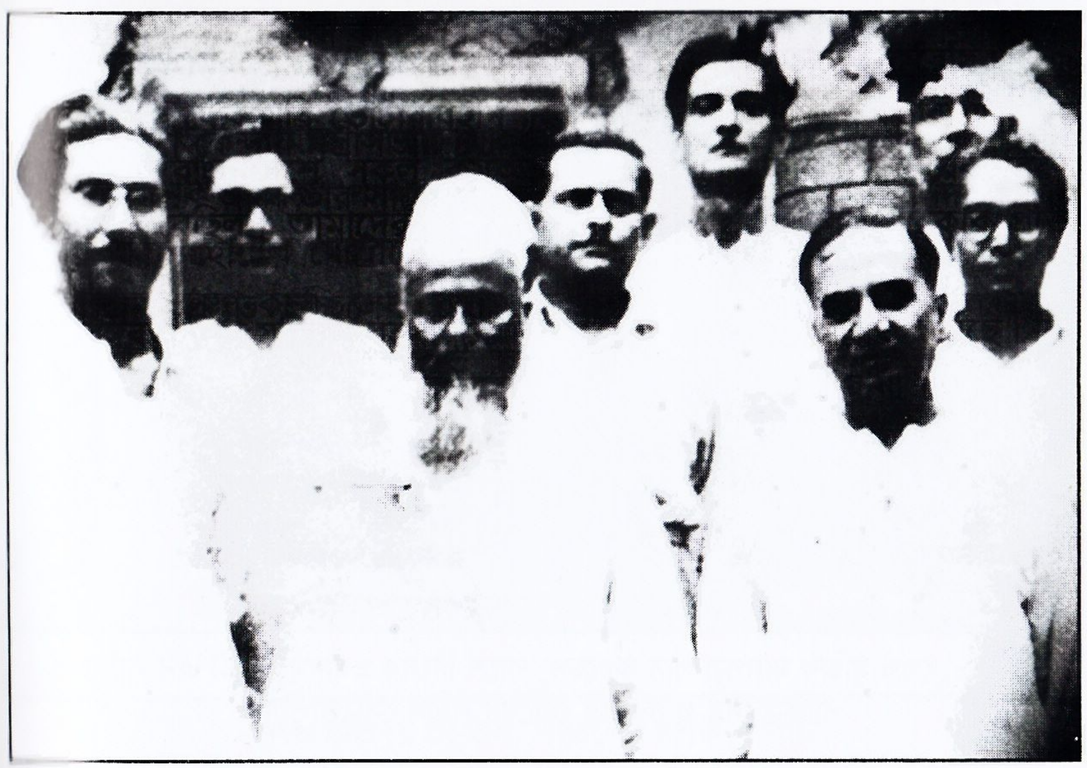
কাজী গোলাম মাহবুব
রাষ্ট্র ভাষার সংগ্রাম কমিটির আহ্বায়ক



দবিরুল ইসলাম
ছাত্রলীগের প্রথম সভাপতি '৪৯-৫৩



১৯৫৬ সালে শেখ মুজিবুর রহমান পূর্ব পাকিস্তানের শিল্পমন্ত্রী হিসেবে শপথ গ্রহণ করছেন
গভর্নর শেরেবাংলা এ কে ফজলুল হকের নিকট



হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী ও মওলানা ভাসানীর সাথে শেখ মুজিব



১৯৫৬, শেখ মুজিব মানপত্র পাঠ করছেন, পাশে চীনের প্রধানমন্ত্রী চৌ এন লাইন ও পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী



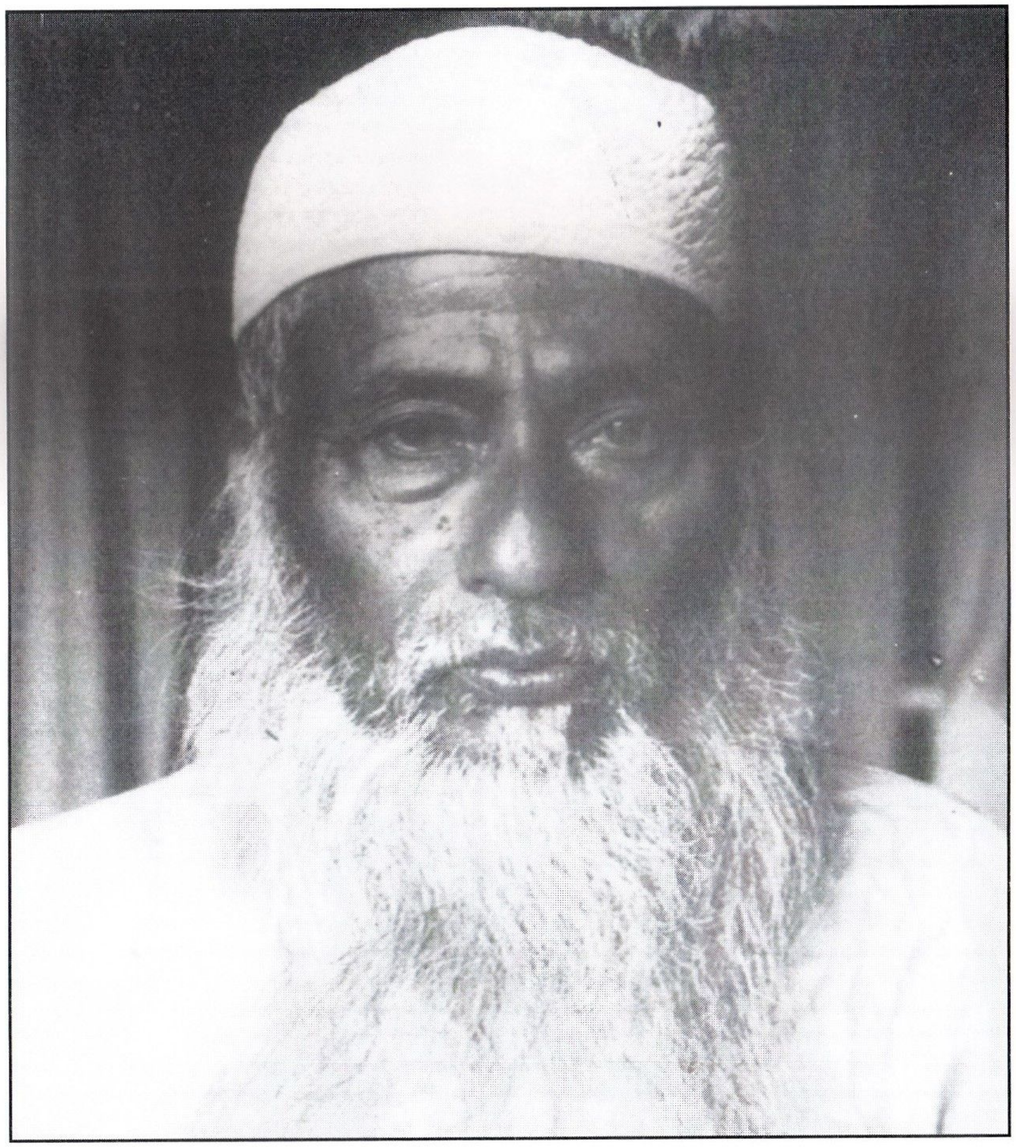
শেখ মুজিবুর রহমান, পঞ্চাশের দশক, করাচী



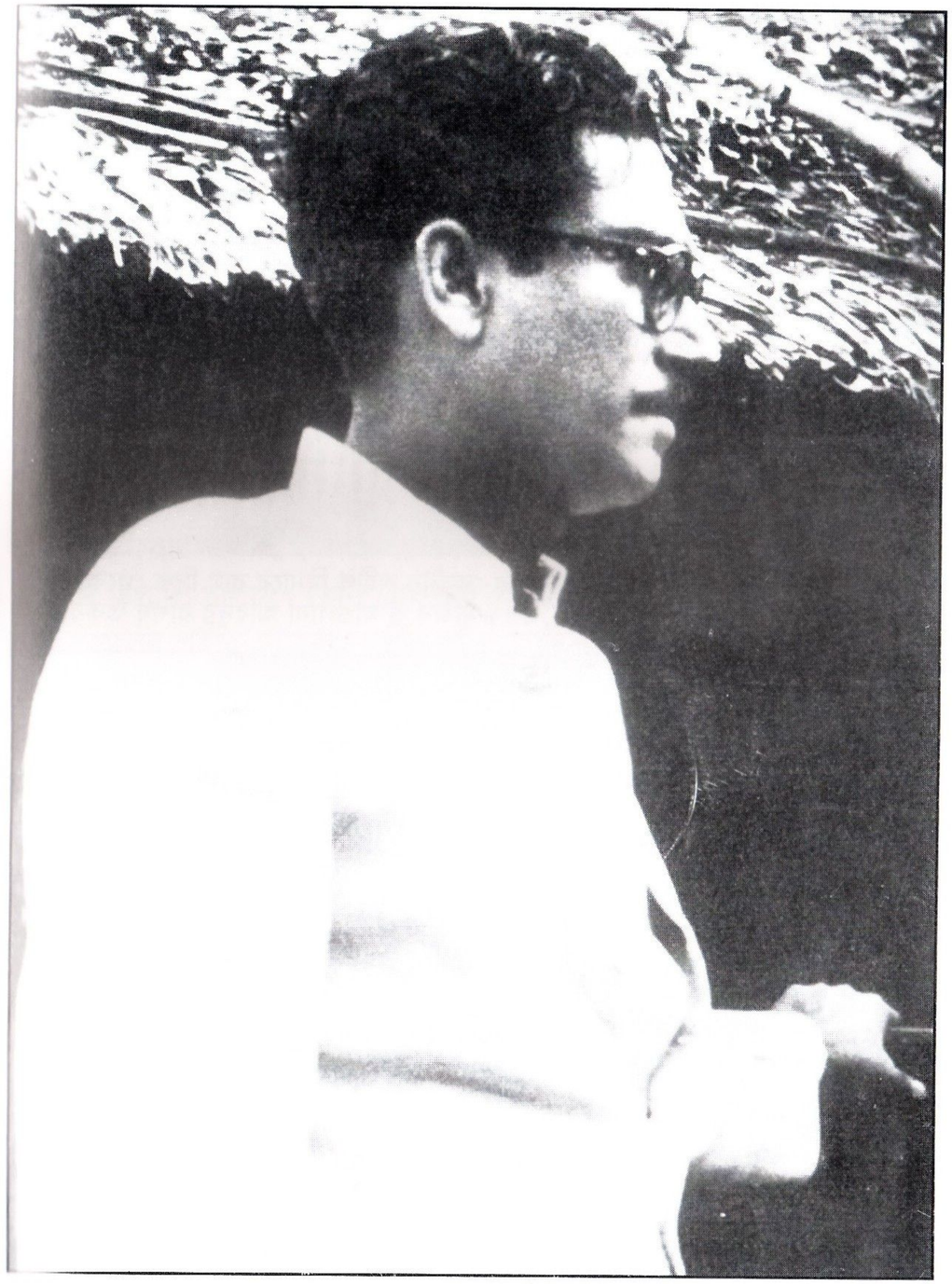
শেরেবাংলা এ কে ফজলুল হক
গভর্নর পূর্বপাকিস্তান, ১৯৫৬-১৯৫৮



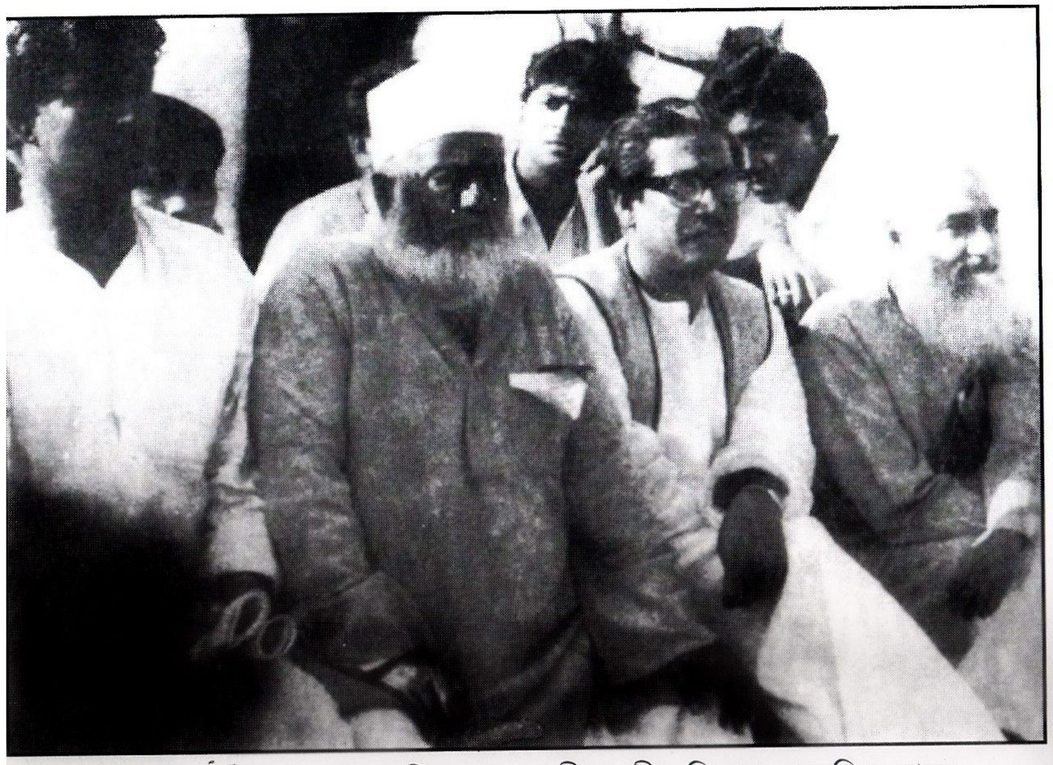
হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী
সভাপতি পাকিস্তান আওয়ামী লীগ
পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী, ১৯৫৬-১৯৫৭



মওলানা আব্দুল হামিদ খান ভাসানী
সভাপতি ন্যাশনাল আওয়ামিপার্টি-ন্যাপ



১৯৫৪, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান



আগরতলা মামলা থেকে মুক্তির পর কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে বাম দিক থেকে মহিউদ্দিন আহমদ, মওলানা ভাসানী, শেখ মুজিব ও মাওলানা আবদুর রশিদ তর্কবাগীশ



বঙ্গবন্ধুসহ দৈনিক ইত্তেফাক পত্রিকার সম্পাদক তফাজ্জল হোসেন মানিক মিয়া, পাশেদাঁড়ানো বাম থেকে তাজউদ্দীন আহমদ, সাংবাদিক সিরাজ উদ্দিন হোসেন প্রমুখ

১৯৪৯ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় চতুর্থ শ্রেণী কর্মচারীদের আন্দোলনে নেতৃত্ব দেয়ার কারণে তাঁকে ১৫ টাকা জরিমানা করা হয়। তিনি জরিমানা দিতে অস্বীকার করার তাঁকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় হতে বহিষ্কার করা হয়। তিনি এলএলবি দ্বিতীয় বর্ষের ছাত্র ছিলেন। তাঁর রোল নম্বর ১৬৫, হলের নাম ছিল এসএম হল। তিনি মুচলেকা দিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ে ফিরে আসেননি। তিনি প্রধানমন্ত্রী হয়ে ১৯৭২ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে এসেছিলেন। টাঙ্গাইলের উপনির্বাচনের পর ১৯৪৯ সালে সরকার দ্বিতীয়বার তাঁকে গ্রেফতার করে। ১৯৪৯ সালের ২৯ এপ্রিল আইন অমান্য কর্মকাণ্ডের জন্য তাকে গ্রেফতার করে ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে আটক রাখা হয। তিনি ১৯ জুলাইয়ের পূর্বে মুক্তি লাভ করেন। ১৯৪৯ সালের ১৯ জুলাই শেখ মুজিবুর রহমান ও আবদুস সালাম খান ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করে গোপালগঞ্জে জনসভা করেছিলেন। শেখ মুজিব নবগঠিত আওয়ামী মুসলিম লীগ গঠন করার জন্য ব্যাপক কর্মসূচি গ্রহণ করেন এবং এ কারণে তাঁকে এবং শওকত আলীকে গ্রেফতার করার জন্য ১৭ অক্টোবর ১৫০ মোঘলটুলির আওয়ামী মুসলিম লীগের অফিসে তল্লাশি চালায়। তিনি গ্রেফতার পরিহার করার জন্য লাহোরে চলে যান এবং হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর সাথে রাজনৈতিক পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনা করেন। পশ্চিম পাকিস্তান থেকে ফেরার পর শেখ মুজিব চতুর্থবার গ্রেফতার হন। ১৯৪৯ সালের ৩১ ডিসেম্বর পুলিশ ৬৯/১ খাজে দেওয়ান রোড হতে তাঁকে গ্রেফতার করে কেন্দ্রীয় কারাগারে নিরাপত্তা বন্দি হিসেবে রাখা হয়। বন্দি অবস্থায় শেখ মুজিবুর রহমানের বিরুদ্ধে বিভিন্ন অভিযোগ এনে আটকাদেশ বৃদ্ধি করা হয়েছিল। তাকে ফরিদপুর, খুলনা ও গোপালগঞ্জ জেলে ভিন্ন ভিন্ন মামলায় হস্তান্তর করা হয়।

জেলের অভ্যন্তরে ১৪৭ পাকিস্তান দণ্ডবিধি ধারায় বিচারে ১২-৯-১৯৫০ তারিখে তার ৩ মাসের জেল হয়। ফরিদপুরে ১৪৩/১৮৮ পিপিসি ধারায় একটি মামলা ফরিদপুরে বিচারাধীন। একই সময় খুলনায় ১৪৭ পিপিসি ধারায় আরো একটি মামলা চলছিল। এ কারণে ১৯৫০ সালের ২৯ ডিসেম্বর তাঁকে ফরিদপুরের জেল থেকে খুলনা জেলে প্রেরণের জন্য স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় নির্দেশ দেয়। শেখ মুজিবুর রহমানকে হয়রানি, নির্যাতন ও মানসিকভাবে দুর্বল করার জন্য খুলনা ও ফরিদপুর জেল থেকে একাধিকবার গোপালগঞ্জ জেলে পাঠানো হয়। খুলনা জেলে গোয়েন্দা বিভাগের এক কর্মকর্তা শেখ মুজিবুর রহমানকে ১৯৫১ সালের ২২ ফেব্রুয়ারি জিজ্ঞাসাবাদ করেন। সে সময় শেখ মুজিবুর রহমান পূর্ব পাকিস্তান সরকারের সমালোচনা করেন এবং তিনি বিশ্বাস করতেন সাধারণ নির্বাচন হলে আওয়ামী মুসলিম লীগ জয়লাভ করবে। গোয়েন্দা কর্মকর্তা বলেন, He was not

willing to execute any bond for his release. His attitude was found very stiff. তিনি বন্ড স্বাক্ষর করে তার মুক্তিলাভে ইচ্ছুক ছিলেন না। তার মনোবল ছিল অত্যন্ত শক্ত। সে কারণে গোয়েন্দা অফিসার তাকে ৬ মাসের আটকের সুপারিশ করেন। ডিআইজি এমডি খালেক ২৮-০৩-৫১ তারিখে ৬ মাসের আটক অনুমোদন করেন। ১৯৫১ সালের ২২ মার্চ খুলনা জেলে গোয়েন্দা কর্মকর্তা শেখ মুজিবুর রহমানকে জিজ্ঞাসা করে সরকারের নিকট প্রতিবেদন দেন।

গোয়েন্দা কর্মকর্তা লিখেছেন– আমি শেখ মুজিবুর রহমানকে ২২-২-৫১ তারিখে সাক্ষাতকার গ্রহণ করি। তিনি সাক্ষাতকালে পূর্ব বাংলার মন্ত্রিসভাকে সমালোচনা করে বলেন, তারা গরীব মানুষের কোনো সহায়তা করতে অযোগ্যতার পরিচয় দিয়েছেন। তিনি বিপিসির সমালোচনা করে বলেন, এ হলো পূর্ববাংলাকে কলোনি করার জন্য পশ্চিম পাকিস্তান কর্তৃপক্ষের ষড়যন্ত্র। তিনি পাঞ্জাবের নির্বাচন সম্পর্কে বলেন, হয়তো মুসলিম লীগ অল্প ব্যবধানে জয়লাভ করবে। তবে তাতে বিরোধী দলের শক্তি প্রমাণিত হবে। তিনি বলেন, পূর্ব বাংলায় যদি সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় তাহলে আওয়ামী মুসলিম লীগ ব্যাপক সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করবে। যদি কারাগারে মৃত্যুও হয় তবু তিনি চুক্তি স্বাক্ষর করে মুক্তি লাভ করবেন না।

১৯৫১ সালের ৭ মার্চ পুলিশ সুপার নির্দেশ দেন যে নিরাপত্তা বন্দি শেখ মুজিবুর রহমানকে এখনই বরিশাল জেলে প্রেরণ করা হোক।

এক সময় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের বিশেষ শাখা তাঁকে মুক্তি ও পুনরায় গ্রেফতার করার আদেশ দেয়। ১৯৫১ সালের ৭ মার্চ তাঁকে খুলনা জেল থেকে তখনই মুক্তি দেয়ার নির্দেশ দেয়। একই আদেশে তাঁকে পুনরায় গ্রেফতার করার আদেশ দেয়।

১৯৫১ সালের ১৪ মার্চ ফরিদপুরের পুলিশ সুপার শেখ মুজিবুর রহমানকে গোপালগঞ্জে গ্রেফতার করার নির্দেশ দেয়। সেদিন তাঁকে কয়েক ঘণ্টার জন্য মুক্তি দেয়া হয়। তিনি আগত ছাত্রদের মিছিলে সংক্ষিপ্ত ভাষণ দেন। মওলানা ভাসানীকে গ্রেফতারের তিনি নিন্দা করেন। গোপালগঞ্জে ব্যাপক হরতাল পালিত হয় এবং ছাত্ররা স্লোগান দেয়– মুজিবের মুক্তি চাই, রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই। ১৬ মার্চ তাকে ফরিদপুর জেলে স্থানান্তর করা হয়। ১৯৫১ সালের ২২ মে ফরিদপুর জেলে গোয়েন্দা পুলিশের সাথে সাক্ষাতকালে তিনি বলেন, মওলানা আব্দুল হামিদ খান ভাসানী এবং শামসুল হক আওয়ামী মুসলিম লীগের সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক মুক্তি লাভ করেছেন। কিন্তু তাঁর ব্যাপারে ভিন্ন আচরণ করা হচ্ছে।

পুলিশ রিপোর্টে শেখ মুজিবুর রহমানের অনমনীয় ও প্রতিবাদী মনোভাব

প্রকাশ পায়। তিনি জোরের সাথে বলেন, তিনি যে রাজনীতি করেন তার জন্য অনুতপ্ত নয়, বরং মুক্তি পেয়ে তিনি পুনরায় রাজনীতি শুরু করবেন। তিনি কোনো প্রকার সরকারের শর্ত মেনে বন্ড দিয়ে মুক্তি লাভ করবেন না। ২২-৫-৫১ তারিখের রিপোর্টের আইবি অফিসার বলেন– He is still-full of potentialities for mischief making. His detention in Jail for a further period of 6 months is considered essential for the security of the state. ঢাকার জেলা ম্যাজিস্ট্রেট উপরোক্ত সুপারিশ অনুমোদন করায় রাষ্ট্রের নিরাপত্তার জন্য তাকে ৬ মাসের জন্য অন্তরীণ রাখা হয়।

শেখ মুজিবুর রহমানের মুক্তির জন্য ঢাকা হাইকোর্ট রিট পিটিশন করা হয়। ৮-৬-৫১ তারিখে হাইকোর্ট শুনানি এবং শেখ মুজিবুর রহমানের আটক আদেশ বহাল রাখা হয়।

ফরিদপুর জেলে শেখ মুজিবুর রহমান অসুস্থ হয়ে পড়েন। তিনি চোখের পীড়ায় ভুগছিলেন। ১৯৫১ সালের ৩০ আগস্ট তাকে ঢাকা কেন্দ্রীয় জেলে হস্তান্তর করা হয়।

১৯৫১ সালের ২১ সেপ্টেম্বর তার বিরুদ্ধে অভিযোগ করা হয়।

১. আপনি সরকার উৎখাতের জন্য ঢাকা, ফরিদপুর এবং পূর্ব বাংলার কয়েকটি জেলায় একটি গুপ্ত বাহিনীর বেআইনি কার্যাবলীর সঙ্গে সম্পৃক্ত।

২. আপনার উপরোক্ত কার্যাবলী এ প্রদেশের জন্য নিরাপত্তা বিঘ্নিত করতে পারে।

৯-১১-৫১ সালে করাচী থেকে আখতার আহাদ ঢাকা জেলে শেখ মুজিবের নিকট পত্র লেখেন। পত্রে তিনি জানান যে, করাচীর এক সভায় হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী বলেছেন– That had there been five Mujibur Rahman the whole country would have been with him.

হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী বলেছেন– শেখ মুজিবুর রহমানের মতো ৫ জন শেখ মুজিবুর রহমান থাকলে সমগ্র দেশ তার সাথে থাকতো। শেখ মুজিব সম্পর্কে সোহরাওয়ার্দীর উচ্চ ধারণা ছিল।

শেখ মুজিবুর রহমান জেল থেকে হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর নিকট নিয়মিত পত্র লিখতেন। সোহরাওয়ার্দী ঢাকায় এসে জেলে শেখ মুজিবুর রহমানের সাথে দেখা করতেন এবং তার মামলা পরিচালনা করতেন। তিনি ডাইরিতে শেখ মুজিবুর রহমানের সাংগঠনিক প্রতিভা সম্পর্কে লিখেছেন– He is my star organiser তিনি আমার তারকা সংগঠক।

১৬-১১-৫১ তারিখে শেখ মুজিবুর রহমানকে ঢাকা মেডিক্যাল কলেজের চক্ষু বিভাগে প্রেরণ করা হয়। চক্ষু পরীক্ষা করে একই দিনে তাকে জেলে নিয়ে যায়। ডাক্তার তাকে হাসপাতালে ভর্তির পরামর্শ দেন।

৮ ডিসেম্বর এসএইচ সোহরাওয়ার্দী, আজিজ আহমদ এবং সাখাওয়াত আলী শেখ মুজিবুর রহমানের সাথে ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে দেখা করেন। শেখ মুজিব তাদের হাইকোর্টে তার মুক্তির জন্য মামলা করতে বলেন। শেখ মুজিব হাসপাতালে ভর্তি হলে আনোয়ারা খাতুন, এমএলএ, খয়রাত হোসেন এমএলএ আহম্মদ হোসেন, তোফাজ্জল হোসেন মানিক তার সাথে দেখা করেন। চোখের চিকিৎসার জন্য শেখ মুজিবুর রহমান ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে ১৯৫১ সালের ২৯ নভেম্বর ভর্তি হন। প্রত্যেক দিন তার সাথে রাজনীতিবিদরা দেখা করতে আসেন। গোয়েন্দা পুলিশ তার ওপর কড়া নজর রাখত। পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম ছাত্রলীগের ভারপ্রাপ্ত সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক ২ ডিসেম্বর শেখ মুজিবুর রহমানের মুক্তির দাবি জানিয়ে সংবাদপত্রে বিবৃতি দেন। ৪ ডিসেম্বর আলী আহমদ খান এমএলএ সিআর ২০ এফ মান্নান এমএলএ, কফিলউদ্দিন চৌধুরী শেখ মুজিবুর রহমানের সাথে দেখা করার জন্য ঢাকার ডিআইবির নিকট আবেদন করেন। ১৯৫১ সালের ২২ ডিসেম্বর আওয়ামী মুসলিম লীগের সাধালণ সম্পাদক শামসুল হক, শেখ মুজিবুর রহমানের মুক্তি দাবি জানিয়ে পত্রিকায় বিবৃতি দিয়ে বলেন– My heart bleeds to find Sheikh Mujibur Rahman still under detention inspite of his serious illness. His condition is so serious that he had to be removed from the Jail to the Medical College Hospital. গুরুতর অসুস্থতা সত্ত্বেও শেখ মুজিবুর রহমানকে এখনও বন্দি দেখে আমার হৃদয়ে রক্ত ঝরছে। তার অবস্থা এতো খারাপ যে, তাকে জেল হতে মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে প্রেরণ করতে হয়েছে।

শেখ মুজিবুর রহমানকে ১৯৫২ সালের ২৯ জানুয়ারি ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতাল থেকে কেন্দ্রীয় কারাগারে প্রেরণ করা হয়। কারাবন্দি শেখ মুজিবুর রহমান ও বরিশালের মহিউদ্দিন আহমদ ১৯৫২ সালের ৯ ফেব্রুয়ারি পূর্ব পাকিস্তানের মুখ্যমন্ত্রী নূরুল আমিনের নিকট আটকাদেশে আনীত অভিযোগ যদি প্রত্যাহার না করা হয় তাহলে তারা ১৬ ফেব্রুয়ারি থেকে অনশন ধর্মঘট করার হুমকি দিয়ে স্মারকলিপি পেশ করেন।

সরকার ভীত হয়ে নিরাপত্তা বন্দি শেখ মুজিবুর রহমান ও মহিউদ্দিন আহমদকে ১৫ ফেব্রুয়ারি ফরিদপুর জেলে প্রেরণের নির্দেশ দেয়। ১৫ ফেব্রুয়ারি

ভোরে শেখ মুজিবুর রহমান ও মহিউদ্দিন আহমদকে ট্রেনে নারায়ণগঞ্জ প্রেরণ করা হয়। শত শত ছাত্র জনতা নারায়ণগঞ্জ চাষাড়া রেলস্টেশনে শেখ মুজিবুর রহমান ও মহিউদ্দিন আহমদকে স্বাগত জানায়। শেখ মুজিবুর রহমান ছাত্রদের উদ্দেশ্যে জ্বালাময়ী ভাষণ দেন। তারা স্টিমারে নারায়ণগঞ্জ হতে গোয়ালন্দ পৌঁছেন। ১৭ ফেব্রুয়ারি তাদেরকে ফরিদপুর জেলে গ্রহণ করা হয়। ফরিদপুর জেলে পৌঁছে শেখ মুজিব ও মহিউদ্দিন আহমদ অনশন শুরু করেন। এ সম্পর্কে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে ফরিদপুর জেল কর্তৃপক্ষের ১৮-০২-৫২ তারিখের লেখা পত্র : 'জেলে আটক নিরাপত্তা বন্দী শেখ মুজিবুর রহমান এবং মহিউদ্দিন আহমদ আজ সকাল থেকে এই বলে অনশন শুরু করেছেন যে, বিনা শর্তে তাদের মুক্তি দেয়া না হলে মৃত্যু পর্যন্ত অনশন করবেন।'

শেখ মুজিবুর রহমানের অনশনের বিষয়টি ২০ ফেব্রুয়ারি আনোয়ারা খাতুন এমএলএ আইন সভায় মুলতবি প্রস্তাব উত্থাপন করেন। তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী নূরুল আমিন আনোয়ারা খাতুনের প্রস্তাবের বিরোধিতা করেন। শেখ মুজিবুর রহমান ও মহিউদ্দিন আহমদের স্বাস্থ্যের অবস্থা দ্রুত অবনতি ঘটে। ১৯ ও ২৩ ফেব্রুয়ারি ডাক্তারের রিপোর্ট স্বরাষ্ট্র দফতরে প্রেরণ করা হয়। রিপোর্টে শেখ মুজিবুর রহমানের হৃৎপিণ্ড ও চোখের অবস্থা খারাপ ছিল। বন্দিদ্বয়ের প্রতি সমবেদনা জানিয়ে ফরিদপুর জেলে রাজবন্দি নেপাল নাথ, ড. মারুফ হোসেন, চুনিলাল চক্রবর্তী, সত্য মৈত্র, পুর্নেন্দু দে কানুগো ২৫ ফেব্রুয়ারি ২৪ ঘণ্টা অনশন পালন করেন।

গণদাবির মুখে ১৯৫২ সালের ২৭ ফেব্রুয়ারি শেখ মুজিবুর রহমান এবং ১ মার্চ মহিউদ্দিন আহমদকে বিনা শর্তে সরকার মুক্তি দেয়। সরকারের দেয়া শর্ত মেনে নিলে শেখ মুজিবুর রহমান অনেক পূর্বে মুক্তি পেতে পারতেন। কিন্তু তিনি বন্ড স্বাক্ষর করে মুক্তি চাননি। শেষ পর্যন্ত শেখ মুজিবুর রহমান জয়ী হলেন। ২৭ ফেব্রুয়ারি বিপুল ছাত্র-জনতা তাকে ফরিদপুর জেল গেট থেকে সংবর্ধনা দিয়ে শহরে মিছিল করে এবং জনসভা অনুষ্ঠিত হয়। তিনি ফরিদপুর থেকে টুঙ্গিপাড়ায় চলে যান। মহিউদ্দিন আহমদ ২৮ ফেব্রুয়ারি মুক্তি লাভ করে ঢাকায় চলে আসেন।

অধ্যায় ৬

১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলন

১৯৫১ সালের ১১ মার্চ রাষ্ট্রভাষা দিবস পালিত হয়। রাষ্ট্রভাষার দাবি এগিয়ে যেতে থাকে। ১৯৫২ সালের ২৬ জানুয়ারি মুসলিম লীগ আয়োজিত পল্টন ময়দানের জনসভায় খাজা নাযিমউদ্দিন ঘোষণা করলেন, "উর্দুই হবে পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্রভাষা।" খাজা নাযিমউদ্দিন ভুলে গেলেন ১৯৪৮ সালের ১৫ মার্চের চুক্তির কথা। তিনি সেদিন স্বীকার করেছিলেন বাংলা পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্র ভাষা হবে। প্রতিবাদে ছাত্রসমাজ প্রচণ্ড বিক্ষোভে ফেটে পড়ে। ১৯৪৮ সালের ভাষা আন্দোলনের কেন্দ্র ছিল ফজলুল হক হল এবং ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলনের কেন্দ্র ছিল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মধুর ক্যান্টিন। ১৯৫২ সালের ২৭ জানুয়ারি ছাত্ররা মধুর ক্যান্টিনে একত্রিত হয়ে খাজা নাযিমউদ্দিনের ঘোষণার প্রতিবাদ করে এবং ৩১ জানুয়ারি হরতাল আহ্বান করে। ৩১ জানুয়ারি সকল স্কুল-কলেজে ধর্মঘট পালিত হয়। ছাত্র সমাজের মুখে স্লোগান ছিল 'রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই', 'আমাদের দাবি মানতে হবে, নইলে গদি ছাড়তে হবে।' নারায়ণগঞ্জে ভাষা আন্দোলন তুঙ্গে উঠেছিল। নারায়ণগঞ্জের তরুণ নেতা মোস্তফা সারওয়ার এবং সরগাম বালিকা বিদ্যালয়ের শিক্ষয়িত্রী মমতাজ বেগমের নেতৃত্বে নারায়ণগঞ্জ শহরের ছাত্রছাত্রী ও জনতা রাস্তায় বিক্ষোভে বেরিয়ে আসে। পুলিশের নির্যাতনের বিরুদ্ধে গর্জে উঠেছিল নারায়ণগঞ্জবাসী। বাংলা ভাষাকে কেন্দ্র করে পূর্ব বাংলার সকল জেলা, মহকুমায় আন্দোলন, সভা, মিছিল চলছে। ১৯৫২ সালের ৩১ জানুয়ারি ঢাকা জেলা বার লাইব্রেরি হলে মওলানা ভাসানীর সভাপতিত্বে সর্বদলীয় প্রতিনিধিদের সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সম্মেলনে সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম কমিটি গঠন করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। ১৫ নম্বর মোগলটুলি অফিসে ৭ ফেব্রুয়ারি ২৮ সদস্যবিশিষ্ট সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা কমিটি গঠন করা হয়।

মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী	সভাপতি	আওয়ামী মুসলিম লীগ
কাজী গোলাম মাহবুব	আহ্বায়ক	আওয়ামী মুসলিম লীগ

শামসুল হক	সদস্য	আওয়ামী মুসলিম লীগ
আতাউর রহমান খান	সদস্য	আওয়ামী মুসলিম লীগ
আলমাস আলী	সদস্য	আওয়ামী মুসলিম লীগ
আব্দুল আউয়াল	সদস্য	আওয়ামী মুসলিম লীগ
আবুল হাশিম	সদস্য	খেলাফতে রব্বানী পার্টি
কামরুদ্দিন আহমদ	সদস্য	লেবার ফেডারেশন
খালেক নেওয়াজ	সদস্য	ছাত্রলীগ
সৈয়দ নুরুল আলম	সদস্য	ছাত্রলীগ
অধ্যাপক আবুল কাসেম	সদস্য	তমদ্দুন মজলিস
মুহাম্মদ তোয়াহা	সদস্য	যুবলীগ
অলি আহাদ	সদস্য	যুবলীগ
আব্দুল মতিন	সদস্য	আহ্বায়ক, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ
মজিবল হক	সদস্য	ভিপি, এসএম হল
শামসুল আলম	সদস্য	ফজলুল হক হল ভিপি
হেদায়েত হোসেন চৌধুরী	সদস্য	সাধারণ সম্পাদক, এসএম হল
শওকত আলী	সদস্য	কর্মী শিবির
শামসুল হক চৌধুরী	সদস্য	সভাপতি, পূর্ব পাকিস্তান ছাত্রলীগ
গোলাম মওলা	সদস্য	ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ
মুহাম্মদ নুরুল হুদা	সদস্য	ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ
সৈয়দ আব্দুর রহিম	সদস্য	রিকশা ইউনিয়ন
খয়রাত হোসেন এমএলএ	সদস্য	আইনসভার প্রতিনিধি
আনোয়ারা বেগম এমএলএ	সদস্য	আইনসভার প্রতিনিধি
আব্দুল গফুর	সদস্য	সম্পাদক, সাপ্তাহিক সৈনিক
মির্জা গোলাম হাফিজ	সদস্য	সিভিল লিবার্টি পার্টি
আনোয়ারুল হক খান	সদস্য	সাধারণ সম্পাদক ফজলুল হক হল
আখতারউদ্দিন আহমদ	সদস্য	নিখিল পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম ছাত্রলীগ

মওলানা ভাসানীকে সভাপতি ও কাজী গোলাম মাহবুবকে আহ্বায়ক করে ২৮ সদস্যবিশিষ্ট সর্বদলীয় সংগ্রাম পরিষদ ২১ ফেব্রুয়ারি সারা পূর্ব বাংলায়

সাধারণ ধর্মঘট, মিছিল ও জনসভার আহ্বান করে। ২১ ফেব্রুয়ারি ছিল পূর্ববঙ্গ আইন পরিষদের বাজেট অধিবেশন। সংগ্রাম পরিষদের অর্থ সংগ্রহের জন্য ১১-১৩ ফেব্রুয়ারি পতাকা দিবস পালিত হয়। ১৯৫২ সালের ২০ ফেব্রুয়ারি নুরুল আমিন সরকার ঢাকা শহরে এক মাসের জন্য ১৪৪ ধারা জারি করে। উদ্ভূত পরিস্থিতি আলোচনার জন্য সন্ধ্যা ৭টায় ৯৪ নবাবপুর রোডে আওয়ামী লীগ অফিসে সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদের সভা অনুষ্ঠিত হয়। অধিকাংশ সদস্য ১৪৪ ধারা ভঙ্গ না করার পক্ষে মত দেয়। ২০ ফেব্রুয়ারি রাতে বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে।

আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক শামসুল হক মুসলিম লীগের নির্যাতনে ক্লান্ত। একদিকে তার স্ত্রী আফিয়া বেগমের অসহযোগিতা; অন্যদিকে দুই শিশুকন্যার জন্য পিছুটান। সুতরাং তার কাছে থেকে সংগ্রামী নেতৃত্ব আশা করা যায়নি। আওয়ামী লীগের যুগ্ম সম্পাদক শেখ মুজিব জেলে অন্তরীণ। তিনি মুক্ত থাকলে তার কাছ থেকে সংগ্রামী নেতৃত্ব আশা করা যেত।

৫২র ভাষা আন্দোলনে শেখ মুজিব

১৯৫২ সালে ভাষা আন্দোলনকালে শেখ মুজিব জেলে বন্দী ছিলেন। জেল থেকেও তিনি ভাষা আন্দোলনে নেতৃত্ব দেন। '৫২র ভাষা আন্দোলন সম্পর্কে তাঁর আত্মজীবনীতে বলেছেন : "১৯৪৯ সালের ডিসেম্বর মাসে আমি জেলে আসলাম। ১৯৪৭ সালে পাকিস্তান হয়েছে। আমার তিনবার জেলে আসতে হল, এইবার নিয়ে। মওলানা সাহেবের কাছে সকল কিছুই বললাম।

কয়েকদিন পরেই আমাকে মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে আসা হল। চক্ষু দুইটা বেশি যন্ত্রণা দিতেছিল। তাই প্রথমে চোখের চিকিৎসা শুরু করলেন ক্যাপ্টেন লস্কর, চোখের বিখ্যাত ডাক্তার। কিছুদিনের মধ্যে কিছুটা উপকার হল, আরও কিছুদিন লাগবে। ডা. শামসুদ্দিন সাহেব হার্টের চিকিৎসা শুরু করলেন। বিকালে অনেক লোক আসত আমাকে দেখতে।

আমি হাসপাতালে আছি। সন্ধ্যায় মোহাম্মদ তোয়াহা ও অলি আহাদ দেখা করতে আসে। আমার কেবিনের একটা জানালা ছিল ওয়ার্ডের দিকে। আমি ওদের রাত একটার পরে আসতে বললাম। আরও বললাম, খালেক নেওয়াজ, কাজী গোলাম মাহাবুব আরও কয়েকজন ছাত্রলীগ নেতাকে খবর দিতে। দরজার বাইরে আইবিরা পাহারা দিত। রাতে অনেকে ঘুমিয়ে পড়েছে। তখন পিছনের বারান্দায় ওরা পাঁচ-সাতজন এসেছে। আমি অনেক রাতে একা হাঁটাচলা করতাম। রাতে কেউ আসে না বলে কেউ কিছু বলত না। পুলিশরা চুপচাপ পড়ে

থাকে, কারণ জানে আমি ভাগব না। গোয়েন্দা কর্মচারী একপাশে বসে ঝিমায়। বারান্দায় বসে আলাম হল এবং আমি বললাম, সর্বদলীয় সংগ্রাম পরিষদ গঠন করতে। আওয়ামী লীগ নেতাদেরও খবর দিয়েছি। ছাত্রলীগই তখন ছাত্রদের মধ্যে একমাত্র জনপ্রিয় প্রতিষ্ঠান। ছাত্রলীগ নেতারা রাজি হল। অলি আহাদ ও তোয়াহা বলল, যুবলীগও রাজি হবে। আবার ষড়যন্ত্র চলছে বাংলা ভাষার দাবিকে নস্যাৎ করার। এখন প্রতিবাদ না করলে কেন্দ্রীয় আইনসভায় মুসলিম লীগ উর্দুর পক্ষে প্রস্তাব পাস করে নেবে। নাজিমুদ্দীন সাহেব উর্দুকে একমাত্র রাষ্ট্রভাষা করার কথাই বলেন নাই, অনেক নতুন নতুন যুক্তিতর্ক দেখিয়েছেন। অলি আহাদ যদিও আওয়ামী লীগ ও ছাত্রলীগের সদস্য হয় নাই, তবুও আমাকে ব্যক্তিগতভাবে খুবই শ্রদ্ধা করত ও ভালবাসত। আরও বললাম, "খবর পেয়েছি, আমাকে শীঘ্রই আবার জেলে পাঠিয়ে দিবে, কারণ আমি নাকি হাসপাতালে বসে রাজনীতি করছি। তোমরা আগামীকাল রাতেও আবার এস।" আর দু'একজন ছাত্রলীগ নেতাকে আসতে বললাম। শওকত মিয়া ও কয়েকজন আওয়ামী লীগ কর্মীকেও দেখা করতে বললাম। পরের দিন রাতে এক এক করে অনেকেই আসল। সেখানেই ঠিক হল আগামী ২১ শে ফেব্রুয়ারি রাষ্ট্রভাষা দিবস পালন করা হবে এবং সভা করে সংগ্রাম পরিষদ গঠন করতে হবে। ছাত্রলীগের পক্ষ থেকেই রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদের কনভেনর করতে হবে। ফেব্রুয়ারি থেকেই জনমত সৃষ্টি করা শুরু হবে। আমি আরও বললাম, "আমি ও আমার মুক্তির দাবি করে ১৬ই ফেব্রুয়ারি থেকে অনশন ধর্মঘট শুরু করব। আমার ছাব্বিশ মাস জেল হয়ে গেছে।" আমি একথাও বলেছিলাম, "মহিউদ্দিন জেলে আছে, আমার কাছে থাকে। যদি সে অনশন করতে রাজি হয়, তবে খবর দেব। তার নামটাও আমার নামের সাথে দিয়ে দিবে। আমাদের অনশনের নোটিশ দেওয়ার পরই শওকত মিয়া প্যামপ্লেট ও পোস্টার ছাপিয়ে বিলি করার বন্দোবস্ত করবে।"

সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদের অধিকাংশ সদস্য ১৪৪ ধারা ভঙ্গ না করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলেও ২০ ফেব্রুয়ারি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্র সংগ্রাম কমিটি ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। ছাত্রনেতাদের মধ্যে ছিলেন আব্দুল মতিন, গাজীউল হক, শামসুল আলম, এসএ বারী এটি, এমআর আখতার মুকুল, হাবিবুর রহমান শেলী প্রমুখ। ২১ ফেব্রুয়ারি ঢাকা শহরের স্কুল-কলেজের ছাত্রছাত্রী ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আমতলায় সমবেত হয়। সমবেত ছাত্রদের ১৪৪ ধারা ভঙ্গ না করার জন্য আওয়ামী লীগ সম্পাদক শামসুল হক অনুরোধ জানান। অন্যদিকে গাজীউল হকের সভাপতিত্বে ছাত্ররা ১৪৪ ধারা ভাঙ্গার জন্য দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। এ সময় আব্দুস সামাদের মধ্যস্থতায় সিদ্ধান্ত হয় যে,

৫ জন ৫ জন করে ১০ জনের দল ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করে আইনসভার দিকে অগ্রসর হবে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের জগন্নাথ হলের নিকট পুরাতন আইনসভার ভবন ছিল। প্রথমে নাদিরা বেগমের নেতৃত্বে মেয়েদের দলটি অগ্রসর হয়। পুলিশ তাদের ওপর লাঠিচার্জ করে। তারপর ছেলেদের দলটি অগ্রসর হয়। প্রথম দলে ছিলেন আব্দুল মতিন, গাজীউল হক, হাবিবুর রহমান, শামসুল আলম, এম আর আখতার মুকুল প্রমুখ। শত শত ছাত্র মিছিল করে যাচ্ছে। মুখ্যমন্ত্রী নুরুল আমিন ও মুখ্য সচিব পাঞ্জাবী আজিজ আহমদ ছাত্রদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণের নির্দেশ দেন। তখন আইজি পুলিশ জাকির হোসেন, জেলা ম্যাজিস্ট্রেট কোরায়শী, ডিআইজি হাফিজুদ্দিন, পুলিশ সুপার ইদ্রিস এবং সিটি এসপি মাসুদ বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় উপস্থিত ছিলেন এবং তারা পুলিশ দিয়ে হলগুলো ঘিরে ফেলে। তারা গুলির নির্দেশ দেয়। পুলিশের টিয়ারগ্যাস সেল নিক্ষেপ ও লাঠিচার্জের ফলে ছাত্ররা ঢাকা মেডিক্যাল কলেজে সমবেত হয়। ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের ছাত্ররাও মেডিক্যাল কলেজে সমবেত হয়েছে। সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ যখন দেখলো ছাত্ররা ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করেছে তখন তারাও মিছিলে যোগ দেয়। এ কথা সত্যি-সংগ্রাম সংগ্রাম পরিষদ প্রথম ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করে রাস্তায় মিছিল করে এবং অন্যদিকে সর্বদলীয় সংগ্রাম পরিষদের নেতৃবৃন্দ পিছিয়ে ছিলেন না- তারা এগিয়ে আসেন। আইনসভার অধিবেশন ৩টায় শুরু হবে। এমএলএগণ কড়া পুলিশী প্রহরায় জীপে যাচ্ছে– ছাত্ররা রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই, নাযিম-আমিন নিপাত যাক, পুলিশ জুলুম চলবে না প্রভৃতি স্লোগান দিচ্ছে। বেলা ৩টা ২০ মিনিট মেডিক্যাল কলেজ হোস্টেলের সামনে সমবেত ছাত্রদের ওপর পুলিশ গুলিবর্ষণ করলে মেডিক্যাল কলেজ ব্যারাকের পাশে (বর্তমান শহীদ মিনার) দাঁড়ানো ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রাষ্ট্র বিজ্ঞানের এমএ ক্লাসের ছাত্র আবদুল জব্বার গুলিবিদ্ধ হন এবং তার মাথার খুলি উড়ে যায়। তারপর রফিক, বরকত, সালাম মেডিক্যাল কলেজের সামনে গুলিবিদ্ধ হন। তাদের ধরাধরি করে হাসপাতালে নেয়া হয়। মাত্র ৩০ মিনিটে ৩-২০ মিনিটে হতে ৩-৫০ মিনিটের গুলিবর্ষণে বাঙালি জাতিকে প্রবলভাবে কাঁপিয়ে দেয়। গুলিবিদ্ধ ছাত্ররা মৃত্যুবরণ করেন। জব্বার, রফিক, সালাম ও বরকতের মৃত্যুর খবরে ঢাকার জনতা রাস্তায় বেরিয়ে আসে এবং ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ প্রাঙ্গণে সমাবেত হয়।

ছাত্র হত্যার সংবাদ আইনসভায় পৌঁছলে বিরোধী দলের এমএলএগণ এই জঘন্য ছাত্র হত্যার বিচার দাবি করেন। মুখ্যমন্ত্রী উত্তরে বলেন, "এ হলো কল্পনাবিলাসী গল্প।" তিনি আরো বলেন, "পুলিশ ঠিকই করেছে... উচ্ছৃঙ্খলতা

দমনের জন্য পুলিশ। এর পিছনে কমিউনিস্টদের উস্কানি আছে। তাদের নির্মূল করবই।" পরিষদ সদস্য মওলানা তর্কবাগীশ ছাত্র হত্যার প্রতিবাদ জানিয়ে আইনসভা মুলতবির দাবি করেন। ছাত্র হত্যার সংবাদ শুনে শেরেবাংলা এ কে ফজলুল হক তার ভাগিনা সৈয়দ আজিজুল হক নান্না মিয়াকে নিয়ে মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে উপস্থিত হলেন এবং তীব্র ভাষায় ছাত্র হত্যার প্রতিবাদ জানান। ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ ঘোষণা করে ২২ ফেব্রুয়ারি জানাজা অনুষ্ঠিত হবে। ছাত্র হত্যার প্রতিবাদে আইনসভার সদস্য মওলানা তর্কবাগীশ, আনোয়ারা বেগম, আবুল কালাম শামসুদ্দিন, খয়রাত হোসেন মুসলিম লীগ ত্যাগ করে মেডিক্যাল কলেজে ছুটে আসেন এবং ছাত্র হত্যার প্রতিবাদ জানান। ২১ ফেব্রুয়ারি রাতের অন্ধকারে পুলিশ জব্বার, বরকত, রফিকের লাশ নিয়ে যায় এবং সরকারের নির্দেশে তাদের আজিমপুর গোরস্তানে দাফন করা হয়। ২২ ফেব্রুয়ারি ছাত্রজনতা মেডিক্যাল কলেজে সমবেত হয়। কিন্তু লাশ নেই। তারা গায়েবি জানাজা পড়ে মিছিল করে নবাবপুরের দিকে যাচ্ছে। জব্বার, রফিক, বরকতের রক্তমাখা কাপড় নিয়ে ছাত্ররা মিছিল করছে। হাইকোর্টের নিকট হঠাৎ পুলিশ গুলিবর্ষণ করলে শফিকুর রহমান গুলিবিদ্ধ হয়ে মারা যায়। ২১ ও ২২ ফেব্রুয়ারি পুলিশের গুলিতে ১৯ জন নিহত ও অনেকে আহত হয়। ২২ ফেব্রুয়ারি মেডিক্যাল কলেজে শোকসভা অনুষ্ঠিত হয়। জানাজা ও শোকসভায় এ কে ফজলুল হক উপস্থিত ছিলেন। ২২ ফেব্রুয়ারি রাতে জব্বার, রফিক, বরকত ও শফিকের স্মরণে মেডিক্যাল কলেজের সামনে শহীদ মিনার নির্মিত হয় এবং তা শহীদ শফিকের বাবাকে দিয়ে উন্মোচন করা হয়। ২৩ ফেব্রুয়ারি আন্দোলন, মিছিল, সভা চলে। সারা দেশে আন্দোলন ছড়িয়ে পড়ে। পুলিশ শত শত ছাত্র-জনতা গ্রেফতার করে। আন্দোলনের নেতৃত্বে ছিলেন আওয়ামী মুসলিম লীগ, ছাত্রলীগ ও যুবলীগ। কমিউনিস্ট ও তমদ্দুন মজলিস ভাষা আন্দোলনে অংশ নেয়। আইনসভার সদস্য মওলানা আব্দুর রশীদ তর্কবাগীশ, আনোয়ারা বেগম ও কংগ্রেস সদস্যগণ আন্দোলনে অংশ নেন। তাদের অংশগ্রহণ আন্দোলনকে বেগবান করে। নূরুল আমিন সরকারের আইনসভার সদস্য মওলানা তর্কবাগীশ ও খয়রাত হোসেনকে গ্রেফতার করে। ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের নেতৃবৃন্দ ধরা পড়েন। আওয়ামী মুসলিম লীগের শামসুল হক, কেজি মাহবুব আত্মগোপন করেন। তোয়াহা, অলি আহাদ, মজিবুল হক, শামসুল আলম গ্রেফতার হন। এ সময় মওলানা ভাসানী সন্তোষে অবস্থান করছিলেন এবং হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী তখন সিন্ধু প্রদেশে। ২১ ফেব্রুয়ারি গুলির সংবাদ পেয়ে সোহরাওয়ার্দী পত্রিকায় বিবৃতি দেন। তাঁর বিবৃতি সমালোচিত

হয়। তিনি প্রকৃত অবস্থান জানতেন না। তিনি ঢাকা এসে সব ঘটনা জানতে পারেন। বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার জন্য সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা কর্মপরিষদ স্বাক্ষর অভিযান শুরু করে। তাতে হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী ১৯৫২ সালের ৭ জুন স্বাক্ষর দান করেন। ২১ ফেব্রুয়ারির আন্দোলন ফেব্রুয়ারি মাসেই স্তিমিত হয়ে যায়। সারা বাংলায় মুসলিম লীগ সরকারের নিপীড়ন ও নির্যাতন চলতে থাকে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ হয়ে যায়। ছাত্ররা গ্রামে চলে যায়। গ্রামে গ্রামে ভাষা আন্দোলন ছড়িয়ে পড়ে। ২৪ ফেব্রুয়ারি থেকে ঢাকায় ভাষা আন্দোলন বন্ধ হয়ে যায়। কিন্তু গ্রামবাংলায় আন্দোলন চলতে থাকে।

১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলনের নেতৃবৃন্দ মার্চ মাসের প্রথম সপ্তাহে ঢাকার একটি পরিত্যক্ত বাড়িতে গ্রেফতার হন। অবশিষ্ট নেতারা আত্মগোপন করেন। ভাষা আন্দোলনে যারা গ্রেফতার হয়েছিলেন তাদের মধ্যে ছিলেন আওয়ামী মুসলিম লীগের সভাপতি মওলানা আব্দুল হামিদ খান ভাসানী, সাধারণ সম্পাদক শামসুল হক, কাজী গোলাম মাহবুব, খেলাফতে রব্বানী পার্টির আবুল হাশিম, যুবলীগের মুহাম্মদ তোয়াহা, অলি আহাদ, ছাত্রনেতা শামসুল আলম, আব্দুল মতিন, গাজীউল হক, এস এম হলের ভিপি মজিবুল হক, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক মুজাফফর আহমদ চৌধুরী, অধ্যাপক মুনীর চৌধুরী, অধ্যাপক অজিত গুহ প্রমুখ। আইনসভার সদস্য মওলানা আব্দুর রশীদ তর্কবাগীশ, খয়রাত হোসেন দীর্ঘদিন কারাবন্দী ছিলেন। জেল থেকে কয়েকজন মুক্তি পান; কিন্তু অনেকেই দীর্ঘদিন কারা নির্যাতন ভোগ করেন। শামসুল হক অসুস্থ হয়ে পড়লে তার স্ত্রী আফিয়া তার দু'শিশুকন্যাকে নিয়ে মুখ্যমন্ত্রী নুরুল আমিনের সাথে দেখা করে স্বামীর মুক্তি কামনা করেন। কিন্তু নূরুল আমিন তাকে মুক্তি দেননি। আওয়ামী লীগের সম্পাদক সরকারের নির্যাতনের ফলে মানসিক ভারসাম্য হারিয়ে ফেলেন। তার মুক্তির জন্য মুখ্যমন্ত্রীর নিকট বার বার অনুরোধ করা হয়। কিন্তু নুরুল আমিন তাকে মুক্তি দিলেন না। তিনি যখন মুক্তি পেলেন, তখন তিনি সম্পূর্ণ অসুস্থ। হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী তার চিকিৎসার জন্য চেষ্টা করেন। কিন্তু তিনি আর আরোগ্য লাভ করেননি। ১৯৭০ সালের পর তিনি হারিয়ে যান। তাকে আর দেখা যায়নি। আওয়ামী লীগের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা শামসুল হক অকালে বাংলার রাজনীতি থেকে বিদায় নিলেন নীরবে, নিভৃতে। মুসলিম লীগ ও মুখ্যমন্ত্রী নুরুল আমিন তাকে হত্যা করেছে।

১৯৫২ সালে নুরুল আমিন ভাষা আন্দোলনে শুধু ছাত্রদেরই হত্যা করেননি। তিনি বিরোধী রাজনৈতিক দলের অন্যতম স্রষ্টা শামসুল হককেও ধ্বংস করেছেন। ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলন ছাত্রদের ওপর পুলিশের

গুলিবর্ষণ ও হত্যা সম্পর্কে তদন্তের জন্য বিচারপতি এলিসকে নিয়োগ করা হয়। জাস্টিস এলিস তদন্তপূর্বক পুলিশের গুলিবর্ষণ সঠিক হয়েছে বলে রিপোর্ট দাখিল করেন।

১৯৫২ সালের শহীদদের স্মরণে অনেক গান, কবিতা, প্রবন্ধ ও গল্প রচিত হয়। এ গানগুলোর মধ্যে বরিশালের আবদুল গাফ্ফার চৌধুরীর লেখা একুশে ফেব্রুয়ারি, আবদুল লতিফের লেখা 'ওরা আমার মায়ের ভাষা কাইড়া নিতে চায়', ওবায়দুল্লাহ খানের কবিতা এবং আশরাফ আলীর লেখা প্রবন্ধ বাঙলার জনজীবনে সাড়া জাগিয়েছিল। আবদুল গাফ্ফার চৌধুরী বায়ান্নর ভাষা আন্দোলনে যোগ দেন এবং ২১ ফেব্রুয়ারি আহত হন। ২১ ফেব্রুয়ারির পরপরই তিনি একুশের গান রচনা করেন এবং আব্দুল লতিফ তার লেখা গানে প্রথমে সুর দেন এবং ১৯৫৩ সালে তার লেখা গানটি প্রভাতফেরিতে গাওয়া হয়। মঠবাড়িয়ার প্রকৌশলী মোশাররফ উদ্দিনের লেখা একুশের গানটিও ১৯৫৩ সালের প্রভাতফেরিতে গাওয়া হয়। গাফ্ফার চৌধুরীর ২১ ফেব্রুয়ারির গানটিতে বরিশালের আলতাফ মাহমুদ সুর দেন এবং ১৯৫৭ সালে তা প্রভাতফেরিতে গীত হয়। আলতাফ মাহমুদের সুর দেয়া একুশের গান জনপ্রিয়তা লাভ করে এবং বর্তমানে আলতাফ মাহমুদের সুর দেয়া গানটি জাতীয়ভাবে স্বীকৃতিপ্রাপ্ত গান। একুশের গানের সুরকার আলতাফ মাহমুদকে ১৯৭১ সালে পাক বাহিনী নির্মমভাবে হত্যা করে।

১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলন মুসলিম লীগ সরকারকে জনগণ থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেয়। ভাষা আন্দোলন বাঙালি জাতীয়তাবাদের আন্দোলনের সূচনা করে এবং পাকিস্তান জন্মের ভিত্তি দ্বিজাতিতত্ত্বকে ভেঙে ফেলে। বায়ান্নর ভাষা আন্দোলনের পিচ্ছিল পথ বেয়ে ১৯৫৪ সালের যুক্তফ্রন্টের বিজয়, ১৯৬২, ১৯৬৪, ১৯৬৬ সালের ৬ দফা ও ১৯৬৯ সালের গণআন্দোলনের পথ বেয়ে ১৯৭০ সালের নির্বাচনে বিজয় এবং ১৯৭১ সালের সশস্ত্র যুদ্ধের মাধ্যমে বাংলাদেশ সৃষ্টি হয়।

মুসলিম লীগ ভাষা আন্দোলনকে ভারতের ও হিন্দু সম্প্রদায়ের ষড়যন্ত্র বলে আখ্যায়িত করে। ১৯৫২ সালের ২১ ও ২২ ফেব্রুয়ারি মওলানা আব্দুর রশীদ তর্কবাগীশ এমএলএ পূর্ব পাকিস্তান আইনসভায় দাঁড়িয়ে ছাত্র হত্যার প্রতিবাদ জানান। তখন সে মুহূর্তে পূর্ব বাংলার মুখ্যমন্ত্রী নুরুল আমিন নিহত ছাত্রদের প্রতি কোনো সহানুভূতি না জানিয়ে ভাষা আন্দোলনকারীদের কমিউনিস্ট, হিন্দু ও ভারতের দালাল হিসেবে আখ্যায়িত করেন। ২৪ ফেব্রুয়ারির পর ভাষা আন্দোলন ঢাকার স্তিমিত হয়ে পড়লেও জেলায়, মহকুমায় ও গ্রামাঞ্চলে ভাষা আন্দোলন

ছড়িয়ে পড়ে। গ্রামেগঞ্জে স্লোগান চলছে– রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই, মুখ্যমন্ত্রী নুরুল আমিনের ফাঁসি চাই। মুসলিম লীগ সরকার শত শত রাজনৈতিক নেতা ও ছাত্রদের নিরাপত্তা আইনে আটক করে। এ সঙ্কটকালে ভাষা আন্দোলন চালিয়ে যাওয়ার জন্য শেখ মুজিবের উদ্যোগে রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ পুনর্গঠন করা হয়। ১৯৫২ সালের ৭ মার্চ আওয়ামী মুসলিম লীগের সহ-সভাপতি আতাউর রহমানকে রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদের আহ্বায়ক করা হয়। ১৯৫২ সালের ২৭ এপ্রিল ঢাকা বার লাইব্রেরি হলে ভাষা আন্দোলনকারী ৫০০ ভাষাসৈনিকের সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। এ সভায় শেখ মুজিবুর রহমান ভাষণ দেন। এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে, ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলনের কৃতিত্ব যুবলীগসহ বামপন্থী দল দাবি করে। তাদের বক্তব্য, আওয়ামী লীগ ও ছাত্রলীগ ভাষা আন্দোলনের ডাক দিলেও তারা ২১ ফেব্রুয়ারির ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করতে অস্বীকার করেছিল। বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের আহ্বায়ক আব্দুল মতিন, গাজীউল হক, হাবিবুর রহমান, শামসুল আলম, এম আর আখতার মুকুল প্রমুখ নেতৃত্ব দিয়েছিলেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররা যখন ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করে রাস্তায় বেরিয়ে পড়েন তখন আওয়ামী মুসলিম লীগ পিছিয়ে ছিল না, তারাও সেদিন মিছিলে যোগ দেয় এবং ছাত্র হত্যার প্রতিবাদ জানায়। রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদের নেতৃবৃন্দ গ্রেফতারের পর ২৪ ফেব্রুয়ারি হতে আওয়ামী মুসলিম লীগ, ছাত্রলীগ রাষ্ট্রভাষা আন্দোলন চালিয়ে যায় এবং তাদের নেতৃত্বে ১৯৫৩ সালের ২১ ফেব্রুয়ারি ঢাকাসহ সারা প্রদেশে ব্যাপকভাবে শহীদ দিবস পালিত হয়।

হাসপাতালে থেকে শেখ মুজিব রাজনীতি করেন এ কারণে সরকার তাকে কারাগারে পাঠিয়ে দেয়। শেখ মুজিব ও মহিউদ্দিন ১৬ ফেব্রুয়ারি থেকে অনশন ধর্মঘট শুরু করবে। এ সংবাদ পেয়ে সরকার তাদের ফরিদপুর জেলে পাঠিয়ে দেয়।

ফরিদপুর জেলে তিনি ও মহিউদ্দিন অনশন শুরু করেন। জেলে বসে তারা ঢাকায় ছাত্র হত্যার সংবাদ পায়। তিনি ছাত্রহত্যা সম্পর্কে লিখেছেন, "মুসলিম লীগ সরকার এত বড় অপরিণামদর্শীতার কাজ করল। মাতৃভাষা আন্দোলনে পৃথিবীতে এই প্রথম বাঙালীরা রক্ত দিলো। দুনিয়ার কোথাও ভাষা আন্দোলন করার জন্য গুলি করে হত্যা করা হয় নাই।"

শেখ মুজিবুর রহমান ও বরিশালের মহিউদ্দিন আহমেদ ফরিদপুর জেলে তাদের মুক্তির দাবীতে অনশন করছেন। তারা শারীরিকভাবে খুবই দুর্বল হয়ে পড়েন। শেখ মুজিব অনশন সম্পর্কে বলেন,

"২৭ তারিখ রাত আটটার সময় আমরা দুইজন চুপচাপ শুয়ে আছি। কারও সাথে কথা বলার ইচ্ছাও নাই, শক্তিও নাই। দুইজনেই শুয়ে শুয়ে কয়েদির

সাহায্যে ওজু করে খোদার কাছে মাপ চেয়ে নিয়েছি। দরজা খুলে বাইরে থেকে ডেপুটি জেলার এসে আমার কাছে বসলেন এবং বললেন, "আপনাকে যদি মুক্তি দেওয়া হয়, তবে খাবেন তো?" বললাম, "মুক্তি দিলে খাব, না দিলে খাব না। তবে আমার লাশ মুক্তি পেয়ে যাবে।" ডাক্তার সাহেব এবং আরও কয়েকজন কর্মচারী এসে গেছে চেয়ে দেখলাম। ডেপুটি জেলার সাহেব বললেন, "আমি পড়ে শোনাই, আপনার মুক্তির অর্ডার এসে গেছে রেডিওগ্রামে এবং জেলা ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবের অফিস থেকেও অর্ডার এসেছে। দুইটা অর্ডার পেয়েছি।" তিনি পড়ে শোনালেন, "আমি বিশ্বাস করতে চাইলাম না। মহিউদ্দিন শুয়ে শুয়ে অর্ডারটা দেখল এবং বলল যে, তোমার অর্ডার এসেছে।"

শেখ মুজিবুর রহমান ২৭ ফেব্রুয়ারি ফরিদপুর জেল মুক্তি পান। পিতা শেখ লুৎফর রহমান এবং এক বিশাল জনতা তাকে সংবর্ধনা জানায়। শেখ মুজিব পিতার সাথে টুঙ্গিপাড়ার উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন। "পাঁচ দিন পর বাড়ি পৌঁছালাম। মাকে তো বোঝানো কষ্টকর।" হাচু আমার গলা ধরে প্রথমেই বলল, "আব্বা রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই, রাজবন্দিদের মুক্তি চাই।" ২১শে ফেব্রুয়ারি ওরা ঢাকায় ছিল, যা শুনেছে তাই বলে চলেছে। কামাল আমার কাছে আসল না, তবে আমার দিকে চেয়ে রইল।"

"একদিন সকালে আমি ও রেণু বিছানায় বসে গল্প করছিলাম। হাচু ও কামাল নিচে খেলছিল। হাচু মাঝে মাঝে খেলা ফেলে আমার কাছে আসে আর 'আব্বা' 'আব্বা' বলে ডাকে। কামাল চেয়ে থাকে। একসময় কামাল হাসিনাকে বলছে, "হাসু আপা, হাসু আপা, তোমার আব্বাকে আমি একটু আব্বা বলি।" আমি আর রেণু দু'জনই শুনলাম। আস্তে আস্তে বিছানা থেকে উঠে যেয়ে ওকে কোলে নিয়ে বললাম, "আমি তো তোমার ও আব্বা।" কামাল আমার কাছে আসতে চাইত না। আজ গলা ধরে পড়ে রইল। বুঝতে পারলাম, এখন আরও সহ্য করতে পারছে না। নিজের ছেলেও অনেক দিন না দেখলে ভুলে যায়! আমি যখন জেলে যাই তখন ওর বয়স মাত্র কয়েক মাস। রাজনৈতিক কারণে একজনকে বিনা বিচারে বন্দি করে রাখা আর তার আত্মীয়স্বজন ছেলেমেয়েদের কাছ থেকে দূরে রাখা যে কত বড় জঘন্য কাজ তা কে বুঝবে? মানুষ স্বার্থের জন্য অন্ধ হয়ে যায়। আজ দুইশত বৎসর পরে আমরা স্বাধীন হয়েছি। সামান্য হলেও কিছুটা আন্দোলনও করেছি স্বাধীনতার জন্য। ভাগ্যের নিষ্ঠুর পরিহাস আজ আমাকেও আমার সহকর্মীদের বছরের পর বছর জেল খাটতে হচ্ছে। আরও কতকাল খাটতে হয়, কেইবা জানে? একেই কি বলে স্বাধীনতা? ভয় আমি পাই না, আর মনও শক্ত হয়েছে। যে পাকিস্তানের স্বপ্ন দেখেছিলাম, সেই পাকিস্তানই করতে হবে, মনে মনে প্রতিজ্ঞা করলাম।" ১৯৫২ সালের পুরো মার্চ মাস শেখ মুজিব টুঙ্গীপাড়ায় ছিলেন।

এ সময় মানিক মিয়ার চিঠি পেয়ে এপ্রিল মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহে গোপালগঞ্জ হতে শেখ মুজিবুর রহমান ঢাকায় আসেন। শামসুল হক সাহেব আওয়ামী লীগ অফিস নবাবপুরে নিয়েছেন। ১৫০ নম্বর মোগলটুলিতে না থেকে তিনি আবদুল হামিদ চৌধুরী ও মোল্লা জামালউদ্দিনের তাতী বাজারে থাকলেন। মওলানা ভাসানী ও শামসুল হক জেলে। তাই শেখ মুজিব ওয়ার্কিং কমিটির সভা ডাকেন। সভায় তাকে ভারপ্রাপ্ত সেক্রেটারী করা হয়। আওয়ামী লীগ অফিসে কামরুজ্জামান ও শেখ মুজিব বসেন। এ সময় এডভোকেট মোহাম্মদ উল্লাহ আওয়ামী লীগের অফিস সেক্রেটারী। শেখ মুজিব জেলা কমিটি গঠন করার উদ্যোগ গ্রহণ করেন। ইতিমধ্যে সভায় সিদ্ধান্ত হল– শেখ মুজিবকে করাচী যেতে হবে গভর্নর জেনারেলের সাথে বন্দী মুক্তি ও সোহরাওয়ার্দীর সাথে আলোচনা করতে। "আমরা এক আলোচনা সভা করলাম, তাতে ঠিক হল আমাকে করাচি যেতে হবে। পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী খাজা নাজিমুদ্দীনের সাক্ষাৎ করে রাজবন্দিদের মুক্তির দাবি করতে হবে। শহীদ সাহেবের সাথেও আলাপ-আলোচনা করা দরকার। তাঁর সাহায্য আমাদের খুব প্রয়োজন।

শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৫২ সালের জুন মাসে করাচী গমন করেন। তিনি করাচী আওয়ামী-মুসলিম লীগের সভাপতি মাহমুদুল হক ওসমানীর বাসভবনে ওঠেন। করাচী আওয়ামী লীগের বাঙালি কর্মী আমানুল্লাহ শেখ মুজিবকে সহায়তা করেন। এ সময় হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী সিন্ধুর রাজধানী হায়দরাবাদ কোর্টে পিন্ডি ষড়যন্ত্র মামলা পরিচালনা করছিলেন। শেখ মুজিব গভর্নর জেনারেল খাজা নাযিমুদ্দিনের সাথে সাক্ষাত করেন। তার সাক্ষাত সম্পর্কে যে বর্ণনা দেন তা নিম্নে উদ্ধৃত হলো :

"আমি যথাসময়ে প্রধানমন্ত্রী খাজা সাহেবের সাথে দেখা করতে তাঁর অফিসে হাজির হলাম। প্রধানমন্ত্রী এ্যাসিসট্যাট সেক্রেটারি মিস্টার সাজেদ আলী আমাকে অভ্যর্থনা করলেন। তাঁকে আমি পূর্ব থেকে জানতাম, তিনি কলকাতার বাসিন্দা পূর্বে তিনি পূর্ব পাকিস্তান প্রধানমন্ত্রীর পিএ ছিলেন। আমাকে নিয়ে বসালেন তাঁর কামরায়। আমার জন্য বিশ মিনিট সময় ধার্য করেছিলেন প্রধানমন্ত্রী। আমাকে খাজা সাহেব তাঁর কামরায় নিজে এগিয়ে এসে নিয়ে বসালেন। যথেষ্ট ভদ্রতা করলেন, আমার শরীর কেমন? আমি কেমন আছি, কতদিন থাকব– এইসব জিজ্ঞাস কররেন। তিনিও জানতেন, ব্যক্তিগতভাবে তাঁকে আমি শ্রদ্ধা করি। আমি যে একজন ভাল কর্মী সে কথা তিনি নিজেই স্বীকার করতেন এবং আমাকে স্নেহও করতেন। আমি তাঁকে অনুরোধ করলাম, "মাওলানা ভাসানী, শামসুল হক, আবুল হাশিম, মাওলানা তর্কবাগীশ, খয়রাত হোসেন, খান সাহেব ওসমান আলীসহ

সমস্ত কর্মীকে মুক্তি দিতে। আরও বললাম, জুডিশিয়াল ইনকোয়ারি বসাতে, কেন গুলি করে ছাত্রদের হত্যা করা হয়েছিল?" তিনি বললেন, "এটা প্রাদেশিক সরকারের হাতে, আমি কি করতে পারি?" আমি বললাম, "আপনি মুসলিম লীগ সরকারের প্রধানমন্ত্রী, আর পূর্ব বাংলায়ও মুসলিম লীগ সরকার, আপনি তাদের নিশ্চয়ই বলতে পারেন। আপনি তো চান না যে দেশে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হোক, আর আমরাও তা চাই না। আমি করাচি পর্যন্ত এসেছি আপনার সাথে দেখা করতে, এ জন্য যে প্রাদেশিক সরকারের কাছে দাবি করে কিছুই হবে না। তারা যে অন্যায় করেছে সেই অন্যায়কে ঢাকবার জন্য আরও অন্যায় করে চলেছে।" তিনি বিশ মিনিটের জায়গায় আমাকে এক ঘণ্টা সময় দিলেন। আমি তাঁকে বললাম যে, "আওয়ামী লীগ বিরোধী পার্টি। তাকে কাজ করতে সুযোগ দেওয়া উচিত। বিরোধী দল না থাকলে গণতন্ত্র চলতে পারে না। আপনি গণতন্ত্রে বিশ্বাস করেন, তা আমি জানি।" তিনি স্বীকার করলেন, আওয়ামী লীগ সরকারবিরোধী রাজনৈতিক দল। আমি তাঁকে বললাম, "আওয়ামী লীগ বিরোধী দল আপনি স্বীকার করে নিয়েছেন, একথা আমি খবরের কাগজে দিতে পারি কি না?" তিনি বললেন, "নিশ্চয়ই দিতে পার।" তিনি আমাকে বললেন, প্রদেশের কোন কাজে তিনি হস্তক্ষেপ করেন না, তবে তিনি চেষ্টা করে দেখবেন কি করতে পারেন। আমি তাঁকে আদাব করে বিদায় নিলাম। তিনি যে আমার কথা ধৈর্য ধরে শুনেছেন এ জন্য তাঁর কাছে আমি কৃতজ্ঞ। দুই দিন পরে প্রেস কনফারেন্স করলাম। আমার লেখা বিবৃতি পাঠ করার পরে প্রেস প্রতিনিধিরা আমাকে প্রশ্ন করতে শুরু করলেন, অনেক প্রশ্নই আমাকে করলেন। আমি তাদের প্রশ্নের সন্তোষজনক উত্তর দিতে পেরেছিলাম এবং পূর্ব বাংলার অবস্থা তাদের বুঝিয়ে বলতে পেরেছিলাম। এখানে এক প্রশ্নের উত্তরে তাদের বলেছিলাম, "প্রায় ত্রিশটা উপনির্বাচন বন্ধ করে রাখা হয়েছে। যে কোন একটায় ইলেকশন হোক, আমরা মুসলিম লীগ প্রার্থীকে শোচনীয়ভাবে পরাজিত করতে সক্ষম হব।"

হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী ১৯৫০ সালে পাকিস্তান আওয়ামী-মুসলিম লীগ গঠন করেন। কিন্তু ১৯৫১ সালে পাঞ্জাবের প্রাদেশিক নির্বাচনকালে মামদৌতের নওয়াবের জিন্নাহ লীগের সাথে অন্তর্ভুক্ত হয়ে তার দল বিলুপ্ত করে। শেখ মুজিবুর রহমানের অনুরোধে হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী ১৯৫২ সালে পাকিস্তান আওয়ামী মুসলিম লীগ পুনরায় প্রতিষ্ঠা করেন। করাচী সফরকালে শেখমুজিব সোহরাওয়ার্দীকে বলেন, "আপনি জিন্নাহ আওয়ামী লীগ করেছেন, আমরা নাম পরিবর্তন করতে পারব না। কোনো ব্যক্তির নাম রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানের সাথে যোগ করতে চাই না। দ্বিতীয়ত আমাদের ম্যানিফেস্টো আছে, গঠনতন্ত্র আছে,

তার পরিবর্তন করা সম্ভবপর নয়। মওলানা ভাসানী সাহেব আমাকে ১৯৪৯ সালে আপনার কাছে পাঠিয়েছিলেন। তখনও তিনি নিখিল পাকিস্তান আওয়ামী লীগ গঠনের জন্য অনুরোধ করেছিলেন। তাঁরও কোনো আপত্তি থাকবেনা, যদি আপনি পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের ম্যানিফেস্টো ও গঠনতন্ত্র মেনে নেন।'

অনেক আলোচনার পরে তিনি মানতে রাজি হলেন এবং নিজ হাতে তাঁর সম্মতির কথা লিখে দিলেন। কারণ, আমাকে ফিরে যেয়ে ওয়ার্কিং কমিটির সভায় তা পাস করিয়ে এফিলিয়েশনের জন্য দরখাস্ত করতে হবে। আমি বললাম, "আপনার হাতে লেখা থাকলে কেউই আর আপত্তি করবে না। মওলানা সাহেবের সাথে জেলে আমার কথা হয়েছিল। তাতে আমাদের ম্যানিফেস্টো, নাম ও গঠনতন্ত্র মেনে নিলে এফিলিয়েশন নিতে তাঁর আপত্তি নাই।" আমি আর একটা অনুরোধ করলাম, তাঁকে লিখে দিতে হবে যে, উর্দু ও বাংলা দুইটাকেই রাষ্ট্রভাষা হিসেবে তিনি সমর্থন করেন। কারণ অনেক ভুল বোঝাবুঝি হয়ে গেছে। মুসলিম লীগ এবং তথাকথিত প্রগতিবাদীরা প্রপাগান্ডা করছেন তাঁর বিরুদ্ধে। তিনি বললেন, 'নিশ্চয়ই লিখে দেব, এটা তো আমার নীতি ও বিশ্বাস।' তিনি লিখে দিলেন।"

শেখ মুজিবুর রহমানের লাহোরে ঐতিহাসিক সাংবাদিক সম্মেলন-১৯৫২

পশ্চিম পাকিস্তানে সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হলেও মুসলিম লীগ সরকার পূর্ব পাকিস্তানে সাধারণ নির্বাচন বিলম্বিত করে। নির্বাচন অনুষ্ঠানের দাবি জানিয়ে শেখ মুজিবুর রহমান পাকিস্তানের গভর্নর জেনারেলের নিকট স্মারকলিপি প্রদান করেন এবং লাহোরে সাংবাদিক সম্মেলনে ভাষণ দেন।

১৯৫২ সালের ১৪ জুন পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী মুসলিম লীগের ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক শেখ মুজিবুর রহমান লাহোরে অনুষ্ঠিত সাংবাদিক সম্মেলনে ইংরেজিতে ভাষণ দেন।

১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলনের পর ভারত-পাকিস্তানের মধ্যে অবাধ যাতায়াত নিয়ন্ত্রণের উদ্দেশে পাসপোর্ট-ভিসা প্রবর্তন করা হয়। মুসলিম লীগ সরকার ১৯৫২ সালের সেপ্টেম্বর-অক্টোবর মাসে ঘোষণা করে– যে সকল কমিউনিস্ট রাজবন্দী পাকিস্তান ত্যাগ করে ভারতে চলে যেতে চায় তাদের অনুমতি দেয়া হবে। এ সময় প্রায় ১৫ হাজার দেশপ্রেমিক কমিউনিস্ট পার্টির নেতাকর্মী পূর্ব বাংলা ত্যাগ করে ভারতে আশ্রয় নেয়। ফলে পূর্ব বাংলার শিক্ষা সংস্কৃতি ও রাজনীতি অঙ্গনে স্থবিরতা সৃষ্টি হয়। শেখ মুজিবুর রহমান পূর্ব বাংলায় শান্তি মিশনের নেতা ছিলেন।

শান্তি মিশন ১৯৫২

শেখ মুজিব পূর্ব পাকিস্তান শান্তি কমিটিতে যোগদেন। কমিটির সভাপতি ছিলেন আতাউর রহমান খান। শান্তি কমিটির আহ্বান ছিল, 'আমরা যুদ্ধ চাই না, শান্তি চাই'। চীনের রাজনীতি পিকিংএ ১৯৫২ সালের সেপ্টেম্বর মাসে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া ও প্রশান্ত মহাসগারীয় দেশসমূহের প্রতিনিধিরা শান্তি সম্মেলনে যোগদান করবে। পাকিস্তান থেকে ত্রিশজন যাবে। পূর্ব পাকিস্তান থেকে মাত্র পাঁচজন– তারা হলেন আতাউর রহমান খান, তফাজ্জল হোসেন মানিক মিয়া, শেখ মুজিবুর রহমান, খন্দকার ইলিয়াস এবং উর্দু লেখক ইবনে হাসান। যুদ্ধ চাই না– শান্তি চাই। চীন যাওয়ার পথে বিমান রেঙ্গুনে অবস্থান করেন। শান্তি কমিটির প্রতিনিধিরা রেঙ্গুন শহর ঘুরে দেখে। রেঙ্গুন থেকে ব্যাংকক, হংকং এবং ২৭ সেপ্টেম্বর ক্যান্টন পৌঁছেন। ১ অক্টোবর চীনের তৃতীয় স্বাধীনতা দিবস। শান্তি সম্মেলন শুরু হয় পিকিং শহরে ৩৭৮ জন প্রতিনিধি সম্মেলন যোগ দেন। ১১ দিন শান্তি কমিটির সম্মেলন শেষে তিনি ফিরে আসেন। চীনে তিনি কম্যুনিস্ট পার্টির নেতা মাওসেতুং-এর সাথে দেখা করেন। চীন সফর সম্পর্কে তার মূল্যায়ন হল– "আমি নিজে কমিউনিস্ট নই। তবে সমাজতন্ত্রে বিশ্বাস করি এবং পুঁজিবাদী অর্থনীতিতে বিশ্বাস করি না। একে আমি শোষণের যন্ত্র হিসাবে মনে করি। এই পুঁজিপতি সৃষ্টির অর্থনীতি যতদিন দুনিয়ায় থাকবে ততদিন দুনিয়ার মানুষের উপর থেকে শোষণ বন্ধ হতে পারে না। পুঁজিপতিরা নিজেদের স্বার্থে বিশ্বযুদ্ধ লাগাতে বদ্ধপরিকর। নতুন স্বাধীনতাপ্রাপ্ত জনগণের কর্তব্য বিশ্বশান্তির জন্য সংঘবদ্ধভাবে চেষ্টা করা। যুগ যুগ ধরে পরাধীনতার শৃঙ্খলে যারা আবদ্ধ ছিল, সাম্রাজ্যবাদী শক্তি যাদের সর্বস্ব লুট করেছে তাদের প্রয়োজন নিজের দেশকে গড়া ও জনগণের অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিক মুক্তির দিকে সর্বশক্তি নিয়োগ করা। বিশ্বশান্তির জন্য জনমত সৃষ্টি করা তাই প্রয়োজন হয়ে পড়েছে।"

১৯৫২ সালে শেখ মুজিব চীনের রাজধানী বেইজিংয়ে অনুষ্ঠিত শান্তি সম্মেলনে যোগ দেন। তিনি চীনের কমিউনিস্ট পার্টির নেতা মাও সে-তুং ও প্রধানমন্ত্রী চৌ এন লাইয়ের সাথে সাক্ষাৎ করেন। বিশ্বের অন্যতম কমিউনিস্ট নেতা ও কমিউনিস্ট চিন্তাবিদদের সাথে শেখ মুজিব মাত্র ৩২ বছর বয়সে সাক্ষাৎ করার সৌভাগ্য লাভ করেন। তার পূর্বে পাকিস্তানের কোনো নেতা চীন সফর করেনি। চীনের সাথে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক সৃষ্টিতে শেখ মুজিব ১৯৫২ সালে শুভ সূচনা করেছিলেন।

১৯৫২ সালে পাকিস্তানের পাঞ্জাবের জামায়াতে ইসলামীর নেতৃত্বে কাদিয়ানীদের বিরুদ্ধে দাঙ্গা শুরু হয়। পাঞ্জাবের মুখ্যমন্ত্রী মমতাজ দৌলতানার

ইঙ্গিতে জামায়াত কাদিয়ানীদের ওপর আক্রমণ চালায় এবং শত শত কাদিয়ানীকে হত্যা করে। মেজর জেনারেল আজম খান কঠোরহস্তে দাঙ্গা দমন করেন। মুসলিম লীগ মওলানা মওদুদীকে মৃত্যুদণ্ডাদেশ প্রদান করে। মুখ্যমন্ত্রী মমতাজ দৌলতানাকে পদচ্যুত করে তার স্থলে পূর্ববঙ্গের গভর্নর ফিরোজ খান নূনকে পাঞ্জাবের মুখ্যমন্ত্রী নিয়োগ করা হয়। ফিরোজ খানের স্থলে মুসলিম লীগের সভাপতি চৌধুরী খালেকুজ্জামান পূর্ব বাংলার গভর্নর নিযুক্ত হন।

১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলনের পর মুসলিম ছাত্রলীগ বিভক্ত হয়ে পড়ে। বামপন্থী ছাত্রদের সাথে ছাত্র ফেডারেশন যোগ দেয়। কমিউনিস্ট পার্টির সমর্থক হিসেবে ছাত্র ইউনিয়ন সৃষ্টি হয়। ১৯৫২ সালের ডিসেম্বর মাসে মুহাম্মদ সুলতানকে সভাপতি ও মুহাম্মদ ইলিয়াসকে সম্পাদক করে পূর্ব পাকিস্তান ছাত্র ইউনিয়ন গঠন করা হয়।

১৯৫১ সালে যুবলীগ এবং ১৯৫২ সালে ছাত্র ইউনিয়ন প্রতিষ্ঠার ফলে একটি বামপন্থী রাজনৈতিক দল গঠনের পটভূমি সৃষ্টি হয়। ১৯৫৩ সালের ১৭ জানুয়ারি গণতন্ত্রী দল গঠিত হয়। গণতন্ত্রী দলের প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি হলেন দিনাজপুরের কৃষক নেতা হাজী মুহাম্মদ দানেশ এবং সহ-সভাপতি ছিলেন মহিউদ্দিন আহমদ। সিলেটের মাহমুদ আলীকে সম্পাদক এবং আব্দুর রব সেরনিয়াবাতকে যুগ্ম সম্পাদক করে কমিটি গঠন করা হয়। মাহমুদ আলীর স্থলে যুবলীগের সভাপতি হলেন মুহাম্মদ তোয়াহা। ১৯৫৩ সালে একুশে ফেব্রুয়ারি ব্যাপকভাবে পালিত হয়। ছাত্র-জনতা ঢাকা মেডিক্যাল কলেজের পাদদেশে সমবেত হয় এবং আব্দুল গাফ্ফার রচিত একুশের গান গাওয়া হয়। একুশে ফেব্রুয়ারির প্রভাতফেরিতে গাওয়া হয় প্রকৌশলী মোশাররফ উদ্দিন আহমদ রচিত একুশের গানটি। এ বছরই প্রকাশিত হয় হাফিজুর রহমান সম্পাদিত 'একুশে ফেব্রুয়ারি' সঙ্কলন। ১৯৫৩ সালের ভাষা আন্দোলনকারী অনেককে গ্রেফতার করা হয়।

১৯৫২-৫৩ সালে বিশ্ব ইতিহাসে উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন ঘটে। ১৯৫২ সালে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের সম্রাট ষষ্ঠ জর্জ প্রাণত্যাগ করেন এবং তার স্থলে তার জ্যেষ্ঠ কন্যা প্রিন্সেস এলিজাবেথ (দ্বিতীয়) সিংহাসনে আরোহণ করেন। ১৯৫২ সালে মিসরের রাজা ফারুককে সিংহাসনচ্যুত করে জেনারেল নাগিব ক্ষমতা দখল করেন। ১৯৫৩ সালে জেনারেল নাগিবকে বন্দী করে আব্দুল নাসের মিসরের রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা দখল করেন। সোভিয়েত রাশিয়ার প্রধানমন্ত্রী জোসেফ স্ট্যালিন ১৯৫৩ সালের ৫ মার্চ প্রাণত্যাগ করেন। তার মৃত্যুর পর ক্রুশ্চেভ রাশিয়ার প্রধানমন্ত্রী নিযুক্ত হন। ১৯৫১ সালে উত্তর কোরিয়া ও দক্ষিণ কোরিয়ার

মধ্যে যুদ্ধ শুরু হয় এবং তা কয়েক বছরব্যাপী চলে। কোরিয়ায় যুদ্ধকালে পাটের দাম বৃদ্ধি পায় এবং পূর্ব বাংলার পাটচাষীরা পাট রপ্তানি করে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করেন। কিন্তু তা পশ্চিম পাকিস্তানের শিল্প প্রতিষ্ঠায় ব্যয় করা হয়। তাই দেখা যায় ১৯৫২ সালের পর থেকে অর্থনৈতিক উন্নয়নে পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যে বৈষম্য সৃষ্টি হতে থাকে। বাঙালিদের পাটের পয়সা দিয়ে পশ্চিম পাকিস্তানে বস্ত্রশিল্প প্রতিষ্ঠিত হয় এবং পরবর্তীতে পশ্চিম পাকিস্তানের ২২ পরিবার পাকিস্তানের অর্থনীতিতে একচেটিয়া আধিপত্য বিস্তার করে। কোরিয়ায় যুদ্ধ বন্ধ হলে পাটের দাম দ্রুত হ্রাস পায় এবং পাটচাষীরা ক্ষতিগ্রস্ত হন। মুসলিম লীগ সরকারের জনপ্রিয়তা পূর্ব পাকিস্তানে হ্রাস পায়।

প্রধানমন্ত্রী লিয়াকত আলী খানের হত্যার মাধ্যমে পাকিস্তানে যে ষড়যন্ত্রের রাজনীতি শুরু হয় তা আমলাদের নেতৃত্বে চলতে থাকে। ১৯৫১-৫২ সালে পাকিস্তানে খাদ্য সঙ্কট দেখা দেয়। আমেরিকা পাকিস্তানকে খাদ্য ও অস্ত্র সাহায্যে দেয়। বগুড়ার মুহাম্মদ আলী তখন আমেরিকায় পাকিস্তানের রাষ্ট্রদূত। গভর্নর জেনারেল গোলাম মুহাম্মদ, প্রধান সেনাপতি জেনারেল আইয়ুব খান এবং রাষ্ট্রদূত মুহাম্মদ আলীর মাধ্যমে পাকিস্তান-আমেরিকা অস্ত্র সাহায্য চুক্তি সম্পাদন করে। গোলাম মুহাম্মদ পাকিস্তানে গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠান ধ্বংস করার জন্য ষড়যন্ত্র করেন। এদিকে মুসলিম লীগ পূর্ব বাংলায় অত্যন্ত দুর্বল হয়ে পড়ে। বিশেষ করে পূর্বাঞ্চলে খাজা নাযিমউদ্দিনের জনপ্রিয়তা ছিল না। মুসলিম লীগ জনবিচ্ছিন্ন একটি ঘৃণিত দলে পরিণত হয়। এ সুযোগে ১৯৫৩ সালের ১৭ এপ্রিল গভর্নর জেনারেল গোলাম মুহাম্মদ খাজা নাযিমউদ্দিনকে প্রধানমন্ত্রীর পদ থেকে পদচ্যুত করেন। গোলাম মোহাম্মদের নেতৃত্বে পাকিস্তানের আমলারা গণতন্ত্রের বিরুদ্ধে প্রথম 'ক্যু' করে খাজা নাযিমউদ্দিনকে সরিয়ে দেয়। গোলাম মোহাম্মদের অগণতান্ত্রিক পদক্ষেপকে বিনা প্রতিবাদে মুসলিম লীগ গ্রহণ করে। ১৭ এপ্রিল পাকিস্তানের কোথাও প্রধানমন্ত্রী খাজা নাযিমউদ্দিনের পদচ্যুতির প্রতিবাদ হয়নি। পূর্ব পাকিস্তানে আনন্দের বন্যা বয়ে যায়। আওয়ামী লীগ ও ছাত্রলীগ খাজা নাযিমউদ্দিনের পতনকে তাদের বিজয় বলে চিহ্নিত করে। ১৯৫৩ সালের এপ্রিল মাসে মওলানা ভাসানীর সভাপতিত্বে আওয়ামী মুসলিম লীগের জনসভা চলছে। এ সভায় হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী ও শেখ মুজিব ভাষণ দেন এবং খাজা নাযিমউদ্দিনের পদচ্যুতিকে স্বাগত জানায়। খাজা নাযিমউদ্দিন চিরদিন হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর প্রতি শত্রুতা করেছেন। খাজা নাযিমউদ্দিনকে পদচ্যুত করার পিছনে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ইঙ্গিত ছিল এবং তাদের পরামর্শে রাষ্ট্রদূত মুহাম্মদ আলীকে গভর্নর জেনারেল পাকিস্তানের নতুন

প্রধানমন্ত্রী নিযুক্ত এবং তার অধীনে একটি মন্ত্রিসভা গঠন করেন। মন্ত্রিসভার সদস্যরা ছিলেন মুহাম্মদ আলী, স্যার জাফরুল্লাহ খান, এম এ গুরমানী, সর্দার বাহাদুর খান, ডা. এ এম মালেক, ডা. এইচ আই কোরেশী, এ কে ব্রোহী, এ কে খান, শোয়েব কোরেশী ও তোফাজ্জল আলী।

১৯৫৩ সালে পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম ছাত্রলীগের কাউন্সিল অধিবেশনে মুসলিম শব্দ বাদ দিয়ে সংগঠনটির পূর্ব পাকিস্তান ছাত্রলীগ নামকরণ করা হয়। অসাম্প্রদায়িক নামকরণ করায় ছাত্রলীগের জনপ্রিয়তা বৃদ্ধি পায়। এম কামরুজ্জামানকে সভাপতি এবং এম আবদুল ওয়াদুদকে সাধারণ সম্পাদক করে ১৯৫৩-৫৪ সালে পূর্ব পাকিস্তান ছাত্রলীগের কমিটি গঠন করা হয়।

১৯৫২ সালে শামসুল হক অসুস্থ হয়ে পড়লে মওলানা ভাসানী যুগ্ম সম্পাদক শেখ মুজিবুর রহমানকে সম্পাদকের চলতি দায়িত্ব প্রদান করেন। ১৯৫৩ সালে মওলানা ভাসানী জেল থেকে মুক্তিলাভ করেন। ঢাকার মুকুল সিনেমা হলে আওয়ামী মুসলিম লীগের প্রথম কাউন্সিল সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী ভাষণ দেন। সভায় মওলানা ভাসানীকে সভাপতি, মওলানা তর্কবাগীশ ও আতাউর রহমান খানকে সহসভাপতি এবং শেখ মুজিবকে সাধারণ সম্পাদক করে পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী মুসলিম লীগ গঠন করা হয়। ১৯৫১ সালে পশ্চিম পাকিস্তান প্রাদেশিক আইনসভার নির্বাচন সমাপ্ত হয়। পূর্ব পাকিস্তানের রাজনৈতিক দলগুলো পূর্ব বাংলা আইন পরিষদে নির্বাচন দাবি করে। ১৯৪৯ সালে টাঙ্গাইলের উপনির্বাচনে পরাজয়ের পর মুসলিম লীগ প্রায় ৩৬টি আসনে উপনির্বাচন ও সাধারণ নির্বাচন দিতে ভীত হয়ে পড়ে। শেষ পর্যন্ত মুসলিম লীগ সরকার ঘোষণা দেয় যে, ১৯৫৪ সালের ৭-১২ মার্চ সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী, মওলানা ভাসানী ও শেখ মুজিব বাংলার সকল জেলায়, মহকুমায় সফর করে আওয়ামী লীগকে জনপ্রিয় সংগঠনে পরিণত করেন।

হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর পুরনো মুসলিম লীগ কর্মী ও নেতারা দলে দলে আওয়ামী লীগে যোগ দিতে থাকে। ১৯৫০ সালের দাঙ্গা ও ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলনের পর বাঙালিদের রাজনৈতিক চিন্তাধারায় বিপ্লবী পরিবর্তন শুরু হয়। গণতন্ত্রী দল, যুবলীগ, ছাত্রলীগ সংগঠনগুলো শক্তিশালী হতে থাকে এবং আরো কয়েকটি রাজনৈতিক দল প্রতিষ্ঠা লাভ করে।

অধ্যায় ৭

যুক্তফ্রন্টের নির্বাচন-১৯৫৪

১৯৫৩ সালের ২৭ জুলাই একে ফজলুল হক কৃষক শ্রমিক পার্টি কেএসপি গঠন করেন। একে ফজলুল হককে সভাপতি এবং আবদুল লতিফ বিশ্বাসকে সম্পাদক করে কেএসপি গঠিত হয়।

মুসলিম লীগের সাবেক সম্পাদক আবুল হাশিম খেলাফতে রাব্বানী পার্টি গঠন করেন। ১৯৫৩ সালের শেষে কিশোরগঞ্জের মওলানা আতাহার আলী গঠন করেন নিজামে ইসলাম পার্টি। এছাড়া ছিল কংগ্রেস, তফসিলী ফেডারেশন, সোস্যালিস্ট পার্টি, গণতন্ত্রী দল। মুসলিম লীগ কমিউনিস্ট পার্টিকে ১৯৪৮ সালে বেআইনি ঘোষণা করে।

১৯৫৩ সালে ১৪-১৫ নভেম্বর ময়মনসিংহে মওলানা ভাসানীর নেতৃত্বে আওয়ামী মুসলিম লীগের কাউন্সিল অধিবেশন বসে। এ সভায় শেখ মুজিবুর রহমানকে আওয়ামী মুসলিম লীগের সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত করা হয়। ১৯৫৩ সালের ২৫ ডিসেম্বর সাপ্তাহিক ইত্তেফাক দৈনিক ইত্তেফাক হিসেবে প্রকাশিত হতে থাকে। সরকার ১৯৫৪ সালে সাধারণ নির্বাচন ঘোষণা করে। মওলানা ভাসানী ও শেখ মুজিবুর রহমান প্রথমে যুক্তফ্রন্ট গঠনের পক্ষে ছিলেন না। ছাত্র সমাজের চাপে সকল বিরোধী দল একত্রিত হয়ে যুক্তফ্রন্ট গঠন করে। একে ফজলুল হক, হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী এবং মওলানা ভাসানী ১৯৫৩ সালের ৪ ডিসেম্বর যুক্তফ্রন্ট গঠন করেন। আওয়ামী লীগের সহ-সভাপতি আবুল মনসুর আহমদের প্রণীত ২১ দফায় তিন নেতা স্বাক্ষর করেন। ১৯৫৩ সালের ৫ ডিসেম্বর ২১ দফা প্রকাশিত হয়।

ঐতিহাসিক ২১ দফা

১. লাহোর প্রস্তাবের ভিত্তিতে আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন।
২. বাংলাকে পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করতে হবে।
৩. নিরাপত্তা আইন বাতিল, সকল রাজবন্দীর মুক্তি।
৪. বিচার বিভাগকে প্রশাসন বিভাগ থেকে পৃথক করা।

৫. বিনা ক্ষতিপূরণে জমিদারী-মধ্যস্বত্ব প্রথা উচ্ছেদ।
৬. সমবায় কৃষি খামার ব্যবস্থা প্রবর্তন করা।
৭. পূর্ব বাংলাকে শিল্পায়িত করা। খাদ্যে স্বাবলম্বী করা।
৮. সেচ ব্যবস্থা উন্নয়ন। দেশকে বন্যা ও দুর্ভিক্ষ থেকে রক্ষা করা।
৯. পাট ব্যবসা জাতীয়করণ। ন্যায্যমূল্য প্রদান করা।
১০. পূর্ববঙ্গকে লবণ শিল্পে স্বয়ংসম্পূর্ণ করা। মুসলিম লীগ আমলে লবণ কেলেঙ্কারির শাস্তি প্রদান।
১১. অবিলম্বে মোহাজেরদের পুনর্বাসন করা।
১২. বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা প্রবর্তন। শিক্ষকদের উপযুক্ত বেতন ভাতার ব্যবস্থা করা।
১৩. সরকারি বেসরকারি বিদ্যালয়সমূহের পার্থক্য দূর করা। শিক্ষা ব্যবস্থার পুনর্বিন্যাস। শিক্ষার মাধ্যম হবে মাতৃভাষা।
১৪. শিক্ষাকে জনসাধারণের নিকট সহজলভ্য করা। ছাত্রদের জন্য অল্প খরচে আবাসের ব্যবস্থা করা।
১৫. দুর্নীতি, স্বজনপ্রীতি নির্মূল করা হবে এবং ব্যবসায়ীদের ১৯৪০ সাল হতে সম্পদের হিসাব গ্রহণ করা হবে। হিসাব বহির্ভূত সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা হবে।
১৬. প্রশাসনে ব্যয় হ্রাস করা হবে। নিম্ন বেতনভুক কর্মচারীদের বেতন যৌক্তিক হবে। সর্বোচ্চ বেতন মাসিক এক হাজার টাকার বেশি হবে না।
১৭. মুখ্যমন্ত্রীর বাসভবন বর্ধমান হাউজকে ভাষা সাহিত্যের গবেষণা প্রতিষ্ঠানে রূপান্তরিত করা হবে।
১৮. একুশে ফেব্রুয়ারি তারিখে শহীদদের কবরে একটি মিনার নির্মাণ করা এবং ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারদের ক্ষতিপূরণ দান করা হবে।
১৯. ২১ ফেব্রুয়ারি শহীদ দিবস ও ছুটির দিন ঘোষণা করা হবে।
২০. পূর্ব পাকিস্তান মন্ত্রীসভা আইনসভার আয়ু বৃদ্ধির করতে পারবে না। নির্বাচনের এক মাস পূর্বে মন্ত্রিসভা পদত্যাগ করবে।
২১. আইনসভার কোনো আসন শূন্য হলে ৩ মাসের মধ্যে নির্বাচন দিতে হবে। পরপর ৩টি আসনে পরাজিত হলে মন্ত্রিসভা পদত্যাগ করবে।

২১ দফা ছিল সাড়ে চার কোটি বাঙালির মুক্তি সনদ।

২১ দফার ভিত্তিতে যুক্তফ্রন্ট ১৯৫৪ সালের সাধারণ নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে। যুক্তফ্রন্টের প্রতীক ছিল নৌকা এবং মুসলিম লীগের প্রতীক ছিল হারিকেন।

শেরেবাংলা, সোহরাওয়ার্দী ও ভাসানীর নেতৃত্বে পূর্ব বাংলার জনগণ ঐক্যবদ্ধ হয়। ১৯৫৪ সালের ৭-১২ মার্চ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। মোট আসন ছিল ৩০৯টি। তার মধ্যে ৭২টি হিন্দু ও তফসিলী। ২৩৭টি মুসলমান আসন-৯টি বাদে সব আসনে যুক্তফ্রন্ট জয়লাভ করে। পূর্ব বাংলায় ভোটের বিপ্লব হলো। বাঙালি জাতীয়তাবাদের জয় হলো। ১৯৫৪ সালের ২ এপ্রিল সরকারিভাবে ভোটের ফলাফল প্রকাশিত হয়।

আওয়ামী মুসলিম লীগ	১৪৩
কৃষক শ্রমিক পার্টি	৪৮
নেজামে ইসলাম	২৮
গণতন্ত্রী দল	১৩
খেলাফতে রব্বানিয়া পার্টি	২
যুক্তফ্রন্ট	২২৮
মুসলিম লীগ	৯
মোট	**২৩৭**
অমুসলিম	৭২
সর্বমোট	**৩০৯**

একে ফজলুল হক বরিশাল থেকে ২টি আসনে জয়লাভ করেন। শেখ মুজিবুর রহমান গোপালগঞ্জ আসন থেকে মুসলিম লীগ প্রার্থী অহিদুজ্জামান ঠাণ্ডা মিয়াকে পরাজিত করে প্রাদেশিক আইনসভার এমএলএ নির্বাচিত হন। গোপালগঞ্জ নির্বাচন সম্পর্কে শেখ মুজিবুর রহমান বলেন, "নির্বাচনে দেখা গেল ওয়াহিদুজ্জামান সাহেব প্রায় দশ হাজার ভোটে পরাজিত হয়েছেন। জনসাধারণ আমাকে শুধু ভোটই দেয় নাই, প্রায় পাঁচ হাজার টাকা নজরানা হিসাবে দিয়েছিল নির্বাচনে খরচ চালানোর জন্য। আমার ধারণা হয়েছিল, মানুষকে ভালবাসলে মানুষও ভালবাসে। যদি সামান্য ত্যাগ স্বীকার করেন, তবে জনসাধারণ আপনার জন্য জীবন দিতেও পারে। এই নির্বাচনে মুসলিম লীগ শোচনীয়ভাবে পরাজিত হয়। নির্বাচনের কিছুদিন পূর্বে শহীদ সাহেব বিবৃতির মারফতে বলেছিলেন, 'মুসলিম লীগ নয়টা আসনই পেয়েছিল।

দুনিয়ার ইতিহাসে একটা ক্ষমতাসীন দলের এভাবে পরাজয়ের খবর কোনোদিন শোনা যায় নাই। বাঙালিরা রাজনীতির জ্ঞান রাখে এবং রাজনৈতিক চেতনাশীল। এবারও তারা তার প্রমাণ দিল। ১৯৪৬ সালে পাকিস্তান ইস্যুর উপর সাধারণ নির্বাচনেও তারা তা প্রমাণ করেছিল।

এই নির্বাচনে একটা জিনিস লক্ষ্য করা গেছে যে জনগণকে 'ইসলাম ও মুসলমানের নামে' স্লোগান দিয়ে ধোঁকা দেওয়া যায় না। ধর্মপ্রাণ বাঙালি মুসলমানরা তাদের ধর্মকে ভালবাসে; কিন্তু ধর্মের নামে ধোঁকা দিয়ে রাজনৈতিক কার্যসিদ্ধি করতে তারা দিবে না। এ ধারণা অনেকেরই হয়েছিল। জনসাধারণ চায় শোষণহীন সমাজ এবং অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নতি। শেরে বাংলা যুক্তফ্রন্টের নেতা নির্বাচিত হন। মন্ত্রিসভা গঠন নিয়ে যুক্তফ্রন্টে মতবিরোধ দেখা দেয়। ১৯৫৪ সালের ৩ এপ্রিল একে ফজলুল হক ৪ সদস্যবিশিষ্ট মন্ত্রিসভা গঠন করেন। ১৯৫৪ সালের ১৫ মে পূর্ণাঙ্গ যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রিসভা গঠন করা হয়।

মন্ত্রিসভা সদস্যবৃন্দ–১৯৫৪

এ কে ফজলুল হক	মুখ্যমন্ত্রী, স্বরাষ্ট্র, সংস্থাপন
আবু হোসেন সরকার	অর্থ
আতাউর রহমান খান	বেসামরিক সরবরাহ
আবুল মনসুর আহমদ	জনস্বাস্থ্য
কফিল উদ্দিন চৌধুরী	বিচার ও আইন
সৈয়দ আজিজুল হক	শিক্ষা ও রেজিস্ট্রেশন
আবদুস সালাম খান	শিল্প ও পূর্ত
শেখ মুজিবুর রহমান	কৃষি, ঋণ, সমবায় ও পল্লী উন্নয়ন
আবদুল লতিফ বিশ্বাস	রাজস্ব ও ভূমি সংস্কার
আশরাফ আলী চৌধুরী	সড়ক ও গৃহ নির্মাণ
হাশিম উদ্দিন আহমদ	বাণিজ্য ও বিদ্যুৎ উন্নয়ন
রাজ্জাকুল হায়দার চৌধুরী	স্বাস্থ্য ও কারা
ইউসুফ আলী চৌধুরী	কৃষি, বন ও পাট
মোয়াজ্জেম উদ্দিন হোসেন	জমিদারী অধিগ্রহণ

মন্ত্রিসভার শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানটি শুরুর আগে অবাঙালিদের ষড়যন্ত্রে আদমজী জুট মিলে দাঙ্গা চলছে। দাঙ্গায় ১৫শ' নিরপরাধ শ্রমিক নিহত হয়।

আদমজী জুট মিলে দাঙ্গা

আদমজী জুট মিলে দাঙ্গা সম্পর্কে শেখ মুজিবুর রহমান নিজের বিবরণ দেন, "১৯৫৪ সালের মে মাস। আমরা সকলে শপথ নিতে সকাল নয়টায় লাটভবনে উপস্থিত হলাম। আমাদের যখন মন্ত্রী হিসাবে শপথ নেওয়া শেষ হল, ঠিক সেই

সময় খবর এল আদমজী জুট মিলে বাঙালি ও অবাঙালি শ্রমিকদের মধ্যে ভীষণ দাঙ্গাহাঙ্গামা শুরু হয়েছে। ভোররাত থেকে সৈয়দ আজিজুল হক সেখানে উপস্থিত আছেন। রাতেই ইপিআর ফোর্স ও পুলিশ বাহিনী সেখানে মোতায়েন করা হয়েছে। ঢাকার দু'একজন বড় সরকারি কর্মকর্তা ও পুলিশের কর্মচারীরাও উপস্থিত আছেন। আমরা যখন শপথ নিচ্ছি ঠিক সেই মুহূর্তে দাঙ্গা শুরু হওয়ার কারণ কি? বুঝতে বাকি রইল না, এ এক অশুভ লক্ষণ! হক সাহেব আমাদের নিয়ে সোজা রওয়ানা করলেন আদমজী জুট মিলে। তখন নারায়ণগঞ্জ যেয়ে শুনলাম, হক সাহেব আমার জন্য অপেক্ষা করে ঢাকা রওয়ানা হয়ে গেছেন। একটা লঞ্চ রেখে গেছেন। আমি পৌঁছালাম এবং সাথে সাথে যেখানে দাঙ্গা তখনও চলছিল সেখানে উপস্থিত হলাম। আমাকে একটা পুলিশের জিপে করে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। দাঙ্গা তখন অল্প চলছিল। যেদিকে যাই দেখি রাস্তায় বস্তিতে মরা মানুষের লাশ পড়ে আছে। অনেকগুলি আহত লোক চিৎকার করছে, সাহায্য করার কেউই নাই। ইপিআর পাহারা দিতেছে, বাঙালি ও অবাঙালিদের আলাদা আলাদা করে দিয়েছে। গ্রাম থেকে খবর পেয়ে হাজার হাজার বাঙালি এগিয়ে আসছে। অবাঙালিদের ট্রাকে করে মিলের বাইরে থেকে মিলের ভিতরে নিতেছে। আমার বড় অসহায় মনে হল। আমার সাথে মাত্র দুইজন আর্মড পুলিশ। এই সময় আরও কয়েকজন পুলিশের সাথে আমার দেখা হল। তাদের কাছে আসতে হুকুম দিলাম। এক গাছতলায় আমি আস্তানা পাতলাম। মিলের চারটা ট্রাক আছে, একটাকে পাওয়া যাচ্ছে না। কিছু সংখ্যক লোক পাওয়া গেল, তাদের সাহায্যে যারা মরে গেছে তাদের রেখে আহত লোকগুলিকে এক জায়গায় করে পানি দিতে শুরু করলাম। আমার দেখাদেখি কয়েকজন কর্মচারীও কাজে হাত দিল। এই সময় মোহন মিয়া সাহেব এসে উপস্থিত হলেন। আমার মনে বল এল। তিনটা ট্রাক হাজির করা হল। ড্রাইভাররা ভাগতে চেষ্টা করছিল। আমি হুকুম দিলাম, ভাগতে চেষ্টা করলেই গ্রেফতার করে জেলে পাঠিয়ে দিব। আমার মেজাজ দেখে তারা ভয় পেয়ে গেল। ঢাকায় টেলিফোন করা হয়েছে, এ্যাম্বুলেন্স পাঠাবার জন্য। মোহন মিয়া ও আমি সকাল এগার টা থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত প্রায় তিনশতের মত আহত লোককে হাসপাতালে পাঠাতে পেরেছিলাম। বিভিন্ন জায়গা থেকে যে সমস্ত বাঙালি জনসাধারণ জমা হচ্ছিল মিল আক্রমণ করার জন্য তাদের কাছে গিয়ে আমি বক্তৃতা করে তাদের শান্ত করলাম। তারা আমার কথা শুনল। যদি তারা সঠিক খবর পেত তাহা হলে আমার কথা শুনত কি না সন্দেহ ছিল। সন্ধ্যার একটু পূর্বে আমি সমস্ত এলাকা ঘুরে মৃত লাশের হিসাব করলাম একটা একটা করে গণনা করে তাতে পাঁচশতের উপর লাশ আমি স্বচক্ষে দেখলাম।

আরও শ'খানেক পুকুরের মধ্যে আছে, তাতে সন্দেহ নাই।"

সামান্য একটা ঘটনা নিয়ে এই দাঙ্গা শুরু হয়। তিনদিন পূর্বে এক অবাঙালি দারোয়ানের সাথে এক বাঙালি শ্রমিকের কথা কাটাকাটি ও মারামারি হয়। তাতে বাঙালির এক আঘাতে হঠাৎ দারোয়ানটা মারা যায়। এই নিয়ে উত্তেজনা এবং ষড়যন্ত্র শুরু হয়।

এই দাঙ্গা যে যুক্তফ্রন্ট সরকারকে হেয় প্রতিপন্ন করার জন্য এবং দুনিয়াকে নতুন সরকারের অক্ষমতা দেখাবার জন্য বিরাট এক ষড়যন্ত্রের অংশ সে সম্বন্ধে আমার মনে কোনো সন্দেহ নাই। ষড়যন্ত্র করাচী থেকে করা হয়েছে। প্রধানমন্ত্রী মোহাম্মদ আলী এ রকম দাঙ্গার সুযোগ নেয়। মন্ত্রীদের দপ্তর বন্টন নিয়ে ষড়যন্ত্র চলছে, শেখ মুজিবকে দেয়া হল সমবায় ও কৃষি উন্নয়ন। তিনি শেরেবাংলার নিকট অভিযোগ করলে বললেন, "করবার দে, আমার পোর্টফলিও তোকে দিয়ে দেব, তুই রাগ করিস না, পরে সব ঠিক করে দেব।" বৃদ্ধ লোক তাকে আর কি বলব, তিনি খুব স্নেহ করতে শুরু করেছেন। তিনি খবরের কাগজের প্রতিনিধিদের বলেছেন "আমি বুড়া আর মুজিব গুড়া তাই ওর আমি নানা ও আমার নাতি।" আমি সকলের চেয়ে বয়সে ছোট।" শেখ মুজিব দপ্তর বুঝে নেন। তিনি পরিবারের সকলকে নিয়ে মিন্টো রোডে সরকারী বাস ভবনে উঠেন।

যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রিসভা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে যে, ২১ ফেব্রুয়ারি শহীদ দিবস ও ছুটি পালন, শহীদ মিনার নির্মাণ, বর্ধমান হাউজকে বাংলা একাডেমিতে রূপান্তর করা হবে।

নিউইয়র্ক টাইমস পত্রিকার সাংবাদিক মি. কালাহান বলেন, মুখ্যমন্ত্রী একে ফজলুল হক বলেছেন, বাংলাকে স্বাধীন করা তার প্রথম কাজ। গভর্নর জেনারেল গোলাম মোহাম্মদ ১৯৫৪ সালের ৩১ মে দেশদ্রোহিতার অভিযোগে এ কে ফজলুল হকের যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রিসভা ভেঙে দিয়ে ৯২ক ধারা জারি করে। গভর্নর শাসন প্রবর্তন করে মেজর জেনারেল ইস্কান্দার মির্জাকে পূর্ব পাকিস্তানের গভর্নর নিযুক্ত করা হয়।

শেখ মুজিবুর রহমানকে গ্রেফতারের জন্য পুলিশ এসেছিল বাসায়। তিনি বাসায় এসে জেলা ম্যাজিস্ট্রেট ইয়াহিয়া খান চৌধুরীকে ফোন করে বলেন, "আমার বাড়িতে পুলিশ এসেছিল, বোধহয় আমাকে গ্রেফতার করার জন্য। আমি এখন ঘরেই আছি, গাড়ি পাঠিয়ে দেন"। পুলিশ এল– তাদের গাড়িতে তিনি ঢাকা জেলে চলে যান।

শহীদ সোহরাওয়ার্দী ও মওলানা ভাসানী দেশের বাইরে– শেখ মুজিব কারাগারে– কোন প্রতিবাদ হল না। ষড়যন্ত্রকারীরা বুঝতে পারল যে যতই হৈচৈ

বাঙালীরা করুক না কেন তাদের দাবিয়ে রাখতে কষ্ট হবে না। বন্দুক লাঠি দেখলে তারা গর্তে ঢুকবে। এ সময় যদি বাধা পেত তবে হাজার বার চিন্তা করত বাঙ্গালিদের ওপর ভবিষ্যতে অত্যাচার করতে। যুক্তফ্রন্টের রাজনীতির কাপুরুষতা দেখে তিনি আত্মজীবনীতে লিখেছেন, "এই দিন থেকে বাঙালীদের দুঃখের দিন শুরু হলো। অযোগ্য নেতৃত্ব, নীতিহীন নেতা ও কাপুরুষ রাজনীতিবিদদের সাথে কোনোদিন একসাথে হয়ে দেশের কাজ করতে নামতে নেই, তাতে দেশসেবার চেয়ে দেশের ও জনগণের সর্বনাশ বেশি হয়।"

১৯৫৪ সালের ২৩ অক্টোবর গভর্নর জেনারেল গোলাম মোহাম্মদ পাকিস্তান গণপরিষদ ভেঙে দেয়। বগুড়ার মহম্মদ আলী পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী নিযুক্ত হন। হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর চেষ্টায় শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৫৪ সালের ১৮ ডিসেম্বর মুক্তি লাভ করেন।

হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর মুহাম্মদ আলীর মন্ত্রিসভায় যোগদান

হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর চেষ্টায় শেখ মুজিবুর রহমান ঢাকা জেল থেকে মুক্তি লাভ করেন। প্রায় ৭ মাস বন্দী জীবন-যাপন করে তিনি পরিবারের সদস্যদের সাথে মিলিত হন। তার পরিবার মিন্টু রোডের সরকারী বাসভবন ত্যাগ করে একটি ভাড়া বাড়িতে বাস করছিল। জেল থেকে মুক্তি পাওয়ার পর দলের নির্দেশে শেখ মুজিবুর রহমান করাচী গমন করেন। দলের সাথে আলাপ না করে সোহরাওয়ার্দী কেন্দ্রীয় মন্ত্রীসভায় যোগদান করায় তিনি ক্ষুব্ধ ছিলেন। এ সম্পর্কে তিনি বলেন : "আমি তাঁর সাথে বেয়াদবি করে বসতে পারি। পরের দিন সকাল নয়টায় আমি হোটেল মেট্রোপোলে তাঁর সঙ্গে দেখা করতে যাই। তিনি বাইরে যাবার জন্য প্রস্তুত হচ্ছিলেন। আমাকে দেখে বললেন, "গত রাতে এসেছ শুনলাম, রাতেই দেখা করা উচিত ছিল।" আমি বললাম, "ক্লান্ত ছিলাম, আর এসেই বা কি করব, আপনি তো এখন মোহম্মদ আলী সাহেবের আইনমন্ত্রী।" তিনি বললেন, "রাগ করছ, বোধহয়।" বললাম, "রাগ করব কেন স্যার, ভাবছি সারা জীবন আপনাকে নেতা মেনে ভুলই করেছি কি না?" তিনি আমার দিকে চেয়ে বললেন, "বুঝেছি, আর বলতে হবে না, বিকাল তিনটায় এস, অনেক কথা আছে।"

আমি বিকাল তিনটায় যেয়ে দেখি তিনি একলা শুয়ে বিশ্রাম করছেন। স্বাস্থ্য এখনও ঠিক হয় নাই, কিছুটা দুর্বল আছেন। আমি তাঁর কাছে বসলাম। তিনি আলাপ করতে আরম্ভ করলেন। অনেকক্ষণ আলাপ করলেন, তার সারাংশ হল গোলাম মোহাম্মদ জানিয়ে দিয়েছেন যে, মন্ত্রিসভায় যোগদান না করলে তিনি

মিলিটারিকে শাসনভার দিয়ে দেবেন। আমি বললাম, "পূর্ব বাংলায় যেয়ে সকলের সাথে পরামর্শ করে অন্য কাউকেও তো মন্ত্রিত্ব দিতে পারতেন। আমার মনে হয় আপনাকে ট্র্যাপ করেছে। ফল খুব ভাল হবে না, কিছুই করতে পারবেন না। যে জনপ্রিয়তা আপনি অর্জন করেছিলেন, তা শেষ করতে চলেছেন।" তিনি আমাকে বোঝাতে চেষ্টা করলেন এবং বললেন, "কিছু না করতে পারলে ছেড়ে দেব, তাতে কি আসে যায়!" আমি বললাম, "এই ষড়যন্ত্রের রাজনীতিতে আপনার যোগদান করা উচিত হয় নাই, আপনি বুঝতে পারবেন।' তিনি আমাকে পূর্ব বাংলায় কখন যাবেন তার প্রোগ্রাম করতে বললেন। আমি বললাম, "ভাসানী সাহেব দেশে না এলে এবং রাজনৈতিক বন্দিদের মুক্তি না দিয়ে আপনার ঢাকায় যাওয়া উচিত হবে না।" তিনি রাগ করে বললেন, "তার অর্থ তুমি আমাকে পূর্ব বাংলায় যেতে নিষেধ করছ।" আমি বললাম, "কিছুটা তাই।" তিনি অনেকক্ষণ চক্ষু বন্ধ করে চুপ করে রইলেন। পরে আমাকে বললেন, আগামীকাল আসতে, ঠিক বিকাল তিনটায়। আমি থাকতে থাকতে দেখলাম, আবু হোসেন সরকার সাহেবকে হক সাহেবের নমিনি হিসাবে কেন্দ্রীয় মন্ত্রিত্বের গ্রহণ করা হয়েছে। শহীদ সাহেব কিছুই জানেন না। এবার তিনি কিছুটা বুঝতে পারলেন যে খেলা শুরু হয়েছে।"

প্রধানমন্ত্রী মুহাম্মদ আলী সম্পর্কে শেখ মুজিবের মূল্যায়ণ হলো : "মোহাম্মদ আলীর (বগুড়া) মধ্যে কোনো রাজনৈতিক চেতনা ছিল না। তার মধ্যে কোনো গভীরতাও ছিল না।"

সোহরাওয়ার্দী কয়েকটি শর্তে মন্ত্রিসভায় যোগদানে সম্মত হন। ১৯৫৪ সালের ২৯ ডিসেম্বর তিনি আইনমন্ত্রী হিসেবে মুহাম্মদ আলীর মন্ত্রিসভায় যোগ দেন। সোহরাওয়ার্দীর নিকট দেশ বড় ছিল, তাই মন্ত্রিত্ব গ্রহণ করেন। মওলানা ভাসানী ইউরোপ থেকে ফিরে কলকাতায় একটি হোটেলে অবস্থান করছিলেন। তাঁকে দেশে ফিরিয়ে আনার কোন উদ্যোগ নেই। যুক্তফ্রন্ট নিষ্ক্রিয়প্রায়। এদিকে গোলাম মুহাম্মদ সোহরাওয়ার্দীকে জিজ্ঞেস না করে কেএসপি নেতা আবু হোসেন সরকারকে কেন্দ্রের স্বাস্থ্যমন্ত্রী নিযুক্ত করেন। গোলাম মুহাম্মদ শেরে বাংলার সাথে আলোচনা করে আবু হোসেন সরকারকে মন্ত্রী করেছিলেন। এ ঘটনায় সোহরাওয়ার্দী খুবই দুঃখ পেলেন। ১৯৫৪ সালের ২৯ ডিসেম্বর হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী পাকিস্তানের আইনমন্ত্রী নিযুক্ত হন। পাকিস্তানে একটি শাসনতন্ত্র প্রণয়নের জন্য তিনি মন্ত্রিত্ব গ্রহণ করেন। গভর্নর মেজর জেনারেল ইস্কান্দার মির্জা মওলানা ভাসানীর দেশে ফিরে আসার প্রতি নিষেধাজ্ঞা জারি করেন। সোহরাওয়ার্দী চেষ্টায় ভাসানী ১৯৫৫ সালের ২৬ এপ্রিল কলকাতা থেকে ঢাকায় ফিরে আসেন।

শেরেবাংলা এ. কে. ফজলুল হকের বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাব

শেরেবাংলার বিরুদ্ধে অনস্থা প্রস্তাব সম্পর্কে শেখ মুজিবুর রহমান নিম্নলিখিত বিবরণ দেন : "হক সাহেব লাহোরে এক খবরের কাগজের প্রতিনিধির কাছে বলেছেন, সোহরাওয়ার্দী যুক্তফ্রন্টের কেউই নন, আমি তো নেতা। অথচ আওয়ামী লীগ সংখ্যাগরিষ্ঠ যুক্তফ্রন্টের। হক সাহেব কেএসপি'র দলের নেতা। কেএসপি, নেজামে ইসলাম মিলেও আওয়ামী লীগের সমান হবে না। সোহরাওয়ার্দী সাহেব আওয়ামী লীগের নেতা-হক সাহেব একথা কি করে বলতে পারেন! হক সাহেবের দল গোলাম মোহাম্মদকে বলে দিয়েছে যে, তাঁরা সোহরাওয়ার্দী সাহেবকে প্রধানমন্ত্রী চান না, মোহাম্মদ আলী বগুড়াকে চান, এই জন্যই শহীদ সাহেবকে প্রধানমন্ত্রী করা হয় নাই। আর মোহাম্মদ আলী সাহেব বলে দিয়েছেন, আওয়ামী লীগ দলকে বাদ দিয়েই পূর্ব বাংলায় সরকার গঠন করতে হবে। আমি বুঝতে পারলাম, মোহাম্মদ আলী বগুড়া হক সাহেবের মাথায় ভর করেছেন। আর চৌধুরী মোহাম্মদ আলী শহীদ সাহেবের মাথায় ভর করেছেন। কেএসপি'র নেতারা তখন অনেকেই করাচিতে কেউই শহীদ সাহেবের সঙ্গে দেখা করতে আসেন না। আমার সাথে কেএসপি'র নেতাদের দু'একজনের দেখা হলে আমি তাঁদের জানালাম, আপনারা অনেক কিছুই করেছেন। কথা ছিল, শহীদ সাহেবকে আপনারা পাকিস্তানের নেতা মানবেন, আর আমরা হক সাহেবকে পূর্ব বাংলার নেতা মানব, এখন আপনার করাচি এসে মুসলিম লীগ নেতা বগুড়ার মোহম্মদ আলীকে নেতা মানছেন এবং তাঁকেই সমর্থন করছেন। শহীদ সাহেব যাতে প্রধানমন্ত্রী হতে না পারেন তার চেষ্টা করছেন। আমরাও বাধ্য হব হক সাহেবকে নেতা না মানতে, দরকার হলে যুক্তফ্রন্টের সভায় অনাস্থা প্রস্তাব দেব তাঁর নেতৃত্বের বিরুদ্ধে। আমরা হক সাহেবকে ক্ষমতা দেই নাই যে, তিনি যুক্তফ্রন্টের পক্ষ থেকে মোহাম্মদ আলী সাহেবকে সমর্থন দেবেন এবং মুসলিম লীগ নেতাকে নেতা মানবেন। কৃষক-শ্রমিক দলের নেতারা কথা পেয়েছেন পূর্ব বাংলায় সরকার তাঁদেরকে দেওয়া হবে। আওয়ামী লীগ দল থেকে কিছু লোক তাঁরা পাবেন, এ আশ্বাসও তাঁরা পেয়েছেন। যদিও শহীদ সাহেবের সাথে তাঁর মন্ত্রিত্ব গ্রহণ করার ব্যাপার নিয়ে একমত হতে পারি নাই, তবু অন্য কেউ তাঁকে অপমান করুক এটা সহ্য করা আমার পক্ষে কষ্টকর ছিল। আমি শহীদ সাহেবকে বললাম, "যখন হক সাহেব প্রকাশ্যে বলে দিয়েছেন আপনি যুক্তফ্রন্টের কেউই নন, তখন বাধ্য হয়ে প্রমাণ করতে হবে আপনিও যুক্তফ্রন্টের কেউ। কেএসপিও নেজামে ইসলামী যুক্তফ্রন্টে থাকে থাকুক। আমরা অনাস্থা দিব হক সাহেবের বিরুদ্ধে। তাতে অন্ত তপক্ষে আওয়ামী লীগের নেতা হিসাবে তো কথা বলতে পারবেন এবং আওয়ামী

লীগ পার্টি পূর্ব বাংলার আইনসভায় একক সংখ্যাগরিষ্ঠ। আওয়ামী লীগ ছাড়া কারও পূর্ব বাংলায় সরকার চালাবার ক্ষমতা নাই।" শহীদ সাহেব বললেন, "যতদিন আওয়ামী লীগ যুক্তফ্রন্টে আছে ততদিন তো সত্যই আমি কেউই নই। হক সাহেব যুক্তফ্রন্টের নেতা, তিনি আওয়ামী লীগ, কেএসপি ও নেজামে ইসলাম পার্টির পক্ষ থেকে কথা বলতে পারেন।"

"আমি ঢাকায় ফিরে এসে আতাউর রহমান সাহেব, আবুল মনসুর আহমদ ও মানিক ভাইকে নিয়ে বৈঠকে বসলাম এবং সকল কথা তাদের বললাম। শহীদ সাহেবের মতামতও জানালাম। ভাসানী সাহেব কলকাতা এসে পৌঁছেছেন খবর পেয়েছি, কিন্তু কোথায় আছেন জানি না। শহীদ সাহেব এন. এম. খান চিফ সেক্রেটারি সাহেবকে টেলিফোন করেছেন রাজবন্দিদের মুক্তি দিতে। অনেক কর্মীই আস্তে আস্তে মুক্তি পেতে লাগল। কেএসপি দলের নেতারা রাজবন্দিদের মুক্তির জন্য একটা কথাও বলেন নাই। কারণ, তাদের দলের কেউই জেলে নাই। আওয়ামী লীগ এমএল ও কর্মীরা তখনও অনেকে জেলে এবং অনেকের বিরুদ্ধে গ্রেফতারি পরোয়ানা ঝুলছে। আতাউর রহমান সাহেব, আবুল মনসুর আহমদ, মানিক ভাই ও আমি অনেকক্ষণ আলাপ-আলোচনা করলাম। হক সাহেবের নেতৃত্বে অনাস্থা দেওয়া হবে কি হবে না, এ বিষয়ে। হক সাহেবের চেয়েও তাঁর কয়েকজন সাঙ্গপাঙ্গই বেশি তৎপর মুসলিম লীগের সাথে কোনো নীতি, আদর্শ ছাড়াই মিটমাট করার। কোথায় গেল একুশ দফা, আর কোথায় গেল জনতার রায়। তিনজনই প্রথমে একটু একটু অনিচ্ছা প্রকাশ করছিলেন। অনাস্থা সম্বন্ধে কোনো আপত্তি নাই, তবে পারা যাবে কি যাবে না এ প্রশ্ন তুলেছিলেন। আমি বললাম, না পারার কোনো কারণ নাই। নীতি বলেও তো একটা কথা আছে। শেষ পর্যন্ত সকলেই রাজি হলে আমি ওয়াকিং কমিটির সভা আহ্বান করলাম। ওয়াকিং কমিটির প্রায় সকল সদস্যই একমত, কেবল সালাম সাহেব ও হাশিমউদ্দিন সাহেব একমত হতে পারলেন না। তবে একথা জানালেন যে, তাঁরা ওয়াকিং কমিটির সিদ্ধান্ত নিশ্চয়ই মানতে বাধ্য।

আমি ও আতাউর রহমান সাহেব বের হয়ে পড়লাম এমএলএদের দস্তখত নিতে। সতের দফা চার্জ গঠন করলাম। হক সাহেবের সামনে দাঁড়িয়ে কে অনাস্থা প্রস্তাব প্রথমে পেশ করবে, সে প্রশ্ন হল। অনেকেই আপত্তি করতে লাগলেন, আমার নিজেরও লজ্জা করতে লাগল। তাঁকে তো আমিও সম্মান ও ভক্তি করি। কিন্তু এখন কয়েকজন তথাকথিত নেতা তাঁকে ঘিরে রেখেছে। তাঁকে তাদের কাছ থেকে শত চেষ্টা করেও বের করতে পারলাম না। এদের অনেকেই নির্বাচনের মাত্র কয়েক মাস পূর্বে মুসলিম লীগ ত্যাগ করে এসেই ক্ষমতার

লড়াইয়ে পরাজিত হয়। ঠিক হল, আমিই প্রস্তাব আনব আর জনাব আবদুল গণি বার এট ল' সমর্থন করবেন। আমরা তাঁর কাছে সভা ডেকে অনাস্থা প্রস্তাব মোকাবেলা করার জন্য অনুরোধ করলাম। তিনিও সভা ডাকতে রাজি হলেন। আমরা আওয়ামী লীগের প্রায় একশত তেরজন সদস্যের দস্তখত নিলাম। তাতেই আমাদের হয়ে গেল।"

আওয়ামী লীগের সহ-সভাপতি আতাউর রহমান, মওলানা আব্দুর রশীদ তর্কবাগীশ, শেখ মুজিবুর রহমান, শেরে বাংলার বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাবের উদ্যোগ গ্রহণ করেন। উভয় দল সংখ্যাগরিষ্ঠতার দাবি করে। পরিশেষে ১৯৫৫ সালের ১৭ ফেব্রুয়ারি আইন পরিষদে অনাস্থার পক্ষে-বিপক্ষে ভোটগ্রহণ করা হয়– এ.কে. ফজলুল হক ১৯৯ জন এবং আতাউর রহমান খান ১০৫ জন সদস্যের সমর্থন পান। অনাস্থা প্রস্তাব বাতিল হলো। কিন্তু যুক্তফ্রন্ট ভেঙ্গে গেল, যুক্তফ্রন্ট ভাঙ্গার জন্য শেখ মুজিবকে বেশি দায়ী করা হয়। প্রকৃতপক্ষে বাংলার নেতৃবৃন্দ কেন্দ্রীয় প্রাসাদ ষড়যন্ত্রের শিকার হয়েছেন।

১৯৫৫ সালের ৩১ মে পশ্চিম পাকিস্তানের মারী শহরে পাকিস্তান গণপরিষদের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। সংখ্যাসাম্যের ভিত্তিতে পূর্ব পাকিস্তান ৪০ আসন লাভ করে। এমএলএগণ ভোটার। নির্বাচনের ফলাফল নিম্নরূপ–

কেএসপি	১০
আওয়ামী লীগ	১৩
আওয়ামী মুসলিম লীগ	২
নেজামে ইসলাম	২
গণতন্ত্রী দল	২
মুসলিম লীগ	১
স্বতন্ত্র	১
হিন্দু আসনে	৯
মোট	**৪০**

একে ফজলুল হক, হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী, শেখ মুজিবুর রহমান প্রমুখ গণপরিষদের সদস্য নির্বাচিত হন। কেন্দ্রের ষড়যন্ত্রের ফলে যুক্তফ্রন্ট ভেঙে যায়। ১৯৫৫ সালের ৩ জুন ৯২ক ধারা প্রত্যাহার করা হয়। কেএসপি নেতা আবু হোসেন সরকার পূর্ব পাকিস্তানের মুখ্যমন্ত্রী নিযুক্ত হয়।

১৯৫৫ সালের ৭-১৩ জুলাই মারীতে গণপরিষদের সভা চলে। হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর উদ্যোগে মারীতে ৪ দফা চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়।

১. পশ্চিম পাকিস্তানে এক ইউনিট;
২. পূর্ণ আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন;
৩. দু'অঞ্চলের মধ্যে সংখ্যাসাম্য;
৪. বাংলা ও উর্দু রাষ্ট্রভাষা।

১৯৫৫ সালের ৫ আগস্ট প্রাদেশিক পরিষদের সভায় আবদুল হাকিম স্পিকার ও শাহেদ আলী পাটোয়ারী ডেপুটি স্পিকার নিবাচিত হন।

১৯৫৫ সালের ১০ আগস্ট মুসলিম লীগ নেতা চৌধুরী মোহাম্মদ আলী পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভা গঠন করেন। এ মন্ত্রিসভায় একে ফজলুল হক স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী নিযুক্ত হন। যুক্তফ্রন্ট ভেঙে যাওয়ায় আওয়ামী লীগ বিরোধী দল গঠন করে। হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী পাকিস্তানের প্রথম বিরোধী দলের নেতা।

১৯৫৫ সালের ১২ আগস্ট পাকিস্তান গণপরিষদের স্পিকার ও ডেপুটি স্পিকার নির্বাচিত হন আবদুল ওহাব খান ও মি. গিবন।

আওয়ামী মুসলিম লীগ হতে আওয়ামী লীগ– ১৯৫৫

১৯৫৫ সালের ২১-২৩ অক্টোবর আওয়ামী লীগের তিনদিনব্যাপী বার্ষিক সম্মেলন সদরঘাট রূপমহল সিনেমা হলে অনুষ্ঠিত হয়। এ সভায় আওয়ামী মুসলিম লীগকে ধর্মনিরপেক্ষতার রূপ দেয়া হয়। দলের নাম হয় আওয়ামী লীগ। মুসলিম শব্দ বিলুপ্ত করা হয়। আওয়ামী লীগকে সর্বজনীন করায় শেখ মুজিবুর রহমান গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। এ সভায় আওয়ামী লীগের কার্যনির্বাহী কমিটি গঠন করা হয়।

মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী	সভাপতি
আতাউর রহমান খান	সহ-সভাপতি
আবুল মনসুর আহমদ	সহ-সভাপতি
খয়রাত হোসেন	সহ-সভাপতি
শেখ মুজিবুর রহমান	সাধারণ সম্পাদক
অলি আহাদ	যুগ্ম সম্পাদক
অধ্যাপক আবদুল হাই	প্রচার সম্পাদক
আবদুস সামাদ	শ্রম সম্পাদক
তাজউদ্দীন আহমদ	সংস্কৃতি ও সমাজকল্যাণ সম্পাদক
সেলিনা বানু	মহিলা সম্পাদক
মুহাম্মদ উল্লাহ	দফতর সম্পাদক
ইয়ার মোহাম্মদ খান	কোষাধ্যক্ষ

৩৬ সদস্যবিশিষ্ট কার্যনির্বাহী কমিটি গঠন করা হয়। কমিটি গঠনে শেখ মুজিবুর রহমান সাংগঠনিক প্রতিভার পরিচয় দেন।

১৯৫৫ সালের ৬ অক্টোবর পশ্চিম পাকিস্তানের ৪টি প্রদেশ নিয়ে এক ইউনিট গঠন করা হয়। পশ্চিম পাকিস্তানের গভর্নর নিযুক্ত হলেন মুসতাক আহমদ গুরমানি এবং প্রধানমন্ত্রী হলেন ডা. খান সাহেব।

পাকিস্তান পার্লামেন্টে পূর্ব বাংলার দাবি

১৯৫৫ সালে আগস্ট মাস হতে পাকিস্তান গণপরিষদে শাসনতন্ত্র প্রণয়ন করার জন্য বিতর্ক শুরু হয়। শাসনতন্ত্রে পূর্ব বাংলার স্বার্থ সংরক্ষণের জন্য শেখ মুজিবুর রহমান দাবি পেশ করেন। তিনি পূর্ব বাংলাকে বঞ্চিত করার প্রস্তাবের প্রবল বিরোধিতা করেন। পশ্চিম পাকিস্তানের ৪টি প্রদেশ নিয়ে এক ইউনিট গঠন করার বিল পেশ করা হয়। ১৯৫৫ সালে ২৫ আগস্ট শেখ মুজিবুর রহমান এক ইউনিট বিলের বিরোধিতা করেন। তিনি এক ইউনিট বিলের ওপর জনমত যাচাইয়ের প্রস্তাব দেন।

কেন্দ্রীয় মুসলিম লীগ সরকার পূর্ববাংলার নাম পরিবর্তন করে পূর্ব পাকিস্তান রাখার প্রস্তাব করে এবং তা শাসনতন্ত্রে অন্তর্ভুক্ত করা হবে। গণপরিষদের সভায় শেখ মুজিবুর রহমান এ প্রস্তাবের তীব্র বিরোধিতা করে বলেন, Sir you will see that the word to place the word East Pakistan instead of East Bengal. We have demanded so many times that you should make Bengal (Pakistan). The word Bengal have a history, has a tradition of its own. "কিন্তু দেখবেন তারা পূর্ব বাংলার নাম পূর্ব পাকিস্তান রাখতে চায়। আমরা বারবার বলেছি যে, আপনাদের বাংলা নামকরণ করতে হবে। বাংলার ইতিহাস ও ঐতিহ্য আছে।"

১৯৫৫ সালে ২৫ আগস্ট একই দিনে শেখ মুজিবর রহমান জাতীয় পরিষদে ১৯ বার ভাষণ দেন। এদিন শেখ মুজিবুর রহমানের দিন। ১৯৫৫ সালের ১ অক্টোবর তিনি গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার জন্য শাসনতন্ত্র প্রণয়ন, স্বায়ত্তশাসন ও গভর্নর জেনারেলের সীমিত ক্ষমতা প্রদানের প্রস্তাব করেন।

সোহরাওয়ার্দীর নির্দেশে শেখ মুজিবুর রহমান Parity বা সংখ্যা সাম্যনীতি সমর্থন করেন। তিনি জাতীয় পরিষদে তার ভাষণে বলেন, পূর্ববাংলায় পাকিস্তানের ৫৬ ভাগ লোক বসবাস করেন। তবু দু'অঞ্চলের মধ্যে সম্পর্ক উন্নয়নের লক্ষ্যে তিনি সংখ্যাসাম্য গ্রহণ করে বলেন, East Pakistan claim parity in all the matters. পূর্ব পাকিস্তান সর্বক্ষেত্রে সংখ্যা সাম্য চায়।

পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা

১৯৫৬ সালের ৭ ফেব্রুয়ারি বিকেল ৩টায় পাকিস্তান গণপরিষদে সংবিধান আলোচনায় অংশগ্রহণ করে শেখ মুজিবুর রহমান বলেন, বাংলা যেহেতু পাকিস্তানের ৫৬% লোকের ভাষা, তাই পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা হবে বাংলা ও উর্দু। ১৯৫৬ সালে সংবিধানে পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষা হিসেবে বাংলা স্বীকৃতি লাভ করে।

২১ ফেব্রুয়ারি ১৯৫৬ শেখ মুজিবুর রহমান গণপরিষদে ২১ ফেব্রুয়ারি শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা জানানোর জন্য অধিবেশনের তুলতবি ঘোষণা করার প্রস্তাব করেন। তিনি বলেন, পূর্ব বাংলা সরকার ২১ ফেব্রুয়ারি ছুটি ঘোষণা করেছে।

ঢাকায় রাজধানী

শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৫৬ সালের ২১ ফেব্রুয়ারি দুপুর ৩টায় খসড়া সংবিধান আলোচনায় অংশ নিয়ে পাকিস্তানের জন্য দুটো রাজধানী– এটা করাচীতে এবং অন্যটি ঢাকায় করার প্রস্তাব করেন।

We have definitely said in accordance with the demand of the people of East Bengal that Capital of Pakistan must be at Karachi and at Dacca.

১৯৫৬ সালের ২৮ ফেব্রুয়ারি তিনি খসড়া শাসনতন্ত্রে মহিলাদের জন্য ১০টি আসন সংরক্ষণের দাবি করেন। উল্লেখ্য, ১৯৫৬ সালের শাসনতন্ত্রে মহিলাদের আসন সংরক্ষিত ছিল না।

পার্লামেন্টে মুসলিম লীগ সদস্য ফজলুর রহমান বলেন, হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী পাকিস্তান ধ্বংস করবেন। উত্তরে শেখ মুজিবুর রহমান বলেন, তারাই পাকিস্তান ধ্বংস করছেন। তিনি আরও বলেন, একমাত্র সোহরাওয়ার্দী পাকিস্তান রক্ষা করতে পারেন।

১৯৫৬ সালের ৬ জানুয়ারি হতে খসড়া শাসনতন্ত্রের ওপর বিতর্ক শুরু হয়। ১৯৫৬ সালের ২৩ মার্চ শাসনতন্ত্র গৃহীত হয়। শেরেবাংলা একে ফজলুল হক ১৯৫৬ সালের ২৪ মার্চ পূর্ব পাকিস্তানের গভর্নর নিযুক্ত হন।

অধ্যায় ৮

প্রধানমন্ত্রী পদে হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী

১৯৫৬ সালে পূর্ব পাকিস্তানে খাদ্য অভাব দেখা দেয়। আবু হোসেন সরকার পূর্ব পাকিস্তানের মুখ্যমন্ত্রী। তিনি খাদ্য সমস্যা সমাধানে ব্যর্থ হন। মওলানা ভাসানী ও শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্ব ১৯৫৬ সালের ৪ আগস্ট বিক্ষোভ ও ভুখা মিছিল হয়। পুলিশ গুলি চালালে ৩ জনের মৃত্যু হয়। ১৯৫৬ সালের ৩০ আগস্ট আবু হোসেন সরকারের মন্ত্রিসভা পদত্যাগ করে।

১৯৫৬ সালের ৫ সেপ্টেম্বর আওয়ামী লীগ নেতা আতাউর রহমান খান মন্ত্রিসভা গঠন করেন। মন্ত্রিসভায় ৫ জন আওয়ামী লীগ, কংগ্রেস-২, গণতন্ত্রী-১, ইউপিপি-১, তফসিল ফেডারেশন-১, কৃষক শ্রমিক পার্টি-১।

মন্ত্রিসভার সদস্যগণ–

১. আতাউর রহমান খান	মুখ্যমন্ত্রী, স্বরাষ্ট্র, পরিকল্পনা
২. আবুল মনসুর আহমদ	শিক্ষা
৩. কফিলউদ্দিন চৌধুরী	যোগাযোগ, পূর্ত ও সেচ
৪. শেখ মুজিবুর রহমান	বাণিজ্য, শিল্প, শ্রম ও দুর্নীতি
৫. মাহমুদ আলী	রাজস্ব বিভাগ ও জেল
৬. মশিউর রহমান	জনসংযোগ, স্থানীয় সরকার
৭. ধীরেন্দ্র নাথ দত্ত	স্বাস্থ্য
৮. মনোরঞ্জন ধর	অর্থ ও সংখ্যালঘু বিষয়
৯. খয়রাত হোসেন	কৃষি ও পশু
১০. আবদুর রহমান	সমবায়, ঋণ, কৃষি ও বাজার
১১. ক্যাপটেন মনসুর আলী	বিচার ও সংসদীয় বিভাগ
১২. শরৎচন্দ্র মজুমদার	আবগারী, মৎস্য ও লবণ
১৩. গৌরচন্দ্র বালা	বন

হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী

কেন্দ্রের রাজনীতিতে পরিবর্তন আসে। পশ্চিম পাকিস্তানের মুখ্যমন্ত্রী ডা. খান রিপাবলিকান নামে একটি দল গঠন করেন। মুসলিম লীগের অনেক এমএনএ রিপাবলিকান দলে যোগ দেন। ড. খান মুসলিম লীগ হতে সমর্থন প্রত্যাহার করলে প্রধানমন্ত্রী চৌধুরী মহম্মদ আলী সংখ্যাগরিষ্ঠতা হারায়। ১৯৫৬ সালের ৮ সেপ্টেম্বর তিনি পদত্যাগ করেন। ১৯৫৬ সালের ১২ সেপ্টেম্বর পাকিস্তান আওয়ামী লীগের সভাপতি, বিরোধী দলের নেতা হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী পাকিস্তানের পঞ্চম প্রধানমন্ত্রী নিযুক্ত হন।

মন্ত্রিসভার সদস্যবৃন্দ

এইচএস সোহরাওয়ার্দী	প্রধানমন্ত্রী, প্রতিরক্ষা, কাশ্মীর, দেশীয় রাজ্য, সীমান্ত, রিফিউজি পুনর্বাসন
মালিক ফিরোজ খান নূন	পররাষ্ট্র ও কমনওয়েলথ
আবুল মনসুর আহমদ	বাণিজ্য ও শিল্প
সৈয়দ আমজাদ আলী	অর্থ
এম এ খালেক	শ্রম ও পূর্ত
মীর গোলাম আলী তালপুর	স্বরাষ্ট্র
সরদার আমির আজম খান	আইন, তথ্য ও বেতার
এ এইচ দেলদার আহমদ	খাদ্য ও কৃষি
মিয়া জাফর শাহ	যোগাযোগ
জহির উদ্দিন	শিক্ষা, স্বাস্থ্য

প্রতিমন্ত্রী

রসরাজ মণ্ডল	অর্থ
হাজী মাওলা বকস সুমরো	পুনর্বাসন
আবদুল আলীম	অর্থ
নুরুর রহমান	বাণিজ্য

মন্ত্রীদের মধ্যে পূর্ব পাকিস্তান থেকে ছিলেন হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী, আবুল মনসুর আহমদ, এমএ খালেক, এ এইচ দেলদার আহমদ, জহির উদ্দিন। প্রতিমন্ত্রী ছিলেন রসরাজ মণ্ডল, আবদুল আলীম এবং নুরুর রহমান। কেন্দ্রে ও প্রদেশের আওয়ামী লীগ সরকার প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় বাংলায় নবযুগের সৃষ্টি হয়। বাঙালিরা চাকরি ব্যবসা-বাণিজ্যে সুযোগ পায়। বাঙালি জাতির ঐক্য প্রতিষ্ঠিত হয়।

১৯৫৬ সালে পূর্ব পাকিস্তানের দুর্ভিক্ষ অবস্থা সৃষ্টি হয়। ১৪ সেপ্টেম্বর

সোহরাওয়ার্দী ঢাকায় চলে আসেন এবং খাদ্য সংকট দূর করার জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ করেন।

জাতীয় ঐক্য ও ধর্মনিরপেক্ষ রাজনীতি প্রতিষ্ঠার জন্য সোহরাওয়ার্দী পার্লামেন্টে যুক্ত নির্বাচন প্রবর্তনের জন্য উদ্যোগ গ্রহণ করেন। প্রথমে পূর্ব পাকিস্তান আইনসভা ১৯৫৬ সালের ২৯ সেপ্টেম্বর মুখ্যমন্ত্রী আতাউর রহমান যুক্ত নির্বাচন বিল উত্থাপন করে এবং তা ১৫৯-১ ভোটে পাস। বিরোধী দল ভোট দানে বিরত থাকে।

পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর ঢাকায় প্রথম ১৯৫৬ সালের ১৪ অক্টোবর জাতীয় সংসদের অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। জাতীয় পরিষদে সোহরাওয়ার্দী যুক্ত নির্বাচনের সমর্থনে দীর্ঘ ভাষণ দেন। যুক্ত নির্বাচন বিল ৪৮-১৯ ভোটে গৃহীত হয়। ইংরেজ আমল হতে ১৯৫৬ সাল পর্যন্ত পাকিস্তানে পৃথক নির্বাচন প্রচলিত ছিল। হিন্দুরা হিন্দু প্রতিনিধি এবং মুসলমানরা মুসলমান প্রতিনিধি নির্বাচিত করত। যুক্ত নির্বাচন প্রথা প্রবর্তিত হলে দেশে পৃথক নির্বাচন প্রথা থাকবে না। সোহরাওয়ার্দীর পথ ধরে ১৯৬২, ১৯৬৪ এবং ১৯৭০ সালে যুক্ত নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়।

পররাষ্ট্রনীতি

হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী পশ্চিমাপন্থী পররাষ্ট্রনীতি অনুসরণ করেন। তিনি সামরিক চুক্তি এবং সেন্টো, সিয়াটো সমর্থন করেন। তিনি চীন ও রাশিয়ার সাথে সুসম্পর্ক গড়ে তোলেন। ১৯৫৬ সালের ২২ অক্টোবর হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী শেখ মুজিবুর রহমান, তফাজ্জল হোসেন মানিক মিয়াসহ চীন সফরে যান। তিনি চীনের কমিউনিস্ট পার্টি প্রধান মাও সে-তুং ও প্রধানমন্ত্রী চৌ এন লাইর সাথে বৈঠক করেন। ১৯৫৬ সালের ২৯ ডিসেম্বর চীনের প্রধানমন্ত্রী চৌ এন লাই ঢাকা সফর করেন। শেখ মুজিবুর রহমান তাকে সংবর্ধনা জানিয়ে ভাষণ দেন।

শেখ মুজিবুর রহমান বিশ্ব শান্তি সম্মেলনের সদস্য ছিলেন। ১৯৫৬ সালে স্টকহোমে অনুষ্ঠিত শান্তি সম্মেলনে তিনি যোগ দেন। প্রধানমন্ত্রীর সাথে শেখ মুজিব জাপান সফর করেন।

প্রধানমন্ত্রীর দূত হিসেবে শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৫৭ সালের অক্টোবর মাসে রাশিয়ার উদ্দেশে যাত্রা করেন; কিন্তু প্রধানমন্ত্রী পদত্যাগ করায় তিনি দেশে ফিরে আসেন।

আঞ্চলিক বৈষম্য

পাকিস্তান সৃষ্টির পর হতে পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যে বৈষম্য সৃষ্টি শুরু হয়। পশ্চিম পাকিস্তান পূর্ব পাকিস্তানকে শোষণ করত। পূর্বাঞ্চল ছিল পশ্চিম

পাকিস্তানের কলোনি। চাকরি ক্ষেত্রে বিশেষ করে সামরিক বাহিনীতে দু'অঞ্চলে বিশাল বৈষম্য ছিল। ১৯৫৬ সালে সেনাবাহিনীতে বিরাজমান বৈষম্য তুলে ধরা হলে–

পদবি	পশ্চিম পাকিস্তান	পূর্ব পাকিস্তান
জেনারেল	১	০
লেফটেন্যান্ট জেনারেল	৩	০
মেজর জেনারেল	২০	১
ব্রিগেডিয়ার	৩৫	০
কর্নেল	৫০	২
লে. কর্নেল	১৯৮	১০
মেজর	৫৯৩	১০
নৌবাহিনী অফিসার	৬১৩	০
বিমান বাহিনী অফিসার	৬৪০	৬০

পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যে সর্বক্ষেত্রে বৈষম্যের কারণে পাকিস্তানে ঐক্য গড়ে উঠেনি। ফলে বাঙালি জাতীয়তাবাদ আন্দোলন সুদৃঢ় হতে থাকে।

অধ্যায় ৯

কাগমারী সম্মেলন

মওলানা ভাসানীর নেতৃত্বে ১৯৫৭ সালে টাঙ্গাইলের কাগমারী সম্মেলন বাংলাদেশের ইতিহাসে একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। ১৯৫৭ সালের ৫-৭ ফেব্রুয়ারি কাগমারীতে আওয়ামী লীগের কাউন্সিল অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। পূর্ব বাংলার স্বায়ত্তশাসন ও পররাষ্ট্রনীতি সম্মেলনের প্রধান আলোচ্যসূচি ছিল। বিখ্যাত মনীষীদের নামে অনেক গেট ও মঞ্চ নির্মিত হয়েছিল। সভায় প্রধানমন্ত্রী হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী ভাষণ দেন। পররাষ্ট্র নীতি নিয়ে আওয়ামী লীগের মধ্যে মতবিরোধ দেখা দেয়।

"১৯৫৭ সালের ৮ ফেব্রুয়ারি কাগমারী সম্মেলনে মাওলানা ভাসানী ঘোষণা করেন যে, দাবি মানা না হলে ভবিষ্যতে আজ থেকে দশ বছর পর এমন সময় আসতে পারে যখন পূর্ব বাংলা আসসালামু আলাইকুম বলবে।"

কাগমারী সম্মেলনে পররাষ্ট্রনীতি নিয়ে প্রধানমন্ত্রী হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী ও মওলানা ভাসানীর মধ্যে বিরোধ দেখা দেয়। ১৯৫৭ সালের ১৮ মার্চ মওলানা ভাসানী আওয়ামী লীগের সভাপতি পদে ইস্তফা দেন।

যুক্তফ্রন্টের একুশ দফার অন্যতম দফা ছিল আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন। ১৯৫৭ সারের ৩ এপ্রিল গণতন্ত্রী দলের এমএলএ মহিউদ্দিন আহমেদ আইনসভায় আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন প্রস্তাব উত্থাপন করেন। আওয়ামী লীগের সম্পাদক শেখ মুজিবুর রহমান স্বায়ত্তশাসন প্রস্তাব সমর্থন করেন। আইন সভায় প্রস্তাবটি অনুমোদিত হয়।

আওয়ামী লীগের সাংগঠনিক সম্পাদক অলি আহাদের ধারণা ছিল শেখ মুজিবুর রহমান সম্পাদকের পদ ত্যাগ করে মন্ত্রী পদে থাকবেন। তাহলে অলি আহাদ আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক হবেন। কিন্তু শেখ মুজিবুর রহমান মন্ত্রিত্ব ত্যাগ করে দলের সাধারণ সম্পাদক থেকে যান। তখন অলি আহাদ হতাশ। তিনি দলের শৃঙ্খলা ভঙ্গ করলে তাকে বরখাস্ত করা হয়। শেখ মুজিবুর রহমান তাজউদ্দীন আহমদকে দলের সাংগঠনিক সম্পাদক নিযুক্ত করেন।

১৯৫৭ সালের ১৩ ও ১৪ জুন ঢাকার শাবিস্তান সিনেমা হলে পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের কাউন্সিল অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সোহরাওয়াদী ও ভাসানী ভাষণ দেন। সভায় উপস্থিত ৫০০ কাউন্সিলর সোহরাওয়ার্দীর পররাষ্ট্রনীতি সমর্থন করেন। ৩৫ ভোট মওলানা ভাসানীর পক্ষে পড়ে।

ন্যাপ গঠন-১৯৫৭

১৯৫৭ সালে ২৫ জুলাই মওলানা ভাসানীর সভাপতিত্বে ঢাকায় আওয়ামী লীগের বামপন্থী, গণতন্ত্রী দল, কমিউনিস্ট পার্টির সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সভায় পাকিস্তান ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি-ন্যাপ গঠন করা হয়। পূর্ব পাকিস্তানের সভাপতি হলেন মওলানা ভাসানী এবং সম্পাদক হলেন মাহমুদ আলী। পাকিস্তান ন্যাপের সভাপতি ও সম্পাদক নির্বাচিত হন মওলানা ভাসানী ও পশ্চিম পাকিস্তানের মাহমুদুল হক ওসমানী। আওয়ামী লীগে বিভক্ত হয়। ফলে প্রদেশে ও কেন্দ্রে আওয়ামী লীগ দল ভাঙনের সম্মুখীন হয়।

সোহরাওয়ার্দী মন্ত্রিসভার পদত্যাগ

প্রেসিডেন্ট ইস্কান্দার মির্জার ষড়যন্ত্রের কারণে ১৯৫৭ সালের ১১ অক্টোবর সোহরাওয়ার্দী প্রধানমন্ত্রী পদ থেকে পদত্যাগ করেন। ১৯৫৭ সালের ১২ অক্টোবর মুসলিম লীগের আই আই চুন্দ্রিগড় ১৪ সদস্যবিশিষ্ট মন্ত্রিসভা গঠন করেন।

এক মাসের মধ্যে প্রধানমন্ত্রী আই আই চুন্দ্রিগড়ের মন্ত্রিসভার পতন হয়। ১৯৫৭ সালের ১০ ডিসেম্বর রিপাবলিকান দলের নেতা ফিরোজ খান নূন মন্ত্রিসভা গঠন করেন। ১৯৫৭ সালে শেখ মুজিবুর রহমান Under Leadership Exchange Programme-এর অধীনে আমেরিকা সফর করেন। এ সময় তিনি পেটের পীড়ায় ভুগছিলেন। বোস্টন হাসপাতালে তার চিকিৎসা হয়। মুনির চৌধুরী ও মতিউল ইসলাম সিএসপি আমেরিকায় ছিলেন। তাদের সাথে তার সাক্ষাৎ হয়। পরবর্তী সময় মতিউল ইসলাম ও শেখ মুজিবর রহমানের বন্ধুত্ব গভীর হয়।

মন্ত্রিত্ব ত্যাগ

১৯৫৭ সালের ৩০ মে শেখ মুজিবুর রহমান মন্ত্রিত্ব ত্যাগ করে দলের সাধারণ সম্পাদকের দায়িত্ব পালন করেন। তাকে টি বোর্ডের চেয়ারম্যান নিযুক্ত করা হয়। তিনি আবদুল গনি রোডের সরকারি বাসা ত্যাগ করে সেগুনবাগিচায় টি বোর্ডের বাসায় ওঠেন। হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী আওয়ামী লীগের কাজ করার জন্য শেখ মুজিবুর রহমানকে একটি লিমুজিন গাড়ি উপহার দেন।

যুক্তফ্রন্টের ভাঙন

যুক্তফ্রন্টের ভাঙন শুরু হয় এ কে ফজলুল হক ও হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর দ্বন্দ্বের কারণে। ১৯৫৫ সালে কেএসপি কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভায় যোগ দেয়ার পর আওয়ামী লীগ যুক্তফ্রন্ট থেকে বের হয়ে আসে। কেএসপি চৌধুরী মোহাম্মদ আলীর মন্ত্রিসভায় যোগ দেয়। এ সময় আওয়ামী লীগ কেন্দ্রে ও প্রদেশে বিরোধী দলের ভূমিকা পালন করে। এ কে ফজলুল হক যুক্তফ্রন্টকে ঐক্যবদ্ধ করার চেষ্টা করেন। কিন্তু তার চেষ্টা ব্যর্থ হয়। আতাউর রহমান খান, আবুল মনসুর আহমদ, তফাজ্জল হোসেন মানিক মিয়া যুক্তফ্রন্ট ভাঙ্গার জন্য শেখ মুজিবুর রহমানকে দায়ী করেন। শেখ মুজিবুর রহমান যুক্তফ্রন্টকে প্রতিক্রিয়াশীল বলতেন। তিনি আওয়ামী লীগকে এককভাবে শক্তিশালী করায় বিশ্বাসী ছিলেন। ১৯৫৯ সালের মার্চ মাসে সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। তাই তিনি এককভাবে দলকে গড়ে তুলতে চেয়েছেন।

গভর্নর এ কে ফজলুল হক ১৯৫৮ সালের ৩১ মার্চ আতাউর রহমানের মন্ত্রিসভা বাতিল করে কেএসপি নেতা আবু হোসেন সরকারকে মন্ত্রিসভা গঠন করার আহ্বান জানালে আওয়ামী লীগ ক্ষুব্ধ হয়ে এ কে ফজলুল হককে পদচ্যুত করে। শুরু হয় পূর্ব বাংলার ভাঙার রাজনীতি।

আইনসভায় দাঙ্গা-১৯৫৮

পূর্ব পাকিস্তানে বার বার মন্ত্রিসভার রদবদল হতে থাকে। একবার আওয়ামী লীগের আতাউর রহমান খান মন্ত্রিসভা গঠন করে। আবার কেএসপি নেতা আবু হোসেন সরকার মন্ত্রিসভা গঠন করেন। কংগ্রেস ও ন্যাপ তাদের আনুগত্য পরিবর্তন করে। মন্ত্রিসভা অস্থিতিশীল হয়ে পরে। হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী এ খেলার জন্য প্রেসিডেন্ট ইস্কান্দার মির্জাকে দায়ী করেন। প্রেসিডেন্ট এমন ঘটনা সৃষ্টি করতে চায়, যার দ্বারা তিনি সামরিক শাসন জারির যুক্তি খুঁজে পান। এ ব্যাপারে তিনি কেএসপিকে ব্যবহার করেন। আওয়ামী লীগ স্পিকার আবদুল হাকিমের বিরুদ্ধে অনাস্থা দিয়েছে। তারা ডেপুটি স্পিকার শাহেদ আলী পাটওয়ারীকে ১৯৫৮-৫৯ সালের বাজেট সেশন চালিয়ে যেতে অনুরোধ করে। তিনি সম্মত হলেন। ১৯৫৮ সালের ২৩ সেপ্টেম্বর পূর্ব পাকিস্তান আইন পরিষদে তুমুল সংঘর্ষ হয়। কেএসপি তাকে অধিবেশন চালাতে দেবে না। ডেপুটি স্পিকারকে লক্ষ্য করে তারা চেয়ারের হাতল ছুড়ে মারতে থাকে। সরকারি ও বিরোধী দলের মধ্যে সংঘর্ষ বাধে। একপর্যায়ে ডেপুটি স্পিকার শাহেদ আলী পাটওয়ারী গুরুতর আহত হন। তিনি ছিলেন ডায়াবেটিসের রোগী। তাকে ঢাকা

মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। তার অবস্থার অবনতি ঘটে। ১৯৫৮ সালের ২৫ সেপ্টেম্বর ১-২০ মিনিটে তিনি মৃত্যুবরণ করেন। ২৫ সেপ্টেম্বর গিলোটিন করে বাজেট পাস হয়। ডেপুটি স্পিকার শাহেদ আলী পাটোয়ারীর হত্যাকে কেন্দ্র করে প্রেসিডেন্ট ইস্কান্দার মির্জা ও জেনারেল আইয়ুব খান ক্ষমতা দখলের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন।

আওয়ামী লীগ ভেঙে যাওয়ায় ন্যাপ সৃষ্টি। ন্যাপের এমএলএগণ প্রদেশে আওয়ামী লীগ মন্ত্রিসভাকে সমর্থন করছে না। তারা আবু হোসেনকে সমর্থন দেয়। ফলে আওয়ামী লীগ নেতা আতাউর রহমান সংখ্যাগরিষ্ঠতা হারায়। ১৯৫৮ সালের ৩১ মার্চ গভর্নর একে ফজলুল হক তার মন্ত্রিসভা ভেঙে দেয় এবং আবু হোসেন সরকারকে মন্ত্রিসভা গঠন করার জন্য আহ্বান জানান। আবু হোসেন সরকার মন্ত্রিসভা গঠন করেন। কিন্তু সংখ্যাগরিষ্ঠতা না থাকায় তাকে ২৪ ঘণ্টার মধ্যে পদত্যাগ করতে হয়। এদিকে হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী গভর্নরের পদক্ষেপে অসন্তুষ্ট হয়ে প্রধানমন্ত্রী ফিরোজ খান নূনকে দিয়ে ফজলুল হককে গভর্নরের পদ থেকে অপসারণ করান। ১৯৫৮ সালের ১ এপ্রিল এ কে ফজলুল হক গভর্নর পদ হারান। তার স্থলে চীফ সেক্রেটারি হামিদ আলীকে পূর্ব পাকিস্তানের গভর্নরের দায়িত্ব দেয়া হয়।

জননায়ক ফজলুল হকের প্রতি অন্যায় আচরণ করা হয়েছে। আওয়ামী লীগের ধারণা এ কে ফজলুল হক তার নিজস্ব দল কেএসপিকে ক্ষমতাসীন করার জন্য আতাউর রহমান খানের মন্ত্রিসভা বাতিল করেছে। কিন্তু এ কথা সত্য নয়। ন্যাপ আওয়ামী লীগ ত্যাগ করে কেএসপিকে সমর্থন করে। আবার তারা কেএসপির প্রতি সমর্থন প্রত্যাহার করলে ২৪ ঘণ্টার মধ্যে আবু হোসেন সরকারের মন্ত্রিসভার পতন হয়। পুনরায় আতাউর রহমান খান মন্ত্রিসভা গঠন করে এবং ১৯৫৮ সালের ৭ অক্টোবর পর্যন্ত ক্ষমতায় ছিল।

আওয়ামী লীগের সমর্থক রাষ্ট্রদূত মোহাম্মদ সুলতান উদ্দিনকে পূর্ব পাকিস্তানের গভর্নর নিয়োগ করা হয়।

শেরে বাংলা এ কে ফজলুল হক ১৯৫৮ সালের পর রাজনীতিতে ফিরে আসেননি। ঢাকার কে এম দাশ লেনের বাসায় অবসর জীবন যাপন করতেন।

পশ্চিম পাকিস্তান আইনসভা এক ইউনিট বাতিল করে। ন্যাপ তা সমর্থন করে। কিন্তু হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী এক ইউনিটের পক্ষে। তিনি পশ্চিম পাকিস্তান আইন সভার সমালোচনা করেন। আওয়ামী লীগ এক ইউনিট ভাঙার বিরোধিতা করায় ন্যাপ আতাউর রহমান খানের প্রতি সমর্থন প্রত্যাহার করে। ১৯৫৮ সালের ১৮ জুন আওয়ামী লীগ মন্ত্রিসভার পতন হয়। ১৯৫৮ সালের ১৯

জুন আবু হোসেন সরকার পুনরায় মন্ত্রিসভা গঠন করেন। ২২ জুন অনাস্থা ভোটে আবু হোসেন সরকারের মন্ত্রিসভার পতন হয়। ২৫ জুন শাসনতন্ত্রের ১৯৩(ক) ধারায় পূর্ব পাকিস্তানে গভর্নর শাসন জারি হয়। প্রায় দু'মাস রাষ্ট্রপতির শাসন চলতে থাকে। আওয়ামী লীগের সংখ্যাগরিষ্ঠতা প্রমাণিত হওয়ায় ১৯৫৮ সালের ২৯ আগস্ট আতাউর রহমান খান মন্ত্রিসভা গঠন করেন। কেন্দ্রীয় সরকার ঘোষণা করে যে, ১৯৫৯ সালের মার্চ মাসে সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে।

শেখ মুজিবুর রহমানের রাজনৈতিক কার্যাবলি সম্পর্কে পূর্ব পাকিস্তান স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের প্রতিবেদন

দেশ বিভাগের পূর্বে শেখ মুজিবুর রহমান মুসলিম ছাত্রলীগের প্রভাবশালী নেতা ছিলেন। দেশ বিভাগের পর ঢাকা বিশ্ববিদালয়ে আইন বিভাগে ভর্তি হন। তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারীদের আন্দোলনে অংশ নেয়ার অভিযোগে তিনি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বহিষ্কার হন। ১৯৪৮ সালে ভাষা আন্দোলনে তিনি বিশেষ ভূমিকা পালন করেন। ১৯৪৮ সালে ১১ মার্চ ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করার অভিযোগে তিনি গ্রেফতার হন এবং ১৪ মার্চ মুক্তি লাভ করেন।

তিনি হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর নেতৃত্বে বিরোধী দলে যোগ দেন। ১৯৪৯ সালের ২৯ এপ্রিল তাকে গ্রেফতার করা হয়। জেলে থাকায় তিনি রাজবন্দীদের মুক্তির দাবিতে অনশন পালন করেন। ১৯৫২ সালের ২৭ ফেব্রুয়ারি তিনি মুক্তি পান। ১৯৫২ সালের সেপ্টেম্বর মাসে তিনি পিকিং সম্মেলনে যোগ দেন। ১৯৫৩ সালের ২১ ফেব্রুয়ারি তিনি ঘোষণা দেন যে, বাংলাকে যতিদিন অন্যতম রাষ্ট্রভাষা করা না হবে ততদিন আন্দোলন চলবে।

১৯৫৩ সালের জুলাই মাসে দলের প্রথম বার্ষিকী সম্মেলনে শেখ মুজিবুর রহমান আওয়ামী মুসলিম লীগের সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হন। ১৯৫৪ সালের ৩০ মে রাতে ঢাকা জেল ব্যারাক ভেঙে ফেলার অভিযোগে তাকে গ্রেফতার করে। ১৯৫৫ সালে ১৮ ফেব্রুয়ারি মুক্তি লাভ করেন।

পাকিস্তানে সামরিক আইন জারি হলে ১৯৫৮ সালের ১২ অক্টোবর তিনি গ্রেফতার হন। তিনি ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে বন্দী ছিলেন।

অধ্যায় ১০

আইয়ুব খানের সামরিক শাসন

পাকিস্তান সরকার ঘোষণা করে যে, ১৯৫৯ সালের ১৫ মার্চ দেশে সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। দেশ গণতন্ত্রের পথে যাবে। কিন্তু প্রেসিডেন্ট ইস্কান্দার মির্জা ও জেনারেল আইয়ুব খান ক্ষমতা দখলের ষড়যন্ত্র করতে থাকে। তারা ক্ষমতা দখলের ক্ষেত্র প্রস্তুত করেছেন। ক্ষেত্রগুলো হলো– পূর্ব পাকিস্তানের আইনসভায় ডেপুটি স্পিকার শাহেদ আলী পাটোয়ারী হত্যা এবং কেন্দ্রে সরকার গঠনে অস্থিতিশীলতা সৃষ্টি করা, আওয়ামী লীগ ও রিপাবলিকান পার্টি কেন্দ্রে সরকার গঠন করা, ফিরোজ খান নূন প্রধানমন্ত্রী এবং কেন্দ্রে মন্ত্রীদের দফতর বণ্টন নিয়ে বিরোধ। সোহরাওয়ার্দী বলেন, তার দল ফিরোজ খান নূনকে সমর্থন করবে। তবে মন্ত্রিত্ব গ্রহণ করবে না। এমন পরিস্থিতিতে প্রেসিডেন্ট ইস্কান্দার মির্জা ১৯৫৮ সালের ৭ অক্টোবর রাত ১০.৩০ মিনিটে বেতার ভাষণ দেন এবং দেশে সামরিক আইন জারি করে নিম্নের পদক্ষেপ গ্রহণ করেন।

১. ১৯৫৬ সালের ২৩ মার্চের শাসনতন্ত্র বাতিল
২. কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক সরকার বাতিল
৩. কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক আইন সভা ভেঙে দেয়া হয়েছে
৪. সকল রাজনৈতিক দল বেআইনি ঘোষণা
৫. সারা দেশে সামরিক আইন জারি করা হয়েছে।

৮ অক্টোবর প্রেসিডেন্ট ইস্কান্দার মির্জা অন্তর্বর্তীকালীন মন্ত্রিসভা গঠন করেন।

মেজর জেনারেল ইস্কান্দার মির্জা	প্রেসিডেন্ট
লে. জেনারেল মুহাম্মদ আইয়ুব খান	প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক
লে. জেনারেল আজম খান	পুনর্বাসন
লে. জেনারেল বারকি	স্বাস্থ্য ও শ্রম
বিচারপতি মোহাম্মদ ইব্রাহিম	আইন
আবুল কাসেম খান	শিল্প ও পূর্ত
এফএম খান	যোগাযোগ

লে. জেনারেল কেএম শেখ	খাদ্য ও কৃষি
জুলফিকার আলী ভুট্টো	বাণিজ্য

পূর্ব পাকিস্তানে পুলিশের সাবেক আইজি জাকির হোসেন এবং পশ্চিম পাকিস্তানে কালাবাগের আমির আজমকে গভর্নর নিযুক্ত করা হয়। মেজর জেনারেল ওমরাও খান পূর্ব পাকিস্তানের জিওসি নিযুক্ত হন। ২৪ অক্টোবর জেনারেল আইয়ুব খানকে প্রধানমন্ত্রী নিযুক্ত হয় এবং ২৭ অক্টোবর শপথ গ্রহণ করেন।

প্রেসিডেন্ট ইস্কান্দার মির্জা জেনারেল আইয়ুব খানকে পদচ্যুত করার ষড়যন্ত্র করে। এ সংবাদ পেয়ে আইয়ুব খান ২৭ অক্টোবর প্রেসিডেন্ট ইস্কান্দার মির্জাকে পদত্যাগ করতে বাধ্য করেন এবং তাকে লন্ডন পাঠিয়ে দেন। ১৯৫৮ সালের ২৭ অক্টোবর আইয়ুব খান ১১ সদস্যবিশিষ্ট মন্ত্রিসভা গঠন করেন।

জেনারেল মুহাম্মদ আইয়ুব খান	প্রেসিডেন্ট, প্রধান সামরিক শাসক
লে. জেনারেল মুহাম্মদ আজম খান	পুনর্বাসন ও পূর্ত
লে. জেনারেল ডব্লিউ এ বারকি	স্বাস্থ্য ও সমাজকল্যাণ
মঞ্জুর কাদের	পররাষ্ট্র
মুহাম্মদ ইব্রাহিম	আইন
লে. জেনারেল কে এম শেখ	স্বরাষ্ট্র
মুহাম্মদ শোয়েব	অর্থ
এ কে খান	শিল্প ও সেচ
এফ এম খান	রেল ও যোগাযোগ
হাবিবুর রহমান	শিক্ষা ও তথ্য
জুলফিকার আলী ভুট্টো	বাণিজ্য
হাফিজুর রহমান	খাদ্য ও কৃষি

সামরিক আইন জারি হলে শেখ মুজিবুর রহমানসহ শত শত নেতাকর্মীকে গ্রেফতার করা হয়। মওলানা ভাসানীকে গ্রেফতার করে ঢাকায় অন্তরীণ রাখা হয়।

১৯৫৮ সালের ১০ অক্টোবর শেখ মুজিবুর রহানকে তার বাসভবন থেকে গ্রেফতার করে ঢাকা কেন্দ্রীয় জেলে আটক রাখা হয়। ১৯৫৮ সালের ২০ অক্টোবর তাকে বিশেষ আইনে নিরাপত্তা বন্দী করা হয়। তার বিরুদ্ধে ৯টি মামলা দায়ের করা হয়।

সামরিক আইনে আবুল মনসুর আহমদ, হামিদুল হক চৌধুরী, আবদুল খালেক, অতিরিক্ত চীফ সেক্রেটারি আসগর আলী খান, চীফ ইঞ্জিনিয়ার আবদুল জব্বার প্রমুখ গ্রেফতার হন। প্রেসিডেন্ট আইয়ুব খান ১৯৫৯ সালের ৪ সেপ্টেম্বর ৪৩ জন রাজনীতিবিদদের বিরুদ্ধে এবডো প্রয়োগ করে তাদের রাজনীতি করা

নিষিদ্ধ করেন। নেতারা হলেন আতাউর রহমান খান, আবু হোসেন সরকার, ইউসুফ আলী চৌধুরী, মোহাম্মদ মনসুর আলী, মশিউর রহমান, কফিলউদ্দিন চৌধুরী, আবদুল লতিফ বিশ্বাস, মাহমুদুন নবী চৌধুরী, আবদুল হালিম, হামিদ চৌধুরী, এম কোরবান আলী, নূরউদ্দিন আহমদ প্রমুখ। ১৯৫৯ সালের ২৭ ডিসেম্বর শেখ মুজিবুর রহমান মুক্তি লাভ করেন।

১৯৫৯ সালে আইয়ুব খান মৌলিক গণতন্ত্র প্রবর্তন করেন। প্রেসিডেন্ট আইয়ুব খান ১৯৬০ সালে মৌলিক গণতন্ত্রীদের দ্বারা 'হ্যাঁ' 'না' ভোটে প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হন। সাধারণ নাগরিকদের ভোটাধিকার ছিল না। পাকিস্তানের ৮০ হাজার মৌলিক গণতন্ত্রী ভোটার ছিল।

১৯৬০ সালের ১৫ এপ্রিল লে. জেনারেল আজম খান পূর্ব পাকিস্তানের গভর্নর নিযুক্ত হন।

১৯৬০ সালের ১০ ও ৩১ অক্টোবর পূর্ব পাকিস্তানের উপকূল অঞ্চলে ঘূর্ণিঝড় ও জলোচ্ছ্বাস বয়ে যায়। অনেক লোক নিহত হয়।

১৯৬০ সালের ১৯ সেপ্টেম্বর করাচীতে ভারতের প্রধানমন্ত্রী পণ্ডিত জওহর লাল নেহরুর সাথে সিন্ধু নদীর পানি বণ্টন চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়।

ঢাকা জেলা জজ এস এ মওদুদ ১৯৬০ সালের ১২ সেপ্টেম্বর দুর্নীতি ও ক্ষমতা অপব্যবহার মামলায় শেখ মুজিবুর রহমানকে দু'বছর শাস্তি দেন। ১৯৬০ সালের ২৩ সেপ্টেম্বর হাইকোর্ট তাকে জামিন দেয়। ১৯৬১ সালের ২১ জুন ঢাকা হাইকোর্টের বিচারপতি আসির একটি দুর্নীতি মামলা থেকে তাকে খালাস দেন। এ মামলায় সোহরাওয়ার্দী ৫ ঘণ্টা সওয়াল জবাব করেন।

অধ্যায় ১১

গণতন্ত্র পুনরুদ্ধারের সংগ্রাম

১৯৫৯ সালের ২৭ ডিসেম্বর শেখ মুজিবুর রহমান মুক্তি লাভ করেন। সামরিক সরকার তার বিরুদ্ধে একাধিক দুর্নীতির মামলা দায়ের করে। পাকিস্তান আওয়ামী লীগের সভাপতি হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী দলীয় নেতাকর্মীদের মামলা পরিচালনা করতেন। তার চেষ্টায় অনেক নেতাকর্মী মুক্তি লাভ করেন।

আওয়ামী লীগকে শক্তিশালী করার জন্য সোহরাওয়ার্দী দৈনিক ইত্তেফাক পত্রিকার পৃষ্ঠপোষকতা ও শেখ মুজিবুর রহমানকে আর্থিক সচ্ছল অবস্থায় রাখতেন। তার সুপারিশে শেখ মুজিবুর রহমান মাসিক ১৫০০ টাকা বেতনে পাকিস্তান আলফা ইন্স্যুরেন্সের পূর্ব পাকিস্তানের কন্ট্রোলার নিযুক্ত হন। সোহরাওয়ার্দী তাকে একটি লাল রঙের জীপ (নম্বর ১১০০) উপহার দেন। এ কারণে শেখ মুজিবকে সংসার পরিচালনা নিয়ে ভাবতে হয়নি। তিনি সার্বক্ষণিকভাবে দলের সাংগঠনিক কাজ করার সুযোগ পেয়েছেন।

১৯৬২ সালে হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী গ্রেফতার ও ছাত্র আন্দোলন

১৯৬০ সালের ১৭ ফেব্রুয়ারি শাসনতন্ত্র প্রণয়নের জন্য আইয়ুব খান পশ্চিম পাকিস্তানের বিচারপতি সাহাবুদ্দিনের নেতৃত্বে শাসনতন্ত্র কমিশন গঠন করেন। কমিশন ১৯৬২ সালের মে মাসে সংসদীয় গণতন্ত্র সুপারিশ করে প্রতিবেদন দেয়। কিন্তু আইয়ুব খানের নির্দেশে মন্ত্রিসভা প্রেসিডেন্ট পদ্ধতির শাসন ব্যবস্থা অনুমোদন করে। হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী সামরিক শাসন মেনে নেননি। তিনি সামরিক সরকারের বিরুদ্ধে আন্দোলন করার নির্দেশ দেন। আইয়ুব খান ১৯৬২ সালের ৩০ জানুয়ারি তাকে করাচির বাসভবন থেকে গ্রেফতার করে জেলে আটক রাখে। সোহরাওয়ার্দীর গ্রেফতারের বিরুদ্ধে পূর্ব পাকিস্তানে আন্দোলন শুরু হয়। ১৯৬২ সালে ১ ফেব্রুয়ারি ঢাকা বিশ্ববিদালয়ের ছাত্র সমাজ তার মুক্তির দাবিতে সামরিক আইন ভঙ্গ করে হরতাল, মিছিল শুরু করে। সামরিক সরকার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ ঘোষণা করে। ৬ ফেব্রুয়ারি ঢাকার ছাত্র সমাজ সামরিক

সরকারের বিরুদ্ধে মিছিল করে রাস্তায় বেরিয়ে আসে। তারা অফিস-দোকানপাট থেকে আইয়ুব খানের ছবি ভাঙচুর করে। সরকার রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের গ্রেফতার শুরু করে। ৬ ফেব্রুয়ারি শেখ মুজিবুর রহমান, তফাজ্জল হোসেন মানিক মিয়া, তাজউদ্দীন আহমদসহ অনেকেই গ্রেফতার হন।

শেখ মুজিবুর রহমানের আগরতলা গমন

১৯৬২ সালের ফেব্রুয়ারি মাসের প্রথম সপ্তাহে গোপন শেখ মুজিবুর রহমান ত্রিপুরায় গমন করেন। তিনি ত্রিপুরা ও লন্ডন থেকে সুভাষ চন্দ্র বসুর ন্যায় পূর্ব পাকিস্তানের স্বাধীনতার জন্য সংগ্রাম চালিয়ে যাবেন। প্রধানমন্ত্রী পণ্ডিত নেহেরু শেখ মুজিবুর রহমানের এ প্রস্তাবে রাজি হননি। তাই বাধ্য হয়ে শেখ মুজিবুর রহমান ৫ ফেব্রুয়ারি বাংলাদেশে ফিরে আসেন। ৬ ফেব্রুয়ারি সকালেই পুলিশ তাকে গ্রেফতার করে।

আইয়ুব খানের শাসনতন্ত্র ঘোষণা

১৯৬২ সালের ১ মার্চ আইয়ুব খান প্রেসিডেন্ট পদ্ধতির শাসনতন্ত্র ঘোষণা করেন। ১৯৬২ সালের ১৪ এপ্রিল পূর্ব পাকিস্তানের বিরোধী দলের নেতৃবৃন্দ আইয়ুব খানের একতরফা শাসনতন্ত্র গ্রহণ ও নির্বাচনে অংশগ্রহণ না করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। প্রেসিডেন্ট আইয়ুব খান ২৮ এপ্রিল জাতীয় পরিষদ ও ৬ মে প্রাদেশিক পরিষদের নির্বাচন অনুষ্ঠানের ঘোষণা দেন।

শেরেবাংলা এ কে ফজলুল হকের মৃত্যু

১৯৬২ সালের ২৭ এপ্রিল শেরেবাংলা এ কে ফজলুল হক ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে মৃত্যুবরণ করেন। ২৮ এপ্রিল তাকে ঢাকা হাইকোর্ট প্রাঙ্গণে সমাহিত করা হয়।

জাতীয় পরিষদ ও প্রাদেশিক পরিষদের নির্বাচন

১৯৬২ সালের ২৮ এপ্রিল জাতীয় পরিষদের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। ভোটার ৮০ হাজার মৌলিক গণতন্ত্রী। কেন্দ্রীয় পরিষদের সদস্য সংখ্যা ছিল ১৬৭ জন। পূর্ব পাকিস্তান প্রাদেশিক পরিষদের সদস্য ছিল ১৫৬ জন।

পূর্ব পাকিস্তানের জনপ্রিয় গভর্নর লে. জেনারেল আজম খানের সাথে আইয়ুব খানের বিরোধ সৃষ্টি হয়। ১৯৬২ সালের ১০ মে আজম খান পদত্যাগ করেন। তার স্থলে গোলাম ফারুক গভর্নর নিযুক্ত হন। ১৯৬২ সালের ৮ জুন আইয়ুব খান সামরিক আইন প্রত্যাহার করেন।

১৯৬২ সালের ৮ জুন তমিজউদ্দিন খান স্পিকার, আবুল কাশেম ও আফজাল চিমা ডেপুটি স্পিকার নির্বাচিত হন।

১৯৬২ সালের ১৩ জুন আইয়ুব খান বগুড়ার মোহাম্মদ আলীকে সিনিয়র মন্ত্রী করে মন্ত্রিসভা গঠন করেন। মন্ত্রিসভা হলো–

মুহাম্মদ আলী	পররাষ্ট্র, সিনিয়র মন্ত্রী
বিচারপতি মুহাম্মদ মুনীর	আইন
আবদুল কাদির	অর্থ
আবদুল মোনায়েম খান	স্বাস্থ্য, শ্রম
হাবিবুল্লাহ খান	স্বরাষ্ট্র, কাশ্মীর
ওয়াহেদুজ্জামান	বাণিজ্য
সবুর খান	যোগাযোগ
এ কে এম ফজলুল কাদের চৌধুরী	খাদ্য ও কৃষি
আবদুল ওয়াহেদ খান	তথ্য ও বেতার
এ টি এম মোস্তফা	শিক্ষা

পরে আইন, অর্থ ও স্বাস্থ্যমন্ত্রী পদত্যাগ করলে তাদের স্থলে মন্ত্রী হলেন

শেখ মোহাম্মদ শোয়েব	অর্থ
শেখ খুরশিদ আহমদ	আইন
আবদুল্লাহ জহিরউদ্দিন	স্বাস্থ্য ও শ্রম

১৯৬৩ সালে বগুড়ার মুহাম্মদ আলীর মৃত্যুর পর জুলফিকার আলী ভুট্টো পররাষ্ট্রমন্ত্রী এবং খুলনার সবুর খান সিনিয়র মন্ত্রী নিযুক্ত হন।

৯ নেতার বিবৃতি

১৯৬২ সালের ১৮ জুন আইয়ুব খান পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক শেখ মুজিবুর রহমানকে মুক্তি দেন। পূর্ব পাকিস্তানের বিরোধী দলের ৯ জন নেতা ১৯৬২ সালের ২৪ জুন সর্বজনীন ভোটে নির্বাচিত গণপরিষদ কর্তৃক শাসনতন্ত্র প্রণয়নের আহ্বান জানান। নেতারা হলেন–

নুরুল আমিন, মুসলিম লীগ
আতাউর রহমান খান, আওয়ামী লীগ
শেখ মুজিবুর রহমান, আওয়ামী লীগ
আবু হোসেন সরকার, কেএসপি
হামিদুল হক চৌধুরী, কেএসপি
এস এম সোলায়মান, কেএসপি

মাহমুদ আলী, ন্যাপ
সৈয়দ আজিজুল হক, কেএসপি
মৌলানা পীর মুহসেনউদ্দিন দুদু মিয়া-নেজামে ইসলাম

নয় নেতার বিবৃতি প্রকাশিত হওয়ার পর ছাত্র ও জনগণের মধ্যে বিপুল সাড়া পড়ে যায়। প্রাপ্তবয়স্কদের ভোটের ভিত্তিতে গণপরিষদের নির্বাচন এবং শাসনতন্ত্র প্রণয়নের দাবি শক্তিশালী হতে থাকে।

১৯৬২ সালের ১৪ জুলাই আইয়ুব খান রাজনৈতিক দল বিধি প্রণয়ন করে এবং তা সংসদে পাস হয়। যে সকল রাজনৈতিক নেতার বিরুদ্ধে এবডো প্রয়োগ করা হয়েছে, তারা ১৯৬৬ সাল পর্যন্ত কোনো রাজনৈতিক দলের সদস্য হতে পারবে না। তারা রাজনৈতিক কাজে অংশগ্রহণ করতে পারবে না।

সোহরাওয়ার্দীর মুক্তি

তীব্র আন্দোলনের মুখে প্রেসিডেন্ট জেনারেল আইয়ুব খান পাকিস্তান আওয়ামী লীগ সভাপতি গণতন্ত্রের মানসপুত্র হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীকে ১৯৬২ সালের ১৯ আগস্ট মুক্তি দেন। জেলে ৬ মাস ২০ দিন কারাভোগের পর তিনি মুক্তি পেলেন। জেলে থাকায় তিনি জটিল রোগে আক্রান্ত হন। ১৯৬২ সালের ১৬ সেপ্টেম্বর করাচী থেকে বিমানযোগে ঢাকা তেজগাঁও বিমানবন্দরে অবতরণ করেন। কয়েক লক্ষ জনতা তাকে সংবর্ধনা জানায়।

শিক্ষা আন্দোলন ১৯৬২-৬৪

জেনারেল আইয়ুব খান ক্ষমতা দখল করার পর শিক্ষা ক্ষেত্রে সংস্কারের জন্য ১৯৫৮ সালের ৩০ ডিসেম্বর কেন্দ্রীয় শিক্ষা সচিব ড. এসএম শরিফের নেতৃত্বে দশ সদস্যবিশিষ্ট শিক্ষা কমিশন গঠন করা হয়। কমিশন উচ্চ শিক্ষা সংশোধন, ব্যয় বৃদ্ধি, ছাত্র রাজনীতি বন্ধ, ডিগ্রি কোর্স ২ বছরের পরিবর্তে ৩ বছর প্রভৃতি সুপারিশ করে ১৯৬০ সালে রিপোর্ট প্রকাশ করে। কমিশনের রিপোর্টের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ ও সমালোচনা শুরু হয়। শিক্ষা কমিশনের রিপোর্ট বাতিলের দাবিতে ছাত্রলীগ ও ছাত্র ইউনিয়ন ১৯৬২ সালের ১৭ সেপ্টেম্বর প্রদেশব্যাপী হরতাল পালন করে। ঢাকায় পুলিশ মিছিলে গুলি করে মোস্তফা, বাবুল ও ওয়াজিউল্লাহকে হত্যা করে। ছাত্র সমাজ ১৭ সেপ্টেম্বর শিক্ষা দিবস হিসেবে পালনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। ছাত্র আন্দোলনের মুখে সরকার শরীফ কমিশন রিপোর্ট বাস্তবায়ন স্থগিত করে এবং তিন বছরের ডিগ্রি কোর্স পুনরায় দু'বছরে ফিরিয়ে আনে। তৃতীয় বছরের ছাত্র-ছাত্রী অটো প্রমোশন পায়।

হামুদুর রহমান শিক্ষা কমিশন রিপোর্ট

সরকার শরীফ কমিশনের রিপোর্ট পর্যালোচনা ও ছাত্র অসন্তোষ অনুসন্ধানের জন্য পাকিস্তান সরকার ১৯৬৪ সালের ১৫ ডিসেম্বর সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি হামুদুর রহমানের নেতৃত্বে একটি কমিশন গঠন করে। কমিশনের রিপোর্টে ছাত্রদের দাবি উপেক্ষিত হয়। পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানে হামুদুর রহমান কমিশনের রিপোর্ট বাতিলের দাবিতে ১৯৬৪ সাল হতে ছাত্র আন্দোলন শুরু হয়। ১৯৬৪ সালে শিক্ষা কমিশনের রিপোর্টকে হামুদুর রহমান শিক্ষানীতি বলা হয়ে থাকে। ছাত্র আন্দোলনের ফলে হামুদুর রহমান শিক্ষানীতি বাতিল হয়ে যায়।

শিক্ষা আন্দোলনে ছাত্র নেতাদের মধ্যে ছিলেন শেখ ফজলুল হক মনি, আসমত আলী সিকদার, সিরাজুল আলম খান, সওগাতুল আলম সগীর, রাশেদ খান মেনন, কাজী জাফর আহমদ প্রমুখ।

এনডিএফ গঠন

গণতন্ত্র পুনরুদ্ধারের জন্য হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী ১৯৬২ সালের ৪ অক্টোবর লাহোরে এক সম্মেলন আহ্বান করেন। আওয়ামী লীগ, ন্যাপ, কেএসপি, রিপাবলিকান পার্টি, কাউন্সিল মুসলিম লীগ সভায় যোগ দেয়। সভায় এনডিএফ-National Democratic Front গঠন করা হয়। সভায় সিদ্ধান্ত হয় যে, গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত না হওয়া পর্যন্ত রাজনৈতিক দল পুনরুজ্জীবিত হবে না। ১৯৬২ সালের ৭ অক্টোবর হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী পল্টন ময়দানে ৫ লাখ লোকের উপস্থিতিতে ভাষণ দেন। তিনি সকল জেলা, মহকুমায় এনডিএফ গঠন করার নির্দেশ দেন। আওয়ামী লীগের ২ জন, ন্যাপের ২ জন, কেএসপির ১-২ জন, মুসলিম লীগের ১-২ জন এবং নেজামে ইসলামের ১ জন নিয়ে থানা, মহকুমা জেলা এনডিএফ কমিটি গঠনের নির্দেশ দেয়া হয়।

নিম্নলিখিত নেতাদের নিয়ে পূর্ব পাকিস্তান এনডিএফ গঠন করা হয়।

নাম	দলের নাম	পদ
নুরুল আমিন	মুসলিম লীগ	আহ্বায়ক
আতাউর রহমান খান	আওয়ামী লীগ	সদস্য
শেখ মুজিবুর রহমান	আওয়ামী লীগ	সদস্য
আবুল মনসুর আহমদ	আওয়ামী লীগ	সদস্য
খন্দকার মোস্তাক আহমেদ	আওয়ামী লীগ	সদস্য
এম মনসুর আলী	আওয়ামী লীগ	সদস্য
এ এইচ এম কামরুজ্জামন	আওয়ামী লীগ	সদস্য

আবু হোসেন সরকার	কেএসপি	সদস্য
হামিদুল হক চৌধুরী	কেএসপি	সদস্য
সৈয়দ আজিজুল হক	কেএসপি	সদস্য
তোফাজ্জল আলী	ইসলামী ফ্রন্ট	সদস্য
শাহ আজিজুর রহমান	ইসলামী ফ্রন্ট	সদস্য
ফজলুর রহমান	ইসলামী ফ্রন্ট	সদস্য
খাজা খয়ের উদ্দিন	ইসলামী ফ্রন্ট	সদস্য
শফিকুল ইসলাম	ইসলামী ফ্রন্ট	সদস্য
হাজী মোহাম্মদ দানেশ	ন্যাপ	সদস্য
মাহমুদ আলী	ন্যাপ	সদস্য
প্রফেসর মোজাফফর আহমদ	ন্যাপ	সদস্য
মশিউর রহমান	ন্যাপ	সদস্য
মহিউদ্দিন আহমেদ	ন্যাপ	সদস্য
অলি আহাদ	ন্যাপ	সদস্য
পীর মোহসেন উদ্দিন দুদু মিয়া	নেজাম ইসলাম	সদস্য
মৌলভী ফরিদউদ্দিন আহমদ	নেজামে ইসলাম	সদস্য

এনডিএফ নেতাদের নিয়ে হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী পূর্ব পাকিস্তানের সকল জেলা, মহকুমা সফর করেন। লক্ষ লক্ষ লোক তার সভায় উপস্থিত হতো। তার আহ্বানে গণজাগরণ সৃষ্টি হয়। ১৯৬২ সালের ৩ নভেম্বর মওলানা ভাসানীর অন্তরীণ আদেশ প্রত্যাহার করা হয়। তিনি মুক্তি লাভ করেন।

কনভেনশন মুসলিম লীগ

আইয়ুব খান রাজনৈতিক দলগুলোর কঠোর সমালোচনা করতেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত ১৯৬২ সালের ৪ ও ৫ সেপ্টেম্বর মুসলিম লীগের কনভেনশন আহ্বান করা হয়। চৌধুরী খালেকুজ্জামানকে আহ্বায়ক করে পশ্চিম পাকিস্তানে এবং আবুল হাশিমকে আহ্বায়ক করে পূর্ব পাকিস্তানে কনভেনশন মুসলিম লীগ গঠন করা হয়।

১৯৬৩ সালের ২৩ জানুয়ারি পাকিস্তানের পররাষ্ট্রমন্ত্রী ও দল নেতা মুহাম্মদ আলী হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যুবরণ করেন।

হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর মৃত্যু– ৫ ডিসেম্বর ১৯৬৩

১৯৬২ সালের ৩১ ডিসেম্বর সোহরাওয়ার্দী হৃদরোগে আক্রান্ত হন। ১৯৬৩ সালের ১৯ মার্চ চিকিৎসার জন্য বৈরুতে গমন করেন। চিকিৎসার পর তিনি লন্ডনে তার পুত্র রাশেদ সোহরাওয়ার্দীর সাথে থাকেন। চিকিৎসার জন্য তিনি পুনরায় বৈরুত গমন

করেন। ১৯৬৩ সালের ৫ ডিসেম্বর বৈরুতের হোটেল ইন্টারকন্টিনেন্টালে হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে তিনি মৃত্যুবরণ করেন। ৮ ডিসেম্বর তার লাশ ঢাকা বিমানবন্দরে পৌঁছলে লাখ লাখ বাঙালি কান্নায় ভেঙে পড়ে। রমনা রেসকোর্স ময়দানে কয়েক লাখ লোক জানাজায় অংশ নেন। তাকে হাইকোর্ট প্রাঙ্গণে শেরে বাংলার মাজারের পাশে সমাহিত করা হয়। তার মৃত্যুতে পাকিস্তানের রাজনীতিতে অপূরণীয় ক্ষতি হয়। তিনি ইতিহাসে গণতন্ত্রের মানসপুত্র হিসেবে স্মরণীয় হয়ে থাকবেন।

১৯৬৪ সালের দাঙ্গা

ভারতের কাশ্মীর মসজিদ হতে হযরত মুহাম্মদ (স.)-এর পবিত্র চুল চুরি হওয়ার ঘটনাকে কেন্দ্র করে ১৯৬৪ সালে পূর্ব পাকিস্তানে দাঙ্গা ছড়িয়ে পড়ে। কেন্দ্রীয় মন্ত্রী সবুর খান ও পূর্ব পাকিস্তানের গভর্নর মোনায়েম খান দাঙ্গার ইন্ধন দেন। খুলনা ও ঢাকায় শত শত হিন্দু নিহত হয়, নারীরা নির্যাতিত হয় ও সম্পদ লুট হয়। দাঙ্গা প্রতিরোধে শেখ মুজিব এগিয়ে এলেন। ১৯৬৪ সালের ১৬ জানুয়ারি দৈনিক ইত্তেফাক পত্রিকা অফিসে তফাজ্জল হোসেন মানিক মিয়াকে আহ্বায়ক করে ৯৯ সদস্যবিশিষ্ট দাঙ্গা প্রতিরোধে কমিটি গঠন করা হয়। ৩৩ নম্বর তোপখানা রোডে কমিটির অফিস করা হয়। ১৬ জানুয়ারি কমিটি 'পূর্ব পাকিস্তান রুখিয়া দাঁড়াও' শীর্ষক প্রচারপত্র বিলি করে। প্রচারপত্র বিলির অভিযোগে শেখ মুজিবুর রহমানসহ নেতাদের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করা হয়। ১৯৬৪ সালে দাঙ্গার ফলে লাখ লাখ হিন্দু দেশ ত্যাগ করে ভারতে বসতি স্থাপন করে।

আওয়ামী লীগের দায়িত্বভার গ্রহণ

১৯৬৩ সালের ৫ ডিসেম্বর পাকিস্তান আওয়ামী লীগের সভাপতি হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর মৃত্যুর পর আওয়ামী লীগের দায়িত্ব শেখ মুজিবুর রহমানের ওপর অর্পিত হয়। শেখ মুজিবুর রহমান আওয়ামী লীগকে পুনরুজ্জীবিত করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। ১৯৬৪ সালের ২৫ জানুয়ারি মওলানা আবদুর রশীদ তর্কবাগীশের সভাপতিত্বে ধানমণ্ডি ৩২ নম্বর সড়কে আওয়ামী লীগের কার্যকরী কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় এনডিএফপন্থী নেতারা উপস্থিত হননি। ২৫ জানুয়ারির সভায় নিম্নলিখিত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

১. দেশে পার্লামেন্টারি পদ্ধতির গণতান্ত্রিক শাসনতন্ত্র প্রবর্তন;
২. আঞ্চলিক সার্বভৌমত্ব;
৩. রাজবন্দীদের মুক্তি;
৪. পূর্ব পাকিস্তানে নৌবাহিনীর সদর দফতর স্থাপন।

মওলানা তর্কবাগীশকে সভাপতি ও শেখ মুজিবুর রহমানকে সাধারণ সম্পাদক করে পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগ পুনরুজ্জীবিত করা হয়। আওয়ামী লীগ পুনরুজ্জীবিত হওয়ায় নেতাকর্মীদের মধ্যে উৎসাহ-উদ্দীপনা সৃষ্টি হয়। আওয়ামী লীগ নেতা আতাউর রহমান খান, আবুল মনসুর আহমদ, সালাম খান প্রমুখ এনডিএফে থেকে যান। তারা কোনো দিন আওয়ামী লীগে ফিরে আসেননি।

১৯৬৪ সালের জুন মাসে সরকার ঘোষণা করে যে ১৯৬৫ সালের জানুয়ারি মাসে রাষ্ট্রপতি নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে।

১৯৬৪ সালের ৫ জুন আওয়ামী লীগ ওয়ার্কিং কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় ১১ দফা গৃহীত হয় :

১. পাকিস্তানে সত্যিকার ফেডারেশন পদ্ধতি প্রবর্তন;
২. বয়স্কদের ভোটাধিকার ভিত্তিতে গণতন্ত্র কায়েম ও সুষ্ঠু নির্বাচনের মাধ্যমে কেন্দ্রীয় সরকার গঠন;
৩. কেন্দ্রীয় সরকারের অধীনে সামরিক বাহিনীসহ সকল সরকারি উচ্চ পদে মেধানুসারে বাঙালিদের নিয়োগ;
৪. উভয় অঞ্চলে বৃহৎ শিল্প কারখানা তৈরি করা;
৫. মোহাজেরদের পুনর্বাসন কর্মসূচি গ্রহণ;
৬. ফেডারেশনে বিভিন্ন জাতিভিত্তিক কৃষ্টি, সংস্কৃতি ও ভাষার বিকাশ সাধনে কর্মসূচি গ্রহণ;
৭. পূর্ণ স্বায়ত্তশাসন কায়েমের জন্য পূর্ব পাকিস্তানে পৃথক মুদ্রা ব্যবস্থাপনাসহ পৃথক অর্থনীতি প্রণয়ন;
৮. পূর্ব পাকিস্তানসহ সকল প্রদেশে পৃথক বৈদেশিক বাণিজ্য নীতি প্রণয়ন;
৯. বৈদেশিক মুদ্রার হিসাব ও আয়-ব্যয়ের পূর্ণ অধিকার হাতে ন্যস্তকরণ;
১০. পূর্ব পাকিস্তানে নৌবাহিনীর সদর দপ্তরসহ দেশবাসীর উদ্দেশে মিলিশিয়া বাহিনী গঠন;
১১. ছাত্রদের দাবিসহ শ্রমিকদের-কৃষকদের ন্যায্য দাবিসমূহ পূরণ।

১৯৬৪ সালের ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কনভোকেশন অনুষ্ঠান

১৯৬৪ সালের ২২ মার্চ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ৩৮তম কনভোকেশন অনুষ্ঠিত হয়। পদাধিকারবলে গভর্নর মোনায়েম খান ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চ্যান্সেলর হিসেবে ছাত্রদের ডিগ্রি সনদ প্রদান করবেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রগণ স্বৈরাচারী মোনায়েম খানের নিকট থেকে সনদ গ্রহণ করবে না। সমাবর্তনে পুলিশের সাথে ছাত্রদের সংঘর্ষ হয়। ৩১৩ জন ছাত্র গ্রেফতার হয়। ছাত্রলীগ নেতা শেখ ফজলুল

হক মনি ও আসমত আলী সিকান্দরের এমএ ডিগ্রি বাতিল করা হয়। ৫ বছরের জন্য বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বহিষ্কৃত হন রাশেদ খান মেনন, সাওগাতুল আলম সগীর, কে এম ওবায়দুর রহমান, একে বদরুল হক বাচ্চু প্রমুখ।

কপ- Combined Opposition Party গঠন-১৯৬৪

সকল বিরোধী দল একতাবদ্ধ করে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার জন্য ১৯৬৪ সালের ২২ জুলাই বিরোধী দলের খাজা নাজিমউদ্দিনের বাসভবনে ৩ দিনব্যাপী আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। এনডিএফ ও কেএসপি এ সভায় যোগ দেয়নি। বিরোধী দল ১৯৬৪ সালের ২৬ জুলাই ৯ দফার ভিত্তিতে কপ গঠন করে। কপ গঠনে শেখ মুজিবুর রহমান উদ্যোগী ভূমিকা পালন করেন।

১৯৬৫ সালের নির্বাচন

১৯৬৫ সালের জানুয়ারি মাসে রাষ্ট্রপতি নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। ১৯৬৪ সালের নভেম্বর মাসে ইউনিয়ন নির্বাচনে উভয় অঞ্চলে ৮০ হাজার মৌলিক গণতন্ত্র নির্বাচিত হয়। অধিকাংশ মৌলিক গণতন্ত্রী গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠান অঙ্গীকার করে নির্বাচিত হয়। কনভেনশন মুসলিম লীগ আইয়ুব খানকে এবং কপ পাকিস্তানের প্রতিষ্ঠাতা মহম্মদ আলী জিন্নাহর বোন মিস ফাতেমা জিন্নাহকে প্রেসিডেন্ট পদে মনোনয়ন দেয়। শেখ মুজিবুর রহমান কপ প্রার্থী মিস ফাতেমা জিন্নাহর পক্ষে দেশে ব্যাপক প্রচার অভিযান চালায়। ১৯৬৫ সালের ২ জানুয়ারি প্রেসিডেন্ট নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। সরকারি প্রভাব খাটিয়ে আইয়ুব খান প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হন। ৮০ হাজার ভোটের মধ্যে আইয়ুব খান ৪৯৯৫১ ভোট এবং ফাতেমা জিন্নাহ ২৮১৯১টি ভোট লাভ করেন। ১৯৬৫ সালের ২১ মার্চ জাতীয় পরিষদের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। শেখ মুজিব নিজে প্রার্থী না হয়ে বিরোধী দলের পক্ষে প্রচার অভিযান চালান। বিরোধী দল হতে কপ ১০টি আসন এনডিএফ-৫ এবং ৫টি আসনে স্বতন্ত্র প্রার্থী জয় লাভ করে। ২০টি আসনে আইয়ুব খানের মুসলিম লীগ জয় লাভ করে। ১৯৬৫ সালের ২৩ মার্চ আইয়ুব খান প্রেসিডেন্টে হিসেবে শপথ গ্রহণ করেন এবং মন্ত্রিসভা গঠন করেন। এনডিএফ নেতা নুরুল আমিন বিরোধী নেতা নির্বাচিত হন।

১৯৬৫ সালের ২৫ মার্চ ঢাকা হাইকোর্টে শেখ মুজিবুর রহমানের দেশদ্রোহিতার মামলার রায় দান করে নিম্ন আদালতের ২ বছরের শাস্তি বহাল রাখে। পল্টন ময়দানে দেশদ্রোহিতামূলক ভাষণ দেয়ায় জজকোর্ট তাকে দু'বছরের জেল দেয়। সুপ্রিমকোর্টে আপিল করলে দু'বছরের শাস্তি বাতিল করে দেয়।

১৯৬৫ সালের ৩ এপ্রিল মওলানা তর্কবাগীশের সভাপতিত্বে পূর্ব পাকিস্তান

আওয়ামী লীগের ওয়ার্কিং কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় লাহোর প্রস্তাবের ভিত্তিতে আন্দোলন চালিয়ে যাবার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। এ সময় অনেক নেতা কর্মী গ্রেফতার হয়। ১৯৬৫ সালের ১৬ মে প্রাদেশিক আইন সভার নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। নির্বাচনে মুসলিম লীগ ৬৬, বিরোধী দল ২৫ এবং স্বতন্ত্র ৫৮টি আসন জয় লাভ করে। স্বতন্ত্র প্রার্থীরা অনেকে সরকারি দলে যোগ দেয়।

১৯৬৫ সালের ৮ এপ্রিল আওয়ামী লীগের কার্যনির্বাহী সভায় ১১ দফাভিত্তিক আন্দোলন চালিয়ে যাওয়ার সিদ্ধান্ত হয়।

১৯৬৫ সালের পাক-ভারত যুদ্ধ

কাশ্মীর দখল করার উদ্দেশে প্রেসিডেন্ট আইয়ুব খান ১৯৬৫ সালের ৬ সেপ্টেম্বর ভারত আক্রমণ করেন। ১৭ দিন যুদ্ধ চলে। পাকিস্তানের বিরাট অংশ ভারত দখল করে নেয়। পূর্ব পাকিস্তান যুদ্ধকালে সম্পূর্ণ অরক্ষিত ছিল। জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদ ১৯৬৫ সালের ২০ সেপ্টেম্বর যুদ্ধবিরতির আহ্বান জানায়। ১৯৬৬ সালের ১০ জানুয়ারি তাসখন্দ চুক্তি স্বাক্ষরের মধ্য দিয়ে উপমহাদেশে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হয়। চুক্তি স্বাক্ষরের পরের দিন ভারতের প্রধানমন্ত্রী লাল বাহাদুর শাস্ত্রী তাসখন্দে মৃত্যুবরণ করেন।

অধ্যায় ১২

ছয় দফা আন্দোলন

১৯৬৫ সালে পাক-ভারত যুদ্ধকালে পূর্ব পাকিস্তান ছিল সম্পূর্ণভাবে অরক্ষিত। এ অঞ্চলে পাক-ভারত যুদ্ধ হয়নি। ভারত ইচ্ছা করলে পূর্ব পাকিস্তান দখল করে নিতে পারত। পাক-ভারত যুদ্ধের ফলে শেখ মুজিবুর রহমানের রাজনৈতিক চিন্তার বৈপ্লবিক পরিবর্তন ঘটে। তিনি পূর্ব পাকিস্তানকে ফেডারেল সরকারের অঙ্গ হিসেবে দেখতে চান। কেন্দ্রের হাতে থাকবে পররাষ্ট্র ও দেশরক্ষা। অন্য সকল বিষয় থাকবে প্রদেশের নিকট। তিনি পূর্ব পাকিস্তানের পূর্ণ আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন প্রতিষ্ঠা করার দাবি করছেন। আওয়ামী লীগের উত্থাপিত ১১ দফা থেকে ৬ দফার পথে চলবে। ৬ দফার স্বাপ্নিক শেখ মুজিব, প্রণেতাও তিনি। ৬ দফা প্রণয়নে তাজউদ্দীন আহমদ ও বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদগণ সহায়তা করেছেন।

১৯৬৬ সালের ৪ ফেব্রুয়ারি পাকিস্তানের সাবেক প্রধানমন্ত্রী মোহাম্মদ আলী চৌধুরীর লাহোরের বাসভবনে বিরোধী দলের সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। পূর্ব বাংলা থেকে ২১ জন এবং পশ্চিম পাকিস্তান থেকে ২০০ সদস্য সম্মেলনে যোগ দেন। ১৯৬৬ সালের ৫ ফেব্রুয়ারি লাহোর সম্মেলনে শেখ মুজিবুর রহমান তার ঐতিহাসিক ৬ দফা পেশ করেন।

সম্মেলনের সভাপতি চৌধুরী মোহাম্মদ আলী তাৎক্ষণিকভাবে তার ভাষণে বলেন, আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন বর্তমান আলোচ্য বিষয় নয়। আলোচ্য বিষয় হলো গণতন্ত্র উদ্ধার ও তাসখন্দ চুক্তি।

শেখ মুজিবুর রহমান কর্তৃক উত্থাপিত ছয় দফার বিষয়ে পশ্চিম পাকিস্তানে প্রতিক্রিয়া শুরু হয়। শেখ মুজিবুর রহমান তার দল নিয়ে করাচি চলে আসেন এবং সোহরাওয়ার্দীর কন্যা আখতার সুলেমানের বাসায় আশ্রয় নেন। তারপর ঢাকায় আসেন।

১৯৬৬ সালের ১৫ মার্চ প্রেসিডেন্ট আইয়ুব খান ৬ দফা প্রণয়নকারীদের পাকিস্তানের শত্রু হিসেবে আখ্যায়িত করেন।

আওয়ামী লীগের ঐতিহাসিক ছয়-দফা

১৯৬৬ সালের ১৩ মার্চ ঢাকায় অনুষ্ঠিত আওয়ামী লীগের কার্যনির্বাহী কমিটির বৈঠকে ৬-দফা অনুমোদিত হয়। ১৯৬৬ সালের ১৮ মার্চ ঢাকায় ইডেন হোটেলে আওয়ামী লীগের কাউন্সিল অধিবেশনে ৬-দফা পেশ করা হয়। শেখ মুজিবুর রহমান প্রণীত– 'আমাদের বাঁচার দাবি ৬-দফা' ১৮ মার্চ অনুমোদিত হয়।

১ নম্বর দফা : এ দফায় বলা হয়েছে যে, ঐতিহাসিক লাহোর প্রস্তাবের ভিত্তিতে শাসনতন্ত্র রচনা করতঃ পাকিস্তানকে একটি সত্যিকার ফেডারেশনরূপে গড়তে হবে। তাতে পার্লামেন্টারী সরকার থাকবে। সকল নির্বাচন সর্বজনীন প্রাপ্তবয়স্কের সরাসরি ভোটে অনুষ্ঠিত হবে। আইনসভাসমূহের সার্বভৌমত্ব থাকবে।

২ নম্বর দফা : ফেডারেশন সরকারের এখতিয়ার কেবল দেশরক্ষা ও পররাষ্ট্র ব্যাপার– এ দুটো বিষয় থাকবে। অবশিষ্ট সকল বিষয় স্টেটসসমূহের (প্রদেশ) হাতে থাকবে। ফেডারেল বা যুক্তরাষ্ট্রের ইউনিটকে প্রদেশ না বলে স্টেট বলা হয়েছে। যেমন আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের ফেডারেল ইউনিটকে স্টেট বা রাষ্ট্র বলা হয়।

৩ নম্বর দফা : মুদ্রা সম্পর্কে দুটি বিকল্প প্রস্তাব ছিল। যে কোনো একটি গ্রহণ করলে চলবে।

ক. পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের জন্য দুটি সম্পূর্ণ পৃথক অথচ সহজে বিনিময়যোগ্য মুদ্রার প্রচলন করতে হবে। এ ব্যবস্থা অনুসারে মুদ্রা কেন্দ্রের হাতে থাকবে না আঞ্চলিক সরকারের হাতে থাকবে দুটি অঞ্চলের জন্য দুটি স্বতন্ত্র স্টেট ব্যাংক থাকবে।

খ. দু'অঞ্চলের জন্য একই মুদ্রা থাকবে। এ ব্যবস্থায় মুদ্রা কেন্দ্রের হাতে থাকবে, যাতে পূর্ব পাকিস্তানের মুদ্রা পশ্চিম পাকিস্তানে পাচার না হতে পারে। এ বিধানে পাকিস্তানে একটি ফেডারেল রিজার্ভ ব্যাংক থাকবে। দু'অঞ্চলের দুটি পৃথক রিজার্ভ ব্যাংক থাকবে।

৪ নম্বর দফা : সকল প্রকার ট্যাক্স-খাজনা কর ধার্য ও আদায়ের ক্ষমতা থাকবে আঞ্চলিক সরকারের হাতে। ফেডারেল সরকারের সে ক্ষমতা থাকবে না। আঞ্চলিক সরকার আদায়ী রাজস্বের নির্ধারিত অংশ আদায়ের সাথে সাথে ফেডারেল তহবিলে জমা হয়ে যাবে। এ মর্মে রিজার্ভ ব্যাংকসমূহের ওপর বাধ্যতামূলক বিধান শাসনতন্ত্রে থাকবে। এভাবে জমাকৃত অর্থ ফেডারেল সরকারের তহবিলে থাকবে।

৫ নম্বর দফা : এ দফায় বৈদেশিক বাণিজ্যের ব্যাপারে নিম্নরূপ শাসনতান্ত্রিক বিধান থাকবে–

১. দু'অঞ্চলের বৈদেশিক মুদ্রা আয়ের পৃথক পৃথক হিসাব রাখতে হবে।

২. পূর্ব পাকিস্তানের অর্জিত বৈদেশিক মুদ্রা পূর্ব পাকিস্তানের এখতিয়ারে এবং পশ্চিম

পাকিস্তানের অর্জিত বৈদেশিক মুদ্রা পশ্চিম পাকিস্তানের এখতিয়ারে থাকবে।

৩. ফেডারেশনের প্রয়োজনীয় বিদেশী মুদ্রা অঞ্চল হতে সমানভাবে অথবা শাসনতন্ত্রে নির্ধারিত হারাহারি মতে আদায় হবে।

৪. দেশজাত দ্রব্যাদি বিনাশুল্কে উভয় অঞ্চলের মধ্যে আমদানি-রপ্তানি চলবে।

৫. ব্যবসা-বাণিজ্য সম্পর্কে বিদেশের সঙ্গে চুক্তি সম্পাদনের, বিদেশে বাণিজ্য মিশন স্থাপনের এবং আমদানি-রপ্তানি করার অধিকার আঞ্চলিক সরকারের হাতে ন্যস্ত করে শাসনতান্ত্রিক বিধান করতে হবে।

৬ নম্বর দফা : পূর্ব পাকিস্তান মিলিশিয়া বা প্যারা মিলিটারি রক্ষীবাহিনী গঠন করতে পারবে। দেশরক্ষা ব্যবস্থা কেন্দ্রের হাতে থাকবে। একই সাথে পূর্ব পাকিস্তানে উপযুক্ত পরিমাণে দেশরক্ষা বাহিনী গঠন করতে হবে। অস্ত্র কারখানা স্থাপন করতে হবে। নৌ বাহিনীর সদর দপ্তর পূর্ব পাকিস্তানে স্থানান্তর করতে হবে।

আওয়ামী লীগের সভাপতি পদে শেখ মুজিবুর রহমান

১৯৬৬ সালের ১৩ মার্চ আওয়ামী লীগের কার্যনির্বাহী কমিটির বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। সভায় ৬ দফা অনুমোদিত হয়।

১৯৬৬ সালের ১৮, ১৯, ২০ মার্চ ঢাকায় ইডেন হোটেলে আওয়ামী লীগের কাউন্সিল অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। সভায় ৬ দফা অনুমোদিত হয়। ১৯৬৬ সালের ২০ মার্চ শেখ মুজিবুর রহমান সভাপতি এবং তাজউদ্দীন আহমদকে সাধারণ সম্পাদক করে পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের কার্যনির্বাহী কমিটি গঠন করা হয়। কমিটির সদস্যরা হলেন–

শেখ মুজিবুর রহমান	সভাপতি
সৈয়দ নজরুল ইসলাম	সহ-সভাপতি
আবদুস সালাম খান	সহ-সভাপতি
খন্দকার মোশতাক আহমদ	সহ-সভাপতি
এম মনসুর আলি	সহ-সভাপতি
মজিবুর রহমান	সহ-সভাপতি
শাহ আজিজুর রহমান	সহ-সভাপতি
তাজউদ্দীন আহমদ	সাধারণ সম্পাদক
মিজানুর রহমান চৌধুরী	সাংগঠনিক সম্পাদক
জহুর আহমদ চৌধুরী	শ্রম সম্পাদক
ওবায়দুর রহমান	সমাজসেবা সম্পাদক
আবদুল মোমেন	প্রচার সম্পাদক
আমেনা বেগম	মহিলা সম্পাদক

মাহমুদুল্লাহ	দফতর সম্পাদক
হাফেজ মুসা	কোষাধ্যক্ষ
এস ডব্লিউ লকিতুল্লাহ	সদস্য
আবদুর রহমান খান	সদস্য
এম এ রশিদ	সদস্য
রওশন আলী	সদস্য
মমিনউদ্দিন আহমদ	সদস্য
আতাউর রহমান	সদস্য
রহিমুদ্দিন আহমদ	সদস্য
সাদ আহমদ	সদস্য
জালাল উদ্দিন আহমেদ	সদস্য
আমজাদ হোসেন	সদস্য
সোহরাব হোসেন	সদস্য
অধ্যাপক ইউসুফ আলী	সদস্য
আবদুল মালেক উকিল	সদস্য
নুরুল হক	সদস্য
বাহাউদ্দিন চৌধুরী	সদস্য
শামসুল হক	সদস্য
শেখ আবদুল আজিজ	সদস্য
আফজাল হোসেন	সদস্য
জাকিরুল হক	সদস্য
আবদুস সামাদ	সদস্য
আবদুর রশীদ তর্কবাগীশ	সদস্য
মোল্লা জালাল উদ্দিন	সদস্য

১৯৬৬ সালের ১৮ মার্চ 'আমাদের বাঁচার দাবি– ৬ দফা' গৃহীত হয়। ২০ মার্চ কাউন্সিল অধিবেশনে ৬ দফা অনুমোদনের পর বিকেলে পল্টন ময়দানে বিশাল জনসভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় শেখ মুজিবুর রহমান সরকারবিরোধী ভাষণ দেন।

১৯৬৬ সালের ২৩ মার্চ থেকে ৮ মে পর্যন্ত শেখ মুজিবুর রহমান পূর্ব পাকিস্তানের প্রায় সকল জেলা ও মহকুমায় ভাষণ দেন এবং জনগণ ৬ দফাকে ব্যাপক সমর্থন প্রদান করে। আইয়ুব-মোনায়েম খানের সরকার ভীত হয়ে শেখ মুজিবুর রহমানের বিরুদ্ধে যশোর, ময়মনসিংহ, সিলেটে কয়েকটি মামলা দায়ের করে। সরকারের রক্তচক্ষু উপেক্ষা করে তিনি জনসভা চালিয়ে যাচ্ছেন। ৬ দফা জনগণের দাবিতে রূপান্তরিত হয়।

গ্রেফতার– ৮ মে ১৯৬৬

১৯৬৬ সালের ৮ মে নারায়ণগঞ্জে বিশাল জনসভা অনুষ্ঠিত হয়। জনসভা শেষে শেখ মুজিব ঢাকায় ধানমণ্ডির বাভবনে পৌঁছেন। পুলিশ বাসভবন ঘিরে ফেলে। তিনি ৩০ মিনিটের মধ্যে তৈরি হলেন। পুলিশ তাকে গ্রেফতার করে ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে বন্দি করে রাখে। একই রাতে পুলিশ তাজউদ্দীন আহমদ, চট্টগ্রামের এম এ আজিজ, জহুর আহম্মদ চৌধুরী, পাবনার এম মনসুর আলী, ময়মনসিংহের রফিকউদ্দিন ভূঁইয়া, রাজশাহীর মুজিবুর রহমান প্রমুখ গ্রেফতার হন। শেখ মুজিবের মুক্তির দাবিতে আন্দোলন মিছিল চলছে। জাতীয় পরিষদ ও প্রাদেশিক পরিষদে রাজবন্দীদের মুক্তির প্রস্তাব করা হয়।

৭ জুন পালন

শেখ মুজিবুর রহমানসহ সকল বন্দীর মুক্তি ও ৬ দফার দাবিতে ১৯৬৬ সালের ৭ জুন পূর্ব পাকিস্তানে সর্বাত্মক হরতাল পালিত হয়। তেজগাঁও এলাকায় শ্রমিক নেতা মনু মিয়া পুলিশের গুলিতে নিহত হন। নারায়ণগঞ্জে শ্রমিক-পুলিশ সংঘর্ষে ৬ জন শ্রমিক নিহত হন। ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করে ছাত্র-জনতা মিছিল করে। পূর্ব পাকিস্তানের গভর্নর মোনায়েম খান বাঙালিদের ওপর চরম নির্যাতন চালায়। পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট আইয়ুব ৬ দফার দাবি দমন করার জন্য অস্ত্রের ভাষায় কথা বলেন। আওয়ামী লীগের শত শত নেতাকর্মী গ্রেফতার হয়। ১৯৬৬ সালের ১৫ জুন সরকার দৈনিক ইত্তেফাক পত্রিকার সম্পাদক তফাজ্জল হোসেন মানিক মিয়াকে গ্রেফতার করে। ১৬ জুন পূর্ব পাকিস্তানের গভর্নর দৈনিক ইত্তেফাক পত্রিকা প্রকাশনা বন্ধ করে দেয়।

তাজউদ্দীন আহমদের গ্রেফতারের পর মিজানুর রহমান চৌধুরী আওয়ামী লীগের ভারপ্রাপ্ত সম্পাদকের দায়িত্ব পালন করেন। ১৯৬৬ সালের ২২ জুন সরকার মিজানুর রহমান চৌধুরীকে তার চাঁদপুরের বাসভবন থেকে গ্রেফতার করে। তিনি ছিলেন জাতীয় পরিষদের এমএনএ। পরিষদে বিরোধী দলে তার গ্রেফতারের প্রতিবাদ জানায়। প্রেসিডেন্ট আইয়ুব খান ও পররাষ্ট্রমন্ত্রী জুলফিকার আলীর মধ্যে মতবিরোধ দেখা দেয়। ১৯৬৬ সালের ১৮ জুন ভুট্টো মন্ত্রিসভা থেকে পদত্যাগ করেন।

পিডিএম গঠন-১৯৬৬

৬ দফা বিরোধী আওয়ামী লীগ ও এনডিএফ ১৯৬৬ সালের ৩০ এপ্রিল আতাউর রহমান খানের বাসভবনে মিলিত হয়ে পিডিএম গঠনের ঘোষণা দেয়। পিডিএম-Pakistan Democratic Movement ভুক্ত দল ছিল এনডিএফ, কাউন্সিল মুসলিম লীগ, জামায়াতে ইসলাম, পাকিস্তান আওয়ামী লীগ-নেতা নবাবজাদা নসরুল্লাহ খান, পাকিস্তান নেজামে ইসলাম। সালাম খান ৬ দফা আওয়ামী লীগ

থেকে বেরিয়ে আসেন। ১৯৬৬ সালের ২৩ ও ২৪ জুলাই আওয়ামী লীগের ওয়ার্কিং কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় মহিলা সম্পাদিকা আমেনা বেগমকে আওয়ামী লীগের ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক নির্বাচিত করা হয়।

আওয়ামী লীগ বিভক্ত

আওয়ামী লীগ পিডিএম পন্থী ১৪ জন সদস্যকে কার্যনির্বাহী কমিটি হতে বহিষ্কার করে। পিডিএমপন্থী আওয়ামী লীগ ১৯৬৭ সালের ২৩ আগস্ট আওয়ামী লীগের এডহক কমিটি গঠন করে।

৬ দফা বিরোধী আওয়ামী লীগের কমিটি ছিল নিম্নরূপ :

মওলানা আবদুর রশীদ তর্কবাগীশ	সভাপতি
মশিউর রহমান	সহ-সভাপতি
মজিবর রহমান (রাজশাহী)	সাধারণ সম্পাদক
নূরুল ইসলাম চৌধুরী	কোষাধ্যক্ষ
আবদুস সালাম খান	সদস্য
মিয়া আবদুর রশীদ	সদস্য
আবদুর রহমান	সদস্য
মতিউর রহমান	সদস্য
রওশন আলী	সদস্য
রহিম উদ্দিন আহমদ	সদস্য
সাদ আহমদ	সদস্য
আবদুল রউফ	সদস্য
এস ডব্লিউ লকিতুল্লাহ	সদস্য
মমিন উদ্দিন আহমদ	সদস্য
নুরুল হক	সদস্য
আমজাদ আলী	সদস্য
বিএম ইলিয়াস	সদস্য
জুলমত আলী	সদস্য

ছাত্রলীগ সভাপতি ফেরদৌস আহমদ কোরেশী ১৯৬৭ পিডিএমপন্থী হয়ে যায়।

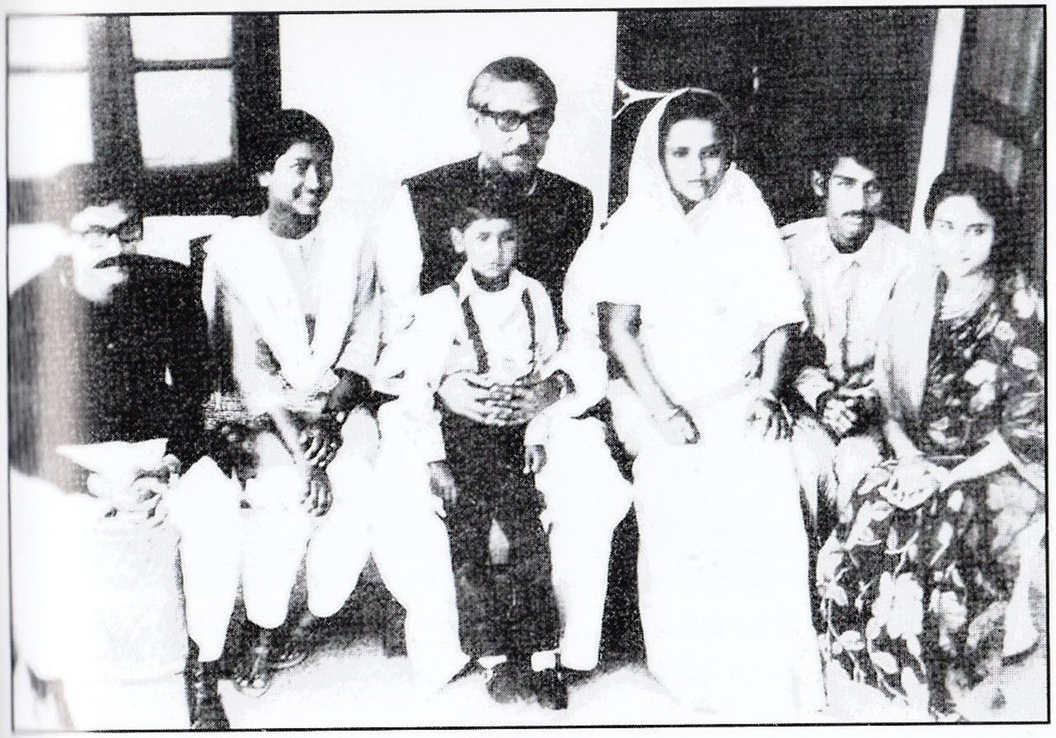
বন্দীশালায়

শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৬৬ সালের ৮ মে হতে ১৯৬৮ সালের ২২ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে বন্দী জীবন যাপন করেন।

১৯৬৮ সালের ১৭ জানুয়ারি শেখ মুজিবুর রহমানকে আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলায় গ্রেফতার করে কুর্মিটোলা সেনানিবাসে আটক রাখা হয়।



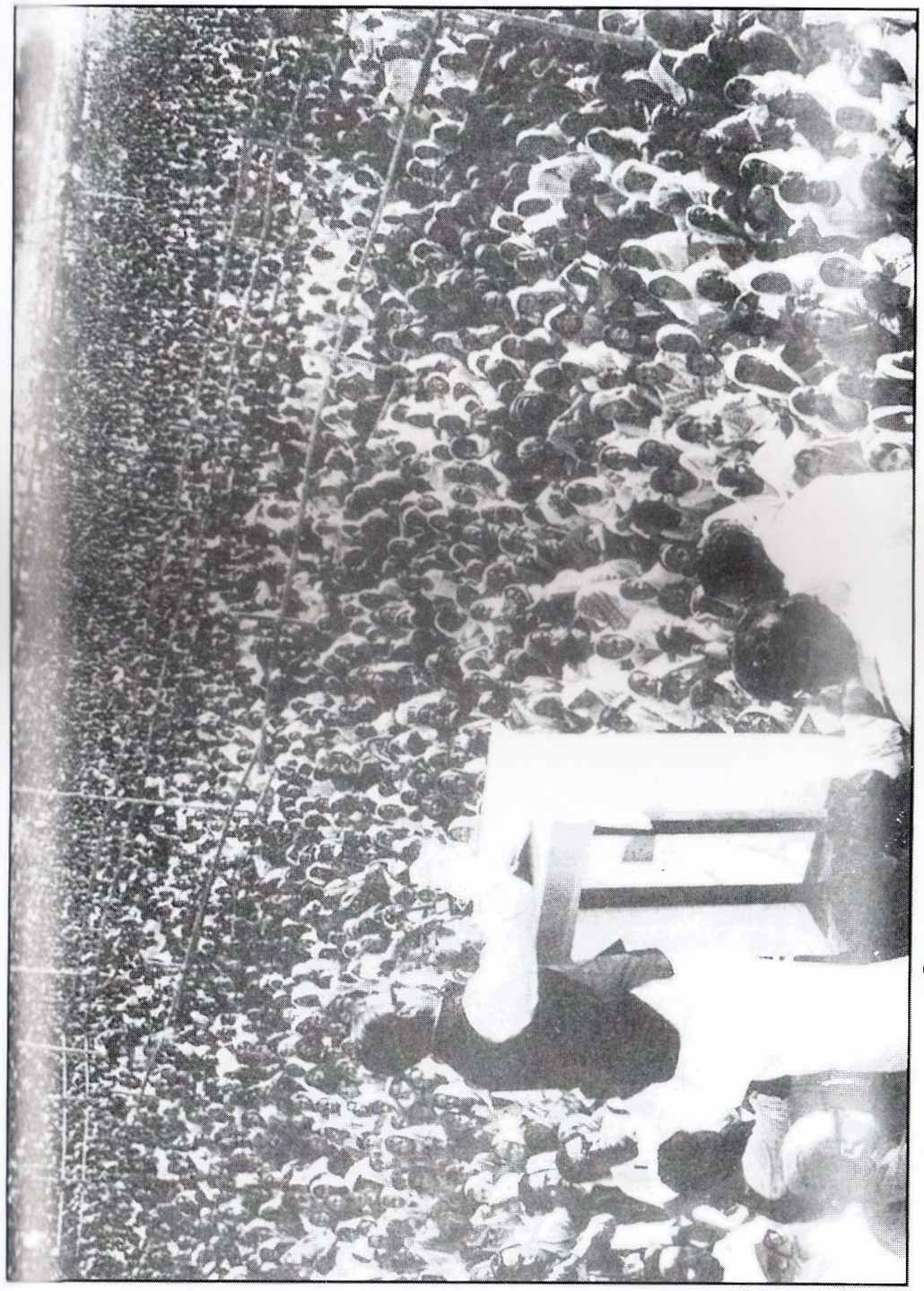
জাতীয় সমস্যা নিয়ে মওলানা ভাসানীর সাথে আলোচনা করছেন বঙ্গবন্ধু



সপরিবারে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। ডানে স্ত্রী বেগম ফজিলাতুননেছা, শেখ জামাল ও শেখ হাসিনা, বামে শেখ রেহানা, শেখ কামাল এবং কোলে শেখ রাসেল : ১৯৭২



আওয়ামী লীগ সভাপতি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ও সাধারণ সম্পাদক তাজউদ্দীন আহমেদ, পিছনে দাঁড়ানো বাম থেকে এমআর আকতার মুকুল, আব্দুর রব সেরনিয়াবাত এবং এ কে ফায়জুল হক, ৩২ নং ধানমণ্ডির বাসভবনে



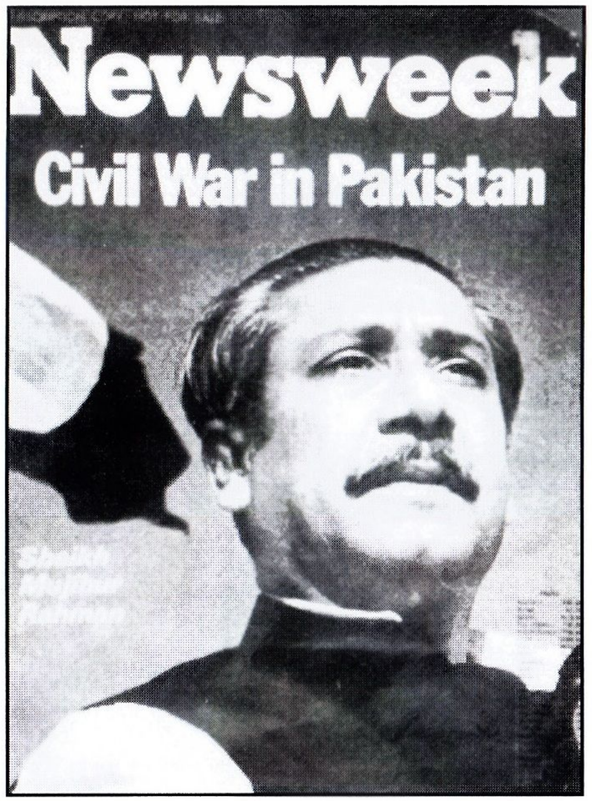
এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম-বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান, রেসকোর্স ময়দান, ৭ মার্চ ১৯৭১



২৩ মার্চ ১৯৭১, ৩২ নং ধানমণ্ডির বাড়িতে উৎফুল্ল জনতার মাঝে
স্বাধীন বাংলার পতাকা উত্তোলন করলেন বঙ্গবন্ধু



ছাব্বিশে মার্চ রাতে পাকিস্তান সেনাবাহিনী বঙ্গবন্ধুকে গ্রেফতার করে।
গ্রেফতাকৃত অবস্থায় করাচী বিমানবন্দরে বঙ্গবন্ধু



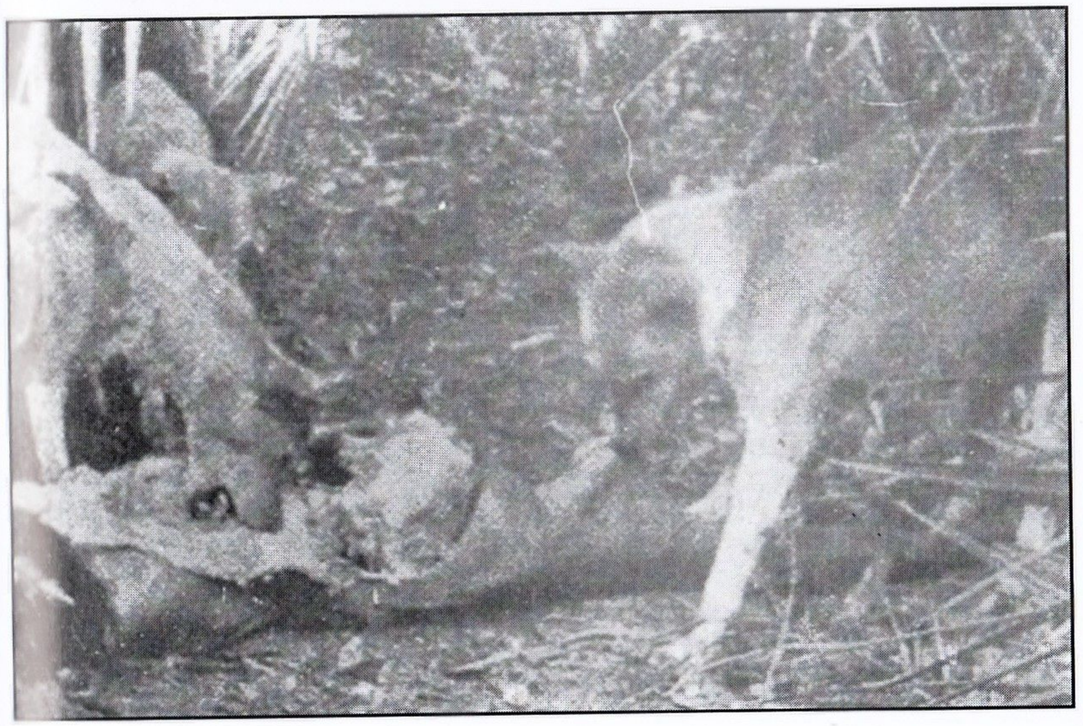
৫ এপ্রিল ১৯৭১, নিউজ উইক পত্রিকার প্রচ্ছদ। বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে শুরু
হয়েছে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ-সেই খবর বিশেষভাবে প্রকাশ করা হয় উক্ত সংখ্যায়





পাকবাহিনীর গণহত্যা, ১৯৭১







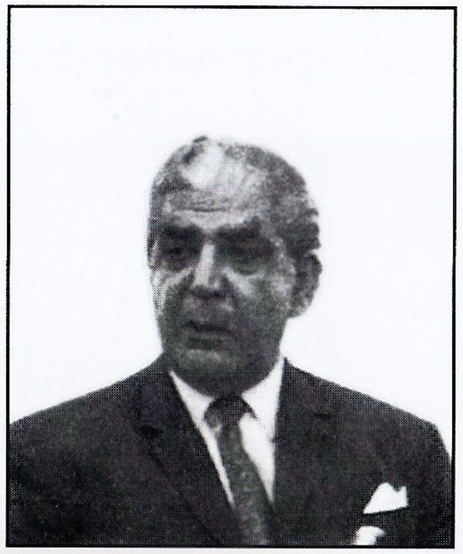
মুজিবনগর সরকারের মন্ত্রিপরিষদ। ভারপ্রাপ্ত রাষ্ট্রপতি সৈয়দ নজরুল ইসলাম, প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দীন আহমেদ, মন্ত্রী এম মনসুর আলী, খন্দকার মোস্তাক, এএইচএম কামরুজ্জামান ও প্রধান সেনাপতি কর্নেল এমএজি ওসমানী



মুজিবনগর সরকারের শপথের পর
বীর মুক্তিযোদ্ধা মাহবুব উদ্‌দীন আহম্মেদ মন্ত্রিসভাকে গার্ড অব অনার দিচ্ছে



জুলফিকার আলী ভুট্টো
পিপলস পার্টির চেয়ারম্যান



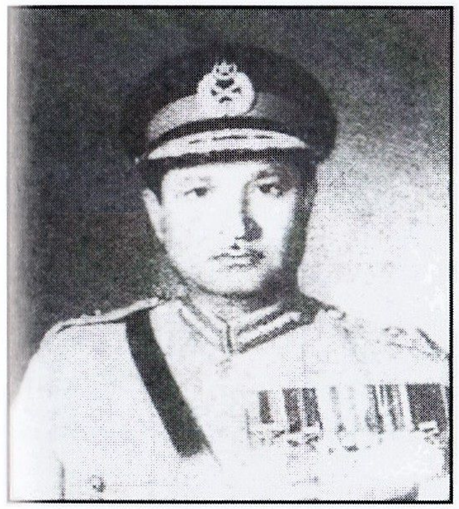
প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান



জেনারেল আব্দুল হামিদ খান
পাকিস্তান সেনাবাহিনী প্রধান



লেঃ জেনারেল টিক্কা খান
পূর্ব পাকিস্তানের গর্ভনর



লেঃ জেনারেল আমির
আব্দুল্লাহ খান নিয়াজী (ইস্টার্ন কমান্ডের প্রধান)



মেজর জেনারেল ফরমান আলী
গভর্নরের পরামর্শদাতা

১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধকালে গঠিত মিত্রবাহিনীর ভারতীয় সেনাবাহিনীর জেনারেলগণ



ভারতীয় সেনাবাহিনী প্রধান
জেনারেল এমএইচএফজে মানেকশা



ভারতের বিমানবাহিনী প্রধান
মার্শাল পিসি লাল

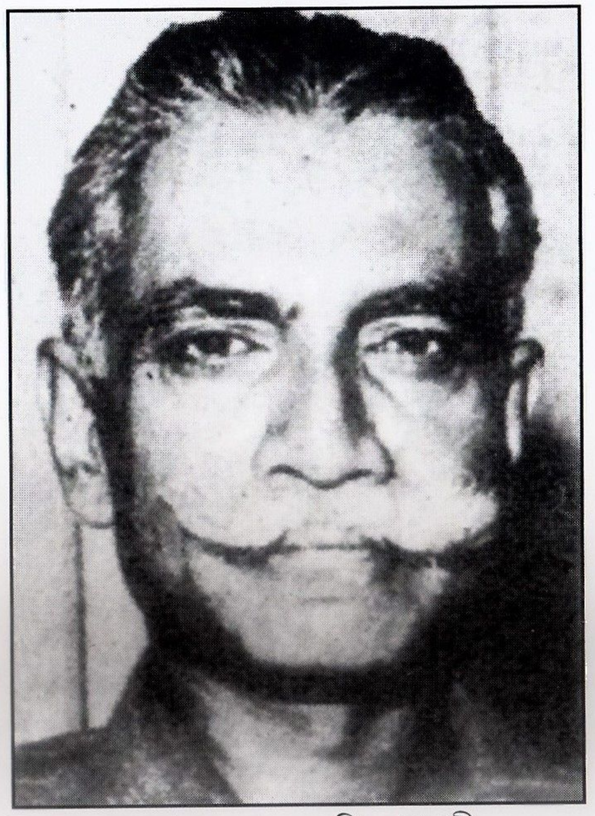


মিত্রবাহিনী প্রধান
লেঃ জেনারেল জগজিৎ সিং আরোরা

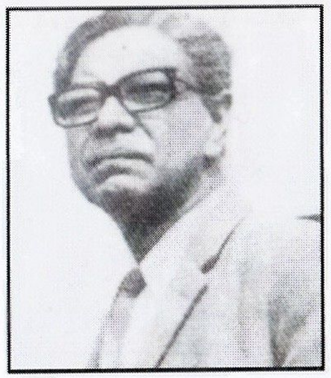


ভারতের নৌবাহিনী প্রধান
এডমিরাল এমএস নন্দা

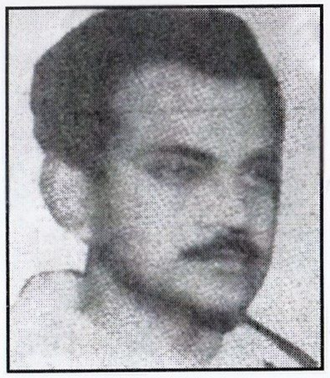
১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধের সেক্টর কমান্ডারগণ



জেনারেল এম এ জি ওসমানী
প্রধান সেনাপতি মুক্তিবাহিনী



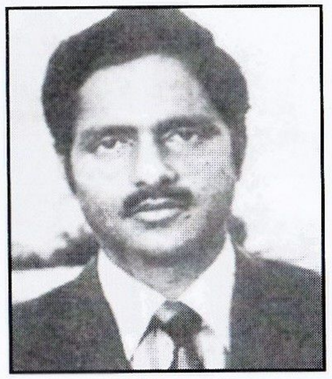
কর্নেল আবদুর রব এমএনএ
চীফ অব ষ্টাফ মুক্তিবাহিনী



এয়ার কমোডর এ কে খন্দকার
ডেপুটি চীফ অব ষ্টাফ



মেজর জিয়াউর রহমান
কমান্ডার জেডফোর্স



মেজর রফিকুল ইসলাম
১ নম্বর সেক্টর কমান্ডার



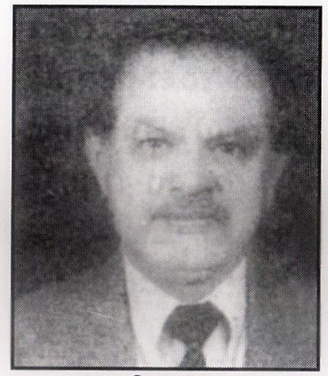
লেঃ কঃ কেএম শফিউল্লাহ
কমান্ডার এসফোর্স



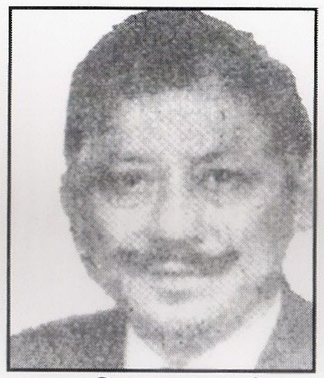
লেঃ কঃ খালেদ মোশাররফ
কমান্ডার কে ফোর্স



মেজর এএনএম নুরুজ্জামান
৩ নম্বর সেক্টর



মেজর সিআর দত্ত
৪ নম্বর সেক্টর



মেজর মীর শওকত আলী
৫ নম্বর সেক্টর



উইং কমান্ডার এম কে বাশার
৬ নম্বর সেক্টর



আবদুল কাদের সিদ্দিকী
টাংগাইল অঞ্চল



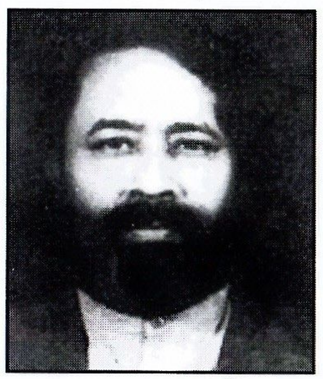
লেঃ কঃ কাজী নুরুজ্জামান
৭ নম্বর সেক্টর



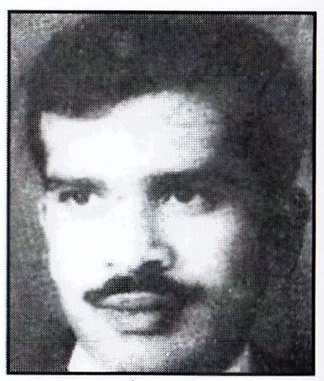
মেজর আবু ওসমান চৌধুরী
৮ নম্বর সেক্টর



মেজর এমএ মঞ্জুর
৮ নম্বর সেক্টর



মেজর এম এ জলিল
৯ নম্বর সেক্টর



লেঃ কর্নেল এম এ তাহের
১১ নম্বর সেক্টর



বঙ্গবন্ধু স্বদেশ প্রত্যাবর্তন, ১০ জানুয়ারী ১৯৭১



১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর বিকেল ৪-৩০ মিনিট। ঢাকার রমনা রেসকোর্স ময়দানে পাকিস্তান বাহিনী ৯০ হাজার সৈন্যসহ আত্মসমর্পণ করে। আত্মসমর্পণ দলিলে স্বাক্ষর করেন মিত্র বাহিনীর অধিনায়ক লেঃ জেনারেল জগজিৎ সিং অরোরা (বামে) এবং পাকবাহিনীর অধিনায়ক লেঃ জেনারেল আমীর আবদুল্লাহ খান নিয়াজী (ডানে) পিছনে দাঁড়িয়ে আছেন মুক্তিবাহিনীর উপ-অধিনায়ক গ্রুপ ক্যাপ্টেন এ. কে. খন্দকার



১০ জানুয়ারী ১৯৭২, স্বাধীন বাংলার রেসকোর্স ময়দানে জনগণের সামনে বঙ্গবন্ধু প্রথম এসে দাঁড়ালেন



৩০ লক্ষ মানুষের রক্তের বিনিময়ে অর্জিত স্বাধীনতা, লক্ষ লক্ষ মা-বোনের ইজ্জতের মূল্যে কেনা স্বাধীনতা-সোনার বাংলার কথা বলতে গিয়ে আবেগাপ্লুত হয়ে যান বঙ্গবন্ধু



১২ জানুয়ারি '৭২, প্রধানমন্ত্রী হিসেবে শপথ গ্রহণ করেন



১৯৭৩, প্রধানমন্ত্রী হিসেবে দ্বিতীয়বার শপথ নিচ্ছেন

অধ্যায় ১৩

আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা–১৯৬৮-৬৯

আগরতলা মামলা বাংলাদেশের ইতিহাসে এক গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। বাঙালি সেনাবাহিনী সশস্ত্র যুদ্ধ করে বাংলাদেশের স্বাধীনতা অর্জন করার পরিকল্পনা করে। তারা শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে সশস্ত্র যুদ্ধের প্রস্তুতি গ্রহণ করে।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান গণতন্ত্রে বিশ্বাসী ছিলেন। তার দাবি ছিল পূর্ব পাকিস্তানের পূর্ণ স্বায়ত্তশাসন প্রতিষ্ঠা। কিন্তু পাকিস্তান সামরিক সরকার পূর্ব বাংলায় শোষণ ও নির্যাতন চালায়। সাধারণ মানুষের ভোটের অধিকার ছিল না। মাত্র ৮০ হাজার মৌলিক গণতন্ত্রীর ভোটের অধিকার ছিল। তারা আইনসভার সদস্য ও প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত করত। ১৯৬২ সালের ৩০ জানুয়ারি সামরিক সরকার আওয়ামী লীগ সভাপতি হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীকে গ্রেফতার করে করাচিতে ৬ মাস কারাবন্দী করে রাখে। শেখ মুজিবুর রহমানের রাজনৈতিক পরিবর্তন আসে। তিনি নেতাজী সুভাষ চন্দ্র বসুর ন্যায় যুদ্ধ করে পূর্ব বাংলার স্বাধীনতা অর্জন করতে চান। এ জন্য তার ভারতের সাহায্য ও সহযোগিতার প্রয়োজন। ১৯৬৩ সালে তিনি গোপনে ত্রিপুরা রাজ্যের রাজধানী আগরতলায় গমন করেন এবং ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রী শ্রী শচীন্দ্র লাল সিংহের সাথে সাক্ষাৎ করেন। শেখ মুজিবুর রহমান চেয়েছিলেন ভারতে অবস্থান করে পূর্ব বাংলার স্বাধীনতার প্রচার চালাবেন। ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রী ভারতের প্রধানমন্ত্রী জওহর লাল নেহরুর সাথে শেখ মুজিবুর রহমানের প্রস্তাব নিয়ে আলোচনা করেন। চীনের সঙ্গে যুদ্ধের পর ভারত বিপর্যস্ত। তাই নেহরু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রস্তাবে রাজি হননি। তাকে দেশে ফিরে যেতে বলেন। আগরতলায় ১৪ দিন অবস্থান করে তিনি ঢাকায় ফিরে আসেন।

বিএলএফ গঠন

লেফটেন্যান্ট কমান্ডার মোয়াজ্জেম হোসেনের নেতৃত্বে ১৯৬২ সালে গোপনে বাংলাদেশে লিবারেশন ফ্রন্ট গঠিত হয়। বিএলএফ পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট

জেনারেল আইয়ুব খানকে হত্যার পরিকল্পনা করে। ১৯৬৭ সালের ডিসেম্বর মাসে প্রেসিডেন্ট চট্টগ্রামের চন্দ্রঘোনা পেপার মিল পরিদর্শন করবেন। তার বিমান ধ্বংস করে দেয়ার ষড়যন্ত্র জানতে পেরে চন্দ্রঘোনার সফরসূচি বাতিল করা হয়। পাকিস্তানের গোয়েন্দা বিভাগ প্রেসিডেন্টকে হত্যার দ্বিতীয় পরিকল্পনা উদঘাটন করল। আইয়ুব খান চাঁদপুর আইডব্লিউটিএ উদ্বোধন করবেন। এ সময় লে. কমান্ডার মোয়াজ্জেম হোসেনের নেতৃত্বে বিএলএফও আইয়ুব খানকে হত্যা করবে। আইয়ুব খান চাঁদপুর সফর পরিত্যাগ করেন।

বাঙালি সেনাবাহিনীর গোপন তৎপরতা চলতে থাকে। তাদের পরিকল্পনায় ছিল ভারতের সহায়তায় বিমান ও জলপথ বন্ধ করে দেয়া। তাহলে বিএলএফএ পূর্ব পাকিস্তানে অবস্থানরত আর্মিকে পরাজিত করে জয়লাভ করতে পারবে। এ উদ্দেশে শেখ মুজিবুর রহমান কমিউনিস্ট পার্টির নেতা বিপ্লবী ত্রৈলক্ষ্য চক্রবর্তীকে ভারতে প্রেরণ করেন। তিনি কলকাতায় অবস্থানকালে মৃত্যুবরণ করেন। এদিকে বাঙালি সেনাদের গোপন তৎপরতা প্রকাশিত হয়ে পড়ে। জড়িত সৈন্যদের বিরুদ্ধে অভিযোগ ছিল তারা আগরতলায় ভারতের প্রতিনিধিদের সাথে আলোচনা করে পরিকল্পনা গ্রহণ করে যে, তারা পূর্ব পাকিস্তানকে বিচ্ছিন্ন করবে। পাকিস্তান গোয়েন্দা দফতর এ তথ্য জানতে পেরে ১৯৬৭ সালের ডিসেম্বর মাস হতে জড়িত ব্যক্তিদের গ্রেফতার শুরু করে। ২ জন সিএসপিসহ ২৮ জনকে আটক করে। ১৯৬৮ সালের ৬ জানুয়ারি পাকিস্তান স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় থেকে প্রেসনোট প্রকাশিত হয়। গ্রেফতারকৃতদের নির্মমভাবে শারীরিক নির্যাতন করা হয়। নির্যাতনের কারণে কমান্ডার মোয়াজ্জেম হোসেনের দাঁত পড়ে যায়। ১৯৬৮ সালের ১৮ জানুয়ারি আরও একটি প্রেসনোটে শেখ মুজিবুর রহমানকে এক নম্বর আসামি করে ৩৫ জন আসামির নাম প্রকাশিত হয়।

আগরতলা মামলায় অভিযুক্ত ৩৫ জন আসামির নাম

১. শেখ মুজিবুর রহমান-টুঙ্গিপাড়া,থানা গোপালগঞ্জ, জেলা-ফরিদপুর। ৬৭৬ ধানমণ্ডি আবাসিক এলাকা, রোড নং-৩২, ঢাকা।
২. লেফটেন্যান্ট কমান্ডার মোয়াজ্জেম হোসেন-গ্রাম-ডুমুরতলা, থানা-পিরোজপুর, জেলা-বরিশাল।
৩. স্টুয়ার্ড মুজিবুর রহমান, গ্রাম-ঘাটিমাঝি, থানা-মাদারীপুর, জেলা-ফরিদপুর।
৪. এলএস সুলতানউদ্দিন আহমদ, গ্রাম-উত্তর খামার, থানা-কাপাসিয়া, জেলা-ঢাকা।

৫. এলএস সিডি নূর মোহাম্মদ, গ্রাম-কুমারবাউ, থানা-লৌহজং, জেলা-ঢাকা।
৬. আহম্মদ ফজলুর রহমান সিএসপি, গ্রাম-কচিসার, থানা-দেবীদ্বার, জেলা-কুমিল্লা।
৭. সার্জেন্ট মাহফুজুল্লাহ, গ্রাম-মুরাদপুর, থানা-বেগমগঞ্জ, জেলা-নোয়াখালী।
৮. করপোরাল আবুল বাশার মোহাম্মদ আবদুস সামাদ, গ্রাম-মিঠাখালি, থানা-মঠবাড়িয়া, জেলা-বরিশাল।
৯. হাবিলদার দলিল উদ্দিন, গ্রাম-শ্যামপুর, থানা-বাকেরগঞ্জ, জেলা-বরিশাল।
১০. রুহুল কুদ্দুস সিএসপি, গ্রাম-পচারাখি, থানা-সাতক্ষীরা, জেলা-খুলনা।
১১. সার্জেন্ট মোহাম্মদ ফজলুল হক, গ্রাম-সায়েস্তাবাদ, থানা-কোতোয়ালি, জেলা-বরিশাল।
১২. ভূপতি ভূষণ চৌধুরী ওরফে মানিক চৌধুরী, গ্রাম-হাবিলাশ দ্বীপ, থানা-পটিয়া, জেলা-চট্টগ্রাম।
১৩. বিধান কৃষ্ণ সেন, গ্রাম-সারুয়াতলা, থানা-বোয়ালখালী, জেলা-চট্টগ্রাম।
১৪. সুবেদার আবদুর রাজ্জাক-গ্রাম-দক্ষিণ বরষারচর, থানা-মতলব, জেলা-কুমিল্লা।
১৫. হাবিলদার ক্লার্ক মুজিবর রহমান, গ্রাম-গোপালপুর, থানা-নবীনগর, জেলা-কুমিল্লা।
১৬. ফ্লাইট সার্জেন্ট মোহাম্মদ আবদুর রাজ্জাক, গ্রাম-বলরামপুর, থানা-দাউদকান্দি, জেলা-কুমিল্লা।
১৭. সার্জেন্ট জহুরুল হক, গ্রাম-সোনাপুর, থানা-সুধারাম, জেলা-নোয়াখালী।
১৮. এজি মোহাম্মদ খুরশীদ, সাবের কটেজ, থানা-কোতোয়ালি, জেলা-ফরিদপুর।
১৯. এম সামসুর রহমান সিএসপি, গ্রাম-লালুবাড়ি, থানা-মানিকগঞ্জ, জেলা-ঢাকা।
২০. রিসালদার এ কে এম শামসুল হক, এসি, গ্রাম-পোতাল, থানা-মানিকগঞ্জ, জেলা-ঢাকা।

২১. হাবিলদার আজিজুল হক, গ্রাম-কচিয়া, থানা-দৌলতখা, জেলা-বরিশাল।
২২. এসসি মাহফুজুল বারী, গ্রাম-চর লক্ষ্মী, থানা-ফেনী, জেলা-নোয়াখালী।
২৩. সার্জেন্ট শামসুল হক, গ্রাম-নেয়াজপুর, থানা-ফেনী, জেলা-নোয়াখালী।
২৪. মেজর শামসুল আলম, গ্রাম-খাজে দেওয়ান রোড, জেলা-ঢাকা।
২৫. ক্যাপ্টেন মোহাম্মদ আবদুল মোতালিব, গ্রাম-দরুদবারিতি, থানা-পূর্বধলা, জেলা-ময়মনসিংহ।
২৬. ক্যাপ্টেন এম শওকত আলী, গ্রাম-চাকদা, থানা-নড়িয়া, জেলা-ফরিদপুর।
২৭. ক্যাপ্টেন খন্দকার নাজমুল হুদা-গ্রাম-পশ্চিম বগুড়া রোড, জেলা-বরিশাল।
২৮. ক্যাপ্টেন এ কে নুরুজ্জামান, গ্রাম-সাহিদাবাদ, থানা-রায়পুর, জেলা-ঢাকা।
২৯. সার্জেন্ট আবদুল জলিল, গ্রাম-সারিয়াবাদ, থানা-নারায়ণপুর, জেলা-ঢাকা।
৩০. মোহাম্মদ মাহবুব উদ্দিন চৌধুরী-গ্রাম-পাইয়াম, জেলা-সিলেট।
৩১. ফ্লাইট লেফটেন্যান্ট এম এস এস রহমান, গ্রাম-মাকরাইল, থানা-লোহাগড়া, জেলা-যশোর।
৩২. সুবেদার এ কে এম তাজুল ইসলাম, গ্রাম-শ্রীপুর, থানা-ভাণ্ডারিয়া, জেলা-বরিশাল।
৩৩. মোহাম্মদ আলী রেজা, গ্রাম-লাহিড়ী, থানা-কোতোয়ালি, জেলা-কুষ্টিয়া।
৩৪. ক্যাপ্টেন খুরশিদ উদ্দিন আহমদ, গ্রাম-বাশিয়া, থানা-গফরগাঁও, জেলা-ময়মনসিংহ।
৩৫. ফার্স্ট লেফটেন্যান্ট আবদুর রউফ, পাকিস্তান হাউজ, থানা-ভৈরব, জেলা-ময়মনসিংহ।

উপরোক্ত অভিযুক্ত আসামিদের প্রথম দেশরক্ষা আইনে গ্রেফতার করা হয়। পরে তাদের ১৯৬৮ সালের ১৮ জানুয়ারি আর্মি, নেভি, এয়ারফোর্স আইনে পুনরায় গ্রেফতার করে কুর্মিটোলা সেনানিবাসে স্থানান্তর করা হয়। শেখ মুজিবুর

রহমানকে একই দিনে ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগার থেকে আর্মি আইনে বন্দী করে কুর্মিটোলা বিমানবন্দরে স্থানান্তর করা হয়।

আগরতলা মামলায় আরো ১১ জন আসামি রাজসাক্ষী হওয়ায় তাদের ক্ষমা করা হয়। তারা হলেন লে. মোজাম্মেল হোসেন, করপোরাল আমির হোসেন, সার্জেন্ট শামসুদ্দিন আহম্মদ, ডা. আবদুর রহমান, মির্জা রমিজ, ক্যাপ্টেন আবদুল আলীম ভূঁইয়া, করপোরাল কামালউদ্দিন, করপোরাল সিরাজুল ইসলাম, মোঃ গোলাম, মোহাম্মদ ইউসুফ, সার্জেন্ট আবদুল হালিম।

শেখ মুজিবুর রহমানকে আগরতলা মামলায় অভিযুক্ত করায় আওয়ামী লীগ ও ছাত্র সমাজ প্রতিবাদ জানাতে থাকে।

মামলার শুনানি

প্রেসিডেন্ট ১৯৬৮ সালের ২১ এপ্রিল ফৌজদারী আইন সংশোধন করে আগরতলা মামলা বিচারের জন্য বিশেষ ট্রাইব্যুনাল গঠন করা হয়। ১৯৬৮ সালের ২০ জুন আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার শুনানি শুরু হয়। শেখ মুজিবুর রহমানের প্রধান কৌসুলি ছিলেন এডভোকেট আবদুস সালাম খান। সরকার পক্ষের প্রধান কৌসুলি ছিলেন পাকিস্তানের সাবেক পররাষ্ট্রমন্ত্রী লাহোর হাইকোর্টের বিখ্যাত আইনজীবী মঞ্জুর কাদের। কুর্মিটোলার একটি কক্ষে বিচারকাজ শুরু হয়। মামলার বিচারের প্রধান বিচারক ছিলেন বিচারপতি এম এস রহমান। তার পাশেই বসতেন বিচারপতি এম আর খান এবং মাকসুমুল হাকিম। ১৯৬৮ সালের ২০ জুন হতে ১৩ ডিসেম্বর পর্যন্ত ২০৬ জনের সাক্ষ্যগ্রহণ করা হয়। ১৯৬৯ সালের ২ জানুয়ারি সওয়াল জবাব শুরু হবে। সাংবাদিকরা প্রত্যেক সাক্ষীর জেরা পত্রিকায় প্রকাশ করে সরকারের বিরুদ্ধে জনমত সৃষ্টি করে। ইংল্যান্ডের রানীর কৌসুলি টমাস উইলিয়াম ২৯ জুলাই শেখ মুজিবুর রহমানের সাথে দেখা করেন। ১৯৬৮ সালের ১৭ নভেম্বর শেখ মুজিবুর রহমানের কন্যা শেখ হাসিনাকে ড. ওয়াজেদ মিয়ার সাথে বিয়ে দেয়া হয়। শেখ মুজিব তাদের বিয়েতে প্যারোলে উপস্থিত থাকতে চেয়েছিলেন। কিন্তু তাকে অনুমতি দেয়া হয়নি।

আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার পাকিস্তান সরকারের আনীত অভিযোগ ছিল–

ভারতীয় অস্ত্রশস্ত্র ও অর্থের সাহায্যে সশস্ত্র বিদ্রোহ ঘটিয়ে পাকিস্তান থেকে একটি অংশ বিচ্ছিন্ন করে সেই অংশে ভারতীয় স্বীকৃত একটি স্বাধীন সরকার গঠন করার এক ষড়যন্ত্রের আভাস গোপন সূত্রে জানা যায়। এই গোপন সূত্র ধরে

১৯৬৭ সালের ডিসেম্বরে পাকিস্তান প্রতিরক্ষা আইনে কয়েকজনকে গ্রেফতার করা হয়।

সশস্ত্র সংগ্রামের প্রধান পরিকল্পনা ছিল সামরিক ইউনিটগুলোর অস্ত্রাগারগুলো দখল করে সেগুলো পঙ্গু করে দেয়া। গেরিলা কায়দায় অতর্কিত অভিযান পরিচালনা করা হবে। এ উদ্দেশে সামরিক, প্রাক্তন ও বেসামরিক কর্মচারীদের নিয়ে সশস্ত্র দল গঠন হবে।

ভারতের নিকট থেকে অর্থ ও অস্ত্র সাহায্য নিয়ে প্রধান এলাকা চিহ্নিত করে সংগ্রাম দিবসের জন্য অপেক্ষা করা। এ কর্মসূচি বাস্তবায়নের জন্য ভারতের আগরতলায় ১৯৬৭ সালের ২৭ জুলাই উভয় দলের এক বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়।

শেখ মুজিবুর রহমানের বিরুদ্ধে অভিযোগ ছিল, ১৯৬৪ হতে বিদ্রোহের প্রধান নেতা লে. কমান্ডার মোয়াজ্জেমসহ অন্যান্য আসামিদের সাথে সভা করেছেন এবং ষড়যন্ত্রের নেতৃত্বে দেন।

শেখ মুজিবুর রহমান আদালতে তার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ অস্বীকার করে এক লিখিত বিবরণ পাঠ করেন।

১৯৬৮ সালের ১৯ অক্টোবর আওয়ামী লীগের ভারপ্রাপ্ত সভাপতি সৈয়দ নজরুল ইসলামের সভাপতিত্বে আওয়ামী লীগের কাউন্সিল অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। দৈনিক ইত্তেফাকের সম্পাদক তফাজ্জল হোসেন মানিক মিয়া সম্মেলন উদ্বোধন করেন। সম্মেলনে সকলকে ঐক্যবদ্ধ করে গণআন্দোলন চালিয়ে যাওয়ার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। সভায় আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা প্রত্যাহার ও শেখ মুজিবুর রহমানসহ সকল আসামির মুক্তি দাবি করা হয়।

১৯৬৯ সালের গণআন্দোলনের ফলে সরকার ২২ ফেব্রুয়ারি আগরতলা মামলা প্রত্যাহার করে এবং সকল আসামিকে মুক্তি দেয়। আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের ভিত্তি স্থাপন করে।

অধ্যায় ১৪

ঊনসত্তরের গণঅভ্যুত্থান

১৯৬৮ সালের ২৭ অক্টোবর প্রেসিডেন্ট আইয়ুব খান ও তার দল কনভেনশন মুসলিম লীগ উন্নয়ন দশক পালন করে। পূর্ব বাংলার জনগণ তার উন্নয়ন দশক প্রত্যাখ্যান করে। তথাকথিত উন্নয়ন দশক ছিল মূলত বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের দশক।

শেখ মুজিবুর রহমানের বিরুদ্ধে মিথ্যা আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা চলছে। প্রত্যেকদিন সরকারি বিবরণ শুনে জনগণ আইয়ুব-মোনায়েম সরকারের বিরুদ্ধে বিক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে।

অর্থনৈতিক, সামাজিক, রাজনৈতিক ক্ষেত্রে পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যে বিশাল বৈষম্য সৃষ্টি হয়েছে। নিম্নে একটি বৈষম্যের চিত্র তুলে ধরা হলো :

উন্নয়ন ক্ষেত্রে বরাদ্দের বৈষম্য

বিষয়	পশ্চিম পাকিস্তান	পূর্ব পাকিস্তান
বৈদেশিক মুদ্রা বরাদ্দ	৮০%	২০%
বৈদেশিক সাহায্য (আমেরিকা সাহায্য)	৯৬%	৪%
মার্কিন সাহায্য	৬৬%	৩৪%
পাকিস্তান শিল্প উন্নয়ন করপোরেশন	৫৮%	৪২%
পাকিস্তান শিল্প ঋণ ও বিনিয়োগ করপোরেশনর	৮০%	২০%
শিল্প উন্নয়ন ব্যাংক	৭৬%	২৪%
গৃহ নির্মাণ	৮০%	১২%

ছয় দফা দাবি ও আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা প্রত্যাহারের দাবির প্রেক্ষিতে শেখ মুজিবুর রহমান ও আওয়ামী লীগের জনপ্রিয়তা দ্রুত বৃদ্ধি পায়। মওলানা আবদুল

হামিদ খান ভাসানী আইয়ুব খানের বিরুদ্ধে চলে আসে। ১৯৬৮ সালের ৩ নভেম্বর পল্টন ময়দানে এক জনসভায় তিনি আইয়ুব খানকে এই মুহূর্তে পদত্যাগ করতে বলেন। ১৮ নভেম্বর ঢাকার আইনজীবীরা বিক্ষোভ মিছিল করে এবং ছাত্র সমাজ প্রদেশব্যাপী প্রতিবাদ দিবস পালন করে।

পশ্চিম পাকিস্তানে আন্দোলন

জুলফিকার আলী ভুট্টোর পিপলস পার্টি ও অন্যান্য বিরোধী দলের নেতৃত্বে পশ্চিম পাকিস্তানে আইয়ুব খানের বিরুদ্ধে প্রচণ্ড আন্দোলন শুরু হয়। রাওয়ালপিন্ডিতে পুলিশ ছাত্রদের ওপর গুলিবর্ষণ করে আবদুল হামিদকে হত্যা করে। আইয়ুব খান ১৯৬৮ সালের ১৩ নভেম্বর পিপলস পার্টির চেয়ারম্যান জুলফিকার আলী ভুট্টোকে গ্রেফতার করে। ভুট্টোর গ্রেফতারের প্রতিবাদে পশ্চিম পাকিস্তানে আন্দোলনের ঝড় বয়ে যায়। ৮ ডিসেম্বর পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানে হরতাল পালিত হয়।

পিডিএম (Pakistan Democratic Movement)

১৯৬৯ সালের ১ জানুয়ারি ঢাকায় পিডিএম গঠিত হয়। পিডিএমভুক্ত দলগুলো হলো– এনডিএম, ৬-দফা বিরোধী আওয়ামী লীগ, কাউন্সিল মুসলিম লীগ, জামায়াতে ইসলাম প্রভৃতি ৫টি দল পিডিএম গঠন করে। ন্যূনতম কর্মসূচির ৫ দল আন্দোলনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। পিডিএম আইয়ুব খানের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন অব্যাহত রাখে। ১৯৬৯ সালের ৮ জানুয়ারি আইয়ুববিরোধী আন্দোলন পরিচালনার জন্য ৫ দফা ঘোষণা করে। দফাগুলো হলো–

১. সর্বজনীন ভোটের ভিত্তিতে সরাসরি নির্বাচন;
২. সরাসরি নির্বাচিত পার্লামেন্ট ও প্রাদেশিক আইনসভাকে পূর্ণ ক্ষমতা প্রদান;
৩. অবিলম্বে জরুরি অবস্থা প্রত্যাহার;
৪. অবিলম্বে মৌলিক অধিকার এবং স্বাধীনতা পুনর্বাসন;
৫. অবিলম্বে সকল রাজবন্দীর মুক্তি ও তাদের বিরুদ্ধে আনীত সকল মামলা প্রত্যাহার।

পিডিএম-এর নেতা ছিলেন–
নূরুল আমিন, এনডিএফ
আতাউর রহমান খান, এনডিএম
মাহমুদ আলী, এনডিএফ
আবদুস সালাম খান, এনডিএফ

ডাক (Democrtic Action Committee—DAC)

১৯৬৯ সালের ৮ জানুয়ারি ঢাকায় ৩২ নম্বর ধানমণ্ডিতে শেখ মুজিবুর রহমানের বাসভবনে অনুষ্ঠিত সভায় পাকিস্তানের সকল বিরোধী দল একনায়কতন্ত্র উৎখাত ও গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার জন্য সম্মিলিত সংগ্রাম কমিটি– 'ডাক' গঠন করে।

ডাক ৮ দফার ভিত্তিতে ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন শুরু করে।

১. ফেডারেল পার্লামেন্টারি পদ্ধতির সরকার।
২. প্রাপ্তবয়স্কদের ভোটাধিকার ভিত্তিতে প্রত্যক্ষ নির্বাচন।
৩. অবিলম্বে জরুরি অবস্থা প্রত্যাহার।
৪. নাগরিক অধিকার পুনরুদ্ধার, সকল কালো আইন বিশেষ করে বিনা বিচারে আটক ও বিশ্ববিদ্যালয় অর্ডিন্যান্স বাতিল।
৫. শেখ মুজিবুর রহমান, খান আবদুল ওয়ালি খান, জুলফিকার আলী ভুট্টোসহ সকল রাজবন্দীদের মুক্তি এবং ট্রাইব্যুনালে বিচারাধীন সকল মামলা প্রত্যাহার।
৬. ১৪৪ ধারা মতে জারিকৃত সকল নির্দেশ প্রত্যাহার।
৭. শ্রমিকদের ধর্মঘট করার অধিকার বহাল।
৮. সংবাদপত্রের ওপর বিধি নিষেধ প্রত্যাহার। দৈনিক ইত্তেফাক ও উর্দু পত্রিকা চাস্তাসহ যে সকল পত্রিকা ডিক্লারেশন বাতিল করা হয়েছে তা প্রত্যাহার।

ডাকের ঘোষণাপত্রে স্বাক্ষর করেন

১. আমির হোসেন-ভারপ্রাপ্ত সভাপতি ন্যাপ
২. চৌধুরী মোহাম্মদ আলী-সভাপতি নেজামে ইসলাম
৩. মুফতি মাহমুদ-সেক্রেটারি জেনারেল, জামায়াতে ওলেমা-ই-ইসলাম।
৪. মমতাজ মোহাম্মদ দৌলতানা-সভাপতি পাকিস্তান মুসলিম লীগ।
৫. নবাবজাদা নসরুল্লাহ খান-সভাপতি পাকিস্তান আওয়ামী লীগ।
৬. নুরুল আমীন-সভাপতি এনডিএফ
৭. সৈয়দ নজরুল ইসলাম-ভারপ্রাপ্ত সভাপতি পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগ।
৮. তোফায়েল মিয়া-ভারপ্রাপ্ত আমির পাকিস্তান জামায়াতে ইসলাম।

এ ঘোষণার সাথে দেশের সর্বত্র ডাকের কর্মসূচি পালিত হয়।

ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ-১১ দফা

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ডাকসু ও হল নির্বাচনে ছাত্রলীগ একক বিজয় লাভ করে।

১৯৬৯ সালের ৫ জানুয়ারি ১১ দফার ভিত্তিতে কেন্দ্রীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ গঠিত হয়।

ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের সদস্যগণ

তোফায়েল আহমদ	ভিপি, ডাকসু, আহ্বায়ক
আবদুর রউফ	সভাপতি, পূর্ব পাকিস্তান ছাত্রলীগ
সাইফুদ্দিন আহমেদ	সভাপতি, পূর্ব পাকিস্তান ছাত্র ইউনিয়ন মস্কোপন্থী
জামাল হায়দার	সভাপতি, ছাত্র ইউনিয়ন, পিকিংপন্থী
খালেদ মোহাম্মদ আলী	সাধারণ সম্পাদক, পূর্ব পাকিস্তান ছাত্রলীগ
মাহবুব উল্ল্যাহ	সাধারণ সম্পাদক, ছাত্র ইউনিয়ন
মাহবুবুল হক দুলন	সভাপতি, এনএসএফ
নাজিম কামরান	সাধারণ সম্পাদক, ডাকসু

ভিপি তোফায়েল আহমদ ছিলেন ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের আহ্বায়ক।

ছাত্রদের এগারো দফা কর্মসূচি

১৯৬৯ সালের ১৪ জানুয়ারি কেন্দ্রীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ সাধারণ দুটো সভায় আনুষ্ঠানিকভাবে এগারো দফা কর্মসূচি ঘোষণা করে।

১১ দফা হলো–

১. সকল কলেজসমূহ প্রাদেশিককরণের নীতি পরিত্যাগ করতে হবে। জগন্নাথ কলেজসহ প্রাদেশিককরণ হতে কলেজসমূহ পূর্বাবস্থায় ফিরিয়ে দিতে হবে। ছাত্রদের বেতন ৫০% হ্রাসকরণ, হোস্টেলে আবাসিক সাবসিডি প্রদান। ছাত্রদের ট্রেন ভাড়া ৫০% হ্রাস। নারী শিক্ষার ব্যাপক প্রসার। অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত শিক্ষা অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক করা। মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন। হামুদুর রহমান শিক্ষা কমিশন রিপোর্ট বাতিল।

২. প্রাপ্তবয়স্কদের ভোটে প্রত্যক্ষ নির্বাচনের মাধ্যমে পার্লামেন্টারি গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা, বাক স্বাধীনতা ও সংবাদপত্রের স্বাধীনতা।

৩. পূর্ব স্বায়ত্তশাসন প্রতিষ্ঠা।

৪. পশ্চিম পাকিস্তান স্বায়ত্তশাসন দিয়ে সাব ফেডারেশন গঠন।

৫. ব্যাংক, বীমা, বৃহৎশিল্প কারখানা জাতীয়করণ করা।

৬. কৃষকদের খাজনা ও ঋণ মওকুফ।

৭. শ্রমিকদের ন্যায্য মজুরি ও বোনাস প্রদান; ট্রেড ইউনিয়নের অধিকার প্রদান।

৮. পূর্ব পাকিস্তানের বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও জল সম্পদের সঠিক ব্যবহার।

৯. জরুরি আইন প্রত্যাহার, জননিরাপত্তা আইনসহ অন্যান্য নির্যাতনমূলক আইন প্রত্যাহার।

১০. সিয়াটো, সেন্টো পাক-মার্কিন সামরিক চুক্তি বাতিল করে স্বাধীন নিরপেক্ষ পররাষ্ট্র নীতি কায়েম করতে হবে।

১১. আগরতলা মামলা প্রত্যাহারসহ সকল রাজনীতিবিদকে মুক্তি ও মামলা প্রত্যাহার করতে হবে।

আসাদের মৃত্যু– ২০ জানুয়ারি ১৯৬৯

১৯৬৯ সালের ২০ জানুয়ারি কেন্দ্রীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের আহ্বানে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ঢাকার সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ছাত্ররা সমবেত হয়। সভা শেষে তারা মিছিল করে রাস্তা প্রদক্ষিণ করে। পুলিশ, ইপিআর লাঠিচার্জ ও টিয়ার গ্যাস নিক্ষেপ করে। মিছিল চানখারপুলের নিকট পৌঁছলে পুলিশ ১টা ৫৫ মিনিটে ঢাকা সেন্ট্রাল ল কলেজের ছাত্র, ছাত্র ইউনিয়ন নেতা এএম আসাদুজ্জামানকে(২৫) গুলি করে হত্যা করে। আসাদুজ্জামানের হত্যার প্রতিবাদে ২২, ২৩, ২৪ জানুয়ারি শোক পালিত হয়। আসাদের মৃত্যু গণআন্দোলনের রূপ নেয়। ১৯৬৯ সালের ২৪ জানুয়ারি হরতাল চলাকালে পুলিশ মিছিলে গুলি করে ঢাকার নবকুমার ইনস্টিটিউশনের নবম শ্রেণীর ছাত্র কিশোর মতিউর রহমান মল্লিককে হত্যা করে। পুলিশের গুলিতে আরও কয়েকজন নিহত হয়। নিহত মকবুল ও রুস্তমের লাশ ছিনিয়ে ছাত্ররা ইকবাল হলে সমবেত হয়। ঢাকার উন্মত্ত জনতা সরকারের প্রেস ট্রাস্টের পত্রিকা দৈনিক পাকিস্তান ও মর্নিং নিউজ পত্রিকায় অগ্নিসংযোগ করে। ট্রেন, বিমান যাতায়াত বন্ধ হয়ে যায়। সরকার গণঅভ্যুত্থান বন্ধ করার জন্য রাত ৮টায় ২৪ ঘণ্টার জন্য কার্ফু জারি করে। সেনাবাহিনী ছাত্র-জনতার ওপর গুলি বর্ষণ করে। ২৫ জানুয়ারি কার্ফু ভঙ্গ করে ছাত্ররা জঙ্গী মিছিল বের করে। সেনাবাহিনীর গুলিতে অনেকে নিহত হয়। তেজগাঁও এলাকায় শিশুকে দুগ্ধপানরত অবস্থায় জনৈক আনোয়ারা গুলিতে নিহত হন। ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ ২৬ জানুয়ারি হতে ৩ দিনের শোক দিবস পালন করে।

পশ্চিম পাকিস্তানে গণআন্দোলন ছড়িয়ে পড়ে। প্রেসিডেন্ট আইয়ুব খান পশ্চিম পাকিস্তানের ওপর নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলেন। ডাক ও ছাত্র সংগ্রাম

পরিষদের নেতৃত্বে আন্দোলন চরমে পৌঁছে। প্রশাসন ভেঙে পড়ে। প্রশাসন নিয়ন্ত্রণ করছে ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ-ডাকসুর ভিপি তোফায়েল আহমদ তখন একচ্ছত্র নেতা। ১৯৬৯ সালের ১ ফেব্রুয়ারি আইয়ুব খান ঘোষণা দিলেন তিনি আলোচনায় বসতে প্রস্তুত। ৬ ফেব্রুয়ারি তিনি ঢাকায় আসেন। ১৭ ফেব্রুয়ারি আলোচনায় যোগদানের জন্য নেতাদের আহ্বান জানান।

১৯৬৯ সালের ৬ ফেব্রুয়ারি ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ কালোব্যাজ ধারণ ও কালো পতাকা উত্তোলনের কর্মসূচি গ্রহণ করে। পরিস্থিতি অনুকূলে আনার জন্য সরকার ৮ ফেব্রুয়ারি দৈনিক ইত্তেফাক পত্রিকার ছাপাখানা বাজেয়াপ্ত আদেশ প্রত্যাহার করে। ইত্তেফাক নিয়মিত প্রকাশিত হতে থাকে। ৯ ফেব্রুয়ারি ঢাকায় সর্ববৃহত্তম মিছিল বের হয়। সরকারের দমননীতির প্রতিবাদে ভাসানী ন্যাপের জাতীয় পরিষদ সদস্য পাঞ্জাবের আরিফ ইফতেখার এবং পূর্ব পাকিস্তানের মশিউর রহমান পদত্যাগ করেন। আওয়ামী লীগ ও ছাত্রলীগ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে যে, আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা প্রত্যাহার ও শেখ মুজিবুর রহমানকে মুক্তি দিতে হবে। তা না হলে আওয়ামী লীগ ১৭ ফেব্রুয়ারি গোলটেবিল বৈঠকে যোগ দেবে না।

১৯৬৯ সালের ১২ ফেব্রুয়ারি পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগ ওয়ার্কিং কমিটি ডেমোক্রেটিক অ্যাকশন কমিটিকে অনুরোধ জানায় যে, আগরতলা মামলা প্রত্যাহার করার পর তারা যেন প্রেসিডেন্টের সাথে আলোচনায় বসে। একই সঙ্গে আওয়ামী লীগের এমএনএ এএইচএম কামরুজ্জামান, অধ্যাপক ইউসুফ আলী, এ বি এম নুরুল ইসলাম জাতীয় পরিষদ হতে পদত্যাগ করেন।

আলোচনার ক্ষেত্র অনুকূলে আনার জন্য সরকার নেতাদের মুক্তি দিতে শুরু করে। ১২ ফেব্রুয়ারি সরকার পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক তাজউদ্দীন আহমদ, নারায়ণগঞ্জের আলী আহমদ, ন্যাপের সিরাজুল ইসলাম খান প্রমুখকে মুক্তি দেয়। জাতীয় পরিষদের অধিবেশন অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ করে দেয়া হয়। ১৭ ফেব্রুয়ারি জরুরি অবস্থা প্রত্যাহার করা হয়।

পশ্চিম পাকিস্তানের পিপলস পার্টির চেয়ারম্যান জুলফিকার আলী ভুট্টোকে ১৪ ফেব্রুয়ারি মুক্তি দেয়।

১৪ ফেব্রুয়ারি ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ ও ডাক ১১ দফা ও ৮ দফা বাস্তবায়নের জন্য দেশব্যাপী হরতাল আহ্বান করে। এদিন পল্টন ময়দানে নুরুল আমিনের সভাপতিত্বে জনসভা অনুষ্ঠিত হয়।

কুর্মিটোলা সেনানিবাসে শেখ মুজিবুর রহমানের নিরাপত্তা ছিল না। তাই তিনি কক্ষের সামনে দুটো জানালা বন্ধ রাখেন।

সার্জেন্ট জহুরুল হকের মৃত্যু– ১৫ ফেব্রুয়ারি ১৯৬৯

আগরতলা মামলার বিচার চলাকালে পাকিস্তানে সেনারা শেখ মুজিবুর রহমানকে হত্যার পরিকল্পনা করে। শেখ মুজিবুর রহমান অফিসার্স মেসে ১৩ জনের সাথে থাকতেন। ১৪ ফেব্রুয়ারি তার পায়চারি করার সময় এক পাঠান ক্যাপ্টেন তাকে কক্ষে যেতে বলেন। তিনি কক্ষে চলে যান। কিন্তু ১৫ ফেব্রুয়ারি বর্বর হত্যাকাণ্ড চলে।

১৯৬৯ সালের ১৫ ফেব্রুয়ারি সকালে সার্জেন্ট জহুরুল হক ও ফ্লাইট সার্জেন্ট মহম্মদ ফজলুল হক টয়লেটে যাচ্ছিলেন। পাকিস্তান সেনাবাহিনীর হাবিলদার মঞ্জুর হোসেনসহ ঠাণ্ডা মাথায় জহুরুল হক ও ফজলুল হককে হত্যার উদ্দেশে গুলি করে। তাদের মৃত্যু নিশ্চিত করার জন্য হাবিলদার তাদের ওপর বেয়নেট চার্জ করে। এ সময় অন্য সেনারা হাবিলদার মঞ্জুরকে নিয়ে যায়। গুলির একপর্যায়ে সার্জেন্ট জহুরুল হক ও ফ্লাইট সার্জেন্ট ফজলুল হককে সিএমএইচ নিয়ে যায়। তখন উভয়ের জ্ঞান ফিরে আসে। কর্তব্যরত ডাক্তার ছিলেন ডা. এম এম আলী। গুলিবিদ্ধ দুজনে প্রচণ্ডভাবে দেশপ্রেমিক ও মানবতাবাদী ছিলেন। জহুরুল হক বলেন, তিনি ভাল আছেন। আগে ফজলুল হকের অপারেশন করা হোক। ফজলুল হক বললেন তিনি ভাল আছেন। আগে জহুরুলকে অপারেশন করা হোক। ডাক্তার দেখলেন জহুরুল হকের অবস্থা ভালো নয়। তিনি ফজলুল হকের চিকিৎসার শুরু করেন। নার্স ছিলেন খাওলা বেগম। তার আন্তরিক সেবায় এক মাস চিকিৎসার পর ফজলুল হক ভাল হয়ে যান। জহরুল হক অপারেশন টেবিলে মৃত্যুবরণ করেন। যদি একসাথে দু'জনকে অপারেশন করা হতো, তবে হয়তো সার্জেন্ট জহুরুল হকও বেঁচে যেতেন। কিন্তু কর্তৃপক্ষের অবহেলার কারণে দু'জনকে এক সাথে অপারেশনের ব্যবস্থা হয়নি। ১৬ ফেব্রুয়ারি ২-৩০ মিনিটে পল্টন ময়দানে জহুরুল হকের জানাজা অনুষ্ঠিত হয়। ৩-৩০ মিনিটে তাকে আজিমপুরে দাফন করা হয়। দাফনের পর মওলানা ভাসানীর নেতৃত্বে বিশাল শোক মিছিল হয়। জনতা বিক্ষুব্ধ হয়ে বাংলা একাডেমীর নিকট গেস্ট হাউজ, কনভেনশন মুসলিম লীগ অফিস, মন্ত্রী খাজা সাহাবুদ্দিন, প্রাদেশিক মন্ত্রী সুলতানের বাসভবনে অগ্নিসংযোগ করা হয়। সরকার ১৪৪ ধারা জারি করে। জনতা ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করে মিছিল করে। ১৭ ফেব্রুয়ারি সারাদেশে হরতাল পালিত হয়।

ড. জোহার মৃত্যু– ১৮ ফেব্রুয়ারি

১৮ ফেব্রুয়ারি রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররা ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করে মিছিল করে।

তাদের সাথে সেনাবাহিনীর সংঘর্ষ হয়। রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ড. শামসুজ্জোহা শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের গেটে এসে ছাত্রদের ফিরিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন। এ সময় সেনাবাহিনী ড. জোহাকে লক্ষ্য করে গুলি করে। তিনি রাজশাহী মেডিকেল কলেজে মৃত্যুবরণ করেন। তার মৃত্যুকে কেন্দ্র করে সমগ্র পাকিস্তানে গণআন্দোলন সৃষ্টি হয়। প্রকৃতপক্ষে সার্জেন্ট জহুরুল হক ও ড. জোহাকে হত্যার পর গণঅভ্যুত্থান চূড়ান্ত বিজয়ে পৌঁছে। ১৯ ফেব্রুয়ারি ঢাকায় কার্ফু ভঙ্গ করে ছাত্র-জনতা সেনাবাহিনী, ইপিআর ও পুলিশের সাথে সংঘর্ষে লিপ্ত হয় এবং গুলিতে ২০৯ জন নিহত হয়। ঢাকার বাইরে কুষ্টিয়ায় ৩, নোয়াখালীতে ৪, বরিশালে ১ জন নিহত হয়। পশ্চিম পাকিস্তানে ড. জোহার হত্যার প্রতিবাদে গণঅভুত্থান হয় এবং অনেকে নিহত হয়। ২১ ফেব্রুয়ারি গুলিতে ঢাকায় ৮ জন, পাবনায় ২ জন নিহত হয়। শহীদদের রক্ত বৃথা যায় না।

আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা প্রত্যাহার, শেখ মুজিবুর রহমান মুক্ত– ২২ ফেব্রুয়ারি ১৯৬৯

প্রেসিডেন্ট আইয়ুব খান দেখলেন কোনো রাজনৈতিক সমাধান হচ্ছে না। তাই তিনি ২১ ফেব্রুয়ারি সন্ধ্যায় বেতার ভাষণে ঘোষণা করেন, "I have decided to announce today that I shall not be a candidate in the next election. The decision is final and irrevocable." আমি আজ ঘোষণা করছি যে, আমি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছি যে, আমি আগামী নির্বাচনে প্রার্থী হবো না। এ সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত এবং অপ্রত্যাহারযোগ্য। তিনি আরো ঘোষণা করলেন যে, আগরতলা মামলা তুলে নেয়া হবে। ১৯৬৯ সালের ২২ ফেব্রুয়ারি দুপুরে আগরতলা মামলার আসামি শেখ মুজিবুর রহমানসহ সকলে মুক্তি লাভ করেন। রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ মুক্তি লাভ করেন। শেখ মুজিবুর রহমান মুক্তি পেয়ে তার ধানমণ্ডির বাসভবনে গমন করেন। সমগ্র পাকিস্তানে বিজয় মিছিল চলছে। গণঅভ্যুত্থানের ফলে আগরতলা মামলা তুলে নেয়। অভিযুক্তরা মুক্তি পায়। বাংলার জনগণের বিজয় সূচিত হয়। শেখ মুজিবুর রহমান এদিন বিকেলে মওলানা ভাসানীর সাথে দেখা করেন।

২২ ফেব্রুয়ারি বিকেলে পল্টন ময়দানে আগরতলা মামলা থেকে সদ্য মুক্ত আসামিদের জাতীয় বীরের সংবর্ধনা দেয়া হয়।

'বঙ্গবন্ধু' উপাধি প্রদান

১৯৬৯ সালের ২৩ ফেব্রুয়ারি কেন্দ্রীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ শেখ মুজিবুর রহমানকে রমনা রেসকোর্স ময়দানে সংবর্ধনা প্রদান করা হয়। সভায় দশ লক্ষ

লোক উপস্থিত হন। সভায় সভাপতিত্ব করেন ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের সভাপতি ডাকসুর ভিপি তোফায়েল আহমদ। তোফায়েল আহমদ বাঙালি জাতির পক্ষে আওয়ামী লীগ সভাপতি বাঙালি জাতির ত্রাণকর্তা শেখ মুজিবুর রহমানকে বঙ্গবন্ধু উপাধিতে ভূষিত করেন। তিনি শুধু বাংলার নয় বাঙালি জাতির বন্ধু। ইতোপূর্বে চিত্তরঞ্জন রায়কে দেশবন্ধু, একে ফজলুল হককে শেরে বাংলা এবং সুভাষ চন্দ্র বসুকে নেতাজি উপাধিতে ভূষিত করা হয়েছে। শেখ মুজিব জনসভায় ছয় দফা ও ছাত্রদের ১১ দফা বাস্তবায়নের অঙ্গীকার করেন।

বঙ্গবন্ধু একজন মুক্ত মানুষ হিসেবে লাহোরে গোলটেবিল বৈঠকে যোগ দেন।

রাওয়ালপিন্ডি গোলটেবিল বৈঠক

শেখ মুজিবুর রহমানকে প্যারোলে গোলটেবিল বৈঠকে যোগদানের আহ্বান করা হয়েছিল। তিনি তা প্রত্যাখ্যান করে একজন মুক্ত প্রতিনিধি হিসেবে যোগ দিতে চেয়েছিলেন। প্রেসিডেন্ট আইয়ুব খান বাধ্য হলেন তাকে মুক্তি দিয়ে গোলটেবিল বৈঠকে তার সাথে আলোচনায় বসতে।

১৯৬৯ সালের ২৬ ফেব্রুয়ারি রাওয়ালপিন্ডিতে আইয়ুব খান গোলটেবিল বৈঠক আহ্বান করেন। বৈঠকে নিম্নলিখিত দলের নেতৃবৃন্দ যোগদান করেন।

শেখ মুজিবুর রহমান	পাকিস্তান আওয়ামী লীগ ৬ দফা
সৈয়দ নজরুল ইসলাম	পাকিস্তান আওয়ামী লীগ
মমতাজ মোহাম্মদ দৌলাতানা	পাকিস্তান মুসলিম লীগ
খাজা খয়ের উদ্দিন	পাকিস্তান মুসলিম লীগ
নুরুল আমিন	এনডিএফ
হামিদুল হক চৌধুরী	এনডিএফ
নবাবজাদা নসরুল্লাহ খান	পাকিস্তান আওয়ামী লীগ ৮ দফা
আবদুস সালাম খান	পাকিস্তান আওয়ামী লীগ
চৌধুরী মোহাম্মদ আলী	পাকিস্তান নেজামে ইসলাম
মৌলভী ফরিদ আহমেদ	পাকিস্তান নেজামে ইসলাম
মওলানা আবুল আলা মওদুদী	জামায়াতে ইসলাম
অধ্যাপক গোলাম আজম	জামায়াতে ইসলাম
ওয়ালি খান	পাকিস্তান ন্যাশনাল পার্টি
অধ্যাপক মোজাফফর আহমদ	ন্যাপ
মুফতি মহম্মদ	পাকিস্তান জমিয়াতুল ইসলাম

পীর মহসিন উদ্দিন দুদু মিয়া জমিয়াতুল ইসলাম
বিচারপতি এস এম মোরশেদ
এয়ার মার্শাল আসগর খান

মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী ও জুলফিকার আলী ভুট্টোকে গোলটেবিল বৈঠকে আহ্বান করা হয়। কিন্তু তারা আহ্বান প্রত্যাখ্যান করেন।

২৪ ফেব্রুয়ারি বঙ্গবন্ধু ৯ জন প্রতিনিধি নিয়ে লাহোর যাত্রা করেন। তার সাথে ছিলেন তাজউদ্দীন আহমদ, মিজানুর রহমান চৌধুরী, আবদুল মোমেম, জহুর আহমদ চৌধুরী, আবদুল মালেক উকিল, এম এ আজিজ, ময়েজউদ্দিন ও মতিউর রহমান। লাহোরে তিনি পাকিস্তানের কয়েকজন বিশিষ্ট ব্যক্তির সাথে আলোচনা করেন। ২৫ ফেব্রুয়ারি তিনি পিণ্ডি যাত্রা করেন।

২৬ ফেব্রুয়ারি সকাল ১০-৩০ মিনিটে প্রেসিডেন্টের গেস্ট হাউজে গোলটেবিল বৈঠক শুরু হয়। ডাকের পক্ষে ১৬ জন, আইয়ুব খানের পক্ষে ১৫ জন মিলিয়ে মোট ৩৩ জন বৈঠকে যোগদান করেন। ৪০ মিনিট আলোচনার পর সভা ১০ মার্চ পর্যন্ত মুলতবি হয়ে যায়।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ৯ মার্চ দল নিয়ে রাওয়ালপিন্ডি পৌঁছেন। তারা পিন্ডির ইস্ট পাকিস্তান হাউজে অবস্থান করেন। ১০ মার্চ আইয়ুব খানের সভাপতিত্বে আরো একটি গোলটেবিল বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। আলোচনা ১৩ মার্চ পর্যন্ত চলে।

গোলটেবিল বৈঠকে উত্থাপিত দাবির মধ্যে ছিল–

১. ৬ দফার ভিত্তিতে সংবিধান রচনা।
২. সর্বজনীন প্রাপ্তবয়স্কদের ভোটে গণতান্ত্রিক পার্লামেন্ট নির্বাচন।
৩. কেন্দ্রীয় আইন পরিষদে জনসংখ্যার ভিত্তিতে নির্বাচন
৪. পূর্ববাংলার পূর্ণ স্বায়ত্তশাসন।
৫. আঞ্চলিক বৈষম্য দূরীকরণ।

প্রেসিডেন্ট আইয়ুব খানের সভাপতিত্বে আলোচনা ১৩ মার্চ অমীমাংসিত অবস্থায় শেষ হয়। ডাকের সভাপতি নবাবজাদা নসরুল্লাহ আলোচনায় সন্তোষ প্রকাশ করেন এবং আইয়ুব খানকে ধন্যবাদ, ডাকের ৮ দফাপন্থী আওয়ামী লীগ আলোচনাকে স্বাগত জানান। ৬ দফাপন্থী আওয়ামী লীগের দাবি– পূর্ণ স্বায়ত্তশাসন গোলটেবিল বৈঠকে গৃহীত না হওয়ায় আওয়ামী লীগ গোলটেবিল আলোচনা প্রত্যাখ্যান করে। গোলটেবিল বৈঠকের ফলাফল শূন্য।

১৩ মার্চের পর শেখ মুজিবুর রহমান ডাকের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করেন।

কারণ ডাক স্বায়ত্তশাসন দাবি মেনে নেয়নি। আলোচনা ভেঙে গেলেও আইয়ুব খান ক্ষমতায় থাকার জন্য চেষ্টা চালিয়ে যান। তিনি পূর্ব বাংলার গভর্নর মোনায়েম খানকে বদলি করে তার স্থলে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ড. এম এন হুদাকে পূর্ব পাকিস্তানের গভর্নর নিযুক্ত করেন।

মওলানা ভাসানী আলোচনায় না এসে তিনি পূর্ব বাংলায় জ্বালাও পোড়াও কর্মসূচি চালিয়ে যান। আইন-শৃঙ্খলা ভেঙে পড়েছে। পূর্ব বাংলা ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ ও নেতাদের হাতে।

প্রেসিডেন্ট আইয়ুব খান শেষ পর্যন্ত শেখ মুজিবুর রহমানের সাথে সমঝোতা করতে চেয়েছিলেন। তিনি তাকে পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রীর পদ দিতে চেয়েছেন। কিন্তু শেখ মুজিবুর রহমান ৬ দফা ব্যতীত কোনো মীমাংসায় আসবেন না। অবশেষে প্রেসিডেন্ট আইয়ুব খান ১৯৬৯ সালের ২৪ মার্চ পদত্যাগ করেন এবং জেনারেল ইয়াহিয়া খানকে পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট ও প্রধান সামরিক শাসক নিয়োগ করেন। রিয়াল এডমিরাল এস এ আহসানকে পূর্ব পাকিস্তানের গভর্নর এবং লে. জেনারেল ইয়াকুবকে সামরিক শাসক নিয়োগ করা হয়।

শেখ মুজিবুর রহমানের কারাদণ্ড মওকুফ

১৯৬৫ সালের ২০ মার্চ পল্টন ময়দানে রাষ্ট্রবিরোধী ভাষণ দেয়ার জন্য নিম্ন আদালত শেখ মুজিবুর রহমানকে ১৫ মাস কারাদণ্ড দেয়। এ দণ্ডাদেশের বিরুদ্ধে হাইকোর্ট আপীল করা হয়। হাইকোর্ট ১৯৬৯ সালের ৬ মে এ দণ্ডাদেশ বাতিল করে দেয়।

দৈনিক ইত্তেফাক সম্পাদক তফাজ্জল হোসেন মানিক মিয়ার মৃত্যু– ১ জুন ১৯৬৯

১৯৬৯ সালের ৩১ মে রাত ১২-৪০ মিনিটে দৈনিক ইত্তেফাক পত্রিকার প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক তফাজ্জল হোসেন মানিক মিয়া রাওয়ালপিন্ডির একটি হোটেলে হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে মৃত্যুবরণ করেন। ১ জুন তার মৃত্যুর খবর ঢাকায় ছড়িয়ে পড়ে। তার মৃত্যুতে বাঙালি জাতি গভীর শোক প্রকাশ করে। বঙ্গবন্ধু তার অকৃত্রিম সংগ্রামী সাথীকে হারিয়ে অসহায় হয়ে পড়েন। তিনি আইয়ুব-মোনায়েম খানের স্বৈরশাসনে নির্যাতিত। তিনি ১৯১১ সালে বরিশালের ভাণ্ডারিয়ায় জন্মগ্রহণ করেন। তিনি হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর স্নেহধন্য ছিলেন। তিনি ছিলেন ৬ দফা আন্দোলনের অগ্রসেনানি।

প্রদেশব্যাপী সফর

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান পূর্ব বাংলার সকল জেলা ও মহকুমা ব্যাপক সফর করেন এবং জনগণকে ৬ দফার দাবিতে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার জন্য আহ্বান জানান।

পূর্ব পাকিস্তানের নাম বাংলাদেশ ঘোষণা

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৬৯ সালের ৫ ডিসেম্বর হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর মৃত্যুবার্ষিকীতে ভাষণে বলেন, পূর্ব পাকিস্তানের নাম হবে বাংলাদেশ।

সাধারণ নির্বাচন ঘোষণা

১৯৬৯ সালের ২৮ সেপ্টেম্বর জাতির উদ্দেশে বেতার ভাষণে প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান এক ইউনিট বাতিল, এক ব্যক্তি এক ভোটের ভিত্তিতে ১৯৭০ সালের ৫ অক্টোবর দেশব্যাপী নির্বাচন অনুষ্ঠানের ঘোষণা করেন।

১৯৭০ সালের ১ জানুয়ারি থেকে রাজনৈতিক তৎপরতা অনুমতি দেয়া হয়।

শেখ মুজিবুর রহমান ৬ দফার ভিত্তিতে নির্বাচনী প্রচারণায় দেশব্যাপী অভিযান চালান।

ছাত্রলীগের বার্ষিকী সম্মেলন

১৯৭০ সালের ২০ মার্চ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইকবাল হলে ছাত্রলীগের বার্ষিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সম্মেলন ১৯৭০-৭১ সালের ছাত্রলীগের সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হন নূরে আলম সিদ্দিকী এবং শাজাহান সিরাজ। ১৯৬৯-৭০ সালের ছাত্রলীগের সভাপতি ও সেক্রেটারি ছিলেন তোফায়েল আহমদ ও নূরে আলম সিদ্দিকী।

ছাত্রলীগ, ছাত্র ইউনিয়ন ও ডাকসু ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধে অনন্য ভূমিকা পালন করে।

অধ্যায় ১৫

১৯৭০ সালের নির্বাচন

আওয়ামী লীগের ঐতিহাসিক বিজয়

১৯৭০ সালের ২৮ মার্চ প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান Legal Framework Order-আইনি কাঠামোর ঘোষণা দেন।

এলএফও-এর প্রধান দিকগুলো–

১. জাতীয় পরিষদে ৩১৩ জন সদস্য নিয়ে গঠিত হবে। এর মধ্যে ১৩ জন মহিলা থাকবেন।

২. শাসনতন্ত্র গণতান্ত্রিক হবে। জনসংখ্যার ভিত্তিতে প্রাপ্তবয়স্কদের ভোটাধিকার থাকবে।

৩. শাসনতন্ত্র প্রণয়নের জন্য ১২০ দিন সময় দেয়া হবে। ১৯৭০ সালের ১ জুলাই থেকে এক ইউনিট বিলুপ্ত হবে।

৪. ১ জুলাই হতে চতুর্থ পঞ্চবার্ষিকীর কাজ শুরু হবে।

৫. ১৯৭০ সালের ৩০ মার্চ এলএফও জারি হবে। শাসনতন্ত্র হবে ইসলামী শাসনতন্ত্র।

পাকিস্তানের বিভিন্ন প্রদেশে আসন সংখ্যা নিম্নরূপ হবে–

জাতীয় পরিষদ

পূর্ব পাকিস্তান	১৬৯
পুরুষ	১৬২
মহিলা	৭
পশ্চিম পাকিস্তান	১৪৪
পুরুষ	৮২
মহিলা	৩
সিন্ধু	২৭
মহিলা	২
বেলুচিস্তান	৪

মহিলা	১
সীমান্ত প্রদেশ	১৮
উপজাতি	৭
মহিলা	১

প্রাদেশিক আসন

পূর্ব পাকিস্তান	৩০০
পশ্চিম পাকিস্তান	৩১৩

১৯৭০ সালে ৫ অক্টোবর জাতীয় পরিষদ এবং ২২ অক্টোবর প্রাদেশিক পরিষদের নির্বাচন হবে।

ডাকসু নির্বাচন

১৯৭০ সালের ১৭ মে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র সংসদ- ডাকসুর নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। আ স ম আবদুর রব ডাকসুর সহ-সভাপতি ও আবদুল কুদ্দুস মাখন সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হন। বিশ্ববিদ্যালয় ৮টি হলের মধ্যে ৬টি হলে ছাত্রলীগ বিজয়ী হয়। ১৪২টি কলেজ বিশ্ববিদ্যালয় ও হল নির্বাচনে ১৩২টিতে ছাত্রলীগ জয়লাভ করে। ছাত্রলীগের বিজয়ে স্বাধীনতা অর্জনের পথ সুদৃঢ় করে। তারা ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধে নেতৃত্ব প্রদান করে।

আওয়ামী লীগের কমিটি গঠন, ৪ জুন ১৯৭০

১৯৭০ সালের ৪ জুন আওয়ামী লীগের প্রাদেশিক কাউন্সিল অধিবেশন ঢাকার হোটেল ইডেনে অনুষ্ঠিত হয়। ১১৩৮ জন কাউন্সিলর অধিবেশনে যোগ দেন।

১৯৭০ সালের ৪ জুন পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগ কমিটি নিম্নের সদস্যদের নিয়ে গঠিত হয়

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান	সভাপতি
সৈয়দ নজরুল ইসলাম	সহ-সভাপতি
ক্যাপটেন মনসুর আলী	সহ-সভাপতি
খন্দকার মোশতাক আহমেদ	সহ-সভাপতি
তাজউদ্দীন আহমদ	সাধারণ সম্পাদক
মিজানুর রহমান চৌধুরী	সাংগঠনিক সম্পাদক
আবদুল মোমিন	প্রচার সম্পাদক
মোহাম্মদ উল্লাহ	দপ্তর সম্পাদক

জহুর আহমেদ চৌধুরী	শ্রম সম্পাদক
বেগম বদরুন্নেসা	সমাজসেবা ও সংস্কৃতি
মোহাম্মদ মোহসিন	কোষাধ্যক্ষ

৬ জুন হোটেল ইডেনে পাকিস্তান আওয়ামী লীগের কমিটি গঠিত হয়।

সভাপতি- বঙ্গবন্ধু মুজিবুর রহমান

সম্পাদক- এ এইচ এম কামরুজ্জামান

শেখ মুজিবুর রহমান ২৭ জুন হতে ৬ জুলাই পশ্চিম পাকিস্তান সফর করেন। তিনি পূর্ব বাংলায় সকল জেলা, মহকুমা ও থানায় নির্বাচনী সফর করেন।

নির্বাচনের তারিখ পরিবর্তন করে ১৯৭০ সালের ৭ ডিসেম্বর ও ১৬ ডিসেম্বর করা হয়। নির্বাচন কমিশন ১৯৭০ সালের ৮ অক্টোবর দলীয় প্রতীক বরাদ্দ করে।

১. পাকিস্তান আওয়ামী লীগ	নৌকা
২. পিডিপি	ছাতা
৩. পিপলস পার্টি	তরবারি
৪. জামায়াতে ইসলামী	দাঁড়িপাল্লা
৫. মুসলিম লীগ কাইয়ুম	বাঘ
৬. কনভেনশন মুসলিম লীগ	বাইসাইকেল
৭. ন্যাপ ওয়ালী	কুঁড়েঘর
৮. ন্যাপ ভাসানী	ধানের শীষ
৯. জমিয়াতে ওলামায়ে ইসলাম	খেজুর গাছ

১৯৭০ সালে ২৮ অক্টোবর বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বেতার-টিভিতে নির্বাচনী ভাষণ দেন। তিনি নির্বাচনে জয়লাভের জন্য নিম্নলিখিত ইশতেহার দেন।

১. ৬-দফার ভিত্তিতে পূর্ণ আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন প্রদান;
২. বাঙালিদের প্রতি বৈষম্য দূর করতে হবে;
৩. শাসনতান্ত্রিকভাবে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করতে হবে;
৪. স্থানীয় স্বায়ত্তশাসনের স্পষ্ট রূপরেখা;
৫. অর্থনৈতিক বৈষম্য দূর;
৬. দুর্নীতি দমন;
৭. ভূমি সংস্কার-২৫ বিঘা পর্যন্ত ভূমি খাজনা মাফ;
৮. উভয় অঞ্চলে দ্রব্যমূল্যের সমতা। বর্তমান করাচীতে সোনা প্রতিভরি ১৩৫ টাকা ঢাকায় ১৫০ টাকা। ঢাকায় চাল মণ ৫০ টাকা, পশ্চিম পাকিস্তানে ২৫ টাকা;

৯. পাটের ন্যায্যমূল্য প্রদান;
১০. গ্যাসের সদ্ব্যবহার;
১১. যমুনা, বুড়িগঙ্গা, শীতলক্ষ্যার ওপর সেতু নির্মাণ;
১২. জনসংখ্যার ভিত্তিতে চাকরিতে নিয়োগ;
১৩. প্যারামিলিটারি বাহিনী গঠন;
১৪. চাষীদের বহুমুখী সমবায় সমিতি প্রতিষ্ঠা, ভূমিহীনদের ভূমি বণ্টন;
১৫. ৫ বছর বয়স্ক শিশুদের বাধ্যতামূলক অবৈতনিক শিক্ষা প্রদান;
১৬. প্রতি ইউনিয়নে একটি পল্লী চিকিৎসা কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা, হাসপাতাল প্রতিষ্ঠা;
১৭. উপজাতীয় এলাকায় সর্বাত্মক উন্নয়ন;
১৮. সর্বনাশা ফারাক্কা বাঁধের ফলে যে ভয়ঙ্কর অর্থনৈতিক সর্বনাশ হবে তা মোকাবেলা করা।

আওয়ামী লীগের নির্বাচনী ইশতেহার জনগণের মধ্যে সাড়া জাগায়। তারা আওয়ামী লীগের পতাকাতলে ঐক্যবদ্ধ হয়।

১৯৭০ সালের ১২ নভেম্বর ভোলা, পটুয়াখালী ও নোয়াখালীর ওপর দিয়ে প্রলয়ঙ্করী ঘূর্ণিঝড় বয়ে যায়। ১০ লাখ লোক নিহত হয়। বঙ্গবন্ধু তার দল নিয়ে ঝড়ে ক্ষতিগ্রস্তদের পাশে দাঁড়ান। তিনি এলাকায় ছুটে যান এবং ত্রাণ বিতরণ করেন।

১৯৭০ সালে নির্বাচনকালে উভয় অঞ্চলের মধ্যে বৈষম্য–

বৈষম্যের বিষয়	পূর্ব পাকিস্তান	পশ্চিম পাকিস্তান
রাজস্ব খাতে ব্যয়	১৬০০ কোটি টাকা	৫০০০ কোটি টাকা
উন্নয়ন খাতে ব্যয়	৩০০০ কোটি টাকা	৬০০০ কোটি টাকা
বৈদেশিক সাহায্য	২০%	৮০%
বৈদেশিক দ্রব্য আমদানি	২৫%	৭৫%
কেন্দ্র সরকারের চাকরি	১৫%	৮৫%
সামরিক বিভাগে চাকরি	১০%	৯০%
চাল মণপ্রতি	৫০ টাকা	২৫ টাকা
আটা মণপ্রতি	৩০ টাকা	১৫ টাকা
সরিষার তেল সেরপ্রতি	৫ টাকা	২.৫০ টাকা
স্বর্ণ প্রতিভরি	১৭০ টাকা	১৩৫ টাকা

পূর্ব পাকিস্তানে ১৯৭০ সালের ৭ ডিসেম্বর ৯টি বাদে ১৫৩টি আসনে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। দুটি ব্যতীত সকল আসনে আওয়ামী লীগ জয়লাভ করে। দুটির একটি আসনে পিডিপির নুরুল আমিন এবং পার্বত্য চট্টগ্রাম হতে চাকমা রাজা ত্রিদিব রায় নির্বাচিত হন। ১৭ ডিসেম্বর প্রাদেশিক পরিষদের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। ১৯৭১ সালের ১৭ জানুয়ারি বরিশাল, পটুয়াখালী, নোয়াখালী ও চট্টগ্রামের ক্ষতিগ্রস্ত এলাকায় নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়।

জাতীয় পরিষদে নির্বাচনের বিজয়ীদের ফলাফল নিম্নরূপ ছিল–

জাতীয় পরিষদের আসন	৩১৩
পাকিস্তান আওয়ামী লীগ	১৬৭
পাকিস্তান পিপলস পার্টি	৮৮
কাইয়ুম মুসলিম লীগ	৯
কাউন্সিল মুসলিম লীগ	৭
কনভেনশন মুসলিম লীগ	২
ন্যাপ ওয়ালী	৭
জামায়াতে ইসলাম	১
মারকাজ জমিয়াতুল ইসলাম	৭
হাজারভি গ্রুপ—	
থানভি গ্রুপ	১৪
নির্দলীয়	১৪
মোট	**৩১৩**

প্রাদেশিক পরিষদে ৩০০ আসনের মধ্যে আওয়ামী লীগ ২৮৮ আসনে জয় লাভ করে। অবশিষ্ট আসনে পিডিপি ২, নেজামে ইসলাম ১, জামায়াতে ইসলামী ১, ন্যাপ-১, স্বতন্ত্র-৭। স্বতন্ত্র সদস্যগণ আওয়ামী লীগে যোগ দেয়। আওয়ামী লীগের আসন দাঁড়ায় ২৯৫টি।

ভাসানী ন্যাপ নির্বাচন বর্জন করে। পরোক্ষভাবে মওলানা ভাসানী বঙ্গবন্ধুকে সমর্থন দেন।

আওয়ামী লীগ পূর্ব পাকিস্তানে জাতীয় পরিষদে মোট ভোটের ৭৫.১০% এবং প্রাদেশিক পরিষদে ৭০.৪৮% ভোট লাভ করে।

শেখ মুজিবুর রহমান তখন ঘনিষ্ঠজনদের বলতেন, My aim is to establish Bangladesh. I will tear the LFO into pieces as soon as the elections are over.

আমার লক্ষ্য হলো বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠা। নির্বাচন শেষ হলে আমি এলএফও ছিঁড়ে ফেলব। শেখ মুজিব ধীরগতিতে চলছেন। তিনি আইয়ুব খানের গোলটেবিল বৈঠকে যোগ দিয়েছেন। এর পরেও নিজে নির্বাচন করেছেন। তিনি পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী হবেন। কিন্তু প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান শেখ মুজিবকে প্রধানমন্ত্রী হিসেবে গ্রহণ করবেন না।

নির্বাচিত সদস্যদের শপথ ৩ জানুয়ারি–১৯৭১

১৯৭১ সালের ৩ জানুয়ারি রমনা রেসকোর্স ময়দানে শেখ মুজিবুর রহমান আওয়ামী লীগের সকল এমএনএ ও এমপিদের শপথ পড়ান। সদস্যরা ৬ দফা বাস্তবায়নের জন্য অঙ্গীকার করেন।

ইয়াহিয়া-শেখ মুজিব আলোচনা

নির্বাচনের পর পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট জেনারেল ইয়াহিয়া খান ১৯৭১ সালের ১১ জানুয়ারি ঢাকায় আগমন করেন। তিনি প্রেসিডেন্ট হাউজে (সুগন্ধা) শেখ মুজিবুর রহমানের সাথে ১২ ও ১৩ জানুয়ারি গোপন বৈঠক করেন। বৈঠকে মূল সমস্যা ৬ দফার সমঝোতা হয়নি। ১৪ জানুয়ারি ইয়াহিয়া খান ঢাকা ত্যাগ করেন। এ সময় ইয়াহিয়া খান শেখ মুজিবুর রহমানকে পাকিস্তানের ভবিষ্যত প্রধানমন্ত্রী হিসেবে সম্বোধন করেন।

১৭ জানুয়ারি প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান ভুট্টোর অতিথি হিসেবে লারকানা গমন করেন। লারকানায় ভুট্টোর সাথে গোপন আলোচনা হয়।

১৯৭১ সালের ৩০ জানুয়ারি কাশ্মীরের দু'জন স্বাধীনতা সংগ্রামী ভারতের গঙ্গা নামে একটি বিমান ভারত থেকে ছিনতাই করে পাকিস্তানের লাহোরে নিয়ে আসেন। এ ঘটনায় ভারত আকাশপথে পাকিস্তান বিমান চলাচলের জন্য বন্ধ করে দেয়। তারপর পাকিস্তানি বিমান শ্রীলংকা ও রেঙ্গুন হয়ে ঢাকা যাতায়াত করতে বাধ্য হয়।

শেখ মুজিবুর রহমান ১৫ ফেব্রুয়ারির মধ্যে জাতীয় পরিষদের অধিবেশন আহ্বান জানান। প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান ১৯৭১ সালের ৩ মার্চ বুধবার সকাল ৯টায় ঢাকায় প্রাদেশিক পরিষদ ভবনে জাতীয় পরিষদের অধিবেশন আহ্বান করেন। পশ্চিম পাকিস্তানে জুলফিকার আলী ভুট্টোর পিপিপি ও কাউন্সিলর মুসলিম লীগ কাইয়ুম ব্যতিত সকল দল ঢাকায় অধিবেশন যোগ দেবে। ১৪ ফেব্রুয়ারি ভুট্টো পেশোয়ারে ঘোষণা করেন যে, পাকিস্তানে তার দলের যারা ঢাকায় ৩ মার্চের অধিবেশনে যোগ দেবে তাদের পা ভেঙে দেয়া হবে।

১৯৭১ সালের ১৬ ফেব্রুয়ারি ঢাকায় ইঞ্জিনিয়ারিং ইনস্টিটিউশনে আওয়ামী লীগের এমপিদের অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। এ সভায় শেখ মুজিবুর রহমানকে দলের নেতা, সৈয়দ নজরুল ইসলাম উপনেতা ও অধ্যাপক ইউসুফ আলী চীফ হুইপ নির্বাচিত হন। ব্যারিস্টার আমীর-উল ইসলাম এবং আবদুল মান্নান হুইপ নির্বাচিত হন। এএইচএম কামরুজ্জামানকে পার্লামেন্টারি দলের সচিব নিযুক্ত করা হয়।

রাওয়ালপিন্ডিতে জুলফিকার আলী ভুট্টো ১৮ ও ১৯ ফেব্রুয়ারি প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খানের সাথে দেখা করেন।

১৯৭১ সালের ২২ ফেব্রুয়ারি প্রেসিডেন্ট মন্ত্রিসভা ভেঙে কয়েকজন উপদেষ্টা নিয়োগ করেন।

২২ ফেব্রুয়ারি প্রেসিডেন্ট গভর্নরদের সম্মেলন আহ্বান করেন।

২৫ ফেব্রুয়ারি গভর্নর এসএম আহসান শেখ মুজিবুর রহমানের সাথে দেখা করেন।

২৮ ফেব্রুয়ারি ভুট্টো করাচির জনসভায় বলেন, বর্তমান সংকট নিরসনের জন্য দুটো প্রস্তাব পেশ করেন। একটি হল ৩ মার্চের অধিবেশন বন্ধ এবং শাসনতন্ত্র প্রণয়নের ১২০ দিন সময়সীমা বাতিল করতে হবে।

অধ্যায় ১৬

অসহযোগ আন্দোলন

জাতীয় পরিষদের অধিবেশন ১৯৭১ সালের ৩ মার্চ ঢাকায় অনুষ্ঠিত হবে। পশ্চিম পাকিস্তান থেকে ২৫ জন এমএনএ ঢাকায় পৌঁছেছেন। ২৮ ফেব্রুয়ারি পাকিস্তানে আমেরিকার রাষ্ট্রদূত জোসেফ ফারল্যান্ড ঢাকায় শেখ মুজিবুর রহমানের সাথে দেখা করেন।

১৯৭১ সালের ১ মার্চ হঠাৎ প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান জাতির উদ্দেশে এক ভাষণে ৩ মার্চ অনুষ্ঠিতব্য জাতীয় পরিষদের অধিবেশন স্থগিত করেন। তিনি রাজনৈতিক মতবিরোধ ও শাসনতন্ত্র প্রণয়নে জটিলতা নিরসনে ব্যর্থতাকে দায়ী করেন।

১ মার্চ শেখ মুজিবুর রহমানের সভাপতিত্বে শাসনতন্ত্র প্রণয়ন কমিটির সভা চলছিল। অধিবেশন স্থগিতের সংবাদ শুনে তিনি ঘোষণা করেন, ৭ কোটি বাঙালির মুক্তির জন্য তিনি সকল প্রকার উৎসর্গ করবেন। তিনি ঘোষণা দেন যে ২ মার্চ ঢাকায় অর্ধদিবস হরতাল, ৩ মার্চ সারা বাংলায় হরতাল এবং ৭ মার্চ জনসভায় তিনি চূড়ান্ত কর্মসূচি দেবেন।

১ মার্চ ইয়াহিয়া খানের ভাষণ শুনে লাখ লাখ লোক রাস্তায় বেরিয়ে পড়ে। ঢাকার পল্টন ময়দানে বিশাল জনসমাগম হয়। ছাত্রনেতা আ স ম রব, আব্দুল কুদ্দুস মাখন, শাজাহান সিরাজ, নূরে আলম সিদ্দিকী ভাষণ দেন।

২ মার্চ ঢাকার সর্বত্র মিছিল চলছে। সেনাবাহিনী মালিবাগের আবুজর গিফারী কলেজের ছাত্র ফারুককে গুলি করে হত্যা করে। তাকে রামপুরা সড়কের আইল্যান্ডে দাফন করা হয়।

২ মার্চ সকাল ১০-৪৫ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে কলা ভবনে বিশাল ছাত্র সমাবেশ। ছাত্রনেতা আ স ম আবদুর রব, শাজাহান সিরাজ, নূরে আলম সিদ্দিকী, আবদুল কুদ্দুস মাখন বাংলাদেশের উদীয়মান লাল সূর্য ও পূর্ব বাংলার মানচিত্র খচিত পতাকা উত্তোলন করেন। ছাত্র সমাবেশে ছাত্রনেতৃবৃন্দ বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। তোফায়েল আহমেদের নেতৃত্বে মিছিল করে ছাত্ররা

পল্টনের জনসভায় যোগ দেয়। ৩ মার্চ প্রদেশব্যাপী হরতাল। শেখ মুজিবুর রহমান পল্টন ময়দানে ভাষণ দেন। ৩ মার্চের জনসভায় বঙ্গবন্ধু নিম্নের নির্দেশ প্রদান করেন–

- অবিলম্বে জনপ্রতিনিধিদের নিকট ক্ষমতা প্রদান;
- অফিস-আদালত বন্ধ থাকবে;
- বেতার টিভিতে আন্দোলনের খবর প্রকাশ নিষেধ থাকলে তা প্রত্যাখ্যান করা হবে।
- আন্দোলনে লুটপাট অগ্নিসংযোগ করলে তা প্রতিহত করতে হবে।

৩ মার্চ সেনাবাহিনীর গুলিতে ১৫ জন নিহত হয়।

পূর্ব পাকিস্তানে প্রচণ্ড গণরোষ দেখে ৪ মার্চ প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান ঢাকায় ১০ মার্চ সর্বদলীয় সম্মেলন আহ্বান করেন। আমন্ত্রিত অতিথিদের মধ্যে ছিলেন

শেখ মুজিবুর রহমান	আওয়ামী লীগ
জুলফিকার আলী ভুট্টো	পিপিপি
আবদুল কাইয়ুম খান	মুসলিম লীগ কাইয়ুম
মিয়া মোহাম্মদ দৌলতানা	কাউন্সিল মুসলিম লীগ
মৌলানা মুফতি মাহমুদ	জমিয়াতুল ওলামায়ে ইসলামী জামায়াত
গফুর আহমদ	জামায়াতে ইসলাম
নুরুল আমিন	পিডিপি
মওলানা শাহ আহম্মদ নুরানী	জমিয়াতুল ওলামায়ে ইসলাম।

আমন্ত্রণ পেয়ে শেখ মুজিবুর রহমান তা ঘৃণাভাবে প্রত্যাখ্যান করেন।

৪ মার্চ আওয়ামী লীগের নির্দেশে পাকিস্তান রেডিওর নাম বাংলাদেশ বেতার এবং পাকিস্তান টিভির নামকরণ করা হয় বাংলাদেশ টিভি। ৩ মার্চ ছাত্রদের স্বাধীনতা ঘোষণা, ৪ মার্চ বেতার টিভির নামকরণ ও মুক্তিযুদ্ধের সূচনা।

৪ মার্চ এয়ার ভাইস মার্শাল আসগর খান ইয়াহিয়া খানকে আওয়ামী লীগের নিকট ক্ষমতা হস্তান্তরের অনুরোধ জানান।

ডাকসু ও ছাত্রলীগ প্রত্যেক জেলা, থানা, ইউনিয়নে ১১ সদস্যবিশিষ্ট সংগ্রাম কমিটি গঠনের নির্দেশ দেয়।

৩ ও ৪ মার্চ পাকিস্তান সেনাবাহিনীর গুলিতে ১১১ জন নিহত হয়।

পূর্ব পাকিস্তানের গভর্নর এডমিরাল এম এস আহসান দমননীতি পরিচালনা করতে অস্বীকার করায় তাকে ১৯৭১ সালের ১ মার্চ বদলি করা হয়। তার স্থলে লে. জেনারেল সাহেবজাদা ইয়াকুবকে গভর্নর নিয়োগ করা হয়। জেনারেল ইয়াকুব সামরিক সরকারের কঠোর নীতি অনুসরণ করতে অস্বীকৃতি জানান। তিনি

৫ মার্চ পদত্যাগ করেন। এ অপরাধে সামরিক সরকার তাকে শাস্তি প্রদান করে। তার স্থলে সরকার ৭ মার্চ লে. জেনারেল টিক্কা খানকে গভর্নর নিয়োগ করে। প্রধান বিচারপতি বিএ সিদ্দিকী টিক্কা খানকে শপথ পড়াতে অস্বীকার করেন।

শেখ মুজিবুর রহমানের আহ্বানে ৫ ও ৬ মার্চ সকাল ৮টা থেকে ২টা পর্যন্ত হরতাল চলে।

৩ হতে ৬ মার্চ পর্যন্ত সেনাবাহিনীর গুলিতে ৩০০ লোক নিহত হয়েছে।

৬ মার্চ প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান ঘোষণা করেন, সংসদের অধিবেশন ২৫ মার্চ অনুষ্ঠিত হবে।

জয় বাংলা স্লোগান-স্বাধীন বাংলাদেশের পতাকা

ছাত্রলীগ ১৯৭১ সালের ২ মার্চের সভায় পতাকা ও বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা অনুমোদন করে। ৩ মার্চ ইস্তেহার নাম্বার এক– স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ ঘোষণা ও কর্মসূচি নামের ঘোষণাপত্র বিতরণ করা হয়।

২ মার্চ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কলাভবনে বিশাল জনসভা অনুষ্ঠিত হয়। নূরে আরম সিদ্দিকী অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন। পাকিস্তানি পতাকা পুড়িয়ে ফেলে আ স ম আব্দুর রব অন্যান্য ছাত্রনেতাদের নিয়ে বাংলাদেশের পতাকা উত্তোলন করেন।

৭ মার্চের ভাষণ

১৯৭১ সালের ৭ মার্চ রমনা রেসকোর্স ময়দানে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ঐতিহাসিক ভাষণ দেন। সকাল হতে জনতা লাঠি, বৈঠা নিয়ে জনসভায় সমবেত হতে থাকেন। বঙ্গবন্ধু ২টায় ভাষণ দেবেন। কিন্তু তিনি ২টা ৪৫ মিনিট পূর্বে জনসভায় পৌঁছতে পারেননি। তিনি মাত্র ১৮ মিনিটে নিম্নোক্ত ভাষণ দেন।

"ভাইয়েরা আমার!

আজ দুঃখ ভারাক্রান্ত মন নিয়ে আপনাদের সামনে হাজির হয়েছি। আপনারা সবই জানেন এবং বোঝেন। আমরা আমাদের জীবন দিয়ে চেষ্টা করেছি। কিন্তু দুঃখের বিষয় আজ ঢাকা, চট্টগ্রাম, খুলনা, রাজশাহী, রংপুরে আমার ভাইয়ের রক্তে রাজপথ রঞ্জিত হয়েছে। আজ বাংলার মানুষ মুক্তি চায়– বাংলার মানুষ বাঁচতে চায়। বাংলার মানুষ তার অধিকার চায়।

কি অন্যায় করেছিলাম! নির্বাচনের পরে বাংলাদেশের মানুষ সম্পূর্ণভাবে আমাকে, আওয়ামী লীগকে ভোট দেন। আমাদের

ন্যাশনাল এসেম্বলি বসবে, আমরা সেখানে শাসনতন্ত্র তৈয়ার করব এবং এ দেশকে আমরা গড়ে তুলব। এ দেশের মানুষ অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক মুক্তি পাবে। কিন্তু দুঃখের বিষয়, আজ দুঃখের সঙ্গে বলতে হয়, ২৩ বছরের করুণ ইতিহাস বাংলার অত্যাচারের, বাংলার মানুষের রক্তের ইতিহাস। ২৩ বছরের ইতিহাস, মুমূর্ষু নর-নারীর আর্তনাদের ইতিহাস। বাংলার ইতিহাস এ দেশের মানুষের রক্ত দিয়ে রাজপথ রঞ্জিত করার ইতিহাস। ১৯৫২ সালে রক্ত দিয়েছি, ১৯৫৪ সালে নির্বাচনে জয়লাভ করেও আমরা গদিতে বসতে পারি নাই। ১৯৫৮ সালে আইয়ুব খান মার্শাল ল জারি করে দশ বছর পর্যন্ত আমাদের গোলাম করে রেখেছে। ১৯৬৬ সালে ৬ দফা আন্দোলনে, ৭ জুনে আমার ছেলেদের গুলি করে হত্যা করা হয়েছে। ১৯৬৯ সালের আন্দোলনে আইয়ুব খানের পতন হওয়ার পরে যখন ইয়াহিয়া খান সাহেব সরকার দায়িত্বভার নিলেন, তিনি বললেন, দেশে শাসনতন্ত্র দেবেন, গণতন্ত্র দেবেন, আমরা মেনে নিলাম। তারপর অনেক ইতিহাস হয়ে গেল, নির্বাচন হলো। আমি প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান সাহেবের সঙ্গে দেখা করেছি। আমি শুধু বাংলার নয়, পাকিস্তানের মেজরিটি পার্টির নেতা হিসাবে তাকে অনুরোধ করলাম ১৫ ফেব্রুয়ারি তারিখে আপনি জাতীয় পরিষদের অধিবেশন দেন। তিনি আমার কথা রাখলেন না, তিনি রাখলেন ভুট্টো সাহেবের কথা। তিনি বললেন প্রথম সপ্তাহের মার্চ মাসে হবে। আমরা বললাম ঠিক আছে, আমরা এসেম্বলিতে বসব। আমি বললাম, এসেম্বলির মধ্যে আলোচনা করব, এমনকি আমি এ পর্যন্ত বললাম, যদি কেউ ন্যায্য কথা বলে, আমরা সংখ্যা বেশি হলেও একজন যদিও, সে হয় তার ন্যায্য কথা আমরা মেনে নেব।

জনাব ভুট্টো সাহেব এখানে এসেছিলেন, আলোচনা করলেন, বলে গেলেন যে, আলোচনার দরজা বন্ধ না, আরো আলোচনা হবে। তারপরে অন্যান্য নেতৃবৃন্দের সঙ্গে আলাপ করলাম : আপনারা আসুন, বসুন, আমরা আলাপ করে শাসনতন্ত্র তৈরি করি। তিনি বললেন, পশ্চিম পাকিস্তানের মেম্বাররা যদি এখানে আসে তাহলে কসাইখানা হবে এসেম্বলি। তিনি বললেন, যে যাবে তাকে মেরে ফেলে দেয়া হবে। যদি কেউ এসেম্বলিতে আসে তাহলে পেশোয়ার থেকে করাচী পর্যন্ত দোকান জোর করে বন্ধ করা হবে। আমি বললাম এসেম্বলি

চলবে। তারপরে হঠাৎ এক তারিখে এসেম্বলি বন্ধ করে দেয়া হলো। ইয়াহিয়া খান সাহেব প্রেসিডেন্ট হিসেবে এসেম্বলি বন্ধ করে দেয়া হলো। ইয়াহিয়া খান সাহেব প্রেসিডেন্ট হিসেবে এসেম্বলি ডেকেছিলেন, আমি বললাম যে আমি যাব। ভুট্টো সাহেব বললেন, তিনি যাবেন না। পঁয়ত্রিশ জন সদস্য পশ্চিম পাকিস্তান থেকে এখানে আসলেন। তারপরে হঠাৎ বন্ধ করে দেয়া হলো। দোষ দেয়া হলো বাংলার মানুষকে, দোষ দেয়া হলো আমাকে। বন্ধ করে দেয়ার পর এ দেশের মানুষ প্রতিবাদমুখর হয়ে উঠল।

আমি বললাম, আপনারা কলকারখানা সবকিছু বন্ধ করে দেন। জনগণ সাড়া দিল। আপন ইচ্ছায় জনগণ রাস্তায় বেরিয়ে পড়লো। তারা শান্তিপূর্ণভাবে সংগ্রাম চালিয়ে যাওয়ার জন্য স্থির প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হলো।

কী পেলাম আমরা? যে আমরা পয়সা দিয়ে অস্ত্র কিনেছি বহিঃশত্রু আক্রমণ থেকে দেশকে রক্ষা করার জন্য, আজ সেই অস্ত্র ব্যবহার হচ্ছে আমার দেশের গরিব-দুঃখী-আর্তমানুষের বিরুদ্ধে। তার বুকের উপর হচ্ছে গুলি। আমরা পাকিস্তানের সংখ্যাগুরু, আমরা বাঙালিরা যখনই ক্ষমতায় যাবার চেষ্টা করেছি, তখনই তারা আমাদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়েছে।

টেলিফোনে আমার সঙ্গে তার কথা হয়। তাকে আমি বলেছিলাম জনাব ইয়াহিয়া খান সাহেব, আপনি পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট, দেখে যান কীভাবে আমার গরিবের ওপরে, আমার বাংলার মানুষের বুকের উপরে গুলি করা হয়েছে। কী করে আমার মায়ের কোল খালি করা হয়েছে। কী করে মানুষকে হত্যা করা হয়েছে, আপনি আসুন, দেখুন, বিচার করুন। তিনি বললেন, আমি নাকি স্বীকার করেছি যে, ১০ তারিখে রাউন্ড টেবিল কনফারেন্স হবে। আমি তো অনেক আগেই বলেছি, কিসের আরটিসি? কার সঙ্গে বসব? যারা আমার মানুষের বুকের রক্ত নিয়েছে তাদের সঙ্গে বসব? হঠাৎ আমার সঙ্গে পরামর্শ না করে পাঁচ ঘণ্টা গোপনে বৈঠক করে যে বক্তৃতা তিনি করেছেন, সমস্ত দোষ তিনি আমার উপর দিয়েছেন। বাংলার মানুষের উপরে দিয়েছেন।

ভাইয়েরা আমার!

পঁচিশ তারিখে এসেম্বলি কল করেছে। রক্তের দাগ শুকায় নাই।

আমি দশ তারিখে বলে দিয়েছি যে, ঐ শহীদের রক্তের উপর পাড়া দিয়ে আরটিসিতে মুজিবুর রহমান যোগদান করতে পারে না। এসেম্বলি কল করেছেন আমার দাবি মানতে হবে প্রথম। সামরিক আইন মার্শাল ল উইথড্র করতে হবে। সমস্ত সামরিক বাহিনীর লোকদের ব্যারাকে ফেরত নিতে হবে। যেভাবে হত্যা করা হয়েছে তার তদন্ত করতে হবে। আর জনগণের প্রতিনিধির কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর করতে হবে। তারপরে বিবেচনা করে দেখব আমরা এসেম্বলিতে বসতে পারব কি পারব না। এর পূর্বে এসেম্বলিতে বসতে আমরা পারি না।

আমি প্রধানমন্ত্রিত্ব চাই না। আমরা এ দেশের মানুষের অধিকার চাই। আমি পরিষ্কার অক্ষরে বলে দেবার চাই যে, আজ থেকে এই বাংলাদেশে কোর্ট, কাছারি, আদালত, ফৌজদারি, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ থাকবে। গরিবের যাতে কষ্ট না হয়, যাতে আমার মানুষ কষ্ট না করে, সে জন্য সমস্ত অন্যান্য জিনিসগুলো আছে সেগুলির হরতাল কাল থেকে চলবে না। রিকশা, ঘোড়ার গাড়ি চলবে, রেল চলবে, লঞ্চ চলবে। শুধু সেক্রেটারিয়েট, সুপ্রীমকোর্ট, হাইকোর্ট, জজকোর্ট, সেমি-গভর্নমেন্ট দফতরগুলো– ওয়াপদা, কোনো কিছু চলবে না। ২৮ তারিখে কর্মচারীরা গিয়ে বেতন নিয়ে আসবেন। এর পর যদি বেতন দেয়া না হয়, আর যদি একটা গুলি চলে, আর যদি আমার লোককে হত্যা করা হয়, তোমাদের উপর আমার অনুরোধ রইল প্রত্যেক ঘরে ঘরে দুর্গ গড়ে তোলো। তোমাদের যা কিছু আছে তাই নিয়ে শত্রুর মোকাবেলা করতে হবে এবং জীবনের তরে রাস্তাঘাট যা যা আছে সব কিছু আমি যদি হুকুম দেবার নাও পারি তোমরা বন্ধ করে দেবে।

আমরা ভাতে মারব। আমরা পানিতে মারব। তোমরা আমার ভাই তোমরা ব্যারাকে থাকো, কেউ তোমাদের কিছু বলবে না। কিন্তু আর আমার বুকের উপর গুলি চালাবার চেষ্টা করো না। সাত কোটি মানুষকে দাবায়ে রাখতে পারবা না। আমরা যখন মরতে শিখেছি, তখন কেউ আমাদের দাবাতে পারবে না। আর যে সমস্ত লোক শহীদ হয়েছে, আঘাতপ্রাপ্ত হয়েছে, আমরা আওয়ামী লীগ থেকে যতদূর পারি তাদের সাহায্য করতে চেষ্টা করব। যারা পারেন আমার রিলিফ কমিটিতে সামান্য টাকা-পয়সা পৌঁছিয়ে দেবেন। আর এই সাতদিন

হরতালে যে সমস্ত শ্রমিক ভাইরা যোগদান করেছেন প্রত্যেকটা শিল্পের মালিক তাদের বেতন পৌঁছিয়ে দেবেন। সরকারি কর্মচারীদের বলি : আমি যা বলি তা মানতে হবে। যে পর্যন্ত আমার এ দেশের মুক্তি না হবে, খাজনা, ট্যাক্স বন্ধ করে দেয়া হলো। কেউ দেবে না। শোনেন– মনে রাখবেন শত্রু বাহিনী ঢুকেছে নিজেদের মধ্যে আত্মকলহ সৃষ্টি করবে, লুটতরাজ করবে। এই বাংলায় হিন্দু-মুসলমান, বাঙালি-নন-বাঙালি যারা আছে তারা আমাদের ভাই। তাদের রক্ষার দায়িত্ব আপনাদের উপরে, আমাদের যেন বদনাম না হয়। মনে রাখবেন, রেডিও-টেলিভিশনের কর্মচারীরা, যদি রেডিওতে আমাদের কথা না শোনে তাহলে কোনো বাঙালি রেডিও স্টেশনে যাবেন না। যদি টেলিভিশন আমার নিউজ না দেয় কোনো বাঙালি টেলিভিশনে যাবেন না, দুই ঘণ্টা ব্যাংক খোলা থাকবে– যাতে মানুষ তাদের মায়নাপত্র নেবার পারে। কিন্তু পূর্ববাংলা থেকে পশ্চিম পাকিস্তানে এক পয়সাও চালান হতে পারবে না। টেলিফোন, টেলিগ্রাফ আমাদের এই পূর্ব বাংলায় চলবে এবং বিদেশের সঙ্গে নিউজ পাঠাতে হলে আপনারা চালাবেন। কিন্তু যদি এ দেশের মানুষকে খতম করার চেষ্টা করা হয়, বাঙালিরা বুঝেশুনে কাজ করবেন।

প্রত্যেক গ্রামে, প্রত্যেক মহল্লায়, আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে সংগ্রাম পরিষদ গড়ে তোলো এবং তোমাদের যা কিছু আছে তাই নিয়ে প্রস্তুত থাক। মনে রাখবা রক্ত যখন দিয়েছি, রক্ত আরও দেব– এ দেশের মানুষকে মুক্ত করে ছাড়ব ইনশাআল্লাহ।

এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম-এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম। জয় বাংলা।"

৭ মার্চের ভাষণ বেতার ও টিভিতে প্রচারের কথা ছিল। কিন্তু সামরিক সরকার তা বন্ধ রাখে। ৮ মার্চ ঢাকা বেতার বঙ্গবন্ধুর ৭ মার্চের ভাষণ প্রচার করে। ৭ মার্চের ভাষণ পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ ভাষণ। ৭ মার্চের ভাষণে বঙ্গবন্ধু প্রকৃতপক্ষে বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। ৭ মার্চের পর হতে অসহযোগ আন্দোলন শুরু হয়।

অসহযোগ আন্দোলন

৮ মার্চ বঙ্গবন্ধু সপ্তাহব্যাপী কর্মসূচি ঘোষণা দেন। তিনি ঘোষণা দেন যে, যতক্ষণ

জনপ্রতিনিধিদের নিকট ক্ষমতা হস্তান্তর না করা হবে ততক্ষণ অহিংস ও অসহযোগ আন্দোলন চলবে।

কর্মসূচি

- কর প্রদান বন্ধ;
- সকল অফিস হরতাল পালন করবে;
- সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধ থাকবে;
- বেতার টিভি আওয়ামী লীগের সংবাদ প্রচার করবে;
- পরিবহন চালু থাকবে- ট্রেন চলবে;
- ব্যাংক ২টা পর্যন্ত খোলা থাকবে;
- প্রতেক্যক ভবনে কালো পতাকা উড়বে;
- ব্যাংকসমূহ পশ্চিম পাকিস্তানে অর্থ প্রেরণ করবে না।

৮ মার্চ পূর্ব পাকিস্তান ছাত্রলীগ তাদের দলের নাম করে বাংলাদেশ ছাত্রলীগ। তাদের দপ্তর ইকবাল হলে স্থানান্তর করা হয়। ৩ মার্চ ইকবাল হলের নাম হয় সার্জেন্ট জহুরুল হক হল। ছাত্র ইউনিয়নের দপ্তর ছিল জগন্নাথ হলে।

ন্যাপ সভাপতি মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী ৯ মার্চ পল্টন ময়দানে স্বাধীন বাংলাদেশ দাবি করেন। তিনি ইয়াহিয়া খানের উদ্দেশে বলেন, আগামী ২৫ মার্চের মধ্যে এ দাবি মেনে না নিলে তিনি শেখ মুজিবুর রহমানের সাথে এক হয়ে ১৯৫২ সালের ন্যায় বাঙালিদের স্বাধীনতার জন্য সর্বাত্মক সংগ্রাম শুরু করবেন।

৯ মার্চ জহুরুল হক হলে ছাত্রলীগের সভা অনুষ্ঠিত হয়। তারা স্বাধীন বাংলাদেশ অনুমোদন করে এবং আন্দোলন পরিচালনার জন্য সংগ্রাম কমিটি গঠন করে। আন্দোলনে ভার চার ছাত্র নেতার ওপর অর্পণ করা হয়। তারা হলেন, আ স ম আবদুর রব, নূরে আলম সিদ্দিকী, শাজাহান সিরাজ এবং আবদুল কুদ্দুস মাখন।

ছাত্র সংগ্রাম কমিটির স্লোগান ছিল–

স্বাধীন বাংলাদেশ দীর্ঘজীবী হোক
স্বাধীন কর স্বাধীন কর বাংলাদেশ
মহান জাতির মহান নেতা শেখ মুজিব, শেখ মুজিব
বীর বাঙ্গালী অস্ত্র ধর বাংলাদেশ স্বাধীন কর

৯ মার্চ প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান ঘোষণা দেন, তিনি সঙ্কট নিরসনের জন্য ঢাকা আসবেন।

৯ মার্চ ইয়াহিয়া খান টিক্কা খানকে পূর্ব পাকিস্তানের সামরিক আইন-প্রশাসক

নিয়োগ করেন। টিক্কা খান শপথ গ্রহণে ব্যর্থ হলে তাকে পূর্ব পাকিস্তানের সামরিক আইন প্রশাসক নিয়োগ করা হয়।

১৯৭১ সালের ১১ মার্চ ভারতে কংগ্রেস নির্বাচনে জয়লাভ করে সরকার গঠন করে। ইন্দিরা গান্ধী ভারতের প্রধানমন্ত্রী নিযুক্ত হন। ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধে ইন্দিরা গান্ধী ঐতিহাসিক ভূমিকা পালন করেন।

১২ মার্চ অসহযোগ আন্দোলন এগিয়ে যায়।

১৩ মার্চ ন্যাপ নেতা ওয়ালি খান ঢাকা পৌঁছেন এবং ১৪ মার্চ শেখ মুজিবুর রহমানের সাথে আলোচনা করেন।

১৪ মার্চ সকল রাজনৈতিক দল ও জনগণের অনুরোধে শেখ মুজিবুর রহমান বাংলাদেশের শাসন ক্ষমতা স্বহস্তে গ্রহণ করেন।

১৫ মার্চ বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক তাজউদ্দীন আহমদ অসহযোগ আন্দোলন পরিচালনার জন্য ৩৫টি বিধি প্রণয়ন করেন এবং তা বঙ্গবন্ধু ১৫ মার্চ ঘোষণা করেন।

৩৫টি বিধি

১. কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক সেক্রেটারিয়েট, সরকারী ও আধা-সরকারী অফিসসমূহ, হাইকোর্ট ও দেশের অন্যান্য আদালত হরতাল পালন করবে। তবে অতিপ্রয়োজনীয় ও আন্দোলনের স্বার্থে নির্দিষ্ট অফিস, দপ্তর ও সংস্থা হরতালের আওতা বহির্ভূত থাকবে।

২. বাংলাদেশে সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধ থাকবে।

৩. আইনশৃঙ্খলা রক্ষা– ডেপুটি কমিশনার, সাব-ডিভিশনাল অফিসার, আওয়ামী লীগ সংগ্রাম কমিটির সাথে যোগাযোগ রক্ষা করে আইনশৃঙ্খলা রক্ষা ও উন্নয়ন কর্মসূচিসহ দায়িত্ব পালন করবে। পুলিশ আইনশৃঙ্খলা রক্ষা করবে।

৪. বন্দরসমূহ– অভ্যন্তরীণ নৌযান চলাচল অব্যাহত থাকবে। তবে সৈন্যদের সযোগিতা করবে না। বন্দরের কাজ চলবে।

৫. মাল আমদানি-আমদানিকৃত সকল মালামাল খালাস করতে হবে। সংগৃহীত অর্থ কেন্দ্রীয় সরকারের হিসেবে জমা হবে না।

৬. রেলওয়ে চলবে– তবে সৈন্য চলাচল বা তাদের রসদ বহন করতে পারবে না।

৭. সড়ক পরিবহন– ইপিআরটিসি চলাচল করবে।

৮. অভ্যন্তরীণ নদীবন্দরের কাজ চলবে।

৯. ডাক ও টেলিগ্রাফ বাংলাদেশের মধ্যে কাজ করবে– বিদেশে মেল সার্ভিস ও টেলিগ্রাফ করা যেতে পারে।

১০. টেলিফোন বাংলাদেশের মধ্যে চালু থাকবে।

১১. বেতার, টেলিভিশন এবং সংবাদপত্র– এগুলো চালু থাকবে এবং জনগণের আন্দোলনের সংবাদ প্রচার করতে হবে।

১২. হাসপাতালসমূহ চালু থাকবে।

১৩. বিদ্যুৎ সরবরাহ অব্যাহত থাকবে।

১৪. পানি, গ্যাস সরবরাহ চালু থাকবে।

১৫. কয়লা সরবরাহ অব্যাহত থাকবে।

১৬. খাদ্য সরবরাহ অব্যাহত থাকবে। খাদ্য আমদানি চালু থাকবে।

১৭. কৃষি তৎপরতা-ধান ও পাটের বীজ, সার ও কীটনাশক ওষুধ সংগ্রহ ও বণ্টন অব্যাহত থাকবে। পাওয়ার পাম্প ও যন্ত্রপাতি সরবরাহ চালু থাকবে। কৃষি ব্যাংকের কাজ চালু থাকবে।

১৮. বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও শহর সংরক্ষণের কাজ অব্যাহত থাকবে।

১৯. উন্নয়ন ও নির্মাণ কাজ চলবে।

২০. সাহায্য ও পুনর্বাসন– ঘূর্ণিদুর্গত এলাকায় বাঁধ নির্মাণ ও উন্নয়ন কাজসহ পুনর্বাসনের কাজ চলতে থাকবে।

২১. ইপিআইডিসি, ইস্টার্ন রিফাইনারি ও সকল কারখানার কাজ চলবে।

২২. সকল সরকারী ও আধা-সরকারী সংস্থার কর্মচারী ও শ্রমিকদের বেতন নিয়মিতভাবে প্রদান করতে হবে।

২৩. পেনশন– নিয়মিতভাবে সরকারী-বেসরকারী অবসরপ্রাপ্ত কর্মচারীদের দেয়া হবে।

২৪. এজি ও ট্রেজারি– বেতন-ভাতা প্রদানের জন্য নির্দিষ্টসংখ্যক কর্মচারী কাজ চালিয়ে যাবে।

২৫. ব্যাংক সকাল ৯টা হতে ১২টা পর্যন্ত ব্যাংকিং কাজ করবে। পশ্চিম পাকিস্তানের সাথে লেনদেন চলবে না। বিদেশের সাথে ব্যবসা-বাণিজ্য চলবে। ইস্টার্ন মার্কেন্টাইল ব্যাংক ও ইস্টার্ন ব্যাংকিং কর্পোরেশনকে নির্দিষ্ট দায়িত্ব দেয়া হবে।

২৬. স্টেট ব্যাংক– অন্যান্য ব্যাংকের মতোই কাজ করবে।

২৭. আমদানি ও রপ্তানি কন্ট্রোলার– আমদানি-রপ্তানি নিশ্চিত করবে এবং কাজ চালিয়ে যাবে।

২৮. ট্রাভেল এজেন্ট ও বিদেশী এয়ারলাইন্স চালু থাকবে।
২৯. ফায়ার সার্ভিস ব্যবস্থা চালু থাকবে।
৩০. পৌরসভার কাজ চালু থাকবে।
৩১. ভূমি রাজস্ব আদায় বন্ধ থাকবে। লবণ ও তামাক কর আদায় হবে না। আয়কর আদায় বন্ধ থাকবে– এছাড়া প্রাদেশিক কর আদায় হবে এবং বাংলাদেশ সরকারের এ্যাকাউন্টে জমা দিতে হবে। কেন্দ্রীয় সরকারের কর আবগারী শুল্ক কর, বিক্রয় কর আদায় করে কেন্দ্রীয় সরকারের খাতে জমা না দিয়ে ইস্টার্ন মার্কেন্টাইল বা ইস্টার্ন ব্যাংকিং করপোরেশনে জমা দিতে হবে।
৩২. পাকিস্তান বীমা কর্পোরেশন, পোস্টাল লাইফ ইন্স্যুরেন্স চালু থাকবে।
৩৩. সব ব্যবসা ও শিল্প প্রতিষ্ঠানের সেবাদান নিয়মিতভাবে চলবে।
৩৪. সকল বাড়ির ওপর কালো পতাকা উড়বে।
৩৫. সংগ্রাম পরিষদগুলো সর্বস্তরে তাদের কাজ চালু রাখবে এবং এসব নির্দেশ যথাযথভাবে বাস্তবায়ন করে যাবে।

ইয়াহিয়া-বঙ্গবন্ধুর আলোচনা

প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান আলোচনার জন্য ১৫ মার্চ ঢাকা পৌঁছেন। তার সাথে ছিলেন বিচারপতি এ আর কর্নেলিয়াস, লে. জেনারেল পীরজাদা, কর্নেল হাসান, পরিকল্পনা কমিশনের ডেপুটি চেয়ারম্যান এম আহমদ।

১৫ মার্চ ইয়াহিয়া খান প্রেসিডেন্ট ভবনে গভর্নর ও উচ্চপদস্থ সামরিক কর্মকর্তাদের নিয়ে চলমান পরিস্থিতি আলোচনা করেন।

১৬ ও ১৭ মার্চ ইয়াহিয়া-শেখ মুজিবুর রহমান কোনো সাহায্যকারী ব্যতীত একক আলোচনা চলে।

১৬ মার্চ সকালে শেখ মুজিবুর রহমান তার বাসভবনে নেতাদের সাথে আলোচনা করে সৈয়দ নজরুল ইসলাম, তাজউদ্দীন আহমদ, খন্দকার মোশতাক আহমদ, এ এইচ এম কামরুজ্জান, ড. কামাল হোসেনকে নিয়ে সকাল ১০টায় প্রেসিডেন্ট ভবনে গমন করেন। ইয়াহিয়া খানের সাথে বঙ্গবন্ধুর ১৫ মিনিট একক আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়। তিনি তার সঙ্গীদের নিয়ে প্রেসিডেন্ট ভবন ত্যাগ করেন। শত শত দেশী-বিদেশী সাংবাদিক সমবেত। তারা তাকে প্রশ্ন করলে উত্তরে তিনি বলেন, আলোচনা চলবে।

১৭ মার্চ সকালে মুজিব-ইয়াহিয়া একক আলোচনা চলে। বিকেলে প্রেসিডেন্টের দলের সাথে আওয়ামী লীগ নেতাদের আলোচনা হয়। রাষ্ট্রপতির

দল বলে যে, সামরিক আইনের জন্য সংসদ কর্তৃক অনুমোদিত বিধি প্রয়োজন। আওয়ামী লীগ নেতারা প্রস্তাবিত পদ্ধতি প্রত্যাখ্যান করেন।

১৬ মার্চ জুলফিকার আলী ভুট্টো সভায় যোগ দেয়ার কথা ছিল। কিন্তু তিনি এ প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেন।

১৭ মার্চ পশ্চিম পাকিস্তানের ন্যাপ নেতা ওয়ালি খান প্রেসিডেন্টের সাথে দেখা করেন।

১৭ মার্চ ছিল বঙ্গবন্ধুর ৫১তম জন্মবার্ষিকী। বাঙালিদের ওপর পাকিস্তানিদের জুলুমের প্রতিবাদে তিনি জন্মদিন পালন করেননি।

১৭ মার্চ মার্কেন্টাইল ব্যাংক কেন্দ্রীয় সরকারের দেয়া রাজস্ব ও কর জমা নেয়া শুরু করে।

১৭ মার্চ অস্ত্র বোঝাই সোয়াত জাহাজ চট্টগ্রাম বন্দরে পৌঁছে। সেখানে শ্রমিকরা অস্ত্র নামাতে অস্বীকার করে।

১৯ মার্চ ইয়াহিয়া-মুজিবের মধ্যে এক ঘণ্টা একান্ত আলোচনা চলে। বিকেলে প্রেসিডেন্টের বিশেষজ্ঞ ও আওয়ামী লীগ নেতাদের মধ্যে সামরিক আইন প্রত্যাহারের পদ্ধতি নিয়ে আলোচনা হয়। সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে শেখ মুজিব বলেন–

'আমি সব সময় ভালই আশা করি এবং খারাপের জন্য প্রস্তুত থাকি।'

২০ মার্চ ইয়াহিয়া ভুট্টোকে ঢাকায় আসার জন্য আহ্বান জানান।

২১মার্চ ভুট্টো ঢাকা পৌঁছেন।

জয়দেবপুরে প্রথম মুক্তিযুদ্ধ ১৯ মার্চ

জয়দেবপুরের রাজবাড়িতে এক ব্যাটালিয়ন বেঙ্গল রেজিমেন্ট ছিল। সামরিক সরকার তাদের অস্ত্রহীন করতে চায়। এ সংবাদ শুনে স্থানীয় জনগণ রাজবাড়ি ঘিরে ফেলে। পাক বাহিনী জনতার ওপর গুলিবর্ষণ করে ২০ জনকে হত্যা করে এবং ১৫ জন আহত হয়। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ প্রথম জয়দেবপুরে শুরু হয়।

২০ মার্চ ইয়াহিয়া খানের সাথে শেখ মুজিবুর রহমানের পূর্ণ আলোচনায় হয়। উভয় দলের সাহায্যকারীরা আলোচনায় উপস্থিত ছিলেন। বিচারপতি কর্নেলিয়াস বলেন, সামরিক আইন প্রত্যাহারের জন্য জাতীয় সংসদের অনুমতি ও শূন্যতা পূরণের জন্য আইনের প্রয়োজন। তাজউদ্দীন আহমদ এ প্রস্তাবের সাথে দ্বিমত পোষণ করেন। শেখ মুজিব প্রস্তাব করেন, শাসনতন্ত্র প্রণয়নের জন্য পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানে দুটি কমিটি গঠন করা যেতে পারে। উভয় কমিটি শাসনতন্ত্রের খসড়া প্রণয়ন করে সংসদে পেশ করবে।

২১ মার্চ ইয়াহিয়া খানের সাথে শেখ মুজিব ও তাজউদ্দীন আহমদের এক অনির্ধারিত সভা অনুষ্ঠিত হয়।

আওয়ামী লীগ নিম্নলিখিত প্রস্তাব আলোচনায় পেশ করে।

- অবিলম্বে পূর্ব পাকিস্তানে বেসামরিক সরকার গঠন এবং আওয়ামী লীগের সুপারিশে গভর্নর নিয়োগ।
- গভর্নর দায়িত্ব গ্রহণের সাথে সাথে সামরিক আইন সম্পূর্ণভাবে তুলে নিতে হবে।
- ১৯৬২ সালের শাসনতন্ত্রের ভিত্তিতে অন্তর্বর্তীকালীন শাসনতন্ত্র যাতে পূর্ব পাকিস্তানের সংশ্লিষ্ট ৬ দফা অন্তর্ভুক্ত থাকবে।
- প্রেসিডেন্ট তার পদে এবং প্রধান সেনাপতি হিসেবে স্বপদে সকল দলের সর্বসম্মত চুক্তির অধীনে বহাল থাকবে।

২১ মার্চ জুলফিকার আলী ভুট্টো ১১ সদস্যবিশিষ্ট দল নিয়ে ঢাকা পৌঁছেন এবং হোটেল ইন্টারকন্টিনেন্টালে ওঠেন।

২১ মার্চ ইয়াহিয়া-ভুট্টো ৭০ মিনিটব্যাপী আলোচনা করেন। ইয়াহিয়া খান পশ্চিম পাকিস্তানের নেতাদের সাথে আলোচনা চালিয়ে যান।

ইয়াহিয়া খান আলোচনার নামে সময় ক্ষেপণ করছেন। তার নির্দেশে প্রত্যেকদিন পশ্চিম পাকিস্তান থেকে বিমানে হাজার হাজার সৈন্য পূর্ব পাকিস্তানে নিয়ে আসতে থাকে।

২১ মার্চ বিকেলে ইয়াহিয়া খানের সাথে ভুট্টোর আলোচনা হয়। ইয়াহিয়া খান শেখ মুজিবের প্রস্তাব নিয়ে তার সাথে আলোচনা করেন। উত্তরে ভুট্টো বলেন, The scheme was fraught with danger– প্রস্তাবটি ভয়ঙ্করভাবে শঠতাপূর্ণ।

২২ মার্চ সকাল ১১টায় প্রেসিডেন্ট ভবনে ইয়াহিয়া খান-শেখ মুজিবুর রহমান ও ভুট্টোর সাথে আলোচনায় বসেন।

২২ মার্চ সন্ধ্যায় প্রেসিডেন্টের দল সামরিক আইন প্রত্যাহারের একটি খসড়া তাজউদ্দীন আহমদ ও ভুট্টোকে প্রদান করে। ভুট্টোর দল পার্লামেন্টের অনুমতি ব্যতীত সামরিক আইন প্রত্যাহারের বিরোধিতা করে। ভুট্টোর দলে ছিলেন জে এ রহিম, মাহমুদ আলী কাসুরী এবং মোবাশ্বের হাসান।

২৩ মার্চ একটি নতুন জাতির জন্ম

২৩ মার্চ ছিল পাকিস্তান দিবস। আওয়ামী লীগ ২৩ মার্চ প্রতিরোধ দিবস হিসেবে পালন করে।

২৩ মার্চ সারাদেশে বাংলাদেশের নতুন পতাকা উত্তোলন করা হয়।

২৩ মার্চ বিভিন্ন সংগঠন-ছাত্র জনতা দলে দলে ৩২ নম্বর ধানমণ্ডি বঙ্গবন্ধুর বাসভবনে গমন করে। ছাত্রলীগ ও শ্রমিক লীগ আনুষ্ঠানিকভাবে উত্তোলনের জন্য বাংলাদেশের পতাকা বঙ্গবন্ধুর হাতে দেন। বঙ্গবন্ধু তার বাসভবনে বাংলাদেশের পতাকা উত্তোলনের সাথে সাথে অখণ্ড পাকিস্তানের সমাপ্তি হলো। একমাত্র সেনানিবাস ব্যতীত বাংলাদেশের কোথাও পাকিস্তানের পতাকা ছিল না।

২৪ মার্চ ভুট্টো ইয়াহিয়া খান ও জেনারেল পীরজাদার সাথে দেখা করেন। ২৪ মার্চ এ কে ব্রোহী ঢাকা আসেন। তিনি বলেন, জনপ্রতিনিধিদের নিকট ক্ষমতা হস্তান্তরের কোনো বাধা নেই।

২৫ মার্চ হরতাল-মিছিল চলে। ২৫ মার্চ সেনাবাহিনী ১১০ জনকে হত্যা করেছে। আওয়ামী লীগ ২৭ মার্চ দেশব্যাপী হরতাল পালনের আহ্বান করে।

প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন যে আওয়ামী লীগ যদি তার প্রস্তাব মেনে না নেয় তাহলে সেনাবাহিনী বাঙালিদের আক্রমণ করবে।

২৫ মার্চ সন্ধ্যায় গোপনে প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান ঢাকা ত্যাগ করেন। এদিন রাত ১১টায় অপারেশন সার্চলাইট শুরু হয়।

অধ্যায় ১৭

২৬ মার্চ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বাধীনতা ঘোষণা

গণহত্যা-অপারেশন সার্চলাইট

পাকিস্তানের জেনারেলরা ইয়াহিয়া খানের সাথে আলোচনা করে অপারেশন সার্চলাইট ২৫ মার্চ রাতে শুরু করেন। অপারেশন ব্লিজ পরিবর্তন করে অপারেশন সার্চলাইট করা হয়েছে। পরিকল্পনা ছিল বেঙ্গল রেজিমেন্ট, ইপিআর, পুলিশ নিরস্ত্র করা হবে। রাজনৈতিক নেতাদের মধ্যে শেখ মুজিবুর রহমান, তাজউদ্দীন আহমদ, ওসমানী, মতিয়া চৌধুরী, তোফায়েল, সিরাজুল আলম প্রমুখকে গ্রেফতার করা হবে।

১৯৭১ সালের ২০ মার্চ ঢাকায় স্টাফ হাউজের সভায় জেনারেল হামিদ এবং লে. জেনারেল টিক্কা খান অপারেশন সার্চলাইট অনুমোদন করেন। জেনারেল হামিদ বাঙালি সৈনিকদের নিরস্ত্র করার প্রস্তাব বাদ দিয়ে ইপিআর পুলিশ নিরস্ত্র করার প্রস্তাব করেন। প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান প্রস্তাব অনুমোদন করেন।

২৫ মার্চ ইয়াহিয়া খান ঢাকা ত্যাগের সিদ্ধান্ত নেয়। এ জন্য তিনি নাটক করেন। প্রেসিডেন্ট বিকেলে ফ্লাগ স্টাফ হাউজে চা পান করার জন্য চলে যান। সন্ধ্যা হওয়ার পূর্বে প্রেসিডেন্ট গাড়িতে বিউগল বাজিয়ে প্রেসিডেন্ট ভবনে আসেন। কিন্তু প্রেসিডেন্ট গাড়িতে ছিলেন না। যখন ইয়াহিয়া খান পিএএফ গেটে প্রবেশ করেন তখন উইং কমান্ডার এ কে খন্দকার এ দৃশ্যে দেখে ফেলেন। তিনি এ সংবাদ সাথে সাথে শেখ মুজিবকে জানিয়ে দেন।

অপারেশন সার্চলাইটের দুটো হেডকোয়ার্টার ছিল। ব্রিগেডিয়ার আরবারের অধীনে ৫৭ ব্রিগেডসহ, মেজর জেনারেল ফরমান অপারেশন-১, ঢাকা শহর এবং পার্শ্ববর্তী এলাকার দায়িত্বে ছিলেন। প্রদেশে অবশিষ্ট এলাকার দায়িত্বে ছিলেন মেজর জেনারেল খাদিম হোসেন রাজা। অপারেশনের অগ্রগতি পর্যবেক্ষণের জন্য লে. জেনারেল টিক্কা খান মার্শাল ল হেডকোয়ার্টারে রাত কাটান। সিদ্ধান্ত ছিল রাত ১১-৩০ মিনিটে বাঙালিদের ওপর আক্রমণ শুরু করা হবে। ইয়াহিয়া খান করাচীতে অবতরণ করার পর অপারেশন শুরু হবে। কিন্তু ইয়াহিয়া খান বিমানে

থাকাকালে ব্রিগেডিয়ার আরবার ঢাকার বিভিন্ন স্থানে আক্রমণ করে।

পাক বাহিনীর ২২ বেলুচ পিলখানার ৫০০০ ইপিআরকে নিরস্ত্র করবে। ৩২ পাঞ্জাব রাজারবাগ পুলিশ লাইনের ১০০০০ পুলিশকে নিরস্ত্র করবে। ২২ বেলুচ ও ৩২ পাঞ্জাব ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে বিদ্রোহীদের শক্ত ঘাঁটি ইকবাল হল ও জগন্নাথ হল ধ্বংস করবে। এক প্লাটুন বিশেষ বাহিনী (কমান্ডো) শেখ মুজিবুর রহমানের বাড়ি আক্রমণ করে তাকে গ্রেফতার করবে।

ইপিআর ও পুলিশ পাকিস্তান সেনাবাহিনীর অভিযান প্রতিহত করার জন্য চট্টগ্রাম, যশোর, দিনাজপুর, রাজশাহী প্রভৃতি স্থানে প্রস্তুত ছিল।

চট্টগ্রামে মেজর রফিকুল ইসলামের নেতৃত্বে ২৫ মার্চ রাত ৮-৩০ মিনিটে বিদ্রোহ করে ও পাকিস্তানিদের বন্দী করে। ইয়াহিয়া খানের ঢাকা ত্যাগের সংবাদ পেয়ে বঙ্গবন্ধু আওয়ামী লীগ ও ছাত্রলীগের নেতাদের সাথে আলোচনায় বসেন। তিনি জানালেন যে, পাকবাহিনী বাঙালিদের আক্রমণ করবে। তারা যেন আত্মগোপন করে প্রতিরোধ গড়ে তুলে। নেতৃবৃন্দ বঙ্গবন্ধুকে তার বাসভবন ত্যাগ করে আত্মগোপন করার অনুরোধ করেন। তিনি তাদের জানালেন যে কোনো অবস্থায় তিনি পালাবেন না। তিনি ৩২ নম্বর ধানমণ্ডিতে নিজ বাসভবনে অবস্থান করবেন। রাত ১২টায় জামাতা ড. ওয়াজেদ, কন্যা শেখ হাসিনা, শেখ রেহানা বঙ্গবন্ধুর নিকট বিদায় নিয়ে ওয়াজেদ মিয়ার বাসায় চলে যান। বঙ্গবন্ধু সংবাদ পেলেন পাকবাহিনী পিলখানা, রাজারবাগ পুলিশ লাইন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় আক্রমণ করেছে। বাঙালিরা আক্রান্ত। পাকিস্তান যুদ্ধ ঘোষণা করেছে। ২৬ মার্চ রাত ১২-৩০ মিনিটে বঙ্গবন্ধু তাৎক্ষণিক বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা ও মুক্তিযুদ্ধের আদেশ দেন। স্বাধীনতার প্রথম ঘোষণা বঙ্গবন্ধু টেলিফোনে চট্টগ্রামের আওয়ামী লীগ নেতা জহুর আহমদ চৌধুরীর নিকট পৌঁছে দেন। মগবাজার ওয়্যারলেস ও পিলখানা ওয়ারলেস বঙ্গবন্ধুর স্বাধীনতার ঘোষণার বার্তা পেয়ে তা প্রত্যেক জেলা, মহকুমা, থানায় ছড়িয়ে দেয়।

DECLARATION OF WAR OF INDEPENDENCE

PAK-ARMY SUDDENLY ATTACKED EPR BASE AT PILKHANA, RAJARBAG POLICE LINE AND KILLING CITIZENS STOP STREET BATTLE ARE GOING ON IN EVERY STREET OF DHAKA-CHITTAGONG STOP I APPEAL TO THE NATIONS OF THE WORLD FOR HELP STOP OUR FREEDOM FIGHTERS ARE GALLANTLY FIGHTING WITH THE ENEMIES TO FREE THE MOTHERLAND STOP I APPEAL AND ORDER YOU ALL IN THE NAME OF ALMIGHTY

ALLAH TO FIGHT TO THE LAST DROP OF BLOOD TO LIBERATE THE COUNTRY STOP ASK POLICE, EPR, BENGAL REGIMENT AND ANSAR TO STANDBY YOU AND TO FIGHT STOP NO COMPROMISE STOP VICTORY IS OURS STOP DRIVE OUT THE LAST ENEMY FROM THE HOLY SOIL OF MOTHERLAND STOP CONVEY THIS MESSAGE TO ALL AWAMI LEAGUE LEADERS, WORKERS AND OTHER PATRIOTS AND LOVERS OF FREEDOM STOP MAY ALLAH BLESS YOU STOP JOY BANGLA STOP- SHEIKH MUJIBUR RAHMAN STOP.

"পাকিস্তান সেনাবাহিনী অতর্কিতভাবে পিলখানা, ইপিআর ঘাঁটি, রাজারবাগ পুলিশ লাইন আক্রমণ করেছে এবং শহরের রাস্তায় রাস্তায় যুদ্ধ চলছে। আমি বিশ্বের জাতিসমূহের কাছে সাহায্যের আবেদন করেছি। আমাদের মুক্তিযোদ্ধারা বীরত্বের সঙ্গে মাতৃভূমি মুক্ত করার জন্য শত্রুদের সঙ্গে যুদ্ধ করছে। সর্বশক্তিমান আল্লাহর নামে আপনাদের কাছে আমার আবেদন ও আদেশ দেশকে স্বাধীন করার জন্য শেষ রক্তবিন্দু থাকা পর্যন্ত যুদ্ধ চালিয়ে যান। আপনাদের পাশে এসে যুদ্ধ করার জন্য পুলিশ, ইপিআর, বেঙ্গল রেজিমেন্ট ও আনসারদের সাহায্য চান। কোনো আপোস নাই। জয় আমাদের হবেই। পবিত্র মাতৃভূমি থেকে শেষ শত্রুকে বিতাড়িত করুন। সকল আওয়ামী লীগ নেতাকর্মী এবং অন্যান্য দেশপ্রেমিক প্রিয় লোকদের কাছে এ সংবাদ পৌঁছে দিন। আল্লাহ আপনাদের মঙ্গল করুন। জয় বাংলা।"

একই রাতে বঙ্গবন্ধু আরো একটি স্বাধীনতার ঘোষণাবার্তা ইপিআর ওয়ারলেসের মাধ্যমে চট্টগ্রামে প্রেরণ করেন। দ্বিতীয় বার্তাটি নিম্নে উদ্ধৃত হলো–

"This may be my last message. From today Bangladesh is independent. I call upon the people of Bangladesh wherever you might be and with whatever you have, to resist the army of occupation to the last. Your fight must go on until the last soldier of Pakistan occupation army is expelled from the soil of Bangladesh and final victory is achieved."

"এ আমার শেষ বাণী। আজ থেকে বাংলাদেশ স্বাধীন। বাংলাদেশের জনগণ তোমরা যে যেখানে থাকো; তোমাদের কাছে যা কিছু আছে তা নিয়ে শেষ পর্যন্ত দখলদার বাহিনীর প্রতিরোধ করো। বাংলাদেশ হতে পাকিস্তান সেনাবাহিনীর শেষ ব্যক্তিকে না তাড়ানো এবং চূড়ান্ত বিজয় অর্জিত না হওয়া পর্যন্ত তোমরা যুদ্ধ চালিয়ে যাবে।"

২৬ মার্চ বঙ্গবন্ধুর স্বাধীনতা ঘোষণা বার্তা পেয়ে চট্টগ্রাম সেলিমপুর ওয়্যারলেস অফিস, চট্টগ্রাম ফৌজদারহাট ওয়্যারলেস তা বৈদেশিক জাহান, বাংলাদেশের বিভিন্ন জেলায় প্রেরণ করে। চট্টগ্রামের আওয়ামী লীগ নেতা এমএ হান্নান ২৬ মার্চ কালুরঘাট বেতার কেন্দ্র খুলে তা প্রচার করেন।

চট্টগ্রামে প্রতিরোধ

১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধে চট্টগ্রাম অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছে। ২৫ মার্চ রাতে বঙ্গবন্ধু চট্টগ্রাম নেতাদের চট্টগ্রামের নিয়ন্ত্রণ নিয়ে কুমিল্লায় অগ্রসর হতে বলেন। সংবাদ পেয়ে ক্যাপ্টেন রফিকুল ইসলাম ২৫ মার্চ রাত ৮-৩০ মিনিটে বিদ্রোহ করেন। তার অধীনে ১০০০ ইপিআর ছিল। তার মধ্যে ৩০০ অবাঙালি ছিল। তিনি অবাঙালি ইপিআরদের বন্দী করেন।

২৫ মার্চ রাত ১১টায় মেজর জিয়াউর রহমান চট্টগ্রাম বন্দরে পাকিস্তানি অস্ত্র বোঝাই সোয়াত জাহাজ হতে অস্ত্র খালাস করার জন্য যাত্রা করেন। পথে তিনি জানতে পারেন, চট্টগ্রাম সেনানিবাসে পাকবাহিনী বাঙালি সেনাদের হত্যা করছে। তখন ফেরত চলে যান এবং বিদ্রোহ করেন। ২৬ মার্চ সকালে তিনি সৈন্যদের নিয়ে নিরাপদ স্থানে চলে যান। তিনি পাক বাহিনীকে প্রতিরোধ ও বাঙালি সেনাদের উদ্ধারের কোনো উদ্যোগ না নিয়ে চট্টগ্রাম শহর ত্যাগ করেন।

২৬ মার্চ কুমিল্লা হতে পাক বাহিনী চট্টগ্রামের পাক সেনাদের সাথে যোগ দেয়ার জন্য অগ্রসর হতে থাকে। ১০২ জন ইবিআর ও ইপিআর কুমিরায় পাক সেনাদের পরাজিত করে। পাক বাহিনীর ১৫২ জন সৈন্যসহ অধিনায়ক নিহত হয়। এ ছিল মুক্তিযোদ্ধাদের প্রথম বিজয়।

চট্টগ্রাম কালুর ঘাটে স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র

চট্টগ্রাম বেতার কেন্দ্র নিরাপদ না থাকায় আওয়ামী লীগ নেতৃবৃন্দ বেতারের কলাকুশলীদের নিয়ে ২৬ মার্চ দুপুরের মধ্যে কালুরঘাট স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র চালু করে। কালুরঘাট বেতার কেন্দ্র প্রতিষ্ঠায় এগিয়ে আসেন কাস্টম অফিসার এম এ হালিম, বেলাল মোহাম্মদ, ইঞ্জিনিয়ার নাসিরউদ্দিন, আবদুস সোবহান, দেলওয়ার হোসেন। চট্টগ্রাম আওয়ামী লীগ নেতা এম এ হান্নান বঙ্গবন্ধুর স্বাধীনতা ঘোষণা বার্তা প্রথম পাঠ করেন।

২৭ মার্চ মেজর খালেদ মোশাররফ, ক্যাপটেন শাফায়াত জামিল ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় বিদ্রোহ করে এবং অবাঙালি অফিসারদের বন্দী করে। মুক্তিযুদ্ধের প্রথম পর্যায় কুষ্টিয়ার যুদ্ধে মুক্তিবাহিনীর সফলতা ছিল অপূর্ব। ২৯ ও ৩০ মার্চ

পাকবাহিনীর সাথে তাদের যুদ্ধ চলে। যুদ্ধে ৮৫ জন পাকিস্তানি সৈন্য নিহত হয়। ইপিআর অধিনায়ক মেজর ওসমান চৌধুরী কুষ্টিয়ার যুদ্ধে নেতৃত্ব দেন। সাথে ছিল হাজার হাজার জনতা। কুষ্টিয়া থেকে অবশিষ্ট সৈন্য নিয়ে মেজর শোয়েব যশোর সেনানিবাসে পালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করে। ঝিনাইদহে পৌঁছলে এসডিপিও মাহবুব উদ্দিন আহমেদ পুলিশ, ইপিআর ও জনতা নিয়ে বার বার আক্রমণ করে মেজর শোয়েবসহ ৫৬ জন সৈন্যকে হত্যা করে।

পাবনার ডিসি নুরুল কাদের খানের নেতৃত্বে ২৭ মার্চ পাকবাহিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ শুরু হয়। এ যুদ্ধে পাক বাহিনীর মেজর আসলামসহ ৮০ জন সৈন্য নিহত হয়।

২৬ মার্চ পাকবাহিনী ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইকবাল হল ও জগন্নাথ হল আক্রমণ করে অনেক শিক্ষক-ছাত্রদের হত্যা করেছে।

২৬ মার্চ নিহত শিক্ষকগণ হলেন–

ড. গোবিন্দ চন্দ্র দেব-দর্শন বিভাগ
ড. জ্যোতির্ময় গুহঠাকুরতা-ইংরেজি
ড. ফজলুর রহমান-মৃত্তিকা বিভাগ
ড. এন এম মনিরুজ্জামান-পরিসংখ্যান বিভাগ
অদ্বৈপায়ন ভট্টাচার্য-পদার্থ বিভাগ
আতাউর রহমান খান -পদার্থ বিভাগ
ড. সাফাত আলী-শিক্ষা ও গবেষণা ইনস্টিটিউট
শারাফত আলী-গণিত বিভাগ

আগরতলা মামলার আসামি লে. কমান্ডার মোয়াজ্জেম হোসেন নিহত

আগরতলা মামলার ২ নম্বর আসামি লে. কমান্ডার মোয়াজ্জেম হোসেনকে ২৬ মার্চ ভোরে সেনাবাহিনী তাকে তার এলিফ্যান্ট রোডের বাসভবনের সামনে নির্মমভাবে হত্যা করে। তার লাশ জীপের সাথে বেঁধে সেনানিবাসে নিয়ে যায়। তার লাশের সন্ধান পাওয়া যায়নি। ১৯৩৬ সালে মোয়াজ্জেম হোসেন পিরোজপুরে ডুমুরতলায় জন্মগ্রহণ করেন।

২৬ মার্চ দিন রাত ঢাকায় গণহত্যা চলে। ২৭ মার্চ কিছুক্ষণের জন্য কার্ফু তুলে নেয়া হয়। এ সময় হাজার হাজার মানুষ ঢাকা শহর ত্যাগ করে। নেতাকর্মীরা পালিয়ে যায়। ২৭-৩১ মার্চ ঢাকায় হত্যাকাণ্ড চলে। পাক সেনারা শহীদ মিনার ধ্বংস করে। জগন্নাথ হলে ছাত্র শিক্ষকদের হত্যার পর তাদের মাঠে গণকবর দেয়া হয়। রাজারবাগ ও পিলখানা ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়। আওয়ামী

লীগের সাধারণ সম্পাদক তাজউদ্দীন আহমদের বাড়ি আক্রমণ করে। তার স্ত্রী জোহরা তাজউদ্দীন প্রাণে বেঁচে যান। কর্নেল ওসমানী গোপ কেটে ঢাকা থেকে পালিয়ে যান। এমনিভাবে অনেক নেতা আত্মগোপন করতে সক্ষম হয়। তাজউদ্দীন আহমদ ও ব্যারিস্টার আমীর-উল ইসলাম ২৭ মার্চ ঢাকা তাগ করে মেহেরপুর হয়ে ভারতে চলে যান।

শেখ মুজিবের স্বাধীনতা ঘোষণা সম্পর্কে মেজর সিদ্দিক সালিক

শেখ মুজিব যে বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করেছেন সে সম্পর্কে পাকিস্তানি মেজর সিদ্দিক সালিক তার Witness to Surrender গ্রন্থে লিখেছেন : "When the first shot had been fired the voice of Sheikh Mujibur Rahman came faintly through an wave length close to that of official Pakistan Radio. In what must have been, and sounded like a pre-recorded message. The Sheikh proclaimed East Pakistan to the peoples Republic of Bangladesh."

"যখন প্রথম গুলিবর্ষণ করা হয় তখন রেডিও পাকিস্তানে ক্ষীণভাবে শেখ মুজিবের কণ্ঠ শোনা যায়। মনে হলো পূর্বে রেকর্ডকৃত বাণী। শেখ মুজিব পূর্ব পাকিস্তানকে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ ঘোষণা করছেন।"

২৬ মার্চ রাত ১-৩০ মিনিট : বঙ্গবন্ধু গ্রেফতার

২৬ মার্চ রাতে একদল কমান্ডো বঙ্গবন্ধুর ধানমণ্ডির বাসভবন ঘিরে ফেলে। তারা গোলাগুলি শুরু করে। লে. কর্নেল জেড এ খান এবং কোম্পানি কমান্ডার মেজর বেলালের নেতৃত্বে বঙ্গবন্ধুর বাসভবনে অভিযান চলে। বঙ্গবন্ধু প্রচণ্ড গুলির শব্দ শুনে নিচে নেমে আসে এবং চিৎকার করে নিজের পরিচয় দেন। সিপাইরা তাকে হত্যা করতে উদ্যত হলে কর্নেল জেড এ খান তাদের বাধা দেন। বঙ্গবন্ধু উপরে উঠে প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র নিয়ে আসেন। কমান্ডোরা তাকে রাত ১-৩০ মিনিটে জীপে তুলে নিয়ে ক্যান্টনমেন্টে চলে যায়। রাতে তাকে ক্যান্টনমেন্টে আদমজী স্কুলে আটক রাখে। ২৬ মার্চ দিনে তাকে ফ্ল্যাগ স্টাফ হাউজে স্থানান্তর করা হয়। তিন দিন পর বঙ্গবন্ধুকে বিমানে পশ্চিম পাকিস্তানে নিয়ে যাওয়া হয়। তাকে পাঞ্জাবের মিয়ানওয়ালি জেলে বন্দী করে রাখা হয়।

বঙ্গবন্ধুর গ্রেফতারের পর বেগম ফজিলাতুন্নেসা পুত্র জামাল ও রাসেলকে নিয়ে পাশের বাড়িতে আশ্রয় নেন।

বঙ্গবন্ধু যখন বন্দী অবস্থায় আদমজী স্কুলে তখন ঢাকা শহর জ্বলছে। বস্তিতে অগ্নিসংযোগ করে জীবন্ত মানুষসহ ঘরবাড়ি পুড়িয়ে ফেলে। ডেইলি পিপলস পত্রিকা অফিস আগুন দিয়ে পুড়ে ফেলে।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ২৬ মার্চ স্বাধীনতা ঘোষণা যেভাবে প্রচারিত হয়েছে

১. ২৬ মার্চ স্বাধীনতা ঘোষণা বঙ্গবন্ধু টেলিফোনে চট্টগ্রাম আওয়ামী লীগ নেতা জহুর আহম্মেদ চৌধুরীর স্ত্রী ড. নুরুন্নাহারের নিকট জানিয়ে দেন। ড. নুরুন্নাহার বার্তাটি লিপিবদ্ধ করে চট্টগ্রাম সংগ্রাম পরিষদ অফিসে এবং সলিমপুর ওয়ারলেস স্টেশনে প্রেরণ করেন।

২. সলিমপুর ওয়ারলেস অফিসের সহকারী প্রকৌশলী এম হাকিম তার কর্মচারীদের দ্বারা ঘোষণা বার্তা দেশে বিদেশে প্রেরণ করেন। তারা চট্টগ্রাম বন্দরে নোঙ্গর করা জাহাজের মাধ্যমে বার্তাটি দিল্লিসহ বিদেশে প্রেরণ করেন।

৩. বঙ্গবন্ধু স্বাধীনতা ঘোষণা বার্তাটি প্রচারের জন্য চট্টগ্রাম আওয়ামী নেতা এমএ হান্নান চট্টগ্রাম বেতারের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের নিয়ে ২৬ মার্চ সকালে কালুঘাটে ট্রান্স মিশনে স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করেন। এমএ হান্নান স্বাধীনতা ঘোষণা বার্তা কালুর ঘাট থেকে ২৬ মার্চ দুপুর ২টা ৩০ মিনিট এবং সন্ধ্যার পর প্রচার করেন। ২৭ মার্চ বঙ্গবন্ধুর ঘোষণা বারবার প্রচারিত হয়েছে।

৪. ঢাকার মগবাজারসহ ডিএএস ওয়ারলেসের সুপারভাইজার মেজবাহউদ্দিন ২৬ মার্চ সকাল ৬টায় বঙ্গবন্ধু স্বাধীনতা ঘোষণা বার্তা চট্টগ্রামের সলিমপুর অফিসে প্রেরণ করেন।

৫. চট্টগ্রাম ফৌজদারহাট ক্যাডেট ওয়ারলেস অফিস ঢাকার মগবাজার ওয়ারলেস থেকে বঙ্গবন্ধুর স্বাধীনতা ঘোষণা বার্তা পেয়ে তা প্রচার করে।

৬. বুয়েটের অধ্যাপক ড. নূরুল উল্লাহ বঙ্গবন্ধুর বাসভবনে বেতারযন্ত্র স্থাপন করেন এবং তা থেকে বঙ্গবন্ধুর ঘোষণা প্রচারিত হয়েছে।

৭. ঐতিহাসিক বলধা গার্ডেন হতে বঙ্গবন্ধু স্বাধীনতা ঘোষণা প্রচারিত হয়েছিল।

৮. পিলখানার ইপিআর সিগন্যাল উইংয়ের সুবেদার শহীদ শওকত তার ট্রান্সমিটার থেকে বঙ্গবন্ধুর স্বাধীনতা ঘোষণা বার্তা বাংলাদেশের বিভিন্নস্থানে প্রেরণ করেন। পাকবাহিনী এ সংবাদ জানতে পেরে নির্যাতন করে তাঁকে হত্যা করে।

৯. ২৬ মার্চ বঙ্গবন্ধু যে স্বাধীনতা ঘোষণা দিয়েছেন তা আমেরিকার ডিফেন্স ইনটেলিজেন্স এজেন্সির (American Defence Intelligence Agency-DIA) রিপোর্টে লিপিবদ্ধ আছে। তা উদ্ধৃত হলো–

D/A Spot Report
Date-26 March 1971
Time-14-30
Subject : Civil war in Pakistan

Pakistan was thrust into Civil war to day when Sheikh Mujibur Rahman proclaimed the east wing of the two Country to be the Soverein independent peoples Republic of Bangladesh. Fighting is reported heavy Dacca and other eastern cities where the 10,000 men paramilitary East Pakistan Rifles have joined Police and Private Citizens in Conflict with an estimated 23000 West Pakistan regular army troops.

ডিআই এ রিপোর্ট
তারিখ : ২৬ মার্চ ১৯৭১
সময় : ১৪-৩০টা

বিষয় : পাকিস্তানে গৃহযুদ্ধ

পাকিস্তানে আজ গৃহযুদ্ধ শুরু হয়েছে। শেখ মুজিবুর রহমান দেশের দুই অংশে পূর্ব অঞ্চলকে স্বাধীন ও সার্বভৌম গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ হিসেবে ঘোষণা দেন। ঢাকা ও পূর্বাঞ্চলের অন্যান্য শহরে ভীষণ যুদ্ধ চলছে। এ অঞ্চলে ১০০০০ ইপিআর পুলিশ এবং জনগণ সাথে যোগ দিয়ে পাকিস্তানের ২৩০০০ সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত আছে।

Department of State
TEL & RAM

A Clandestine Radio began to broadcast resistance messages, one of first of these was a declaration of the sovereign and independent Peoples republic of Bangladesh made in the name of Mujib.

On March 27 the Clandestine radio announced the formation of a revolutionay army and a provisional government under the leadership of a mijor Zia Khan.

একটি গোপন বেতার থেকে প্রতিরোধের সংবাদ পাওয়া যায়। তার মধ্যে প্রথমটি ছিল মুজিবের নামে সার্বভৌম স্বাধীন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের ঘোষণা। ২৭ মার্চ গোপন বেতারে মেজর জিয়ার নেতৃত্বে বিপ্লবী সেনাবাহিনী ও অস্থায়ী

সরকার গঠনের ঘোষণা দেয়া হয়। বঙ্গবন্ধুর স্বাধীনতা ঘোষণা নিয়ে বিএনপি বিভ্রান্তি সৃষ্টি করেছে এবং ইতিহাস বিকৃত করেছে। আমেরিকার হোয়াইট হাউজে রক্ষিত নথিতে দেখা যায় বঙ্গবন্ধু ২৬ মার্চ স্বাধীনতা ঘোষণা দেন এবং তার পক্ষে মেজর জিয়াউর রহমান ২৭ মার্চ ঘোষণা পাঠ করেন।

২৬ মার্চ বঙ্গবন্ধু স্বাধীনতা ঘোষণা উল্লিখিত উৎস থেকে সারা বাংলায় ছড়িয়ে পড়ে এবং পাকবাহিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ শুরু হয়। ২৬ মার্চ বঙ্গবন্ধু ব্যতীত অন্য কোনো ব্যক্তি স্বাধীনতা ঘোষণা দেয়নি। বঙ্গবন্ধুর স্বাধীনতার বার্তা বরিশাল পৌঁছে ২৬ মার্চ। একই দিনে সেখানে অস্থায়ী সচিবালয় গঠন করা হয়। লেখক এ সময় বরগুনা ম্যাজিস্ট্রেট। বরগুনা মহকুমার তৎকালীন এসডিও সৈয়দ আনোয়ার হোসেন এবং লেখক বঙ্গবন্ধুর স্বাধীনতা ঘোষণার বার্তা পেয়েছেন।

সেলিমপুর/ভিএইচএফ সহকারী স্টেশনের প্রকৌশলী হাকিম, জালাল আহমদ টিটিআর, জুলহাস উদ্দিন টিটিআর, ইএসও শফিকুল ইসলাম, টিটিআর এ কাশেম, ক্যাশিয়ার আব্দুল ফজল, মাহফুজ আলী এবং ঢাকার মগবাজারসহ ভিআইএফ-এর সুপারভাইজার মেজবাহ উদ্দিন স্বাধীনতা ঘোষণার বার্তাটি দেশে বিদেশে প্রেরণ করে স্বাধীনতা সংগ্রামে ঐতিহাসিক অবদান রেখেছেন। তাদের এই দুঃসাহসিক অবদানের তেমন কোনো স্বীকৃতি দেয়া হয়নি।

১৯৭২ সালের মাঝামাঝি সময় আবদুল হাকিম, শফিকুল ইসলাম, জালাল আহমেদ, জুলহাস উদ্দিন, আবুল কাশেম গণভবনে বঙ্গবন্ধুর সাথে দেখা করে বঙ্গবন্ধু কর্তৃক স্বাধীনতা ঘোষণার একটি অনুলিপি বাইন্ডিং করে বঙ্গবন্ধুকে উপহার দেন এবং তার একটি অনুলিপি বঙ্গবন্ধু সত্যায়িত করে দেন। বঙ্গবন্ধু তাদের প্রশংসা করে বলেছিলেন, 'এরাই আমার বাংলার মানুষ, প্রকৃত দেশপ্রেমিক মুক্তিযোদ্ধা, জাতি তাদের চিরদিন শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করবে। এই বাণীবদ্ধ স্মৃতি জাতীয় জাদুঘরে সংরক্ষিত থাকবে। তোমাদের সরকারিভাবে মূল্যায়নের ব্যবস্থা করা হবে।" গণভবনে বাণীটি সংরক্ষিত আছে। নিম্নে তা উদ্ধৃত করা হলো :

চট্টগ্রামে ২৬ মার্চ প্রত্যুষে বঙ্গবন্ধুর ঘোষণার বার্তাটি দেশবাসীর নিকট ওয়্যারলেসের মাধ্যমে যারা পৌঁছে দেন তাদের নাম ঠিকানা ঘোষণাপত্রে আছে। গণভবনে রক্ষিত ইংরেজিতে লিখিত উক্ত ঘোষণাপত্রে যেভাবে তাদের নাম-ঠিকানা লিখিত আছে, তার অনুলিপি নিম্নে দেয়া হলো।

1. Management and Guidance by AKSM A Hakim HEW
2. Received and Transmitted by Md. Jalal Ahmed (TTR) ESW
3. Aided by Gulhasuddin Ex-EPR TTR
4. Aided by Md. Shifiqul Islam ESW

5. Aided by Abul Kasem Khan TTR
6. Aided by Abul Fazal, Cashier

এই ৬ জন কর্মকর্তা-কর্মচারী জীবনের ঝুঁকি নিয়ে বঙ্গবন্ধুর ঘোষণা সলিমপুর ওয়্যারলেস স্টেশন থেকে দেশে-বিদেশে প্রচার করেছিলেন। আজ তাদের মধ্যে অনেকেই জীবিত নেই। জাতির উচিত ছিল এই বীর সন্তানদের জবানবন্দি বাণীবদ্ধ করে রাখা। এখনো অনেক কর্মচারী জীবিত আছেন। সরকারের উচিত তাদের সাক্ষাতকার লিপিবদ্ধ করে সংরক্ষণ করা। চট্টগ্রামের সেলিমপুরের স্বাধীনতার ঘোষণা বার্তাটি যথাযথভাবে সংরক্ষিত থাকলে পরবর্তীতে মুক্তিযুদ্ধ বিরোধী সরকার ক্ষমতায় এসে বঙ্গবন্ধুর স্বাধীনতার ঘোষণা বিতর্কিত করতে পারতো না।

বঙ্গবন্ধুর স্বাধীনতার ঘোষণার বার্তা পাবনা জেলার সিরাজগঞ্জ মহকুমার শাহজাদপুর থানায় ২৬ মার্চ সকালে পৌঁছে এবং তা এখনো সংরক্ষিত আছে। বাংলাদেশে এই সংরক্ষিত বার্তাটি এক ঐতিহাসিক দলিল। বিশিষ্ট মুক্তিযোদ্ধা বাংলাদেশ সরকারের সাবেক যুগ্ম সচিব জনাব আবদুল হাই উদ্যোগ গ্রহণ করে বার্তাটি উদ্ধার করেন।

শাহজাদপুর থানার ওসি আবদুল হামিদ ২৬ মার্চ প্রত্যুষে 'পাকিস্তান টেলিগ্রাফ এন্ড টেলিফোনস ডিপার্টমেন্ট', ঢাকা থেকে প্রেরিত বঙ্গবন্ধুর স্বাধীনতার ঘোষণাটির বার্তাটি পান। বঙ্গবন্ধু স্বাধীনতার ঘোষণার বার্তা বাংলাদেশের সকল জেলা, মহকুমা ও থানায় ইপিআর ও ওয়্যারলেস-এর মাধ্যমে পৌঁছে যায়। এ সময় টেলিগ্রাম অপারেটরগণ হাতে বার্তা লিখতেন এ কারণে ভাষার কিছুটা পার্থক্য দেখা দেয়। তবে বার্তার মূল বিষয় একই ছিল।

১৯৭১ সালের ২৬ মার্চ ৮ ঘটিকায় শাহাজাদপুর থানার ওসি আবদুল হামিদ ইপিআর ওয়ারলেসের স্বাধীনতার ঘোষণার বার্তা পেয়ে শহরে প্রচার করেন। তিনি থানা ত্যাগ করার সময় মূল বার্তা নিয়ে যান। তিনি ঢাকায় অবসর জীবন যাপন করতেন। কিছুদিন পূর্বে তিনি মৃত্যুবরণ করেছেন। তিনি ২৬ মার্চ যে বার্তা পেয়েছেন তা নিম্নরূপ :

From Dacca
Receive on
Sd : 26/3
at 0-8 am
To
Peoples of Bangladesh and all of the World.

Pakistan arms forces suddenly attacked E.P.R of Peelkhana and Police forces at Rajarbag from 00 hours of 26th March killing laks of

unarmed people fierce battle going on with EPR and Police forces in the street of Dacca and people are fighting gallantly for the freedom of Bangladesh. Every section of people of Bangladesh asked attack enemy force at any cost of Bangladesh. May Allah bless you and Help in your struggle of freedom.

Joy Bngla
S. K Mujib

ঢাকা হতে
গ্রহণের সময়
এস.ডি : ২৬/৩
সকাল : ০৮টা

বাংলাদেশসহ পৃথিবীর সকল জনগণ।

পাকিস্তানের সেনাবাহিনী হঠাৎ পিলখানার ইপিআর, রাজারবাগের পুলিশ ২৬ মার্চ ১২টায় আক্রমণ করেছে। তারা লক্ষ লক্ষ নিরস্ত্র মানুষ হত্যা করেছে। ঢাকার রাস্তায় ইপিআর, পুলিশ ও জনগণের সাথে বাংলাদেশের স্বাধীনতার জন্য যুদ্ধ চলছে। বাংলাদেশের সকল শ্রেণীর মানুষকে যে কোনো মূল্যে শত্রুর সাথে যুদ্ধ করার জন্য নির্দেশ দেয়া হলো। স্বাধীনতা যুদ্ধে আল্লাহ আপনাদের সহায়তা করুন।

জয় বাংলা
শেখ মুজিব

তেলিয়াপাড়া সেনা সম্মেলন-৪ এপ্রিল

চতুর্থ বেঙ্গল রেজিমেন্টের অধিনায়ক মেজর খালেদ মোশাররফ সিলেটের তেলিয়াপাড়া চা বাগানে ১৯৭১ সালের ৪ এপ্রিল সেনা সম্মেলন আহ্বান করেন। এ সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন কর্নেল এম এ জি ওসমানী, কর্নেল আবদুর রব এমএনএ, মেজর সফিউল্লাহ, মেজর জিয়াউর রহমান, লে. কর্নেল সালাউদ্দিন, মেজর মইনুল হোসেন চৌধুরী, মেজর নুরুজ্জামান, মেজর খালেদ মোশাররফ, কর্নেল ওসমানী এমএনএ সভায় সভাপতিত্ব করেন।

সভায় মুক্তিযুদ্ধ চালিয়ে যাওয়ার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় এবং কর্নেল ওসমানীকে প্রধান সেনাপতি নিয়োগ করা হয়।

অধ্যায় ১৮

স্বাধীন বাংলাদেশ সরকার গঠন

২৫ মার্চ রাত ১১টায় তাজউদ্দীন আহমদ, ড. কামাল হোসেন ও ব্যারিস্টার আমীর-উল ইসলাম বঙ্গবন্ধুর সাথে শেষ সাক্ষাৎ করে তার বাসভবন ত্যাগ করেন। তিনি তাদের নিরাপদ স্থানে যেতে বলেন। তাজউদ্দীন, ড. কামাল হোসেন ও ব্যারিস্টার আমীর-উল ইসলাম ২৫ মার্চ রাতে একত্রে নিরাপদ স্থানে চলে যান। কামাল হোসেন তার বাসায় যান এবং সেখানে তিনি গ্রেফতার হন। ২৭ মার্চ নিঃস্ব অবস্থায় তাজউদ্দীন আহমদ ও ব্যারিস্টার আমীর-উল ইসলাম ঢাকা ত্যাগ করেন। তারা পদ্মা পাড়ি দিয়ে ২৯ মার্চ ঝিনাইদহ পৌঁছেন। ঝিনাইদহের এসডিপিও মাহবুব উদ্দিন আহমেদ, ইপিআর কমান্ডার মেজর আবু ওসমান চৌধুরী ও মেহেরপুরের এসডিও তৌফিক এলাহী চৌধুরী সীমান্তের ওপারে যোগাযোগ করে তাজউদ্দীন ও ব্যারিস্টার আমীর-উল ইসলামের ভারত গমনের ব্যবস্থা করেন। ৩০ মার্চ তারা সীমান্ত অতিক্রম করেন। বিএসএফ-এর আঞ্চলিক প্রধান গোলক মজুমদার তাদের সংবর্ধনা জানায়। বিএসএফ প্রধান ছিলেন কেএফ রুস্তমজী। রুস্তমজী ও গোলক মজুমদার প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর সাথে তাজউদ্দীন আহমদের সাক্ষাতের ব্যবস্থা করেন। তাজউদ্দীন আহমদ ও ব্যারিস্টার আমীর-উল ইসলাম ১ এপ্রিল দিল্লি পৌঁছেন। তাজউদ্দীন আহমদ প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর সাথে ৪ ও ৫ এপ্রিল বিস্তারিত আলোচনা করে নিম্নের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন।

- স্বাধীন বাংলাদেশ সরকারকে ভারতে অবস্থান অনুমতি দেয়া;
- সরকার পরিচালনায় সহায়তা প্রদান;
- মুক্তিযোদ্ধাদের প্রশিক্ষণ ও অস্ত্র প্রদান;
- বাংলাদেশের জন্য আন্তর্জাতিক সমর্থন আদায়;
- বাংলাদেশ থেকে আগত শরণার্থীদের থাকা খাওয়ার ব্যবস্থা করা;
- যোগাযোগের জন্য একটি বিমান প্রদান;
- মুক্তিযুদ্ধের সংবাদ প্রচারের জন্য বেতার কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা;
- মুক্তিযোদ্ধাদের পর্যাপ্ত অস্ত্র সরবরাহ।

৭ এপ্রিল তাজউদ্দিন আহমদ ও ব্যারিস্টার আমীর-উল ইসলাম কলকাতায় ফিরে আসেন। তারা একই কক্ষে থাকতেন। ব্যারিস্টার আমীর-উল ইসলাম

বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণাপত্রের খসড়া প্রণয়ন করেন এবং তাজউদ্দীন আহমদ তা অনুমোদন করেন। কলকাতা হাইকোর্টের বিখ্যাত আইনজীবী সুব্রত রায় চৌধুরী খসড়ার সাথে একমত পোষণ করেন। ১০ এপ্রিল খসড়া স্বাধীনতা ঘোষণাপত্র চূড়ান্ত করা হয়।

১৯৭১ সালের ১০ এপ্রিল এমএনএ ও এমপিএগণ স্বাধীন বাংলাদেশ সরকার গঠন করেন।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান	রাষ্ট্রপতি
সৈয়দ নজরুল ইসলাম	ভারপ্রাপ্ত রাষ্ট্রপতি
তাজউদ্দীন আহমদ	প্রধানমন্ত্রী
খন্দকার মোশতাক আহমদ	মন্ত্রী
এম মনসুর আলী	মন্ত্রী
এ এইচ এম কামরুজ্জামান	মন্ত্রী

১১ এপ্রিল কর্নেল এম এ জি ওসমানীকে মুক্তিযুদ্ধের প্রধান সেনাপতি নিয়োগ করা হয়।

আগরতলায় সংসদীয় দলের প্রথম সভা

১৯৭১ সালের ১১ এপ্রিল তাজউদ্দীন আহমদ আগরতলা গমন করেন। আগরতলায় অনুষ্ঠিত সংসদীয় দলের সভায় নিম্নলিখিত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

- বাংলাদেশ সরকারের নাম হবে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার;
- সংসদীয় পদ্ধতি সরকার হবে। রাষ্ট্রপতি হবেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এবং প্রধানমন্ত্রী নিযুক্ত হবেন তাজউদ্দীন আহমদ;
- ২৬ মার্চ বঙ্গবন্ধুর স্বাধীনতা ঘোষণা অনুমোদন করা হয়;
- স্বাধীনতা ঘোষণা ১০ এপ্রিল ১৯৭১ অনুমোদন;
- অধ্যাপক ইউসুফ আলী মন্ত্রিসভার শপথ পড়াবেন;
- মুক্তিফৌজকে মুক্তিবাহিনী নামকরণ;
- বাংলাদেশের রাজধানীর নাম হবে মুজিবনগর;
- বাংলাদেশকে ৫টি সেক্টর ও কমান্ডার নিয়োগ অনুমোদন।

প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দীন আহমদ ১৯৭১ সালের ১৩ এপ্রিল বাংলাদেশ বেতার হতে স্বাধীন বাংলাদেশ সরকার গঠনের ঘোষণা দেন। বেতার ভাষণে তিনি বলেন, We are at war আমরা যুদ্ধরত। তার ভাষণে নিম্নোক্ত সেক্টর ও কমান্ডার নিয়োগের কথা বলেন।

অঞ্চল	কমান্ডার
চট্টগ্রাম-নোয়াখালী	মেজর জিয়াউর রহমান
সিলেট-কুমিল্লা	মেজর খালেদ মোশাররফ
ময়মনসিংহ-টাঙ্গাইল	মেজর সফিউল্লাহ
কুষ্টিয়া-যশোর	মেজর আবু ওসমান চৌধুরী
রাজশাহী	মেজর আহমদ
দিনাজপুর-রংপুর	মেজর নজমুল হক
পাবনা-বগুড়া	মেজর নওয়াজিশ

মুজিবনগর সরকারের শপথ গ্রহণ

স্বাধীন বাংলাদেশ সরকার ১৯৭১ সালের ১৭ এপ্রিল কুষ্টিয়া জেলার মেহেরপুর মহকুমার বৈদ্যনাথতলায় আম্রকাননে শপথ গ্রহণ করে। শপথ অনুষ্ঠানে দেশী-বিদেশী সাংবাদিক উপস্থিত ছিলেন।

স্বাধীন বাংলাদেশ সরকারের মন্ত্রিসভা

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান	রাষ্ট্রপতি
সৈয়দ নজরুল ইসলাম	উপরাষ্ট্রপতি-ভারপ্রাপ্ত রাষ্ট্রপতি
তাজউদ্দীন আহমদ	প্রধানমন্ত্রী, প্রতিরক্ষা, সংস্থাপন
ক্যাপটেন মনসুর আলী	অর্থ
খন্দকার মোশতাক আহমেদ	পররাষ্ট্র
এ এইচ এম কামরুজ্জামান	স্বরাষ্ট্র
কর্নেল এম এ জি ওসমানী এমএনএ	প্রধান সেনাপতি

প্রধান হুইফ অধ্যাপক ইউসুফ আলী মন্ত্রিসভার শপথ পড়ান।

মন্ত্রিসভাকে গার্ড অব অনার জ্ঞাপন করেন ঝিনাইদহের এসডিপিও মাহবুব উদ্দিন আহমদ। ভারপ্রাপ্ত রাষ্ট্রপতি সৈয়দ নজরুল ইসলাম অভিবাদন গ্রহণ করেন।

শপথ অনুষ্ঠানে ভারপ্রাপ্ত রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রী বেতার ভাষণ দেন। স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র শপথ অনুষ্ঠান প্রচার করে। বাংলাদেশ সরকার শপথ গ্রহণের পর বাংলাদেশ সরকার দেশে ও বিদেশে স্বীকৃতি পায়। বাঙালি জাতি ঐক্যবদ্ধ হয় এবং মুক্তিযুদ্ধ চলতে থাকে।

অধ্যাপক ইউসুফ আলী স্বাধীনতা ঘোষণাপত্র পাঠ করেন।

স্বাধীনতা ঘোষণাপত্র নিম্নে উদ্ধৃত হলো :

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের
স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র

মুজিবনগর, তারিখ : ১০ এপ্রিল, ১৯৭১; শনিবার, ২৭ চৈত্র ১৩৭৭

"যেহেতু ১৯৭০ সালের ৭ই ডিসেম্বর হইতে ১৯৭১ সনের ১৭ই জানুয়ারি পর্যন্ত

বাংলাদেশে অবাধ নির্বাচনের মাধ্যমে শাসনতন্ত্র রচনার উদ্দেশ্যে প্রতিনিধি নির্বাচিত করা হইয়াছিল।"

এবং

"যেহেতু এই নির্বাচনে বাংলাদেশের জনগণ ১৬৯টি আসনের মধ্যে আওয়ামী লীগ দলীয় ১৬৭ জন প্রতিনিধি নির্বাচিত করিয়াছিল।"

এবং

"যেহেতু জেনারেল ইয়াহিয়া খান ১৯৭১ সনের ৩রা মার্চ তারিখে শাসনতন্ত্র রচনার উদ্দেশ্যে নির্বাচিত প্রতিনিধিদের অধিবেশন আহ্বান করেন।"

এবং

"যেহেতু আহূত এই পরিষদ স্বেচ্ছায় এবং বেআইনীভাবে অনির্দিষ্ট কালের জন্য বন্ধ ঘোষণা করেন।"

এবং

"যেহেতু পাকিস্তান কর্তৃপক্ষ তাদের প্রতিশ্রুতি পালন করিবার পরিবর্তে বাংলাদেশের জনপ্রতিনিধিদের সহিত পারস্পরিক আলোচনাকালে পাকিস্তান কর্তৃপক্ষ ন্যায়নীতি বহির্ভূত এবং বিশ্বাসঘাতকতামূলক যুদ্ধ ঘোষণা করেন।"

এবং

"যেহেতু উল্লেখিত বিশ্বাসঘাতকতামূলক কাজের জন্য উদ্ভূত পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে বাংলাদেশের সাড়ে সাত কোটি মানুষের অবিসংবাদিত নেতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান জনগণের আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার অর্জনের আইনানুগ অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য ১৯৭১ সালের ২৬শে মার্চ ঢাকায় যথাযথভাবে স্বাধীনতা ঘোষণা করেন এবং বাংলাদেশের অখণ্ডতা ও মর্যাদা রক্ষার জন্য বাংলাদেশের জনগণের প্রতি উদাত্ত আহ্বান জানান।"

এবং

"যেহেতু পাকিস্তান কর্তৃপক্ষ বর্বর নৃশংস যুদ্ধ পরিচালনা করিয়াছে এবং এখনও বাংলাদেশের সামরিক ও নিরস্ত্র জনগণের বিরুদ্ধে নজিরবিহীন গণহত্যা ও নির্যাতন চালাইতেছেন।"

এবং

"যেহেতু পাকিস্তান সরকার অন্যায় যুদ্ধ ও গণহত্যা ও নানাবিধ নৃশংস অত্যাচার পরিচালনা দ্বারা বাংলাদেশের গণপ্রতিনিধিদের একত্রিত হইয়া শাসনতন্ত্র প্রণয়ন করিয়া জনগণের সরকার প্রতিষ্ঠা অসম্ভব করিয়া তুলিয়াছে।"

এবং

"যেহেতু বাংলাদেশের জনগণ তাহাদের বীরত্ব, সাহসিকতা ও বিপ্লবী কার্যক্রমের মাধ্যমে বাংলাদেশের উপর তাহাদের কার্যকরী কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করিয়াছে। সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকার বাংলাদেশের জনগণ নির্বাচিত

প্রতিনিধিদের প্রতি যে ম্যান্ডেট দিয়াছেন সেই ম্যান্ডেট মোতাবেক আমরা নির্বাচিত প্রতিনিধিরা আমাদের সমবায়ে গণপরিষদ গঠন করিয়া পারস্পরিক আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে বাংলাদেশের জনগণের জন্য সাম্য, মানবিক মর্যাদা ও সামাজিক ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করা আমাদের পবিত্র কর্তব্য– সেইহেতু আমরা বাংলাদেশকে রূপায়িত করার সিদ্ধান্ত ঘোষণা করিতেছি এবং উহা দ্বারা, পূর্বাহ্নে, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বাধীনতা ঘোষণা অনুমোদন করিতেছি।"

এতদ্বারা আমরা আরও সিদ্ধান্ত ঘোষণা করিতেছি যে, শাসনতন্ত্র প্রণীত না হওয়া পর্যন্ত বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান প্রজাতন্ত্রের রাষ্ট্রপ্রধান এবং সৈয়দ নজরুল ইসলাম উপ-রাষ্ট্রপ্রধান পদে অধিষ্ঠিত থাকিবেন।

রাষ্ট্রপ্রধান প্রজাতন্ত্রের সশস্ত্র বাহিনীসমূহের সর্বাধিনায়ক পদেও অধিষ্ঠিত থাকিবেন। রাষ্ট্রপ্রধানই সর্বপ্রকার প্রশাসনিক ও আইন প্রণয়নের ক্ষমতার অধিকারী।

রাষ্ট্রপ্রধানের প্রধানমন্ত্রী এবং মন্ত্রিসভার সদস্যদের নিয়োগের ক্ষমতা থাকিবে। তাঁহার কর ধার্য ও অর্থব্যয়ের ক্ষমতা থাকিবে। তাঁহার গণপরিষদের অধিবেশন আহ্বান ও উহার অধিবেশন মূলতবি ঘোষণার ক্ষমতা থাকিবে। উহা দ্বারা বাংলাদেশের জনসাধারণের জন্য আইনানুগ ও নিয়মতান্ত্রিক সরকার প্রতিষ্ঠার জন্য অন্যান্য প্রয়োজনীয় সকল ক্ষমতারও তিনি অধিকারী হইবেন।

বাংলাদেশের জনগণের দ্বারা নির্বাচিত প্রতিনিধি হিসাবে আমরা আরও সিদ্ধান্ত ঘোষণা করিতেছি যে, কোনো কারণে যদি রাষ্ট্রপ্রধান না থাকেন অথবা যদি রাষ্ট্রপ্রধান কাজে যোগদান করিতে না পারেন তাঁহার কর্তব্য ও প্রদত্ত সকল ক্ষমতা ও দায়িত্ব উপ-রাষ্ট্রপ্রধান পালন করিবেন।

আমরা আরও সিদ্ধান্ত ঘোষণা করিতেছি যে, বিশ্বের একটি জাতি হিসেবে এবং জাতিসংঘের সনদ মোতাবেক আমাদের যে দায়িত্ব ও কর্তব্য বর্তাইয়াছে উহা যথাযথভাবে আমরা পালন করিব।

আমরা আরও সিদ্ধান্ত ঘোষণা করিতেছি যে, আমাদের এই স্বাধীনতার ঘোষণা ১৯৭১ সালের ২৬শে মার্চ হইতে কার্যকর বলিয়া গণ্য হইবে।

আমরা আরও সিদ্ধান্ত ঘোষণা করিতেছি যে, আমাদের এই সিদ্ধান্ত কার্যকরের জন্য আমরা অধ্যাপক এম. ইউসুফ আলীকে যথাযথভাবে রাষ্ট্রপ্রধান ও উপ-রাষ্ট্রপ্রধানের শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠান পরিচালনার জন্য দায়িত্ব অর্পণ ও নিযুক্ত করিলাম।"

স্বাক্ষর

এম. ইউসুফ আলী

বাংলাদেশ গণপরিষদের পক্ষ থেকে

ভারপ্রাপ্ত রাষ্ট্রপতি সৈয়দ নজরুল ইসলাম ১৯৭১ সালের ১০ এপ্রিল অব্যাহত কার্যকর আদেশ জারি করেন। আদেশে বলা হয় যে, ১৯৭১ সালে ২৫ মার্চ যে সকল আইন কার্যকর ছিল তা কার্যকর থাকবে। তবে জনগণের ইচ্ছানুযায়ী আইন

পরিবর্তন করা যাবে।

শপথ অনুষ্ঠানের পর প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দীন আহমদ ১৭ এপ্রিল প্রেসে বিবৃতি দেন। তিনি বলেন, Bangladesh is at War. It has been given no choice but to secure its right of self-determination, through a national liberation struggle against the colonial oppression of West Pakistan.

বাংলাদেশ যুদ্ধ করছে। পশ্চিম পাকিস্তানের ঔপনিবেশিক নির্যাতনের বিরুদ্ধে। আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার আদায়ের জন্য জাতীয় মুক্তিযুদ্ধ ব্যতীত বিকল্প কোনো পথ ছিল না।

১৯৭১ সালের ১৮ এপ্রিল কলকাতায় পাকিস্তানের ডেপুটি হাইকমিশনার এম হোসেন আলী বাংলাদেশ সরকারের প্রতি আনুগত্য স্বীকার করেন। তার সাথে ৫ জন অফিসার এবং ৭০ জন বাঙালি কর্মচারী ছিল। কলকাতার হাইকমিশনার দপ্তরে বাংলাদেশ সরকারের অফিসে রূপান্তরিত হয়।

২০ এপ্রিল দিল্লির পাকিস্তান হাইকমিশনের অফিসে কূটনীতিবিদ কেএম শাহাবুদ্দিন ও আমজাদুল হক বাংলাদেশের প্রতি আনুগত্য স্বীকার করেন।

১৯৭১ সালের ২১ এপ্রিল বাংলাদেশ সরকার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরীকে লন্ডনে বিশেষ দূত নিয়োগ করে।

১৯৭১ সালের ২৬ মার্চ মুক্তিফৌজ গঠিত হয়। জুলাই মাসে মুক্তিফৌজের নামকরণ হয় মুক্তিবাহিনী।

কর্নেল এমএ রব এমএনএকে মুক্তিবাহিনীর চীফ অব স্টাফ নিয়োগ করা হয়। গ্রুপ ক্যাপ্টেন আবদুল করিম খন্দকারকে ডেপুটি চীফ অব স্টাফ নিয়োগ করা হয়।

বাংলাদেশ সরকারের সচিবালয় ছিল কলকাতার পার্ক সার্কাসে। প্রধানমন্ত্রীর অফিস ছিল পার্ক সার্কাস সোহরাওয়ার্দী ভবনে।

বাংলাদেশ সরকারের নির্দেশনাবলি

জনযুদ্ধের আশু সাফল্য অর্জনের উদ্দেশ্যে সরকার সম্প্রতি কতগুলো নির্দেশ জারি করেছে। নির্দেশাবলী :

- প্রতি শহর, গ্রাম, মহল্লায় একজন অধিনায়ক নির্বাচিত করে সমাজ জীবনে শৃঙ্খলা রক্ষা, অসহযোগ, প্রতিরোধ ও দুর্বার সংগ্রাম চালিয়ে যেতে হবে।
- শত্রুকে চিনতে হবে– দেশদ্রোহীকে শাস্তি প্রদানের ব্যবস্থা করতে হবে।
- গ্রামে গ্রামে রক্ষীবাহিনী গড়ে তুলতে হবে। শান্তিশৃঙ্খলা রক্ষার জন্য মুক্তিবাহিনীর সাথে প্রতিরোধ সংগ্রামে অংশগ্রহণ করতে হবে।
- সকল সামরিক, আধা-সামরিক, কর্মরত বা অবসরপ্রাপ্ত বাঙালি কর্মচারীরা নিকটতম মুক্তিসেনা শিবিরে যোগ দেবেন এবং কোনো অবস্থাতে শত্রুর সহযোগিতা করবেন না।

বিশেষ দায়িত্বে নেতৃবৃন্দ

এম এ মান্নান এমএনএ	তথ্য ও স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র
অধ্যাপক ইউসুফ আলী এমএনএ	মুক্তিবাহিনী ট্রেনিং ক্যাম্প
জহুর আহমদ চৌধুরী এমএনএ	রাজনৈতিক

বাংলাদেশ সরকারের সচিবালয়ের দায়িত্বে ছিলেন সাবেক সিএসপি ও ইপিসিএস কর্মকর্তাগণ

হোসেন তৌফিক ইমাম সিএসপি	মন্ত্রিপরিষদ সচিব
নুরুল কাদের খান সিএসপি	সংস্থাপন সচিব
খন্দকার আসাদুজ্জামান সিএসপি	অর্থ সচিব
এম এ সামাদ সিএসপি	প্রতিরক্ষা সচিব
মাহবুব আলম চাষী	পররাষ্ট্র সচিব
এমএ হান্নান, জেলা জজ, দিনাজপুর	সচিব, আইন
এমএ খালেক, আইজি পুলিশ	সচিব, স্বরাষ্ট্র
আনোয়ারুল হক খান	সচিব, তথ্য
নূরুদ্দিন	সচিব, কৃষি
ডা. টি হোসেন	স্বাস্থ্য

২৯ মে প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দীন আহমদ বলেন, বাংলাদেশের ৭৫ মিলিয়ন বাঙালির জন্য স্বাধীনতা ঘোষণা ব্যতীত আমাদের অন্য কোনো উপায় ছিল না।

১৯৭১ সালের ৬ জুন অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি সৈয়দ নজরুল ইসলাম নিম্নের চার দফার ভিত্তিতে রাজনৈতিক সমাধানের প্রস্তাব দেন।

১. বঙ্গবন্ধুসহ সকল রাজনৈতিক নেতাদের মুক্তি দান।
২. বাংলর মাটি থেকে হানাদার বাহিনীকে ফিরিয়ে নেয়া।
৩. স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দান।
৪. বাংলাদেশ থেকে লুণ্ঠিত সম্পদ ও বিগত আড়াই মাসে ক্ষতিপূরণ প্রদানের মাধ্যমে রাজনৈতিক সমাধান আসতে পারে।

প্রবাসী বাঙালিদের ভূমিকা

১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ পাকবাহিনীর গণহত্যার সংবাদ শুনে প্রবাসী বাঙালিরা স্বাধীনতা সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পরে, অর্থ সাহায্য ও জনমত সৃষ্টি করে। বাংলাদেশ সরকার ২১ এপ্রিল বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরীকে আন্তর্জাতিক দূত নিয়োগ করে। লন্ডনে তার দূতাবাস ছিল। লন্ডন, আমেরিকারসহ প্রায় দেশে বাঙালিদের আন্দোলন চলতে থাকে। মুক্তিযুদ্ধে তাদের ভূমিকা স্মরণীয় হয়ে আছে।

অধ্যায় ১৯

মুক্তিযুদ্ধ– সেক্টর ও আঞ্চলিক কাউন্সিল গঠন

আওয়ামী লীগ সরকার মুক্তিযুদ্ধ পরিচালনার জন্য বাংলাদেশকে ১১টি সেক্টরে বিভক্ত করে এবং মুক্তিযুদ্ধের সহায়তা ও বেসামরিক শাসন পরিচালনার জন্য বাংলাদেশে ১০টি আঞ্চলিক কাউন্সিল গঠন করে।

সেক্টরের নাম	এলাকা	সেক্টর প্রধানের নাম
সেক্টর-১	চট্টগ্রাম, পার্বত্য চট্টগ্রাম নোয়াখালীর একাংশ	মেজর জিয়াউর রহমান পরে মেজর রফিকুল ইসলাম
সেক্টর-২	নোয়াখালী, কুমিল্লা ফরিদপুর ও ঢাকার একাংশ	মেজর খালেদ মোশাররফ
সেক্টর-৩	কুমিল্লা, ঢাকা ও সিলেটের একাংশ	মেজর কাজী সফিউল্লাহ
সেক্টর-৪	সিলেট, হবিগঞ্জ	মেজর চিত্তরঞ্জন দত্ত
সেক্টর-৫	উত্তর সিলেট	মেজর মীর শওকত আলী
সেক্টর-৬	রংপুর, দিনাজপুরের একাংশ	উইং কমান্ডার এম কে বাশার
সেক্টর-৭	দিনাজপুরের একাংশ রাজশাহী, পাবনা ও বগুড়া	কর্নেল নুরুজ্জামান
সেক্টর-৮	কুষ্টিয়া, যশোর, খুলনার একাংশ	মেজর ওসমান চৌধুরী ও পরে মেজর মঞ্জুর
সেক্টর-৯	খুলনা, বরিশাল, পটুয়াখালী, ফরিদপুরের একাংশ	মেজর এম এ জলিল
সেক্টর-১০	সমগ্র বাংলাদেশের নদী বন্দর ও সমুদ্র উপকূল	নৌবাহিনীর নৌ কমান্ডো
স্কেটর-১১	ময়মনসিংহ, টাঙ্গাইল	মেজর আবু তাহের, উইং কমান্ডার হামিদুল্লাহ

প্রত্যেক সেক্টরকে সাব-সেক্টরে বিভক্ত করা হয়। সাব-সেক্টরের দায়িত্বে ছিলেন সেনাবাহিনীর একজন কমিশন্ড অফিসার, লে. অথবা ক্যাপ্টেন। পুনরায় সাব-সেক্টর বেইজ বা থানায় বিভক্ত করা হয়। প্রত্যেক থানা/বেইজে একজন নন-কমিশন্ড কর্মকর্তাকে কমান্ডার নিয়োগ করা হয়। মুক্তিবাহিনী দু'ভাগে বিভক্ত ছিল। নিয়মিত বাহিনী ও গেরিলা বাহিনী। নিয়মিত বাহিনী সীমান্ত এলাকায় পাকবাহিনীর সাথে যুদ্ধ করে। গেরিলা বাহিনী দেশের অভ্যন্তরে পাকবাহিনী ও রাজাকারদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে।

প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দীন আহমেদ ১৯৭১ সালের ১১-১৭ জুলাই কলকাতার ৮ নম্বর থিয়েটার রোডে সেক্টর কমান্ডারদের সম্মেলন আহ্বান করেন। সম্মেলনে মুক্তিযুদ্ধ শক্তিশালী করার লক্ষ্যে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। এ সম্মেলনে কর্নেল রব এমএনএ চীফ অব স্টাফ এবং গ্রুপ ক্যাপ্টেন এ কে খন্দকারকে ডেপুটি চীফ অব স্টাফ নিয়োগ করা হয়।

মুক্তিযুদ্ধকে পাঁচটি পর্বে বিভক্ত করা হয় :

১. ২৫ মার্চ থেকে মে পর্যন্ত স্বতঃস্ফূর্ত প্রতিরোধ, সমন্বয়ের অভাবে প্রতিরোধ ভেঙে পড়ে;
২. জুন-জুলাই, মুক্তিবাহিনী গঠন;
৩. আগস্ট-সেপ্টেম্বর, সমগ্র বাংলাদেশে নিয়মিত ও গেরিলা যুদ্ধ;
৪. অক্টোবর-নভেম্বর, পাকিস্তান সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে মুক্তিযোদ্ধাদের প্রচণ্ড যুদ্ধ ও সফলতা অর্জন;
৫. শেষ পর্ব ৩ ডিসেম্বর ১৬ ডিসেম্বর, পাক-ভারত যুদ্ধ, মুক্তিবাহিনী ও ভারতীয় বাহিনী নিয়ে মিত্র বাহিনী গঠন; যুদ্ধে বিজয় ও ১৬ ডিসেম্বর পাকবাহিনীর ৯০ হাজার সৈন্যের মিত্রবাহিনীর নিকট আত্মসমর্পণ।

১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধ ছিল নির্বাচিত সংসদ সদস্যদের নেতৃত্বে জনযুদ্ধ। মুক্তিযুদ্ধ পরিচালনার সার্বিক সহযোগিতা, মুক্তিযোদ্ধাদের প্রশিক্ষণ, শরণার্থীদের আশ্রয়, খাদ্য ও মুক্ত এলাকার প্রশাসন এবং দেশের অভ্যন্তরে মুক্তিযুদ্ধের সমন্বয়ের লক্ষ্যে সংসদ সদস্যদের নেতৃত্বে সমগ্র বাংলাদেশকে ১০টি অঞ্চলে বিভক্ত করা হয় :

আঞ্চলিক কাউন্সিলের নাম	আঞ্চলিক কাউন্সিলের চেয়ারম্যান
১. পূর্ব-দক্ষিণ অঞ্চল-১ চট্টগ্রাম, পার্বত্য চট্টগ্রাম ও ফেনী মহকুমা	নূরুল ইসলাম চৌধুরী, এমএনএ

২.	পূর্ব-দক্ষিণ অঞ্চল-২ ঢাকা, কুমিল্লা ও নোয়াখালী	জহুর আহমদ চৌধুরী, এমএনএ
৩.	পূর্ব অঞ্চল হবিগঞ্জ, মৌলভীবাজার	কর্নেল এম এ রব এমএনএ
৪.	উত্তর-পূর্ব অঞ্চল-১ সিলেট, সুনামগঞ্জ	দেওয়ান ফরিদ গাজী এমএনএ
৫.	উত্তর-পূর্ব অঞ্চল-২ ময়মনসিংহ, টাঙ্গাইল	শামসুর রহমান খান এমএনএ
৬.	উত্তর অঞ্চল-রংপুর	মতিয়ুর রহমান এমএনএ
৭.	পশ্চিম অঞ্চল-১-দিনাজপুর	আব্দুর রহিম এমএনএ
৮.	পশ্চিম অঞ্চল-২ রাজশাহী	আশরাফুল ইসলাম এমপিএ
৯.	দক্ষিণ পশ্চিম অঞ্চল-১ কুষ্টিয়া	আব্দুর রউফ চৌধুরী এমপিএ
১০.	দক্ষিণ পশ্চিমাঞ্চল-১ যশোর, ফরিদপুর	ফণীভূষণ মজুমদার এমপিএ
১১.	দক্ষিণ অঞ্চল খুলনা, বরিশাল, পটুয়াখালী	আব্দুর রব সেরনিয়াবাত এমএনএ

সকল এমএনএ ও এমপিএ স্ব স্ব আঞ্চলিক কাউন্সিলের সদস্য ছিলেন। প্রত্যেক অঞ্চলে আঞ্চলিক দপ্তর ছিল এবং দপ্তরে একজন সিএসপি বা ইপিসিএস কর্মকর্তা প্রশাসনিক ককর্মকর্তা হিসেবে কাজ করতেন। আঞ্চলিক কাউন্সিলের দপ্তরগুলো ভারতের সীমান্ত এলাকায় অবস্থিত ছিল।

মুক্ত এলাকা বৃদ্ধি ও রিফিউজির সংখ্যা দ্রুত বেড়ে যাওয়ায় বেসামরিক প্রশাসনের প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। জুন মাসে সীমান্ত এলাকায় প্রশাসনিক কাঠামো গড়ে তোলা হয়। মুজিবনগর সরকার গঠনের পর জুন মাসে ৫টি আঞ্চলিক প্রশাসনিক পরিষদ গঠন করা হয়। তাদের দায়িত্ব নির্ধারণ করা হয়। জুলাই মাসে ৯টি এবং আগাস্ট মাসে ১১টি আঞ্চলিক প্রশাসনিক পরিষদে উন্নীত হয়। প্রত্যেক অঞ্চলের নির্বাচিত সদস্যগণ চেয়ারম্যান নির্বাচন করতেন এবং প্রত্যেক অঞ্চলে একজন প্রশাসনিক কর্মকর্তা নিয়োগ করা হয়। পরিষদের কার্য পরিচালনার জন্য আরো কর্মকর্তা ও কর্মচারী নিয়োগ করা হয় এবং মুজিবনগর সরকার তাদের ভাতা প্রদান করে। মুক্তিযোদ্ধাদের মধ্যে নিয়মিত বাহিনীর অফিসার ও জওয়ানরা ভাতা পেতেন। ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধে মেজর জিয়াসহ সকল কমান্ডার মুজিবনগর সরকারের কর্মকর্তা ছিলেন। রাজনৈতিক নেতা, কর্মী

ও আমলারা আঞ্চলিক প্রশাসন পরিচালনায় দক্ষতার পরিচয় দেন। চট্টগ্রামের আওয়ামী লীগ নেতা এম এ হান্নান আগরতলায় প্রশাসন প্রতিষ্ঠায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। মুজিবনগর সরকার পরিচালনায় ব্যারিস্টার আমীর-উল ইসলাম এমএনএ প্রধানমন্ত্রীর প্রধান উপদেষ্টা হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। ব্যারিস্টার মওদুদ আহমদ বিদেশীদের দেখাশুনা করতেন। প্রধানমন্ত্রীর আরেকজন সহায়তাকারী ছিলেন মজিদুল হাসান। আব্দুস সামাদ আজাদ এমএনএ প্রচার ও বেতারের দায়িত্বে ছিলেন। চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধ্যক্ষ আজিজুর রহমান মল্লিক এবং সৈয়দ আব্দুস সুলতান এমএনএ সরকারের উপদেষ্টা হিসেবে সহায়তা করতেন। রাষ্ট্রদূত আবুল ফাত্তাহ এবং আবদুল মোমেন পাকিস্তান দূতাবাস ত্যাগ করে বাংলাদেশের প্রতি আনুগত্য স্বীকার করেন এবং তারা অস্থায়ী রাষ্ট্রের উপদেষ্টা হিসেবে কাজ করতেন। এমআর আখতার মুকুল, আব্দুল গাফ্ফার চৌধুরী, আলমগীর কবির, কবি আসাদ চৌধুরী পাকিস্তান সামরিক সরকার ও দালালদের বিরুদ্ধে প্রচার অভিযান চালান। এম আর আখতার মুকুল প্রত্যেক দিন বাংলাদেশ বেতার থেকে চরমপত্র পাঠ করে যুদ্ধরত জাতিকে প্রেরণা যুগিয়েছেন। জহির রায়হান, শিল্পী কামরুল হাসান, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধ্যক্ষ মাজহারুল ইসলাম, সৈয়দ আলী হাসান প্রমুখ স্বাধীনতা সংগ্রামে তাদের দায়িত্ব পালনের মধ্য দিয়ে বিশেষ অবদান রাখেন।

কলকাতায় পার্ক সার্কাস মন্ত্রিসভার সদর দপ্তর ও সেনাবাহিনীর দপ্তর অবস্থিত ছিল। অনেক বেসামরিক কর্মকর্তা-কর্মচারী পূর্ব পাকিস্তান সরকারি দপ্তর পরিত্যাগ করে সীমান্ত অতিক্রম করে মুক্তিযুদ্ধে অংশ নেয়। পশ্চিম পাকিস্তান থেকে অনেক কর্মকর্তা পালিয়ে এসে মুজিবনগর সরকারে যোগ দেন।

২৫ মার্চ রাতে পাকবাহিনী রাজারবাগ পুলিশ লাইন এবং পিলখানা ইপিআর ক্যাম্প আক্রমণ করে। তখন বাংলাদেশের ১৫ হাজার ইপিআর ও চল্লিশ হাজার পুলিশ ছিল। ইপিআর ও পুলিশ পাকবাহিনীর বিরুদ্ধে প্রাথমিক প্রতিরোধ গড়ে তোলে। এ সময় ইপিআরের ভূমিকা ছিল দুঃসাহসিক। বঙ্গবন্ধুর আহ্বানে সারা দেশের ইপিআর মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করে। পুলিশ প্রাথমিক প্রতিরোধের পরে অনেকে পুনরায় চাকরিতে যোগ দেয় এবং একাংশ মুক্তিযুদ্ধে অংশ নেয়। বাংলাদেশের সকল থানায় বাঙালি পুলিশদের দিয়ে সামরিক সরকার আংশিক হলেও প্রত্যেক থানায় কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হয়। তাদের সহায়তায় সামরিক সরকার রাজাকার বাহিনী গঠন করে। আনসার ও মুজাহিদ বাহিনী মুক্তিযুদ্ধে অসীম সাহসের পরিচয় দেয়।

পাক সেনারা প্রথমে ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টকে নিরস্ত্র করার চেষ্টা করলে

তারা বিদ্রোহ করে। বাংলাদেশে তাদের ছয়টি নিয়মিত ব্যাটালিয়ন ছিল। অসহযোগ আন্দোলনকালে পাকবাহিনী অনেক নিরস্ত্র বাঙালিকে হত্যা করে। এ সময় বাঙালি সৈন্যদের মধ্যে বিদ্রোহের ভাব সৃষ্টি হতে থাকে। ২৫ মার্চ অপারেশন সার্চলাইট শুরু করলে তাৎক্ষণিকভাবে বাঙালি সৈন্যরা চট্টগ্রাম, ব্রাহ্মণবাড়িয়া, যশোর, কুষ্টিয়া ও রংপুরে বিদ্রোহ করে এবং মুক্তিযুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ে।

ঢাকা সেনানিবাসে পাকিস্তান বাহিনীর ১৪তম ডিভিশন অবস্থান করছিল। ১৫ এপ্রিলের মধ্যে নবম ও ষোলোতম ডিভিশনকে পশ্চিম পাকিস্তান থেকে পূর্ব পাকিস্তানে নিয়ে আসে। ঢাকায় ৪৭ ব্রিগেড, রংপুরে ২৩ ব্রিগেড ও কুমিল্লায় ৫৩ ব্রিগেডের অবস্থান ছিল। এ সকল ডিভিশনে মোট ১২টি ইনফ্যান্ট্রি ব্যাটালিয়ন, ১টি আর্মড রেজিমেন্ট, একটি কমান্ডো ব্যাটালিয়ন, ৫টি ফিল্ড রেজিমেন্ট আর্টিলারি ও ১টি ১২০ মিলিমিটার মর্টার রেজিমেন্ট ছিল। ৯ম ডিভিশনকে কুমিল্লা-সিলেট এলাকায় এবং ১৬ ডিভিশনকে উত্তর বাংলায় নিয়োগ করা হয়। ১৪তম ডিভিশনকে ঢাকা, ময়মনসিংহ, ফরিদপুর, যশোর ও খুলনার দায়িত্বে দেয়া হয়। পরে পাকবাহিনী ৩৬ ও ৩৯ ডিভিশন গঠন করে। এছাড়া পশ্চিম পাকিস্তান পুলিশ দেশীয় রাজাকার, আলবদর, আল শামস মিলিয়ে প্রায় ৫০ হাজার আধা সামরিক বাহিনী পাকিস্তানি সৈন্যদের সাথে ছিল।

মুক্তিবাহিনী প্রাথমিক বিপর্যয়ের পরে পুনরায় অস্ত্রে সজ্জিত হয়ে পাক বাহিনীর বিরুদ্ধে সর্বাত্মক আক্রমণের জন্য সীমান্ত এলাকায় ঘাঁটি স্থাপন করে। ১৭ এপ্রিল মেহেরপুরের বৈদ্যনাথতলায় স্বাধীন বাংলাদেশ গঠন করার পর মুক্তিযুদ্ধ আরও তীব্র হতে থাকে। প্রথম পর্যায়ে বাংলাদেশকে চারটি সেক্টরে বিভক্ত করা হয়। চট্টগ্রাম সেক্টরে কমান্ডার মেজর জিয়া, কুমিল্লা সেক্টরে মেজর আবু ওসমান চৌধুরীকে দায়িত্ব প্রদান করা হয়। মুক্তিবাহিনীর সদর দপ্তর স্থাপিত হয় কলকাতার ৮ নম্বর থিয়েটার রোডে। লে. কর্নেল রবকে চীফ অব স্টাফ এবং গ্রুপ ক্যাপ্টেন এ কে খন্দকারকে ডেপুটি চীফ অব স্টাফ নিয়োগ করা হয়।

১৯৭১ সালের ১১ জুলাই প্রধানমন্ত্রীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভায় বাংলাদেশকে ১১টি সেক্টরে বিভক্ত করা হয় এবং রাজনৈতিক বেসামরিক সহায়তার জন্য নির্বাচিত সদস্যদের নেতৃত্বে ১০টি অঞ্চলে বিভক্ত করা হয়। এ সভায় ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের সৈন্যদের নিয়ে তিনটি ব্রিগেড গঠন করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

মুক্তিবাহিনীর প্রথম ব্রিগেড ৭ জুলাই মেজর জিয়ার নেতৃত্বে গঠিত হয়। তার নামের প্রথম অক্ষর দিয়ে ব্রিগেডের নামকরণ হয় জেড ফোর্স। প্রথম, তৃতীয় ও অষ্টম ইস্ট বেঙ্গলের সমন্বয়ে জেড ফোর্স ব্রিগেড গঠিত হয়। মেজর মইনুল হাসান

প্রথম ইস্ট বেগম ব্যাটালিয়নের অধিনায়ক নিযুক্ত হন। পরে মেজর জিয়াউদ্দিন পাকিস্তান থেকে পালিয়ে এসে প্রথম বেঙ্গলের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। প্রথম বেঙ্গলের অন্যান্য অফিসারের মধ্যে ছিলেন ক্যাপ্টেন বজলুল গনি পাটওয়ারী, ফ্লাইট লে. লিয়াকত আলী খান, ক্যাপ্টেন মাহবুব, ক্যাপ্টেন হাফিজ, ক্যাপ্টেন কাইয়ুম, লে. আনিস ও লে. ওয়াকার। তৃতীয় ইস্ট বেঙ্গল ব্যাটালিয়নের অধিনায়ক ছিলেন মেজর শাফায়াত জামিল। অন্যান্য অফিসার ছিলেন ক্যাপ্টেন মহসিন, ক্যাপ্টেন আনোয়ার, ক্যাপ্টেন আকবর, লে. নুরুন্নবী, লে. মঞ্জুর, লে. ফজলে হোসেন, ফ্লাইট লে. আশরাফুল আলম। মেজর আমিনুল হক অষ্টম ইস্ট বেঙ্গলের অধিনায়ক ছিলেন। অফিসারদের মধ্যে ছিলেন ক্যাপ্টেন খালেকুজ্জামান চৌধুরী, লে. মাহবুব, লে. এমদাদ, লে. মুনির, লে. ওয়ালী, লে. বাকের। জেড ফোর্স কামালপুর, বাহাদুরাবাদ, চিলমারী, গোবিন্দগঞ্জ ও নকশী বিওপি আক্রমণে বিশেষ সাফল্য অর্জন করে।

নবম, দশম ও চতুর্থ বেঙ্গল নিয়ে ৭ অক্টোবর গঠিত হয় 'কে ফোর্স'। কে ফোর্সের অধিনায়ক খালেদ মোশাররফের নামের প্রথম অক্ষর দিয়ে এ ব্রিগেডের নামকরণ করা হয়। ক্যাপ্টেন আইনউদ্দিন, ক্যাপ্টেন মাহবুব, লে. হারুন, লে. কবীর, ক্যাপ্টেন গাফ্ফার, মেজর সালেক চৌধুরী, লে. দিদার, ক্যাপ্টেন আকবর, ক্যাপ্টেন ইমাম, ক্যাপ্টেন শহীদ, লে, ইমামুজ্জামান, মেজর মতিন, মেজর হায়দার, লে. মিজান, লে. দিদারুল আলম 'কে' ফোর্সে যুদ্ধ করেছেন। বেলোনিয়া, মন্দাভাগ, শালদা ও কসবা যুদ্ধে 'কে' ফোর্স বীরত্বের পরিচয় দেয়।

অক্টোবর মাসে 'এস ফোর্স' গঠন করা হয়। মেজর শফিউল্লাহ এস ফোর্সের অধিনায়ক নিযুক্ত হন। তার নামের প্রথম অক্ষর অনুসারে এস ফোর্সের নামকরণ করা হয়। এস ফোর্সের অফিসারদের মধ্যে ছিলেন মেজর মইনুল হাসান চৌধুরী, লে. সাইদ, লে. আবুল হোসেন, মেজর মতিয়ুর রহমান, লে. আমিনুল ইসলাম, লে. বদিউজ্জামান, লে. সেলিম, লে. ইব্রাহিম, মেজর নাসিম, ক্যাপ্টেন সুবিদ আলী ভুঁইয়া, লে. নজরুল, লে. নাসের ও মেজর নুরুল হান্নান।

'জেড ফোর্স', 'এস ফোর্স', 'কে ফোর্স' ছিল নিয়মিত বাহিনী। মেজর জিয়া 'জেড' ফোর্সের দায়িত্বে ছিলেন। এ ছাড়া হাজার হাজার প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ছাত্র, যুবক, কৃষককে নিয়ে গেরিলা বাহিনী বা অনিয়মিত বাহিনী গঠন করা হয়। তারা দেশের অভ্যন্তরে যুদ্ধ করে পাকসেনা ও রাজাকারদের পর্যুদস্ত করে।

আঞ্চলিক বাহিনী

দেশের অভ্যন্তরে টাঙ্গাইলে কাদের সিদ্দিকীর নেতৃত্বে, হাবিলদার হেমায়েতের

নেতৃত্বে গোপালগঞ্জে, মির্জা লতিফের নেতৃত্বে সিরাজগঞ্জে মুক্তিবাহিনী পাকি বাহিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে কৃতিত্বের পরিচয় দেয়।

বাংলাদেশ বিমানবহিনী

১৯৭১ সালের ২৮ সেপ্টেম্বর ভারতের নাগাল্যান্ডের ডিমাপুরে গ্রুপ ক্যাপ্টেন এ কে খোন্দকারের নেতৃত্বে বাংলাদেশ বিমানবাহিনীর জন্ম হয়। মাত্র কয়েকটি ডাকোটা, অটার এলুভেট হেলিকপ্টার নিয়ে প্রশিক্ষণ শুরু হয়। বাংলাদেশ বিমান বাহিনীর অফিসারদের মধ্যে ছিলেন স্কোয়াড্রন লিডার শামসুল আলম, ক্যাপ্টেন আকরম, ফ্লাইট লে. বদরুল আলম, ক্যাপ্টেন শাহাবুদ্দিন, ক্যাপ্টেন শরফুদ্দিন, মুক্তি ও সারওয়ারসহ ৬৭ জন। ৩ ডিসেম্বর যুদ্ধ শুরু হলে বাংলাদেশ বিমানবাহিনী আকাশযুদ্ধে দক্ষতার পরিচয় দেয়। ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধে বাংলাদেশ নৌবাহিনী গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

এক নম্বর সেক্টর– চট্টগ্রাম-পার্বত্য চট্টগ্রাম

চট্টগ্রাম-পার্বত্য চট্টগ্রাম জেলা ও নোয়াখালী জেলার মুহুরী নদীর পূর্ব পর্যন্ত এক নম্বর সেক্টর অন্তর্ভুক্ত ছিল। সেক্টর কমান্ডার ছিলেন মেজর রফিকুল ইসলাম। এক নম্বর সেক্টর ৫টি সাব সেক্টরে বিভক্ত ছিল।

সাব সেক্টর	কমান্ডার
ঋষিমুখ	ক্যাপ্টেন শামসুল ইসলাম
শ্রীনগর	ক্যাপ্টেন অলি আহমেদ পরে ক্যাপ্টেন মতিউর রহমান
মনুঘাট	ক্যাপ্টেন মাহফুজুর রহমান
তবলছড়ি	সুবেদার আলী হোসেন
ডিমাগিরী	একজন সুবেদার

সেক্টর হেডকোয়ার্টার ছিল হবিনাতে। সেক্টর কমান্ডার হিসেবে মেজর রফিকুল ইসলাম নিষ্ঠার সাথে দায়িত্ব পালন করেন। সেক্টরের অ্যাডজুট্যান্ট ছিলেন ক্যাপ্টেন নাজমুল হক। সংসদ সদস্য এম এ হান্নান, এম এ মান্নান, মনসুর, ফ্লাইট লে. সুলতান, হাবিলদার সিরাজুল ইসলাম এফএফ গেরিলা বাহিনী গঠন এবং অভ্যন্তরে প্রেরণের দায়িত্ব পালন করেন। সেক্টরের নিয়মিত মুক্তিবাহিনীর সংখ্যা ছিল দু'হাজার। তাদের মধ্যে ১৪০০ ইপিআর, ২০০ পুলিশ, ৩০০ সেনাবাহিনী এবং ১০০ বিমান ও নৌবাহিনীর সদস্য ছিল। গেরিলা বাহিনীর সংখ্যা ছিল প্রায় আট হাজার। এক নম্বর সেক্টরে মুক্তিবাহিনীর সংখ্যা ছিল প্রায় দশ হাজার। চাঁদগাজী, হিয়াকুব, করুইয়া, ছাগলনাইয়া, সালিয়া দিঘি ও বেলুনিয়া যুদ্ধে এক

নম্বর সেক্টরের মুক্তিযোদ্ধারা কৃতিত্বের পরিচয় দেয়। বেলুনিয়া যুদ্ধে ৪ নভেম্বর ঋষিমুখ সাব-সেক্টর কমান্ডার ক্যাপ্টেন শামসুল ইসলাম শহীদ হন।

দু'নম্বর সেক্টর নোয়াখালী-কুমিল্লা

নোয়াখালী, আখাউড়া-ভৈরব রেললাইন পর্যন্ত কুমিল্লা জেলা, সিলেটের হবিগঞ্জ, ঢাকা ও ফরিদপুরের একাংশ নিয়ে দু'নম্বর সেক্টর গঠিত ছিল। সেক্টর কমান্ডার ছিলেন মেজর খালেদ মোশাররফ। এ সেক্টরে নিয়মিত সৈন্য ছিল ৬০০০ এবং ৩৫ হাজার গেরিলা ছিল। নিয়মিত বাহিনীর তিনটি ব্যাটালিয়ন ছিল যা পরবর্তীতে কে ফোর্সে উন্নীত হয়। ৪র্থ, ৯ম, ১০ম ইস্ট বেঙ্গল নিয়ে কে ফোর্স গঠিত হয়।

দু'নম্বর সেক্টর ৬টি সাব-সেক্টরে বিভক্ত ছিল–

১. গঙ্গাসাগর, আখাউড়া ও কসবা সাব-সেক্টর, সেক্টর কমান্ডার- ক্যাপ্টেন আইনউদ্দিন, অফিসারদের মধ্যে ছিলেন ক্যাপ্টেন মাহবুব, লে. ফারুক এবং লে. হুমায়ুন কবীর। কসবা, আখাউড়া, সাইদাবাদ, মুরাদনগর, নবীনগর এবং ব্রাহ্মণবাড়িয়া যুদ্ধে বীরত্বের পরিচয় দেয়।
২. মন্দাবাগ সাব-সেক্টর, কমান্ডার ক্যাপ্টেন গাফফার।
৩. সালদা নদী সাব-সেক্টর, কমান্ডার মেজর আব্দুস সালেক চৌধুরী।
৪. মালিগর সাব-সেক্টর, কমান্ডার লে. দিদারুল আলম।
৫. নির্ভয়পুর সাব-সেক্টর, কমান্ডার ক্যাপ্টেন আকবর এবং লে. মাহবুব।
৬. রাজনগর সাব-সেক্টর, গোমতীর সর্বদক্ষিণে কমান্ডার ক্যাপ্টেন জাফর ইমাম।

মেজর খালেদ মোশাররফ ব্রিগেডের দায়িত্বে ছিলেন এবং মেজর মতিনের ওপর সেক্টরের দায়িত্ব দেয়া হয়। খালেদ মোশাররফের নামানুসারে এই ব্রিগেডের নামকরণ করা হয় কে ফোর্স। ১৯৭১ সালের ২২ অক্টোবর কসবা যুদ্ধে মেজর খালেদ মোশাররফ গুরুতররূপে আহত হলে 'কে ফোর্সের' দায়িত্ব দেয়া হয় মেজর সালেকের ওপর। পরে দায়িত্ব দেয়া হয় মেজর হায়দারকে। দুই নম্বর সেক্টরের তৎপরতা জুলাই মাস থেকে শুরু হয়। দুনম্বর সেক্টরে বেলোনিয়া, মন্দাবাগ, সালদা নদীর যুদ্ধে মুক্তিযোদ্ধারা পাক বাহিনীকে বার বার পর্যুদস্ত করে। এ সকল যুদ্ধে মেজর খালেদ মোশাররফ, ক্যাপ্টেন গাফ্ফার, ক্যাপ্টেন জাফর, ক্যাপ্টেন হায়দার অপূর্ব রণকৌশল প্রদর্শন করেন।

তিন নম্বর সেক্টর-সিলেট

সিলেটের মৌলভীবাজার মহকুমার অংশ, হবিগঞ্জ মহকুমা, ব্রাহ্মণবাড়িয়া

মহকুমার অংশ, নারায়ণগঞ্জ মহকুমার অংশ এবং কিশোরগঞ্জ মহকুমার অংশ নিয়ে তিন নম্বর সেক্টর গঠিত ছিল। মেজর এম সফিউল্লাহ তিন নম্বর সেক্টরের কমান্ডার ছিলেন। তিন নম্বর সেক্টরের হেডকোয়ার্টার ছিল হেজামারাতে। এই সেক্টরে নভেম্বর পর্যন্ত গেরিলা যোদ্ধার সংখ্যা দাঁড়ায় ৩০ হাজারে। সেক্টরের অধীনে ১০টি সাব-সেক্টর ছিল।

১. আশ্রমবাড়ী সাব-সেক্টর
২. বাঘাইবাড়ী সাব-সেক্টর, কমান্ডার ক্যাপ্টেন আজিজ
৩. হাতকাটা সাব-সেক্টর, কমান্ডার ক্যাপ্টেন মতিউর রহমান
৪. পঞ্চবটি সাব-সেক্টর, কমান্ডার ক্যাপ্টেন নাসিম
৫. মনতকলা সাব-সেক্টর
৬. বিজয়নগর সাব-সেক্টর, ক্যাপ্টেন এম এস এ ভুইয়া
৭. কারাছড়া সাব-সেক্টর, কমান্ডার লে. কর্নেল মজুমদার
৮. কলকলিয়া সাব-সেক্টর, কমান্ডার লে. মোরশেদ
৯. বামুটিয়া সাব-সেক্টর, কমান্ডার লে. সাইদ।

মেজর সফিউল্লাহর নামানুসারে সেক্টরের সাথে এস ফোর্সের জন্ম হয়। মেজর সফিউল্লাহ ব্রিগেডের দায়িত্ব গ্রহণের পর মেজর নুরুজ্জামান (আগরতলা মামলার আসামি) সেক্টর কমান্ডারের দায়িত্বে নিযুক্ত হন। এস ফোর্সের দুটি নিয়মিত বাহিনী ছিল। দ্বিতীয় ইস্ট বেঙ্গল এবং ১১তম বেঙ্গল রেজিমেন্ট। দ্বিতীয় ব্যাটেলিয়নের কমান্ডিং অফিসার ছিলেন মেজর মইনুল হোসেন চৌধুরী, ১১তম ইস্ট বেঙ্গলের অধিনায়ক ছিলেন মেজর নাসিম। তিন নম্বর সেক্টর তেলিয়াপাড়া ও আখাউড়া যুদ্ধে পাকবাহিনী বার বার পর্যুদস্ত হয়েছে।

চার নম্বর সেক্টর-সিলেট

সিলেট জেলার পূর্বাঞ্চল পূর্ব ও উত্তর দিকে সিলেটের ডাউকি সড়ক পর্যন্ত প্রায় ১০০ মাইল এলাকা নিয়ে গঠিত। উত্তরে হবিগঞ্জ মহকুমা থেকে দক্ষিণে কানাইঘাট থানা পর্যন্ত এই সেক্টর বিস্তৃত ছিল। এই এলাকার পাহাড় ও চা বাগান ছিল গেরিলা যুদ্ধের জন্য নিরাপদ স্থান। সেক্টর কমান্ডার ছিলেন মেজর চিত্তরঞ্জন দত্ত। চার নম্বর ৬টি সাব-সেক্টরে বিভক্ত ছিল :

১. জামালপুর সাব-সেক্টর, কমান্ডার মাসুদুর রব শাদী
২. বড়পুটি সাব-সেক্টর, কমান্ডার ক্যাপ্টেন এ রব
৩. আমলাসিদ সাব-সেক্টর, কমান্ডার ফ্লাইট লে. জহির
৪. কৈলাশ শহর সাব-সেক্টর, কমান্ডার লে. ওয়াকিউজ্জামান

৫. কুকিতলা সাব-সেক্টর, কমান্ডার ফ্লাইট লে. কাদের
৬. কমলাপুর সাব-সেক্টর, কমান্ডার ক্যাপ্টেন এনাম।

চার নম্বর সেক্টরে নিয়মিত বাহিনী ছিল ৪ হাজার এবং ৯ হাজার ছিল গেরিলা। হেডকোয়ার্টার প্রথমে আসামের করিমগঞ্জ, পরে নাসিমপুরে। চার নম্বর সেক্টরের মুক্তিবাহিনী বিয়ানীবাজার, বড়লেখা, জকিগঞ্জ ও কানাইঘাট যুদ্ধে প্রাধান্য বজায় রাখে।

পাঁচ নম্বর সেক্টর

পাঁচ নম্বর সেক্টর এলাকা ছিল সিলেট জেলার পশ্চিমাঞ্চল। সিলেট ডাউকি সড়ক থেকে সুনামগঞ্জ-ময়মনসিংহ সড়ক পর্যন্ত। সেক্টর কমান্ডার ছিলেন মেজর মীর শওকত আলী। এ সেক্টর ৫টি সাব-সেক্টরে বিভক্ত ছিল :

১. মুক্তাপুর সাব-সেক্টর, সুবেদার নাজির হোসেন
২. ডাউকি সাব-সেক্টর, কমান্ডার সুবেদার মেজর বি. আর চৌধুরী
৩. শেলা-সাব-সেক্টর, কমান্ডার ক্যাপ্টেন হেলাল
৪. ভোলাগঞ্জ সাব-সেক্টর, কমান্ডার লে তাহেরউদ্দিন
৫. বালাট সাব-সেক্টর, কমান্ডার সুবেদার গনি, পরে ক্যাপ্টেন সালাউদ্দিন
৬. বড়ছড়া সাব-সেক্টর, কমান্ডার মুসলিম উদ্দিন

সেক্টর এ্যাডজুট্যান্ট ছিলেন চা বাগানের ম্যানেজার মোস্তফা। সেক্টর হেডকোয়ার্টার ছিল বাঁশতলাতে। মুক্তিবাহিনীর সংখ্যা ছিল ১০ হাজার। তার মধ্যে ১ হাজার ছিল নিয়মিত বাহিনী। সুরমা নদী, ছাতক, রাধানগর, টেংরা টিলার যুদ্ধে পাকবাহিনী পর্যুদস্ত হয়।

ছয় নম্বর সেক্টর রংপুর-ঠাকুরগাঁও

বৃহত্তর রংপুর ও দিনাজপুর জেলার ঠাকুরগাঁও মহকুমা নিয়ে ৬ নম্বর সেক্টর গঠিত ছিল। উইং কমান্ডার এম কে বাশার সেক্টর কমান্ডার ছিলেন। ৬ নম্বর সেক্টর ৫টি সাব-সেক্টরে বিভক্ত ছিল :

১. উজানপুর সাব-সেক্টর, কমান্ডার ক্যাপ্টেন নজরুল এবং পরে স্কোয়াড্রন লিডার সদরউদ্দিন
২. পাটগ্রাম সাব-সেক্টর, কমান্ডার ক্যাপ্টেন মতিয়ুর রহমান
৩. সাহেবগঞ্জ সাব-সেক্টর, কমান্ডার ক্যাপ্টেন নওয়াজেশ উদ্দিন
৪. মোগলহাট সাব-সেক্টর, কমান্ডার দেলওয়ার হোসেন
৫. চিলাহাটি সাব-সেক্টর, কমান্ডার ফ্লাইট লে. ইকবাল।

৬ নম্বর সেক্টরের মোট সৈন্য সংখ্যা ছিল ১১ হাজার। তার মধ্যে ১০০০ ছিল ইপিআর। সেক্টর হেডকোয়ার্টার ছিল বুড়িমারীতে। এই সেক্টরের ৬০০ বর্গমাইল সব সময় মুক্ত ছিল এবং স্বাধীন বাংলাদেশ সরকারের প্রশাসন ছিল। প্রধান যুদ্ধক্ষেত্র ছিল পাটগ্রাম, নাগেশ্বরী, ভুরুঙ্গামারী।

সাত নম্বর সেক্টর– রাজশাহী-পাবনা-বগুড়া

রাজশাহী, পাবনা, বগুড়া ও দিনাজপুরের দক্ষিণাংশ নিয়ে ৭ নম্বর সেক্টর গঠিত ছিল। চাঁপাইনবাবগঞ্জে অবস্থানরত ৬ নম্বর উইং, দিনাজপুরের ৮ নম্বর উইং এবং নওগাঁর ৭ নম্বর উইং এবং রাজশাহী, দিনাজপুরের হেডকোয়ার্টারের ইপিআর এ সেক্টরে যুদ্ধ করেছে। ক্যাপ্টেন আনোয়ার ও সুবেদার আব্দুর রব প্রাথমিক পর্যায়ে কিছুদিন সেক্টরের দায়িত্ব পালন করেন। পরে মুজিবনগর সরকার উইং কমান্ডার নাজমুল হককে সেক্টর কমান্ডার নিযুক্ত করে। মুজিবনগরে অনুষ্ঠিত সম্মেলন শেষে ফেরার পথে জীপ দুর্ঘটনায় তিনি নিহত হন। পরে অবসরপ্রাপ্ত মেজর কাজী নুরুজ্জামানকে সেক্টরের দায়িত্ব দেয়া হয়। যুদ্ধকালে মেজর নুরুজ্জামান পদোন্নতি পেয়ে কর্নেল হন।

সাত নম্বর সেক্টর আটটি সাব-সেক্টরে বিভক্ত ছিল :

১. মালন সাব-সেক্টর, ইপিআর জেসিও
২. তপান সাব-সেক্টর, ইপিআর জেসিও
৩. মেহদীপুর, সুবেদার ইলিয়াস এবং পরে ক্যাপ্টেন মহিউদ্দিন জাহাঙ্গীর
৪. ভোলাহাট, লে. রফিকুল ইসলাম
৫. হামজাপুর, ক্যাপ্টেন ইদ্রিস
৬. আংশিনাবাদ, গণবাহিনীর সদস্য
৭. ঠোকরাবাড়ি, সুবেদার মোয়াজ্জেম
৮. লালগোলা, ক্যাপ্টেন গিয়াসউদ্দিন চৌধুরী

আট নম্বর সেক্টর– যশোর-কুষ্টিয়া

কুষ্টিয়া, যশোর, ফরিদপুর ও খুলনার একাংশ নিয়ে ৮ নম্বর সেক্টর গঠিত। চুয়াডাঙ্গার ৪ নম্বর, খুলনার ৫ ও ১৫ নম্বর উইং-এর ইপিআর ৮ নম্বর সেক্টরে যুদ্ধ করেছে।

মেজর ওসমান চৌধুরী ১৮ আগস্ট পর্যন্ত এই সেক্টরের দায়িত্বে ছিলেন। তার কাছ থেকে পাকিস্তান থেকে পালিয়ে এসে মেজর মঞ্জুর সেক্টরের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। সেক্টরের সৈন্যবাহিনী ছিল ২ হাজার এবং গণবাহিনী সদস্য ছিল ৮

হাজার। সেক্টর হেডকোয়ার্টার বেনাপোলে থাকলেও এর একাংশ কল্যাণী শহরে অবস্থিত ছিল।

আট নম্বর সেক্টরের অধীনে ৭টি সাব-সেক্টর ছিল

১. বয়রা সাব-সেক্টর, কমান্ডার ক্যাপ্টেন খন্দকার নাজমুল হুদা
২. হাকিমপুর, ক্যাপ্টেন শফিক উল্লাহ
৩. ভোমরা, ক্যাপ্টেন সালাহউদ্দিন
৪. লালবাজার, ক্যাপ্টেন এ আর আজম
৫. বেনাপাল, ক্যাপ্টেন আব্দুল হালিম
৬. শিকারপুর, ক্যাপ্টেন তৌফিক এলাহী চৌধুরী, পরে লে. জাহাঙ্গীর
৭. বানপুর, ক্যাপ্টেন মুস্তাফিজুর রহমান

নয় নম্বর সেক্টর– খুলনা-বরিশাল

বরিশাল, পটুয়াখালী, দৌলতপুর, সাতক্ষীরা সড়ক হয়ে সমগ্র খুলনা ও ফরিদপুর জেলার একাংশ নিয়ে নবম সেক্টর গঠিত ছিল। সেক্টর কমান্ডার ছিলেন মেজর এম এ জলিল।

৯ নম্বর সেক্টরের অধীনে ৫টি সাব-সেক্টর ছিল

১. টাকি সাব-সেক্টর
২. হিঙ্গলগঞ্জ সাব-সেক্টর, ক্যাপ্টেন নূরুল হুদা
৩. শমসের নগর, কমান্ডার লে. মাহফুজুল আলম বেগ
৪. সুন্দরবন এলাকা, কমান্ডার লে. জিয়াউদ্দিন আহমেদ
৫. বরিশাল, ক্যাপ্টেন শাহজাহান ওমর
৬. পটুয়াখালী, ক্যাপ্টেন মেহেদী আলী ইমাম

৯ম সেক্টর একমাত্র এলাকা যেখানে অনিয়মিত বাহিনী নিয়ে সেক্টর গঠন করা হয়। বেঙ্গল রেজমেন্ট বা ইপিআরের কোনো নিয়মিত বাহিনী এই সেক্টরে ছিল না। সেক্টরের মুক্তিযোদ্ধার সংখ্যা ছিল ৮ হাজার, পরে ২০ হাজারে উন্নীত হয়।

দশ নম্বর সেক্টর

১০ নম্বর সেক্টরের অধীনে ছিল নৌ কমান্ডো-অভ্যন্তরীণ নৌপথ ও সমুদ্র উপকূলীয় অঞ্চল। দশম সেক্টরের অধীনে বাঙালি পদস্থ কর্মকর্তা না থাকায় এ সেক্টরের অধিনায়ক ছিল না। নিজ নিজ সেক্টর কমান্ডারগণ অপারেশন পরিচালনা করেন। নৌবাহিনী অফিসারদের মধ্যে ছিলেন এ জি খুরশীদ, রহমতুল্লাহ, বি আলম,

আসাদুল্লাহ, সলিমুল্লাহ, রফিকুল ইসলাম। নবম সেক্টরে প্রথম বঙ্গবন্ধুর নামে নৌবাহিনী গঠন করা হয়। ১৯৭১ সালের আগস্ট মাসে মন্ত্রী এএইচএম কামরুজ্জামান দশম সেক্টরে প্রথম নৌবাহিনীর শুভ উদ্বোধন করেন। মংলা, চট্টগ্রাম, নারায়ণগঞ্জ প্রভৃতি স্থানে নৌ কমান্ডোরা হামলা চালিয়ে অনেক জাহাজ ডুবিয়ে দেয়।

ফ্রান্স থেকে পাকিস্তান নৌবাহিনীর ৮ জন নাবিক পালিয়ে এসে মুক্তিযুদ্ধে যোগ দেন। তাদের নিয়ে মুজিবনগর সরকার প্রথম নৌবাহিনী গঠন করে। নৌবাহিনীতে বাঙালি কোনো অফিসার না থাকায় ভারতীয় নৌবাহিনীর কমান্ডার এম এন সামন্ত বাংলাদেশ নৌবাহিনীর গঠন ও প্রশিক্ষণের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। মুর্শিদাবাদের পলাশীতে মুক্তিবাহিনীর নৌ-কমান্ডোদের প্রশিক্ষণ শুরু হয়। পলাশীতে ৩০০ নৌ-কমান্ডো প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন। রহমতুল্লাহ, জালালউদ্দিন, লে. সেলিম, বজলুর রহমান প্রমুখ পলাশীতে প্রশিক্ষণ প্রদানে কঠোর পরিশ্রম করেন।

এগার নম্বর সেক্টর, ময়মনসিংহ

কিশোরগঞ্জ মহকুমা ব্যতীত ময়মনসিংহ জেলার এবং টাঙ্গাইল জেলা এগারো নম্বর সেক্টরের অধীনে ছিল। সেক্টর কমান্ডার ছিলেন মেজর আবু তাহের। তিনি ১১ নভেম্বর গুরুতর আহত হলে স্কোয়াড্রন লিডার হামিদুল্লাহকে সেক্টরের দায়িত্ব দেয়া হয়।

এগার নম্বর সেক্টর ৮টি সাব-সেক্টরে বিভক্ত ছিল :

১. মানকারচর সাব-সেক্টর, কমান্ডার স্কোয়াড্রন লিডার হামিদুল্লাহ
২. মহেন্দ্রগঞ্জ, লে. মান্নান
৩. পুরা খাসিয়া, লে. হাশেম
৪. তালু, লে. তাহের এবং পরে লে. কামাল
৫. রংরা, ক্যাপ্টেন মতিয়ুর রহমান
৬. শিববাড়ি, ইপিআর জেসিও
৭. বাগমারা, ইপিআর জেসিও
৮. মহেশখালী, ইপিআর জেসিও

প্রথম ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের কমান্ডিং অফিসার ছিলেন মেজর মঈনুল হোসেন চৌধুরী পরে মেজর জিয়াউদ্দিন। অন্যান্য অফিসার ছিলেন ক্যাপ্টেন বজলুল গনি পাটওয়ারী, ক্যাপ্টেন মাহবুব, ক্যাপ্টেন হাফিজউদ্দিন, ক্যাপ্টেন আব্দুল কাইয়ুম চৌধুরী, লে. আনিসুর রহমান, লে. এম ওয়াকার হাসান।

তৃতীয় বেঙ্গল রেজিমেন্টের কমান্ডিং অফিসার ছিলেন মেজর শাফায়াত জামিল, সহ-অধিনায়ক ক্যাপ্টেন মহসীন, ক্যাপ্টেন আনোয়ার হোসেন, ক্যাপ্টেন আকবর হোসেন, লে. নূরুন্নবী চৌধুরী।

অষ্টম ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের কমান্ডিং অফিসার ছিলেন মেজর এ টি এম আমিনুল হক, সহ-অধিনায়ক ক্যাপ্টেন খালেকুজ্জামান চৌধুরী, ক্যাপ্টেন সাদেক হোসেন, লে. মোদাসসের।

এগারো নম্বর সেক্টর আনুষ্ঠানিকভাবে আগস্ট মাসে শুরু হয়। ১১ নম্বর সেক্টর কামালপুর, বাহাদুরাবাদঘাট, হালুয়াঘাট প্রভৃতি যুদ্ধে অভূতপূর্ব বিজয়লাভ করে।

মুক্তিযুদ্ধের প্রথম পর্যায়ে সবচেয়ে ভয়াবহ যুদ্ধ হয় নোয়াখালী জেলার বেলুনিয়া সীমান্তে। শুভাপুর ব্রিজ পতনের পর বেলুনিয়া ও চাঁদগাজী মুক্তিযোদ্ধাদের দখলে ছিল। মে ও জুন মাসে বেলুনিয়ার দখল নিয়ে পাকবাহিনী ও মুক্তিযোদ্ধাদের মধ্যে তীব্র লড়াই হয়। পাকিস্তান বার বার বেলুনিয়া আক্রমণ করে পরাজিত হয়। পরিশেষে ১৯ জুন পাক বাহিনী বিমানে ছত্রীসেনা নামিয়ে মুক্তিযোদ্ধাদের ঘিরে ফেলে। বাধ্য হয়ে মুক্তিযোদ্ধারা ১৯ জুন রাতে চাঁদগাজী পরিত্যাগ করে। চাঁদগাজী পতনের পর মুক্তিযোদ্ধাদের বাংলার শেষ ভূমি দখল থেকে চলে যায়। মুজিবনগর সরকার প্রাথমিক বিপর্যয়ের পর মুক্তিযোদ্ধারা নতুন যুদ্ধ কৌশল অবলম্বন করে। এপ্রিল হতে ১৫ মে পর্যন্ত একমাত্র ভারতীয় বিএসএফ মুক্তিযোদ্ধাদের সহায়তা প্রদান করতো। ১৫ মে হতে ভারতীয় সেনাবাহিনীর ইস্টার্ন কমান্ড মুক্তিযোদ্ধাদের সহযোগিতা ও সমন্বয়ের দায়িত্ব গ্রহণ করে। তবে তারা সরাসরি সীমান্ত যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেনি।

১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধকে তিন পর্যায়ে ভাগ করা যায় :

প্রথম পর্যায় : ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ থেকে ২০ জুন। এ সময় বঙ্গবন্ধুর স্বাধীনতা ঘোষণার আহ্বানে সাড়া দিয়ে জনগণ, ছাত্র-যুবক, বেঙ্গল রেজিমেন্ট, ইপিআর, পুলিশ, আনসার স্বতঃস্ফূর্তভাবে পাকবাহিনীর আক্রমণ প্রতিহত করে। যুদ্ধপ্রস্তুতি অবশ্য ছিল। কিন্তু সমন্বয়ের অভাবে মুক্তিযোদ্ধাদের বিচ্ছিন্নভাবে আক্রমণ প্রতিহত করতে হয়েছে। এ সময়কাল ছিল প্রকৃতপক্ষে অপরিকল্পিত জনযুদ্ধ। অস্ত্র ও গোলাবারুদের অভাব ছিল। যার যা আছে তা নিয়ে বাংলার মানুষ জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু স্লোগান দিয়ে পাক বাহিনীর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে।

দ্বিতীয় পর্যায় : ১৯৭১ সালের জুনের তৃতীয় সপ্তাহ হতে সেপ্টেম্বর। এ সময় মুক্তিযোদ্ধাদের পুনর্বাসন করা হয় এবং সমগ্র বাংলাদেশকে ১১টি সেক্টরে বিভক্ত

করা হয়। ছাত্র, যুবক, কৃষক সংক্ষিপ্ত সামরিক প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে এবং দেশের অভ্যন্তরে পাকবাহিনী, রাজাকার ও দালালদের বিরুদ্ধে অভিযান চালায়। মুক্তিযোদ্ধাদের নিয়মিত বাহিনী 'কনভেনশন' যুদ্ধ শুরু করে।

তৃতীয় পর্যায় : অক্টোবরের প্রথম সপ্তাহ হতে ৩ ডিসেম্বর পর্যন্ত। এ সময় বাংলাদেশে গেরিলা যুদ্ধ চলে। সীমান্ত এলাকায় পাকবাহিনীর সাথে মুক্তিবাহিনীর নিয়মিত সৈন্যদের যুদ্ধ চলে এবং বাংলাদেশের বিস্তৃত এলাকা আওয়ামী লীগ সরকারের অধীনে চলে আসে। নভেম্বর মাসের শেষ দিকে পাকিস্তানি বাহিনী পর্যুদস্ত হয়। নৌ-কমান্ডোর আক্রমণে চালনা ও চট্টগ্রাম বন্দর অচল হয়ে পড়ে।

চতুর্থ ও শেষ পর্যায় : ১৯৭১ সালের ৩ ডিসেম্বর মুক্তিবাহিনী ও ভারতীয় বাহিনী একত্রিত করে মিত্রবাহিনী গঠন করা হয়। ৩ ডিসেম্বর হতে ১৬ ডিসেম্বর পর্যন্ত মিত্রবাহিনীর সাথে পাকিস্তান সেনাবাহিনীর যুদ্ধ। ১৬ ডিসেম্বর মিত্রবাহিনীর বিজয়।

অধ্যায় ২০

পাকিস্তান সেনাবাহিনীর গণহত্যা

বাঙালীদের ৬ দফা দাবি ধ্বংস করার জন্য জেনারেল ইয়াহিয়া খান, জেনারেল টিক্কা খান ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ রাতে গণহত্যা শুরু করে। তাদের ষড়যন্ত্রের সাথে পিপলস পার্টির নেতা জুলফিকার আলী ভুট্টোর সহযোগিতা ছিল। ভুট্টো ছিলেন ৬ দফা ও আওয়ামী লীগ বিরোধী। তিনি বঙ্গবন্ধুর বিজয়কে মেনে নিতে পারেননি। তার কারণে ঢাকার আলোচনা ভেঙে যায়। পূর্ব বাংলার জনগণের দাবি স্বাধীন বাংলাদেশ ইয়াহিয়া ভুট্টো গ্রহণ করবে না। বাঙালিদের ওপর আক্রমণের নির্দেশ দিয়ে প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান ২৫ মার্চ সন্ধ্যায় ঢাকা থেকে গোপনে চলে যান। পূর্ব পাকিস্তানে সামরিক প্রশাসক লে. জেনারেল টিক্কা খান ২৫ মার্চ রাত ১১টায় বাঙালীদের বিরুদ্ধে অপারেশন সার্চলাইট শুরু করেন। একই সময় পাক বাহিনী ঢাকার পিলখানা, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, রাজারবাগ পুলিশ লাইন, বস্তি এলাকা আক্রমণ করে এবং ঢাকায় প্রথম রাতে ৭ হাজার লোক হত্যা করে। তারা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-শিক্ষকদের হত্যা করে। ২৬ মার্চ ভোরে পাক বাহিনী আগরতলা মামলার ২ নম্বর আসামি লে. কমান্ডার মোয়াজ্জেম হোসেনকে এলিফ্যান্ট রোডে তার বাসভবনের সামনে হত্যা করে লাশ নিয়ে যায়। ২৫ মার্চ রাতে পাক বাহিনী চট্টগ্রাম, রংপুর, রাজশাহী, সিলেট, খুলনা প্রভৃতি স্থানে আক্রমণ চালায়। তারা প্রথমেই বাঙালী সেনাবাহিনী, ইপিআর ও পুলিশদের নিরস্ত্র করে। পাক সেনারা বাঙালী সেনা অফিসার, বেসামরিক কর্মকর্তাদের হত্যা করে। তারা কার্ফু জারি করে হত্যা, অগ্নিসংযোগ, নারী নির্যাতন ও লুণ্ঠন চালায়। ২৫ মার্চ রাতে ঢাকা জ্বলছে। হাজার হাজার বাড়ি ঘর ও বস্তিতে আগুন দিয়ে পুড়ে আতঙ্ক সৃষ্টি করে। মনে হল, চেঙ্গিস খান, হালাকু খান আবার ফিরে এসেছে। ঢাকা মৃতনগরীতে পরিণত হয়। টিক্কা খানের ধ্বংসলীলা এত ভয়ঙ্কর ছিল যে যুদ্ধকালীন পূর্ব পাকিস্তানে পাকিস্তানি কমান্ডার লে. জেনারেল এ কে কে নিয়াজী বলেন, "১৯৭১ সালের ২৫ ও ২৬ মার্চ মধ্যরাতে জেনারেল টিক্কা খান আক্রমণ করেন। সমস্ত রাত আর্তনাদ, চিৎকার ও জ্বলন্ত রাতে পরিণত হলো। জেনারেল

টিক্কা খান তার অধীনে যা কিছু ছিল সব মুক্ত করে দেন। মনে হলো তিনি শত্রুদের ওপর অভিযান চালিয়েছেন। নিজের বিভ্রান্ত বিপদগামী জনগণের সঙ্গে যেভাবে ব্যবহার করা উচিত ছিল তা তিনি করেন নি। তার সামরিক অভিযান ছিল নির্মম ও নিষ্ঠুরতার প্রদর্শন। চেঙ্গিস খান এবং হালাকু খান বোখারা ও বাগদাদ অথবা ব্রিটিশ জেনারেল ডায়ার জালিয়ানওয়ালাবাগে যে নিষ্ঠুর গণহত্যা চালিয়েছিল তার চেয়েও ভয়ঙ্কর ও নিষ্ঠুর ছিল টিক্কা খানের সামরিক আক্রমণ।"

জেনারেল নিয়াজী আরও বলেছেন যে, প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান টিক্কা খানকে নির্দেশ দিয়েছিলেন বাঙালী সেনাবাহিনীকে নিরস্ত্র করতে। কিন্তু তিনি তা না করে সাধারণ নাগরিকদের হত্যা এবং পোড়ামাটিনীতি গ্রহণ করেন। সেনাবাহিনীর প্রতি জেনারেল টিক্কা খানের নির্দেশ ছিল, 'I want the land, not the People.' আমি মানুষ চাই না। ভূমি চাই।' গণহত্যার আর একজন সমর নায়ক মেজর জেনারেল রাওফরমান বলেছেন, "Green Land of East Pakistan will be painted red." পূর্ব পাকিস্তানের সবুজ ভূমি রক্তাক্ত করা হবে। জুলফিকার আলী ভুট্টো ২৫ মার্চ ঢাকায় থেকে স্টেনগানের গুলির শব্দ শুনেছেন। জ্বলন্ত ঢাকা দেখেছেন। আনন্দিত হয়েছেন। তিনি পরের দিন সকালে টিক্কা খান, রাওফরমান ও আরবারকে ধন্যবাদ জানালেন।

জেনারেল নিয়াজী টিক্কা খানের পর পূর্ব বাংলায় গণহত্যা অব্যাহত রেখেছেন। নিয়াজী আওয়ামী লীগ নেতাকর্মীদের সমালোচনা করে লিখেছেন যে, মার্চ মাসের প্রথম ১৪ দিনে অবাঙালীদের হত্যা করেছে এবং নারী নির্যাতন করেছে। নিয়াজীর বক্তব্য সত্য নয়। ২৫ মার্চের পূর্বে অবাঙালীদের হত্যা করা হয়নি। ২৬ মার্চ হতে যুদ্ধ শুরু হয়। এ সময় অবাঙালী নিহত হয়েছে। এ জন্য কিছুসংখ্যক লোক দায়ী ছিল। বঙ্গবন্ধু বা মুজিবনগর সরকার অবাঙালীদের নিরাপত্তা বিধানে অঙ্গীকারাবদ্ধ ছিলেন।

পূর্ব বাংলায় সামরিক আইন প্রশাসক জেনারেল টিক্কা খানের নির্দেশে গণহত্যা চলতে থাকে। তার নিষ্ঠুরতা ও গণহত্যা কাহিনী সারা বিশ্বে ছড়িয়ে পড়ে। ইয়াহিয়া খান জেনারেল টিক্কার স্থলে অভিজ্ঞ লে. জেনারেল এ এ কে নিয়াজীকে পূর্বাঞ্চলের কমান্ডার নিয়োগ করেন। ৪ এপ্রিল নিয়াজী ঢাকায় পৌঁছে এবং ১০ এপ্রিল কমান্ডের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। ১১ এপ্রিল টিক্কা খানকে গভর্নর নিযুক্ত করা হয়। মেজর জেনারেল রাও ফরমান আলী গভর্নরের উপদেষ্টা ছিলেন। ব্রিগেডিয়ার বাকির মুহাম্মদ ছিলেন চিফ অব স্টাফ। ১৪ ডিভিশনের কমান্ডিং অফিসার মেজর জেনারেল খাদিম রাজার স্থলে মেজর জেনারেল আবদুর রহিমকে দায়িত্ব প্রদান করা হয়।

জেনারেল টিক্কা খান সামরিক ও বেসামরিক ক্ষমতা প্রয়োগ করতেন। সুতরাং তার নির্দেশে সারা বাংলায় গণহত্যা, লুণ্ঠন ও নারী নির্যাতন চলছে। মেজর জেনারেল নাজির হোসেন শাহ ১৬ ডিভিশনের জিওসি ছিলেন। মেজর জেনারেল জামসেদকে ইস্ট পাকিস্তান সিভিল আর্মড ফোর্সেস ECAF-এর মহাপরিচালক নিয়োগ করা হয়। বাঙালি ইপিআর মুক্তিযুদ্ধে যোগ দেয়। এ কারণে পাকিস্তান সরকার অবাঙালি ইপিআর ও বিহারীদের নিয়ে ইক্যাপ গঠন করে। EPCAF বাঙালিদের হত্যা করে।

মেজর জেনারেল মিঠ্ঠা খান টিক্কা খানের সহকারী ছিলেন। জেনারেল টিক্কা খান পূর্ব পাকিস্তানের গভর্নর থাকার ফলে লক্ষ লক্ষ বাঙালীকে হত্যা করে এবং এক কোটি বাঙালি বাধ্য হয়ে ভারতে আশ্রয় নেয়। দুই কোটি নর-নারী দেশের অভ্যন্তরে পালিয়ে বেড়াত। অবশিষ্ট ৪ কোটি মানুষ ভয়ঙ্কর পরিস্থিতিতে রাত কাটাত। বাঙালিদের হত্যার জন্য টিক্কা খানকে দায়ী করা হয়। তাই টিক্কা খানকে কসাই বলা হয়। ইতিপূর্বে তিনি বেলুচিস্তানে গণহত্যা চালিয়ে কসাই উপাধি পেয়েছিল।

১৯৭১ সালের ২৫ মার্চের পর জামায়াত, মুসলিম লীগের নেতা-কর্মীরা পাকিস্তান ও ইসলাম রক্ষার নামে শান্তি কমিটি Peace Committee গঠন করে। ১৯৭১ সালের ১০ এপ্রিল ঢাকার নবাব পরিবারের খাজা খয়ের উদ্দিনকে আহ্বায়ক করে ১৪০ সদস্যবিশিষ্ট কেন্দ্রীয় শান্তি কমিটি গঠন করা হয়। শান্তি কমিটির নেতৃবৃন্দ–

খাজা খয়ের উদ্দিন	আহ্বায়ক
খান এ সবুর খান	মুসলিম লীগ
প্রফেসর গোলাম আযম	জামায়াত
এডভোকেট ফরিদউদ্দিন আহমদ	নেজামে ইসলাম
মাওলানা মতিউর রহমান নিজামী	জামায়াত
মাওলানা আব্বাস আলী	জামায়াত
এএস এম সোলায়মান	কৃষক-শ্রমিক পার্টি
পীর মোহসিন উদ্দিন দুদু মিয়া	
মাওলানা মাসুম	

পূর্ব পাকিস্তানের জামায়াত, মুসলিম লীগ, পিডিপি, নেজামে ইসলাম পাকিস্তানকে সমর্থন এবং মুক্তিযুদ্ধের বিরোধিতা করে। রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে জামায়াত গণহত্যায় মুখ্য ভূমিকা পালন করে।

১৯৭১ সালের মে মাসে খুলনার জামায়াত নেতা এ কেএম ইউসুফ প্রথম

রাজাকার বাহিনী গঠন করে। পাক বাহিনীর সহায়তাকারী পূর্ব পাকিস্তানে রাজাকার বাহিনী গঠিত হয়। ১৯৭১ সালে রাজাকার বাহিনী গণহত্যায় কলঙ্কময় ইতিহাস সৃষ্টি হয়। তারা জামায়াতও পাক সেনাদের সহায়তা করে। তারা হিন্দু নারী-পুরুষ, আওয়ামী লীগ ও মুক্তিযোদ্ধাদের ধরে এনে পাকবাহিনীর নিকট হস্তান্তর করতো। রাজাকাররা পাক বাহিনীকে পথ দেখিয়ে গ্রামে গ্রামে নিয়ে যায়। তারা নিজেরাই পাক বাহিনীর ভূমিকা পালন করে এবং মানুষ হত্যা করেছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কয়েকজন শিক্ষক পাক বাহিনীর দালালী করে।

কেন্দ্রীয় শান্তি কমিটির উদ্যোগে প্রত্যেক জেলা, মহকুমা, থানা ও ইউনিয়ন শান্তি কমিটি ও রাজাকার বাহিনী গঠন করা হয়। রাজাকার বাহিনীকে মাসিক বেতন ও অস্ত্র প্রদান করে। পশ্চিম পাকিস্তানি মিলিশিয়ারা পূর্ব বাংলায় গণহত্যা চালায়। পাক সেনারা সকল জেলা, মহকুমা ও থানায় ক্যাম্প প্রতিষ্ঠা করে গণহত্যা, নারী ধর্ষণ, অগ্নিসংযোগ ও লুণ্ঠন চালায় এবং তারা লাখ লাখ বাঙালি হত্যা করেছে। গ্রামবাংলা পুড়ে কোটি মানুষকে আশ্রয়হীন করেছে। তাদের নির্যাতনে এক কোটি বাঙালি ভারতে আশ্রয় নেয়। ভারতে পালিয়ে যাওয়ার সময় তাদের অনেককে হত্যা করা হয়। ভারতের আশ্রয় কেন্দ্রে শরণার্থীরা অবর্ণনীয় কষ্টে দিন যাপন করেছে। জাতিসংঘ শরণার্থীদের সাহায্যে এগিয়ে আসে। পূর্ব পাকিস্তানে গণহত্যার নায়ক ছিলেন গভর্নর ও সামরিক শাসক জেনারেল টিক্কা খান। ১৯৭১ সালের ১০ এপ্রিল জেনারেল টিক্কা খান গভর্নর হিসেবে বিচারপতি বি এ সিদ্দিকীর নিকট শপথ গ্রহণ করেন। ইতিপূর্বে বিচারপতি বি এ সিদ্দিকী টিক্কা খানকে শপথ পড়াতে অস্বীকার করেছিলেন। সারা বিশ্ব গণহত্যার কারণে বর্বর টিক্কা খানকে ঘৃণা করতো। জেনারেল নিয়াজীর সাথে তার সম্পর্ক ভাল ছিল না। ৪ সেপ্টেম্বর টিক্কা খানের সামরিক আইন প্রশাসকের ক্ষমতা জেনারেল নিয়াজীকে দেয়া হয়।

রাজাকার মন্ত্রিসভা

লক্ষ লক্ষ বাঙালি হত্যার নায়ক জেনারেল টিক্কা খানের বিরুদ্ধে বিশ্ব জনমত সৃষ্টি হয়। প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া ও পাকিস্তানের ভাবমূর্তি বিশ্বে ধ্বংস হয়েছে। তাই ইয়াহিয়া খান বাধ্য হয়ে জেনারেল টিক্কা খানকে গভর্নরের পদ থেকে অপসারণের সিদ্ধান্ত নেন।

১৯৭১ সালের ১১ সেপ্টেম্বর সাবেক মন্ত্রী ডা. আবদুল মোত্তালিব মালিককে পূর্ব পাকিস্তানের গভর্নর নিয়োগ করা হয়। বিচারপতি বিএ সিদ্দিকী তাকে শপথ পড়ান। ১১ সেপ্টেম্বর শপথ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন সাবেক গভর্নর মোনায়েম

খান, অধ্যাপক গোলাম আযম, ফজলুল কাদের চৌধুরী, সবুর খান, ইউসুফ আলী চৌধুরী মোহন মিয়া, এ এমএস সোলায়মান, হাসান আসকারী, পীর মোহসীন উদ্দিন দুদু মিয়া, আবদুল জব্বার খান, ইস্পাহানী, এ আর এস দোহা প্রমুখ।

১৯৭১ সালের ১৪ সেপ্টেম্বর ডা. এএম মালেক জামায়াত মুসলিম লীগ ও দলছুটদের নিয়ে মন্ত্রিসভা গঠন করেন। মন্ত্রীরা হলেন–

ডা. এ এম মালিক	গভর্নর
আবুল কাসেম	কাউন্সিল মুসলিম লীগ-অর্থ
এডভোকেট নওয়াজেস আহমেদ	কাউন্সিল মুসলিম লীগ খাদ্য ও কৃষি
আব্বাস আলী খান-জামায়াত	শিক্ষা
মওলানা এ কে এম ইউসুফ	জামায়াত ইসলাম রাজস্ব পূর্ত, বিদ্যুৎ, সেচ
ওবায়দুল্লাহ মজুমদার	আওয়ামী লীগ থেকে দলছুট স্বাস্থ্য ও তথ্য
এ এম এস সোলায়মান	কৃষক শ্রমিক পার্টি, সমাজকল্যাণ ও পরিবার পরিকল্পনা
মওলানা মোহাম্মদ ইসাহাক	নেজামে ইসলাম, স্থানীয় সরকার
ব্যারিস্টার আখতার উদ্দিন আহমদ	কনভেনশন মুসলিম লীগ শিল্প, বাণিজ্যও আইন
অং সু প্রু	পার্বত্য চট্টগ্রাম, বন সমবায় মৎস্য।

প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান বেসামরিক সরকার প্রতিষ্ঠা করে প্রমাণ করতে চেয়েছিলেন যে, পূর্ব পাকিস্তানে স্বাভাবিক অবস্থা বিরাজ করছে। কিন্তু ডা. মালিক মন্ত্রিসভা ছিল পুতুল সরকার। সামরিক সরকারের নির্দেশে তারা দায়িত্ব পালন করতো। গভর্নরের উপদেষ্টা ছিল মেজর জেনারেল রাওফরমান আলী। তিনি পূর্ব পাকিস্তানে গণহত্যার নীল নকশা বাস্তবায়িত করেছিলেন।

বাংলাদেশে গণহত্যার পাকিস্তানী সমরনায়কগণ

জেনারেল ইয়াহিয়া খান	প্রেসিডেন্ট
জেনারেল আবদুল হামিদ খান	সেনাবাহিনীর চীফ অব স্টাফ
এয়ার ভাইস মার্শাল এ রহিম খান	পাকিস্তান বিমান বাহিনীর প্রধান
মেজর জেনারেল পীরজাদা	প্রেসিডেন্টের পিএসও

লে. জেনারেল টিক্কা খান	পূর্ব পাকিস্তানের গভর্নর ও সামরিক আইন প্রশাসক
মে. জেনারেল খাদেম হোসেন রাজা	জিওসি পূর্ব পাকিস্তান
লে. জেনারেল আমীর আবদুল্লাহ খান নিয়াজী	ইস্টার্ন কমান্ডার সামরিক আইন প্রশাসক
মেজর জেনারেল রাওফরমান আলী	গভর্নরের পরামর্শদাতা

১৯৭১ সালে পাকিস্তানের সেনাবাহিনী, মিলিশিয়া ও রাজাকার, আল বদর ৩০ লাখ বাঙালি হত্যা করে এবং দুই লক্ষ পঞ্চাশ হাজার নারী ধর্ষণ করেছে। প্রত্যেক জেলা, মহকুমা ও থানায় গণহত্যার পর মৃতদেহ গণকবর দেয়া হয়। ঢাকা শহরে মিরপুর বধ্যভূমিতে বুদ্ধিজীবীদের হত্যা করা হয়েছে। বাংলাদেশে শত শত গণকবর আবিষ্কার হয়েছে। অনেক গণকবর অবহেলায় পড়ে রয়েছে।

অধ্যায় ২১

বাংলাদেশ সরকারের কার্যাবলি

বাংলাদেশ সরকারের প্রধান দায়িত্ব ছিল মুক্তিযুদ্ধ পরিচালনা। পাকিস্তানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য বাংলাদেশকে ১১টি সেক্টরে বিভক্ত করা হয়। মুক্তিযোদ্ধাদের প্রশিক্ষণ দেয়ার জন্য ভারত সরকারের সহায়তায় ট্রেনিং ক্যাম্প প্রতিষ্ঠা করা হয়। নিয়মিত বাহিনী ব্যতীত এক লাখ মুক্তিযোদ্ধাকে প্রশিক্ষণ দিয়ে দেশের অভ্যন্তরে প্রেরণ করা হয়। তারা দীর্ঘ ৯ মাস যুদ্ধ করে পাকিস্তানীদের পর্যুদস্ত করে। মুক্তিযুদ্ধের দায়িত্ব ছিল প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের। প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দীন আহমদ প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব পালন করেন। তিনি ১১টি সেক্টর গঠন করে যুদ্ধ পরিচালনায় অপূর্ব রণকুশলীর পরিচয় দেন।

বাংলাদেশ সেনাবাহিনী

তাজউদ্দীন আহমদ	প্রতিরক্ষামন্ত্রী
কর্নেল এএম এ জি ওসমানী	প্রধান সেনাপতি
কর্নেল আবদুর রব এমএনএ	চীফ অব স্টাফ
গ্রুপ ক্যাপটেন এ কে খন্দকার	ডেপুটি চীফ অব স্টাফ
মেজর ওসমান চৌধুরী	
মেজর নুরুল ইসলাম	
মেজর হাবিবুল্লাহ	
মেজর এ টি এম সালাউদ্দিন	
স্কোয়াড্রন লিডার শামসুল আলম	
মেজর এনামুল হক	
লে. শেখ কামাল	

ত্রাণ ও পুনর্বাসন দফতর

পাক বাহিনীর অত্যাচারে এক কোটি বাঙালি ভারতে আশ্রয় নেয়। সরকার ভারতের সহায়তায় ত্রাণ ও পুনর্বাসন মন্ত্রণালয়ের অধীনে ত্রাণ শিবির ও যুব অভ্যর্থনা দপ্তর

পরিচালনা করে। ত্রাণ পুনর্বাসন মন্ত্রী ছিলেন এএইচএম কামরুজ্জামান।

যুব অভ্যর্থনা দপ্তরের দায়িত্বে ছিলেন :
অধ্যাপক ইউসুফ আলী এমএনএ, সচিব
আবদুল মালেক উকিল এমএনএ, সদস্য
মোঃ শামসুল হক এমএনএ
সোহরাব হোসেন এমএনএ
আক্তারুজ্জামান চৌধুরী এমপিএ

ত্রাণ ও পুনর্বাসন দপ্তর
জিজি ভৌমিক, রিলিফ কমিশনার
মামুনুর রশীদ সিএসপি, উপ-রিলিফ কমিশনার

মুজিবনগর সরকারের সচিবালয়
প্রধানমন্ত্রীর দপ্তর-৮ নম্বর থিয়েটার রোড
প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দীন আহমদ, মন্ত্রিপরিষদ, সংস্থাপন প্রতিরক্ষা, তথ্য ও বেতার, পরিকল্পনা
উপদেষ্টা, ব্যারিস্টার আমীর-উল ইসলাম
মন্ত্রী পরিষদ সচিব, এইচটি ইমাম
সংস্থাপন সচিব, নুরুল কাদের খান

অর্থ মন্ত্রণালয়
মন্ত্রী, ক্যাপ্টেন এম মনসুর আলী
সচিব, খন্দকার আসাদুজ্জামান
আইন মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ মিশন
মন্ত্রী, খন্দকার মোশতাক আহমদ
সচিব, এমএ হান্নান চৌধুরী

কৃষি
মন্ত্রী, এএইচএম কামরুজ্জামান
সচিব, নুরুদ্দিন আহমদ

স্বরাষ্ট্র
মন্ত্রী, এ এইচ এম কামরুজ্জামান
সচিব, এম এ খালেক

পররাষ্ট্র
মন্ত্রী, খন্দকার মোশতাক আহমদ
সচিব, মাহবুবুল আলম চাষী

পরিকল্পনা বিভাগ
ড. মোজাফফর আহমেদ চৌধুরী, চেয়ারম্যান
ড. স্বদেশ বসু, সদস্য
ড. মোশাররফ হোসেন, সদস্য
ড. নুরুল ইসলাম, সদস্য
অধ্যাপক সারওয়ার মোর্শেদ, সদস্য
অধ্যাপক আনিসুজ্জামান, সদস্য

বেতার ও তথ্য
আবদুল মান্নান এমএনএ

বাংলাদেশ বেতার

১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধে বাংলাদেশ বেতার দ্বিতীয় শক্তি হিসেবে ভূমিকা পালন করেছে। ১৯৭১ সালের ২৬ মার্চ চট্টগ্রামে কালুরঘাট বেতার কেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত হয়। বেতার কেন্দ্রে ৩০ মার্চ পাকবাহিনীর আক্রমণের পর বেতার কেন্দ্র আগরতলায় স্থানান্তরিত হয়। কলকাতায় ৫০ কিলোওয়াট ট্রান্সমিটার স্থাপনের মাধ্যমে স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা লাভ করে।

বেতার কেন্দ্র পরিচালনার দায়িত্বে ছিলেন–
শামসুল হুদা চৌধুরী
আশফাকুর রহমান
বেল্লাল হোসেন
তাহের সুলতান
মোস্তফা আনোয়ার
আলী যাকের
আলমগীর কবীর-ইংরেজি প্রোগ্রাম
সমর দাস-সঙ্গীত
কামাল লোহানী-বার্তা বিভাগ

বাংলাদেশ বেতার জাগরণী সঙ্গীত ও গণসঙ্গীত প্রচার করে যুদ্ধরত বাঙালিদের মাতিয়ে রাখে।

বেতারে নিয়মিত কথিকা ও নাটক পরিবেশন করা হতো। এমআর আখতার মুকুল চরমপত্র পাঠ করে সকলকে উজ্জীবিত রাখতেন। বাংলাদেশ সরকার এম এ মান্নানের সম্পাদনায় জয় বাংলা পত্রিকা প্রকাশ করে। পত্রিকার সহকারী সম্পাদক ছিলেন গাফ্ফার চৌধুরী ও আসাদ চৌধুরী।

মুজিবনগর থেকে বেসরকারিভাবে কয়েকটি পত্রিকা প্রকাশিত হতো।

শিল্পী কামরুল হাসান প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খানের ব্যঙ্গচিত্র– এ জানোয়ারদের হত্যা করতে হবে, অংকন করে মুক্তিযুদ্ধে অবদান রেখেছেন।

The Concert in Bangladesh

১৯৭১ সালের ১ আগস্ট নিউইয়র্ক ম্যাডিসন স্কোয়ার গার্ডেনে এক অবিস্মরণীয় সঙ্গীত সন্ধ্যা অনুষ্ঠিত হয়। রবি শঙ্কর, বব ডিলান, রিঙ্গোস্টারসহ ৭৫ জন শিল্পী এতে অংশ নেন। উদ্যোক্তারা সংগৃহীত ২৪৩৪১৮৫ মার্কিন ডলার বাংলাদেশ তহবিলে জমা দেন।

আর এক বিখ্যাত শিল্পী জর্জ হ্যারিসন সঙ্গীত পরিবেশন করে বিশ্ব বিবেক জাগ্রত করেন।

এক কোটি শরণার্থীর ভারতে আশ্রয় গ্রহণ

১৯৭১ সালে ৯১ লাখ ৮৮ হাজার ৫৩২ জন ভারতের পশ্চিমবঙ্গ, আগরতলা, মেঘালয়, আসাম ও বিহারে ৯৩৫টি শরণার্থী শিবিরে অবস্থান করে।

প্রদেশের নাম	আশ্রয় শিবিরের সংখ্যা
পশ্চিমবঙ্গ	৬১৫
ত্রিপুরা রাজ্য	২৭৪
মেঘালয়	১৭
আসাম	২৭
বিহার	৩
মোট	**৯৩৫**

দখলদার বাহিনীর নির্যাতনে বাধ্য হয়ে এক কোটি শরণার্থী ভারতে আশ্রয় নেয়। শরণার্থী শিবির ব্যতীত অনেকে আত্মীয়-স্বজনের আশ্রয়ে ছিল। অনেকে চাকরিস্থলে ভাড়া বাসায় থেকেছেন।

বাংলাদেশ ফুটবল টিম

বাংলাদেশ সরকারের উদ্যোগে ফুটবল টিম গঠিত হয়। তারা ভারতের বিভিন্ন

স্থানে ফুটবল খেলা প্রদর্শন করে অর্থ সংগ্রহ ও জনমত সৃষ্টি করেন।

বাংলাদেশ মিশন

বিশ্বের বিভিন্ন দেশে কর্মরত বাঙালি কূটনীতিবিদগণ ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চের পর বাংলাদেশ সরকারের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করেন।

বাঙালি কূটনীতিবিদদের নাম	কর্মরত দেশ
এম হোসেন আলী	কলকাতা, ভারত
হুমায়ুন রশীদ চৌধুরী	দিল্লি
কে এম শাহাবুদ্দিন	দিল্লি
আমজাদুল হক	দিল্লি
এ এইচ মাহমুদ আলী	নিউইয়র্ক
এস এ করিম	নিউইয়র্ক
এনায়েত করিম	ওয়াশিংটন
এম এ এস এম কিবরিয়া	ওয়াশিংটন
এ এম এ মুহিদ	ওয়াশিংটন
সৈয়দ মোয়াজ্জেম আলী	ওয়াশিংন
মহিউদ্দিন আহমেদ	লন্ডন
এ লুৎফুল মতিন	লন্ডন
রেজাউল করিম	লন্ডন
ওয়ালি উর রহমান	সুইজারল্যান্ড
এ এম এস ফাত্তাহ-রাষ্ট্রদূত	ইরাক
কে কে পন্নী-রাষ্ট্রদূত	ফিলিপাইন
এ রহিম	জাপান
মোস্তাফিজুর রহমান	নেপাল
এস এ জায়গীরদার	লাওস
মহিউদ্দিন আহমদ	হংকং

বাংলাদেশ সরকার লন্ডন, ওয়াশিংটন, নিউইয়র্ক, ভারত প্রভৃতি স্থানে মিশন প্রতিষ্ঠা করে। বাঙালি কূটনীতিবিদগণ বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে জনমত গঠন ও অর্থ সাহায্য করে।

মুজিব বাহিনী গঠন

ভারতের গোয়েন্দা সংস্থা (RAW- Research and Analysis Wing) বিশেষ

প্রশিক্ষণ দিয়ে Bangladesh Liberation Front-BLF গঠন করে। বিএলএফ-এর জনপ্রিয় নাম মুজিব বাহিনী। মুজিব বাহিনীর প্রশিক্ষণের দায়িত্বে ছিলেন ভারতীয় বাহিনীর মেজর জেনারেল ওবান। মুজিব বাহিনীর নেতৃত্বে ছিলেন শেখ ফজলুল হক মনি, সিরাজুল আলম খান, আব্দুর রাজ্জাক এবং তোফায়েল আহমদ। মুজিব বাহিনীর সংখ্যা ছিল প্রায় পাঁচ হাজার।

ভারতে মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী

মওলানা ভাসানী ২৫ মার্চের পর আসামে আশ্রয় নেন। মে মাসে তিনি কলকাতায় অবস্থান করে মুজিবনগর সরকারকে পরামর্শ দিতেন। ভারতে তিনি দেরাদুনে বসবাস করতেন।

১৯৭১ সালের সেপ্টেম্বর মাসে বাংলাদেশ সরকার সর্বদলীয় উপদেষ্টা কমিটি গঠন করে।

উপদেষ্টা কমিটির সদস্যগণ

মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী	চেয়ারম্যান, ভাসানী ন্যাপ
তাজউদ্দীন আহমদ	সদস্য, আওয়ামী লীগ
খন্দকার মোশতাক আহমদ	সদস্য, আওয়ামী লীগ
কমরেড মণি সিং	সদস, কমিউনিস্ট পার্টি
শ্রী মনোরঞ্জন ধর	সদস্য, কংগ্রেস
অধ্যাপক মোজাফফর আহমেদ	সদস্য, ন্যাপ

জাতিসংঘে বাংলাদেশ প্রতিনিধি দল

১৯৭১ সালের ২১ সেপ্টেম্বর জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের অধিবেশন বসবে। বাংলাদেশ সরকার জাতিসংঘে জনমত সৃষ্টির জন্য সেপ্টেম্বর মাসে একটি শক্তিশালী প্রতিনিধি দল নিউইয়র্কে প্রেরণ করে।

প্রতিনিধি দলে ছিলেন–

বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরী	দলনেতা
আব্দুস সামাদ আজাদ এমএনএ	সদস্য
ফনীভূষণ মজুমদার এমপিএ	সদস্য
সৈয়দ আবদুস সুলতান এমএনএ	সদস্য
ড. মফিজ চৌধুরী-এমএনএ	সদস্য
ডা. আহসাবুল হক-এমপিএ	সদস্য
ফকির সাহাবুদ্দিন-এমপিএ	সদস্য
এম আর সিদ্দিকী-এমএনএ	সদস্য

ড. আজিজুর রহমান মল্লিক	সদস্য
অধ্যাপক মোজাফফার আহমেদ ন্যাপ	সদস্য
অধ্যাপক রেহমান সোবহান	সদস্য
আবুল ফাত্তাহ	সদস্য
কে কে পন্নী	সদস্য
এস এ করিম	সদস্য
এম এ মুহিত	সদস্য

অন্যদিকে পাকিস্তান বাঙালি মাহমুদ আলীর নেতৃত্বে একটি দল প্রেরণ করে। এ দলে বাঙালি ছিলেন শাহ আজিজুর রহমান, এ টি সাদী, জুলমত আলী, রাজিয়া ফয়েজ– তারা জাতিসংঘে বলেন, পূর্ব পাকিস্তানের অবস্থা শান্ত, ভারত অভ্যন্তরীণ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করছে।

অধ্যায় ২২

মুক্তিযুদ্ধে ভারত, রাশিয়া, চীন ও আমেরিকার ভূমিকা

১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধে ভারত-রাশিয়া বাংলাদেশের পক্ষে ঐতিহাসিক ভূমিকা পালন করেছে। ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ পাকবাহিনী পূর্ব পাকিস্তানে গণহত্যা শুরু করলে ভারতের প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী তার প্রতিবাদ করেন। ভারতীয় পার্লামেন্ট পূর্ব পাকিস্তানে রাজনৈতিক সমাধান চায়। ১৯৭১ সালের ২ এপ্রিল রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খানের নিকট পত্র লেখেন। রাশিয়া পূর্ব পাকিস্তানে রাজনৈতিক সমাধান চায়।

চীনের প্রধানমন্ত্রী চৌ এন লাই পাকিস্তানের প্রেসিডেন্টের নিকট পত্র প্রেরণ করে বলেন, 'চীনের সরকার ও জনগণ সকল সময় পাকিস্তান সরকার ও জনগণের রাষ্ট্রীয় সার্বভৌমত্ব ও জাতীয় স্বাধীনতা রক্ষায় জনগণকে সমর্থন জানাবে।'

১৯৭১ সালের ২৫ মার্চের পর ভারত বিএসএফের মাধ্যমে মুক্তিযোদ্ধাদের সহায়তা করে আসছে। কিন্তু ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধ শুরু হলে চীন ও আমেরিকা পাকিস্তানের পক্ষে যুদ্ধে জড়িয়ে পড়তে পারে। তাই ভারতের রাশিয়ার সমর্থন একান্ত প্রয়োজন। ১৯৭১ সালের ৯ আগস্ট দিল্লিতে সোভিয়েত রাশিয়া ও ভারতের মধ্যে একটি সামরিক চুক্তি স্বাক্ষর করে। রাশিয়র পক্ষে পররাষ্ট্রমন্ত্রী আন্দ্রে গ্রোমিকো এবং ভারতের পক্ষে পররাষ্ট্রমন্ত্রী শরণ সিং এ চুক্তিতে স্বাক্ষর করেন। এ চুক্তির ফলে ভারত পাকিস্তানের বিরুদ্ধে প্রয়োজনে যুদ্ধ করতে পারবে এবং চীন-আমেরিকা যদি পাকিস্তানের পক্ষে এগিয়ে আসে তাহলে সোভিয়েত রাশিয়া ভারতের সহায়তায় এগিয়ে আসবে।

১৯৭১ সালের ডিসেম্বর মাসে আমেরিকা যুদ্ধবিরতি বাস্তবায়নকল্পে সপ্তম নৌবহর প্রেরণ করলে সোভিয়েত রাশিয়াও তার নৌবহর পাঠিয়ে দেয়। ফলে সপ্তম নৌবহর পিছু হটে যায়। এভাবে ভারত ও রাশিয়া মৈত্রী চুক্তি ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধকালে চীন-আমেরিকাকে সরাসরি যুদ্ধে জড়িত হওয়া থেকে বিরত রাখে।

মুক্তিযুদ্ধের বিরুদ্ধে আমেরিকার ষড়যন্ত্র

১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধে আমেরিকা বাংলাদেশের বিরোধিতা ও পাকিস্তানের পক্ষ অবলম্বন করে। মুক্তিযুদ্ধের শুরু থেকে আমেরিকা অস্ত্র দিয়ে পাকিস্তানকে সাহায্য করে। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে ও জাতিসংঘে আমেরিকা মুক্তিযুদ্ধবিরোধী ভূমিকা পালন করে। এমনকি আমেরিকার সরকার মুজিবনগর সরকারের ভিতরে পররাষ্ট্রমন্ত্রী খন্দকার মোশতাক আহমদ ও পররাষ্ট্র সচিব মাহবুব আলম চাষীর সাথে ষড়যন্ত্র করে মুক্তিযুদ্ধ পর্যুদস্ত করার ষড়যন্ত্র করেছিল। কলকাতায় অবস্থিত আমেরিকার কনসাল এ ব্যাপারে উদ্যোগ গ্রহণ করেন। পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান বন্দী শেখ মুজিবুর রহমানের সাথে আলোচনা করতে উৎসাহী ছিলেন না। সে কারণে আমেরিকার প্রেসিডেন্ট নিক্সনের সহকারী হেনরি কিসিঞ্জার আলোচনার ক্ষেত্র তৈরির সূচনা করেন। কিসিঞ্জারের বিবরণে দেখা যায়, কুমিল্লা থেকে নির্বাচিত আওয়ামী লীগের নেতা কাজী জহিরুল কাইয়ুম একদলের পক্ষে কলকাতায় আমেরিকার কনস্যুলেটরের সাথে সাক্ষাৎ করে পাকিস্তানের সাথে সমঝোতার প্রস্তাব দেন।

প্রস্তাবের শর্ত ছিল, শেখ মুজিবকে আলোচনায় উপস্থিত থাকতে হবে এবং ৬ দফা গ্রহণ করে বাংলাদেশের স্বাধীনতা প্রদান করতে হবে। আগস্ট মাসের মাঝামাঝি পাকিস্তানে আমেরিকার রাষ্ট্রদূত ফারল্যান্ড ইয়াহিয়া খানের নিকট সমঝোতার প্রস্তাব দিলে তিনি সাথে সাথে রাজি হয়ে যান এবং ফারল্যান্ডকে প্রবাসী সরকারের সাথে গোপন বৈঠক করতে বলেন। মধ্য সেপ্টেম্বরে আমেরিকান কনস্যুলেট জহিরুল কাইয়ুমকে বাংলাদেশ সরকার থেকে আয়োজন করতে বলেন। জহিরুল কাইয়ুম জানালেন যে, যেহেতু ভারতের এ ব্যাপারে আপত্তি আছে সে কারণে তার পক্ষে আলোচনার আয়োজন করা সম্ভব নয়।

১৯৭১ সালের ২১ সেপ্টেম্বর ইয়াহিয়া খান ফারল্যান্ডের নিকট আলোচনা আয়োজনের অগ্রগতি সম্পর্কে জানতে চান। ২৩ সেপ্টেম্বর জহিরুল কাইয়ুম আমেরিকার কনসালকে হুঁশিয়ার করে বলেন, ভারত সরকার বাংলাদেশ সরকারকে দিল্লির মাধ্যমে সকল যোগাযোগ করার নির্দেশ দিয়েছে। ২৭ সেপ্টেম্বর আমেরিকার পররাষ্ট্রমন্ত্রী ওয়াশিংটনে ভারতীয় রাষ্ট্রদূতের নিকট পাকিস্তান ও বাংলাদেশের প্রতিনিধিদের মধ্যে এক শর্তহীন আলোচনার প্রস্তাব দেন। ভারতের রাষ্ট্রদূত শেখ মুজিবের আশু মুক্তি ও বাংলাদেশের স্বাধীনতার দাবি জানান।

২৮ সেপ্টেম্বর আমেরিকার কনসালের সাথে বাংলাদেশ সরকারের পররাষ্ট্রমন্ত্রী খন্দকার মোশতাক আহমদের এক বৈঠক হয়। ভারত সরকার খন্দকার মোশতাকের গতিবিধির ওপর নজর রাখতেন। এ কারণে তিনি অনেক

শর্তের সাথে আলোচনায় সোভিয়েত রাশিয়ার শর্ত জুড়ে দেয়। ১৬ অক্টোবর জহিরুল কাইয়ুম ভারতের আপত্তির কারণে ভারপ্রাপ্ত রাষ্ট্রপতি পর্যায়ে আলোচনার কোনো সুযোগ নেই বলে জানিয়ে দেয়। কিসিঞ্জার বলেন, অক্টোবর শেষে বাংলাদেশ নেতাদের সাথে আলোচনার সকল পথ রুদ্ধ হয়ে যায়।

লরেন্স লিফশুলজ তার গ্রন্থে বলেন, মোশতাকের দলের সাথে আমেরিকার কর্মকর্তাদের কলকাতা ও অন্যান্য স্থানে ৮টি গোপন বৈঠক হয়েছে। ১৯৭১ সালে জাতিসংঘে পররাষ্ট্রমন্ত্রী খন্দকার মোশতাক আহমদ বাংলাদেশ বিষয়ে বক্তব্য পেশ করতে যাবেন। কিন্তু প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দীন আহমদ খন্দকার মোশতাকের ষড়যন্ত্রের কথা জানতে পেরে তার স্থলে বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরীকে বাংলাদেশ দলের নেতা নির্বাচিত করেন এবং তার নেতৃত্বে বাংলাদেশ দল নিউইয়র্ক গমন করেন। এভাবে খন্দকার মোশতাক আহমদের ষড়যন্ত্র থেকে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ বেঁচে যায়।

ভারতের প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর বিদেশ সফর

বিশ্ব জনমত ভারতের অনুকূলে আনার জন্য প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী ২৪ অক্টোবর হতে ৬টি দেশ ভ্রমণের জন্য দিল্লি ত্যাগ করেন। তিনি বেলজিয়াম, অস্ট্রিয়া, আমেরিকা, ফ্রান্স, বৃটেন, জার্মানি সফর করে ১২ নভেম্বর তিনি দেশে ফেরেন। ইন্দিরা গান্ধী বিদেশ সফর করেছেন কিছু পাওয়ার জন্য নয়। তাদের উপমহাদেশের পরিস্থিতি সম্পর্কে অবহিত করা। সফরকালে একপর্যায়ে ইন্দিরা গান্ধী বলেছেন, "I feel I am sitting on a Volcano. আমি অনুভব করি যে, আমি আগ্নেগিরির ওপর বসে আছি।"

১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা এবং পাকবাহিনীর সাথে মুক্তিবাহিনীর যুদ্ধ আন্তর্জাতিকরূপ লাভ করে। এ যুদ্ধ পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় সরকার ও বিচ্ছিন্ন পূর্ব পাকিস্তানের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল না। ভারত, রাশিয়া ও আমেরিকা এ সময় জড়িয়ে পড়ে। যুদ্ধ শুরু হওয়ার সাথে সাথে শরণার্থী, নেতাকর্মীরা ভারতে আশ্রয় নেয়। ১৯৭১ সালের ৩০ মার্চ ভারতের রাজ্যসভা পাক সেনাদের বর্বরোচিত হামলায় উদ্বেগ প্রকাশ এবং বাঙালিদের সাথে একাত্মতা প্রকাশ করে।

১৯৭১ সালের ২৮ মে আমেরিকার প্রেসিডেন্ট নিক্সন ভারতের প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী ও পাকিস্তানের প্রেসিডেন্টকে পত্র লিখে তাদের ধৈর্য ধারণের অনুরোধ জানান।

২ এপ্রিল সোভিয়েত প্রধানমন্ত্রী আলেক্সি কোসিগিন প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া

খানের নিকট পত্র লিখে তার সরকারের রক্তপাত, হত্যার জন্য দায়ী করে পূর্ব পাকিস্তানের রাজনৈতিক সমস্যার সমাধানের উপদেশ দেন। প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান উদ্যত ভাষায় কোসিগিনের পত্রের উত্তর দেন। রাশিয়া পাকিস্তানকে সমুচিত শিক্ষা দেয়ার জন্য অপেক্ষা করে।

২৪ জুন কোসিগিন ভারতে শরণার্থী ও পূর্ব পাকিস্তানের রাজনৈতিক সমাধানের আহ্বান জানান। পাকিস্তান এ সকল উপদেশের প্রতি কোনো কর্ণপাত না করে সামরিক শক্তি দিয়ে বাঙালিদের দমনের পথ বেছে নেয়। ১৯৭১ সালের ৯ এপ্রিল চীনের প্রধানমন্ত্রী চৌ এন লাই পাকিস্তানের প্রেসিডেন্টের পত্রের জবাব দেন। তিনি আশ্বাস দেন যে, পাকিস্তানের সার্বভৌমত্ব রক্ষার সংগ্রামে চীন তার পাশে থাকবে।

আমেরিকার বিশেষ দূত হেনরি কিসিঞ্জার পাকিস্তানের মাধ্যমে চীনের রাজধানী বেজিং সফর করেন। ১৫ জুলাই কিসিঞ্জার ঘোষণা করেন যে, তিনি বেজিং সফর করছেন। এ সংবাদে বিশ্ব হতবাক হয়ে যায়। চীনের সাথে কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপন হওয়ায় বিশ্ব পরিবর্তন শুরু হয়।

১৯৭১ সালের ৮ আগস্ট সোভিয়েত পররাষ্ট্রমন্ত্রী আন্দ্রে গ্রোমিকো ১২ সদস্য নিয়ে দিল্লি আসেন এবং ৯ আগস্ট ইন্দো-সোভিয়েত শান্তি, বন্ধুত্ব এবং সহযোগিতা চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। ১২ আগস্ট তারা উভয়ে যুক্ত বিবৃতি প্রদান করেন।

৭ অক্টোবর কেসিগিন ইয়াহিয়া খানকে হুঁশিয়ারি পত্র লেখেন। ২৩ নভেম্বর রাশিয়া পুনরায় উপমহাদেশের শান্তি বিঘ্নিত করার জন্য দায়ী করে পাকিস্তানের নিকট পত্র পাঠান। যুদ্ধ শুরুর ৪ দিন পর রাশিয়া আবার পত্র লিখে ১৯৭০ সালের নির্বাচনের ভিত্তিতে পূর্ব পাকিস্তানের রাজনৈতিক সমাধানের অনুরোধ করে। পাকিস্তান যুদ্ধ ঘোষণা করলে রাশিয়া স্বাধীন বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠায় বলিষ্ঠ পদক্ষেপ গ্রহণ করে।

পাকিস্তানের কারাগারে বিচার

পাকিস্তান শেখ মুজিবুর রহমানকে ১৯৭১ সালের ৩১ মার্চ করাচী নিয়ে আসে। তাকে ফয়সালাবাদ জেলে বন্দী করে রাখা হয়। জেলে তাকে সুযোগ-সুবিধা দেয়া হয়নি। তাকে সংবাদপত্র দেয়া হতো না। ফলে বাংলাদেশে গণহত্যা ও মুক্তিযুদ্ধ চলছে সে সম্পর্কে তিনি অবহিত ছিলেন না।

পাকিস্তানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণার অভিযোগে তার বিচার হবে পাকিস্তান আর্মি অ্যাক্টের অধীনে। প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক সিএমএলএ ফিল্ড মার্শাল

কোর্টের ক্ষমতা দিয়ে গঠিত বিশেষ সামরিক আদালতে বিচার করা হয়। কোর্টের চেয়ারম্যান ছিলেন একজন ব্রিগেডিয়ার। সদস্য ছিলেন একজন নৌবাহিনী ও একজন বিমান বাহিনীর অফিসার এবং পাঞ্জাবের একজন জেলা জজ ছিলেন। তার বিরুদ্ধে ১২টি অভিযোগ আনা হয়। তার বিরুদ্ধে অভিযোগ ছিল তিনি পাকিস্তানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেছেন। তিনটি অভিযোগ পাকিস্তান দণ্ডবিধির এবং অন্যান্য অভিযোগ ছিল সামরিক আইনে। অধিকাংশ অভিযোগের শাস্তি ছিল মৃত্যুদণ্ড। যদিও শেখ মুজিবুর রহমানের অনুমতি নিয়ে এ কে ব্রোহিকে তার আইনজীবী নিয়োগ করা হয়। কিন্তু যখন তাকে ২৬ মার্চের ইয়াহিয়া খানের দেয়া ভাষণের টেপ শোনানো হয়, তখন বঙ্গবন্ধু আত্মপক্ষ সমর্থনের অস্বীকার করেন এবং ব্রোহিকে অব্যাহতি দেন। শেখ মুজিব বলেন, তার ভাগ্য পূর্বনির্ধারিত। শেখ মুজিবের আপত্তি সত্ত্বেও সরকার ব্রোহিকে তার আইনজীবী হিসেবে মামলা চালিয়ে যেতে বলে। সরকার ১০৫ জন সাক্ষীর তালিকা পেশ করে। মাত্র অর্ধেক সাক্ষ্য জানানো হয়। সাক্ষী ছিলেন মূলত বাঙালি অফিসারগণ। আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে সরকারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত থাকার কথা তারা স্বীকার করেন। সেনাবাহিনীর হেফাজতে থেকে পুলিশ তাদের স্বীকারোক্তি আদায় করে। ১৯৭১ সালের ৪ ডিসেম্বর বিশেষ সামরিক আদালত জেলা জজ ব্যতীত সকল সদস্য শেখ মুজিবুর রহমানের বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ প্রমাণিত হয়েছে বলে রায় প্রদান করেন এবং তাকে মৃত্যুদণ্ড প্রদান করা হয়। এ রায় কার্যকর করার জন্য প্রধান সামরিক আইন প্রশাসকের অনুমতি প্রয়োজন। শেখ মুজিবের বিচার সম্পর্কে কেন্দ্রের তথ্য সচিব রোয়েদাদ খান একটি ঘটনা বলেন। একদিন জেনারেল গুল হাসান প্রেসিডেন্টের নিকট শেখ মুজিবের ভবিষ্যত সম্পর্কে জানতে চান। ইয়াহিয়া খান টেবিলে ঘুরে ঘুরে প্রশ্ন করলেন, বিচার করে মৃত্যু বা বিচার ছাড়া মৃত্যু? তিনি liquidation শব্দ ব্যবহার করেন। তার অর্থ হতে পারে ফায়ারিং স্কোয়াডে মৃত্যু। দু'জন বেসামরিকসহ কয়েকজন বলেন, তার বিচার করা হোক। জেনারেলরা তাকে বিচার ছাড়া হত্যার পক্ষে মত দেন। এ ছিল উন্মত্ততা। কয়েকজন দুঃখ করে বলেন, এ বদমাইশকে (মুজিব) অভিযানের প্রথম প্রহরে খতম করা উচিত ছিল। আগস্ট মাসে বিশ্ব বিষয়টি হালকাভাবে নেবে না। আমেরিকা নিশ্চয়তা আদায় করে যে, তার মৃত্যুদণ্ড হবে না। ইয়াহিয়া খান তার মতের বিরুদ্ধে শেখ মুজিবকে বাঁচিয়ে রাখেন। কিন্তু তিনি অভিযোগ প্রত্যাহার বা মুক্তি দিতে নারাজ ছিলেন। যুদ্ধে যদি ইয়াহিয়া খান জয়লাভ করতেন তাহলে ইয়াহিয়া খান তাকে মৃত্যুদণ্ড দিতেন।

অধ্যায় ২৩

মুক্তিযুদ্ধকালে বঙ্গবন্ধুর পরিবার

বঙ্গবন্ধুকে গ্রেফতারের পর শেখ কামাল বাসা থেকে পালিয়ে যান। বেগম মুজিব শেখ জামাল ও শেখ রাসেলকে নিয়ে পাশে মোশাররফ হোসেনের বাসায় আশ্রয় নেন। তিনি স্বামী ও পুত্র কামালের জন্য ব্যাকুল।

২৬ মার্চ বঙ্গবন্ধুর ফুফাত ভাই মমিনুল হক খোকা জীবনের ঝুঁকি নিয়ে ৩২ নম্বর ধানমণ্ডির বাসায় এসে বেগম মুজিবকে খুঁজে পান। তিনি বেগম মুজিব, দুই পুত্রকে নিয়ে মগবাজার এসেছেন। তখন কারফিউ ও গুলিবর্ষণ শুরু হয়েছে। কাছেই ছিল মমিনুল হকের বন্ধু ইঞ্জিনিয়ার আলীর বাসা। কোনো রকমে তারা একটি কামরায় রাত কাটান। ২৭ মার্চ কারফিউ শিথিল করা হয়। মমিনুল হক বেগম মজিব ও তার সন্তানদের নিয়ে ওয়ারীতে তার শ্বশুরের বাসায় পৌঁছেন। কিন্তু পাড়া-প্রতিবেশীরা বঙ্গবন্ধুর পরিবারের অবস্থান মেনে নিতে পারেনি।

মমিনুল হক মালিবাগ চৌধুরীপাড়ায় তার এক পরিচিত মহিলার বাসা ভাড়া নেন। বেগম মুজিব সন্তানদের নিয়ে আসেন। বেগম মুজিব কন্যা হাসিনা ও ওয়াজেদ মিয়ার জন্য চিন্তিত। মমিনুল হক শেখ হাসিনা, রেহানা ও ড. ওয়াজেদের সংবাদ নিয়ে আসেন। মালিবাগ চৌধুরীপাড়ায় ড. ওয়াজেদ তার এক সহকারীর বাসায় অবস্থান করছেন। এক সময় শেখ কামাল বাসায় আসেন। মা-ছেলে জড়িয়ে কান্নাকাটি করেন। তারপর শেখ কামাল ভারতে চলে যান এবং মুক্তিযুদ্ধে অংশ নেন।

চৌধুরীপাড়ার বাসায় দিন কাটছে, স্বাধীন বাংলা বেতারের সংবাদ শুনছেন। হঠাৎ একদিন বেগম মুজিবের বোনের ছেলে শেখ শহীদ চৌধুরীপাড়ায় বেগম মুজিবের কাছে বিদায় নিতে আসেন। পাশের বাসার এক ডিএসপির স্ত্রী শেখ শহীদকে চিনতেন। তিনি বাড়ির মালিক মহিলাকে বলেন, শেখ পরিবার এখানে থাকলে তারা ধ্বংস হয়ে যাবেন। মমিনুল বাসা খোঁজ করছেন। কিন্তু শেখ পরিবারকে কেউ বাসা ভাড়া দিতে চায় না। বেগম মুজিব বঙ্গবন্ধুর ভাগ্য নিয়ে চিন্তিত। এপ্রিল মাসের প্রথম সপ্তাহে সকল দৈনিক পত্রিকায় বন্দী অবস্থায়

বঙ্গবন্ধুর ছবি দেখে সবাই জানতে পারে তিনি জীবিত আছেন। ছবিটি করাচীর বিমানবন্দরে ভিআইপি লাউঞ্জে তোলা হয়েছে। একদিকে পাক মিলিশিয়ারা মোমিনুল হকের খোঁজ করছে। বেগম মুজিব অবিলম্বে বাসা ত্যাগ করেন। মগবাজারে এক বাসার মালিক এক ভদ্রমহিলা শেখ পরিবারের পরিচয় পেয়ে সাহসের সাথে তাদের আশ্রয় দেন। নতুন বাসায় দিন কাটে।

একদিন ড. ওয়াজেদ আসন্ন প্রসবা শেখ হাসিনাকে নিয়ে বেগম মুজিবের বাসায় চলে আসেন। ড. ওয়াজেদ নিয়মিত অফিসে যাচ্ছেন। বেগম মুজিবের নির্দেশে মমিনুল হক বেগম তফাজ্জল হোসেনের বাসায় যান। বেগম তফাজ্জল হোসেন পুত্র আনোয়ার হোসেনকে নিয়ে ধানমণ্ডির বাসায় থাকেন। একদিন আর্মি মঞ্জুকে ধরে নিয়ে যায়। তিনি বাসায় ফিরে এসে বলেন, আর্মি বঙ্গবন্ধুর পরিবারকে খুঁজছে। বেগম তোফাজ্জল হোসেন ও আনোয়ার হোসেন বেগম মুজিবের সাথে দেখা করেন। আনোয়ার হোসেন বেগম মুজিব ও মমিনুল হককে বাসার সংবাদ দেন। বেগম মুজিব ও মোমিনুল হক আনোয়ার হোসেন মঞ্জুর বাসায় পৌঁছে মেজর জেনারেল ওমরকে বসা দেখেন। জেনারেল ওমর বেগম মুজিবকে পশ্চিম পাকিস্তানে অথবা সেনানিবাসে থাকার প্রস্তাব দেন। বেগম মুজিব বাংলাদেশ থেকে কোথাও যাবেন না। জেনারেল ওমর ও মমিনুল হক ধানমণ্ডির ১৮ নম্বরে একটি বাসা ঠিক করেন। বেগম মুজিব প্রথমে ৩২ নম্বরের বাসায় যান। বাসার সব কিছু তছনছ, অনেক মূল্যবান জিনিস চুরি হয়েছে। তিনি এক কাপড়ে বাড়ি ছেড়েছেন। ৩২ নম্বর থেকে বেগম মুজিব মগবাজার যান। এবার তিনি বেঁকে বসলেন। কিছুতেই তিনি ধরা দেবেন না। ইতোমধ্যে সেনাবাহিনী বাসা ঘিরে ফেলে এবং তাদের ধানমণ্ডি ১৮ নম্বরে নিয়ে যায়। সেখানে তারা পাক সেনাদের পাহারায় থাকেন। বাসায় হাঁড়ি পাতিল ফার্নিচার কিছুই ছিল না। অনেক কষ্টে তারা দিন যাপন করেন। সেনাবাহিনীর নির্দেশ ছাড়া কোথাও যাওয়া যায় না।

টুঙ্গিপাড়ায় সেনাবাহিনী বঙ্গবন্ধু বাবা-মাকে বের করে দিয়ে আগুন দিয়ে ঘরবাড়ি পুড়িয়ে ফেলে। বাড়ির কয়েকজনকে হত্যা করে। বঙ্গবন্ধুর বাবা-মা ঢাকায় চলে আসেন। তারা বঙ্গবন্ধুর কনিষ্ঠ বোন লিলির বাসায় ওঠেন। তারা অসুস্থ হলে ডা. নুরুল ইসলাম তাদের পিজি হাসপাতালে ভর্তি করেন। শেখ হাসিনার সন্তান হবে। তাকে ঢাকা মেডিকেল কলেজে ভর্তি করা হয়। বেগম মুজিব মেয়ের সাথে থাকতে চান। কিন্তু সেনাবাহিনী তাকে অনুমতি দেয়নি। তখন শেখ মুজিবের ছোট বোন লিলি আয়া সেজে শেখ হাসিনার দেখাশুনা করেন। ১৯৭১ সালের ২৯ জুলাই শেখ হাসিনা পুত্র সন্তান লাভ করেন। কয়েকদিন পর

শেখ হাসিনা ১৮ নম্বর ধানমণ্ডি চলে আসেন। পুত্রের নাম রাখা হয় জয়। শেখ জামাল মুক্তিযুদ্ধে যোগ দেবেন। একদিন জামাল এক সৈনিকের সাহায্যে বাসা থেকে পালিয়ে যায়। এ ঘটনা নিয়ে সেনাবাহিনী পরিবারে আতঙ্ক সৃষ্টি করে। এ সময় বেগম মুজিব ড. ওয়াজেদকে নিয়ে মেজর জেনারেল রাও ফরমান আলীর সাথে দেখা করেন। তাদের ওপর সেনাবাহিনীর চাপ কমে যায়। কিন্তু সেনাবাহিনী মমিনুল হককে ধরে নিয়ে যায়। মেজর হাসান তাকে রক্ষা করেন।

দীর্ঘ ৯ মাস গৃহবন্দীর পর ১৯৭১ সালের ১৭ ডিসেম্বর বঙ্গবন্ধুর পরিবারকে ভারতীয় বাহিনীর মেজর তারা তাদের উদ্ধার করেন।

অধ্যায় ২৪

পৃথিবী কাঁপানো তেরো দিনের যুদ্ধ
৩-১৬ ডিসেম্বর

ভারতের যুদ্ধপ্রস্তুতি

১৯৭১ সালের ২৫ মার্চের পর লক্ষ লক্ষ শরণার্থী ভারতে আশ্রয়ের জন্য প্রবেশ করতে থাকে। ভারতের আবেদনে কোনো দেশ বাংলার রাজনৈতিক সমাধানে এগিয়ে আসেনি। তাই বাংলার সমস্যা সমাধানে ভারতকে এগিয়ে আসতে হয়েছে।

১৯৭১ সালের এপ্রিল মাসে প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী মন্ত্রিপরিষদের সভা আহ্বান করেন। সভায় জেনারেল মানেকশ উপস্থিত ছিলেন। প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা জেনারেল মানেকশকে শরণার্থীদের আগমন বন্ধ করার জন্য পূর্ব পাকিস্তানের অভ্যন্তরে প্রবেশের নির্দেশ দেন। মানেকশ বলেন, এ মুহূর্তে আক্রমণ করলে পরাজয় বরণ করতে হবে। লে. জেনারেল জে এফ আর জ্যাকব ইস্টার্ন কমান্ডার ছিলেন। তার মাত্র এক ডিভিশন সেনা আছে। ১৫ নভেম্বরের পূর্বে তাদের পক্ষে যুদ্ধ করা সম্ভব নয়। পশ্চিম বাংলার বিএসএফ মুক্তিযোদ্ধাদের সহায়তা করছে। বিএসএফের মহাপরিচালক কে রুস্তমজি এবং উপমহাপরিচালক ছিলেন গোলক মজুমদার। ১৯৭১ সালের ২৯ এপ্রিল ভারতের সেনাবাহিনী সরকারিভাবে মুক্তিযোদ্ধোদের সাহায্যের দায়িত্ব গ্রহণ করে।

জেনারেল মানেকশ ১৯৭১ সালের মে হতে অক্টোবর মাসের মধ্যে পাকিস্তান সেনাবাহিনীর সাথে যুদ্ধ করার সকল প্রস্তুতি গ্রহণ করেন। একই সময়ে মুক্তিযোদ্ধাদের আক্রমণে সহায়তা করেন। তারা মুক্তিযোদ্ধাদের প্রশিক্ষণ ও অস্ত্র প্রদান করে।

পাকিস্তান সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য ভারতের ইস্টার্ন কমান্ডের ৩টি নিয়মিত এবং একটি কমিউনিকেশন জোন ছিল। তারা বাংলাদেশকে ৫টি সেক্টরে বিভক্ত করে সেনাবাহিনী মোতায়েন করেন। কমান্ডার ছিলেন লে. জেনারেল জগজিৎ সিং অরোরা।

ভারতীয় সেনাবাহিনীর অবস্থান-নভেম্বর ১৯৭১

সেক্টর	সেনাবাহিনীর অবস্থান
উত্তর সেক্টর ময়মনসিংহ, টাঙ্গাইল, ঢাকা সদর দফতর শিলিগুড়ি	অধিনায়ক মেজর জেনারেল গুরুবক্স সিং
উত্তর পশ্চিম সেক্টর রংপুর, দিনাজপুর, বগুড়া, রাজশাহী, পাবনা সদর দফতর শিলিগুড়ি	৩৩ কোর কমান্ডার মেজর জেনারেল থাপ্পা ৬ নম্বর মাউন্টেন ডিভিশন মেজর জেনারেল পিপি রেড্ডি ৯ম মাউন্টেন ডিভিশন মেজর জেনারেল লচমন সিংহ
পশ্চিমাঞ্চল সেক্টর কুষ্টিয়া, যশোর, ফরিদপুর, খুলনা বরিশাল-পটুয়াখালী সদর দফতর নদীয়া জেলার কৃষ্ণনগর	ভারতীয় বাহিনীর ২ কোর কমান্ডার লে. জেনারেল টি এন রায়না, নবম ডিভিশন মেজর জেনারেল দলবীর সিংহ, চতুর্থ মাউন্টেন ডিভিশন অধিনায়ক মেজর জেনারেল মহিন্দর সিং বারা
পূর্ব সেক্টর সিলেট, কুমিল্লা, নোয়াখালী, চট্টগ্রাম পার্বত্য চট্টগ্রাম সদর দফতর আগরতলা	ভারতীয় বাহিনী ৪র্থ কোর কমান্ডার লে. জেনারেল সাগত সিং, ৮ম মাউন্টেন মেজর জেনারেল কৃষ্ণ রায়, ৫৭ মাউন্টেন ডিভিশনের মেজর জেনারেল আরটি হীরা
পূর্বাঞ্চল আসাম, গৌহাটি	১০১ কমিউনিকেশন জোন-৯৫, ৬৩ ব্রিগেড-অধিনায়ক মেজর জেনারেল জি এম গিল, মেজর জেনারেল নাগরা

ভারতীয় বিমান বাহিনীর প্রধান এয়ার মার্শাল পি সি লাল কলকাতায় অবস্থিত অধিনায়কের স্থান সমন্বয় করতেন।

ভারতের বিরুদ্ধে পাকিস্তানের যুদ্ধ ঘোষণা

১৯৭১ সালের ২৯ নভেম্বর প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান, জেনারেল হামিদ বিমান ও নৌবাহিনী প্রধানদের সাথে আলোচনা করে ৩ ডিসেম্বর ভারত আক্রমণ এবং পশ্চিম পাকিস্তানে যুদ্ধের ফ্রন্ট খোলার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। ১৯৭১ সালের ৩ ডিসেম্বর বিকেল ৪টা ২০ মিনিটে পাকিস্তান বিমান বাহিনী ভারত

আক্রমণ করে। পাকিস্তানের বিমান ভারতের বিমান বন্দর অমৃতসর, পাঠানকোটে বোমা বর্ষণ করে। ভারতও পাকিস্তানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে। ৪ ডিসেম্বর ভারতীয় বিমান বাহিনী তেজগাঁও ও কুর্মিটোলা বিমানবন্দর আক্রমণ করে ব্যাপক ক্ষতি সাধন করে। পাকিস্তান বিমান বাহিনীর পূর্বাঞ্চলে মাত্র ১৪টি স্যাবর জেট ছিল। এগুলো রাতে কোনো অভিযান পরিচালনা করতে পারত না।

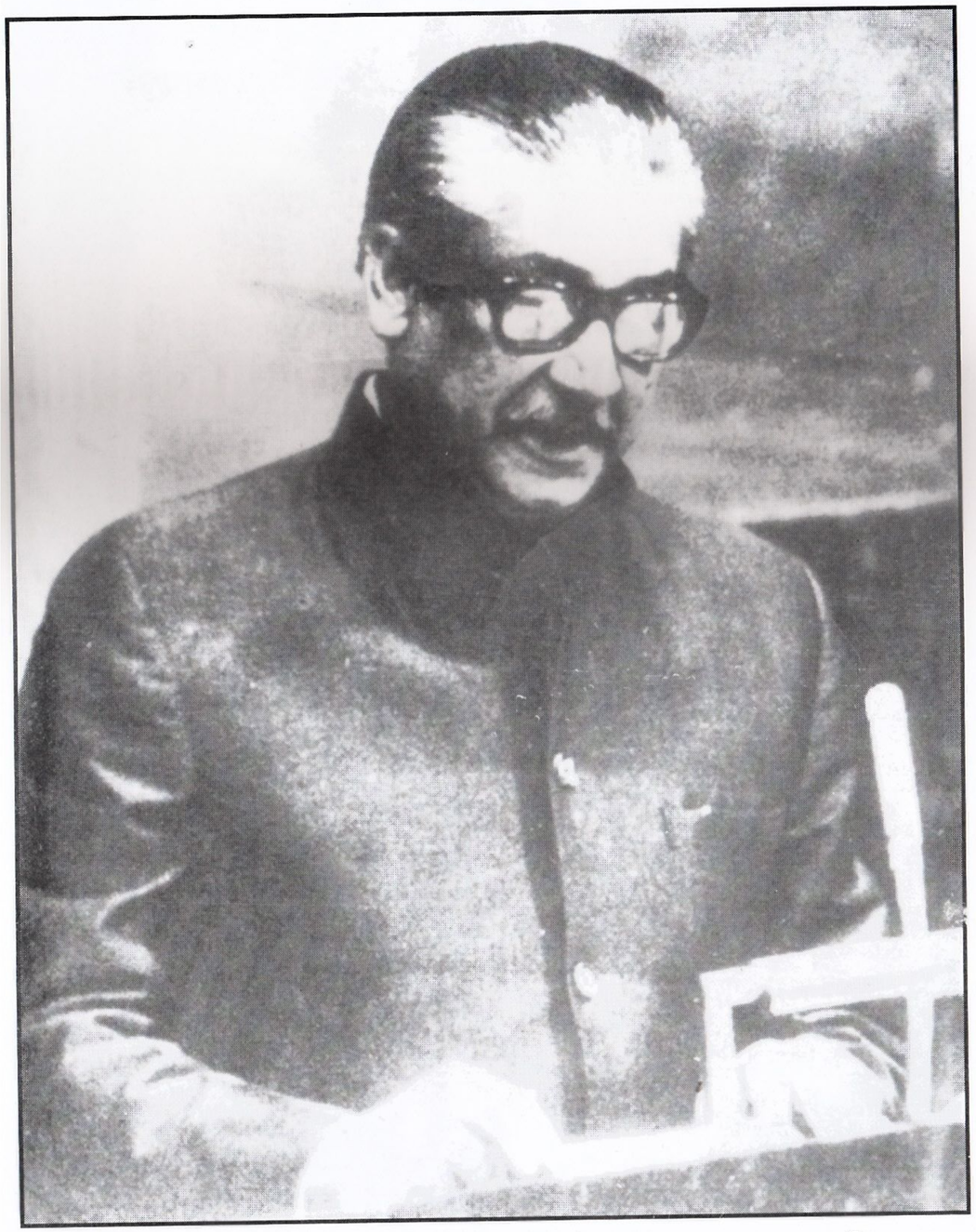
যুদ্ধ শুরুর সময় পূর্বাঞ্চলে ভারত-পাকিস্তান সেনাবাহিনীর অবস্থান নিম্নরূপ ছিল :

	ভারত	পাকিস্তান
	৮,২৩,৫৭০ তিন ডিভিশন নিয়ে গঠিত ৪ নম্বর করপস মাঝে ছিল ৩টি আর্মার্ড স্কোয়াড্রন	১৪,৩৯ ডিভিশন ১৯ক ৫৩ক ব্রিগেড
যশোর সেক্টর	৪ এবং ৯ম ডিভিশন নিয়ে গঠিত ২ করপস। এ ছাড়া ছিল একটি ব্রিগেড এবং ২ আর্মার্ড রেজিমেন্ট	২ ব্রিগেড নিয়ে ৯ম ডিভিশন একটি আর্মার্ড স্কোয়াড্রন-৮টি ট্যাংক
ঢাকা ময়মনসিংহ	১০১ কমিউনিকিশেন জোন ৯৫, ৬৩ ব্রিগেড	৯৩ ব্রিগেড, ৩১৪ ব্রিগেড নিয়ে গঠিত ৩৩৬ এ ডিভিশন
রাজশাহী সেক্টর	২০, ৬ মাউন্টেন ডিভিশন নিয়ে ৩৩ করপস-এর সাথে ছিল একটি পৃথক ব্রিগেড	১৬ নম্বর ডিভিশন এবং ২৯ ক্যাভালরি
	ভারতীয় বিমান বাহিনীর ১৭ স্কোয়াড্রন এম ইউ-৭ এবং মিগ-২১ ৫টি বিমান বন্দর ভিক্রান্তসহ ভারতীয় নৌবাহিনীর স্কোয়াড্রন	পিএএফ-এক স্কোয়াড্রন একটি বিমানবন্দর ৪টি গানবোট

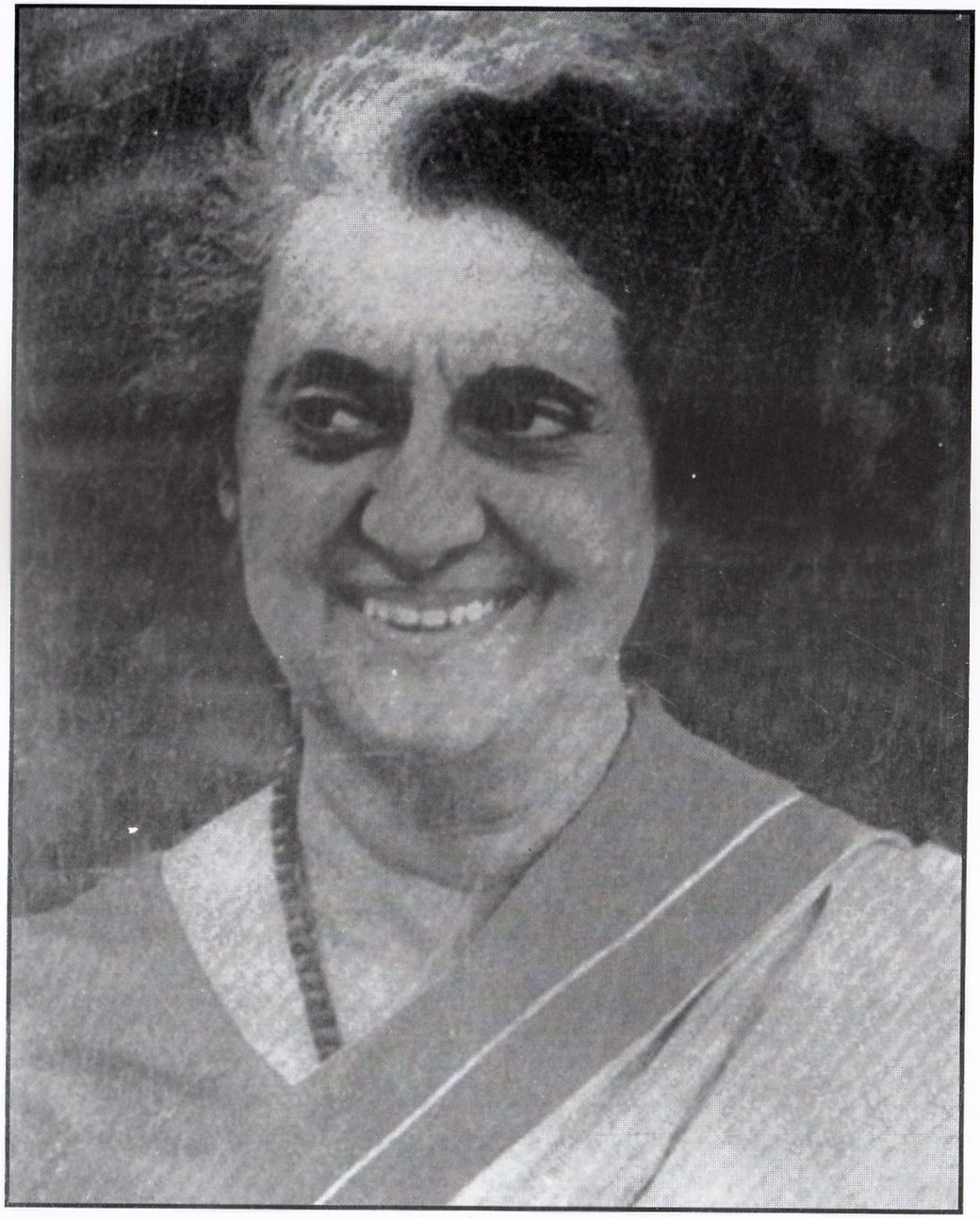
১৯৭১ সালে ডিসেম্বর মাসে ভারত ও পাকিস্তানের সামরিক শক্তির তুলনামূলক সংখ্যা নিম্নে উল্লেখ করা হলো–



বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান



২৪ সেপ্টেম্বর ১৯৭৪, জাতিসংঘে প্রথম বাংলা ভাষায় ভাষণ দান করছেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান



ভারতের প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী ১৯৭১ সাল



সোভিয়েত প্রধানমন্ত্রী আলেক্সি কোসিগিনের সাথে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধু



বাকিংহাম প্রাসাদে রানী এলিজাবেথ ও প্রিন্স ফিলিপের সাথে বঙ্গবন্ধু



ভারতের প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী ও বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান,
তেজগাঁও বিমানবন্দর মার্চ, ১৯৭২

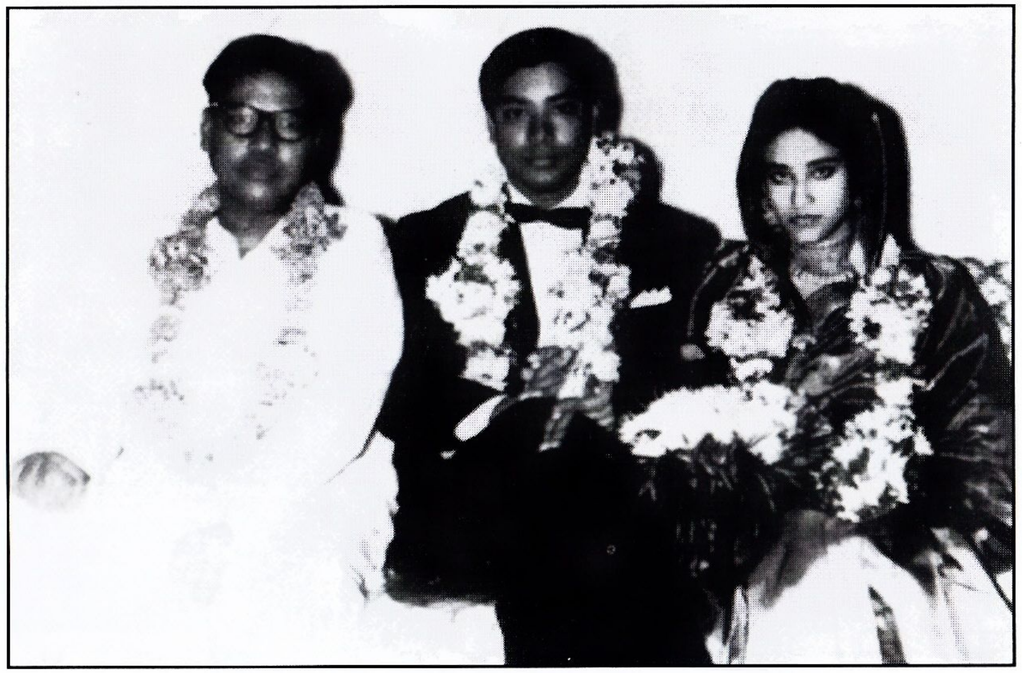
সাত বীরশ্রেষ্ঠ



১৫ আগস্ট ১৯৭৫ হত্যার পর বঙ্গবন্ধুর মৃতদেহ ৩২ নম্বর ধানমন্ডির বাড়ির সিঁড়িতে শায়িত অবস্থায়



বঙ্গবন্ধুর ফুপাত ভাই মমিনুল হক খোকার সাথে শেখ হাসিনা, শেখ কামাল ও
শেখ রেহেনা, সেগুনবাগিচার বাসায় ১৯৫৭



সদ্য বিবাহিত শেখ হাসিনা, স্বামী ডঃ এম এ ওয়াজেদ মিয়া ও
চট্টগ্রামের আওয়ামী লীগ নেতা এম এ আজিজ



পিতা-মাতার সাথে শেখ হাসিনা

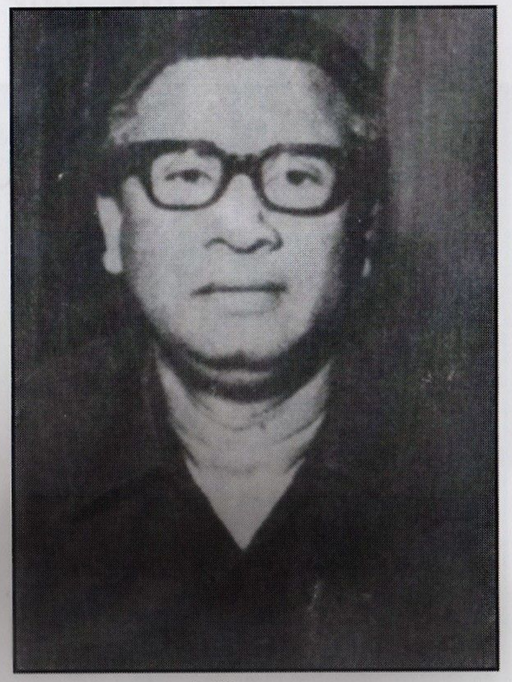


শিশুকালে শেখ হাসিনা ও শেখ কামাল

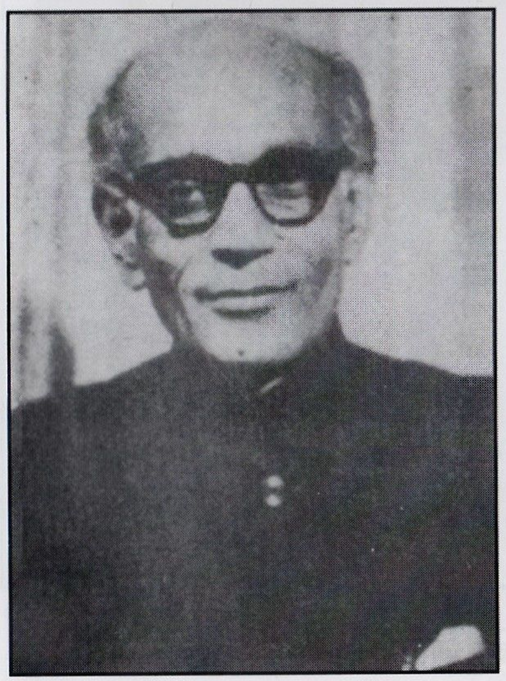
১৯৭৫ সালে ৩ নভেম্বর জেলখানায় নিহত জাতীয় চার নেতা



সৈয়দ নজরুল ইসলাম
স্বাধীন বাংলাদেশ
সরকারের অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি



তাজউদ্দিন আহমেদ
প্রধানমন্ত্রী
স্বাধীন বাংলাদেশ



ক্যাপ্টেন মনসুর আলী
অর্থমন্ত্রী
স্বাধীন বাংলাদেশ সরকার



এ.এইচ.এম কামরুজ্জামান
স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী
স্বাধীন বাংলাদেশ সরকার

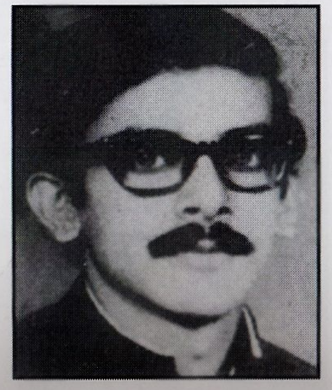


জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর কন্যা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা

১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট
ঘাতকের বুলেটে যারা শহীদ হয়েছেন



বেগম ফজিলাতুন্নেছা মুজিব



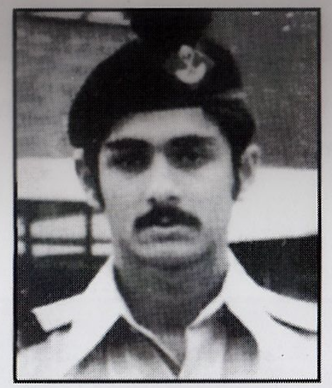
শেখ কামাল



সুলতানা কামাল



শেখ রাসেল



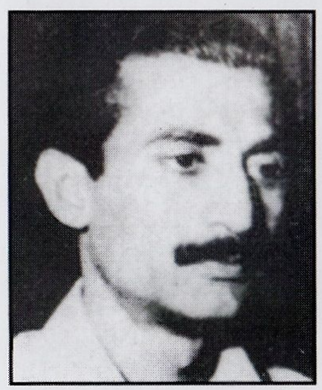
শেখ জামাল



পারভীন জামাল রোজী



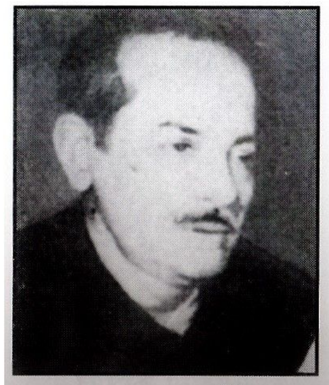
শেখ আবু নাসের



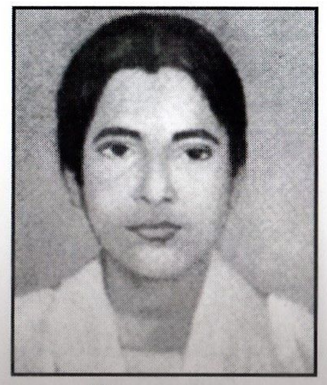
শেখ ফজলুল হক মণি



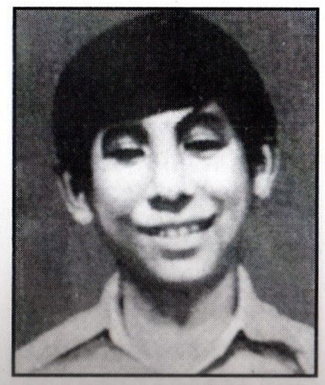
বেগম আরজু মণি



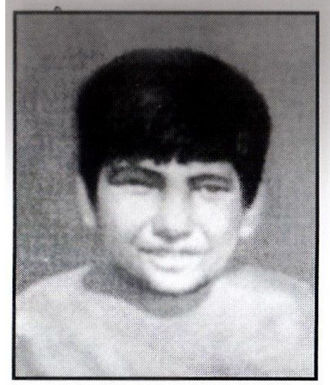
আবদুর রব সেরনিয়াবাত



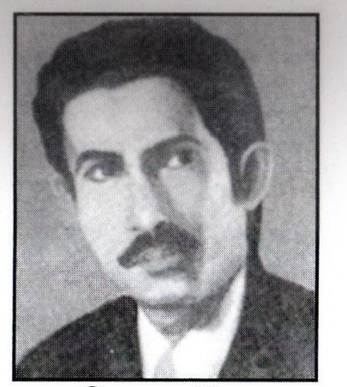
বেবি সেরনিয়াবাত



আরিফ সেরনিয়াবাত



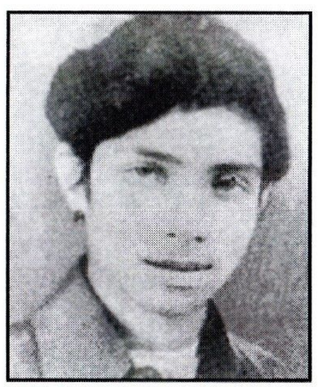
সুকান্ত আবদুল্লাহ বাবু



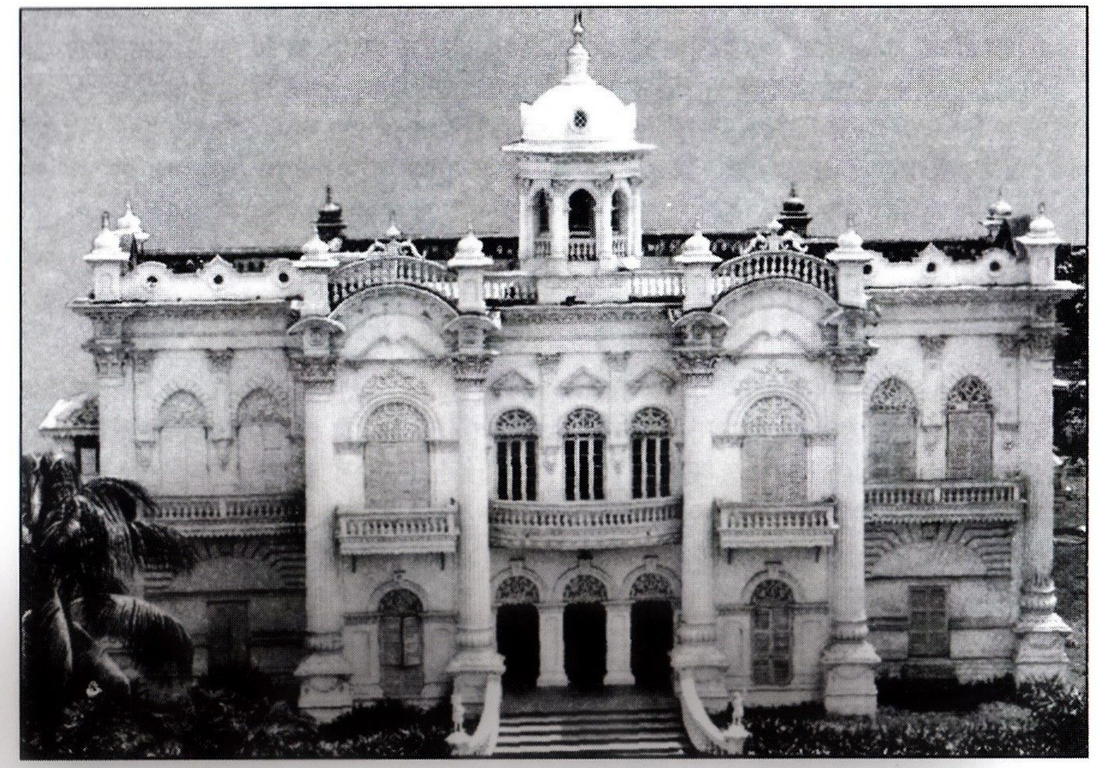
শহীদ সেরনিয়াবাত



কর্নেল জামিল উদ্দিন আহমেদ



আবদুল নঈম খান রিন্টু



পুরাতন ঢাকায় কে. এম. দাস লেনের রোজ গার্ডেন: ১৯৪৯ সালের ২৩শে জুন
আওয়ামী লীগের প্রতিষ্ঠা এখানে



১৫০, মোগলটুলী, ঢাকা ঃ ওয়ার্কার্স ক্যাম্প। এখান থেকেই আওয়ামী লীগের প্রথমিক সাংগঠনিক প্রক্রিয়া শুরু হয়। এ বাড়িতেই শওকত আলী থাকতেন। ছবিতে উক্ত বাড়ির ৩য় তলার বারান্দা দেখা যাচ্ছে (বর্তমানে মূল ভবন অস্তিত্বহীন)।

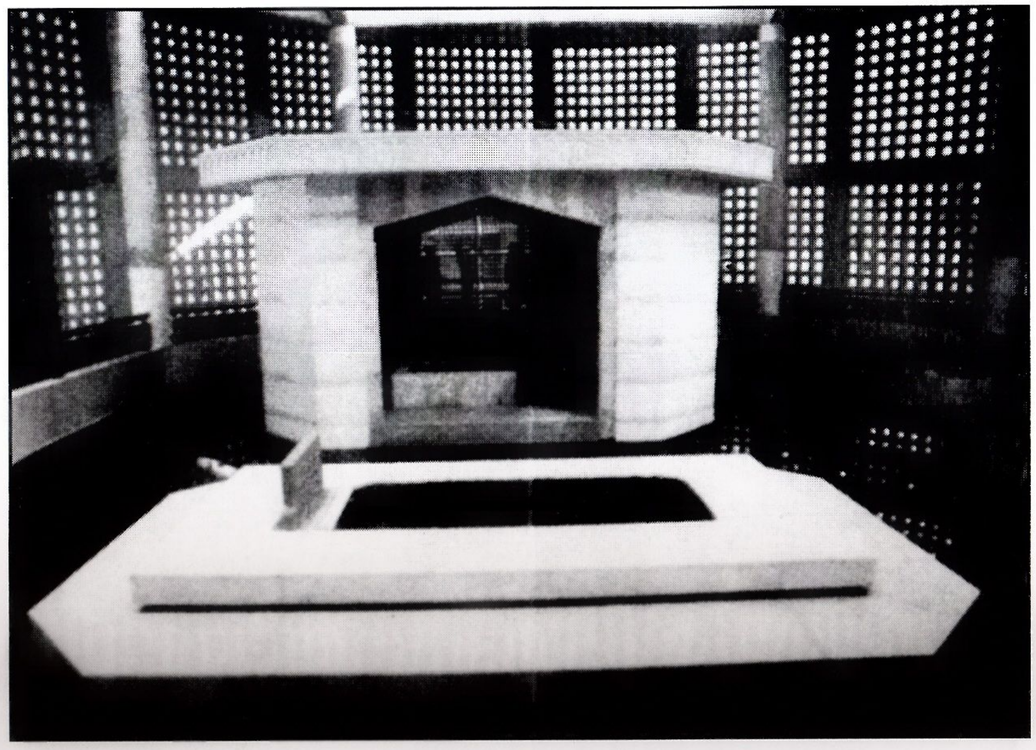
ঐতিহাসিক ১৫০ নম্বর মোগলটুলী পার্টি হাউজ



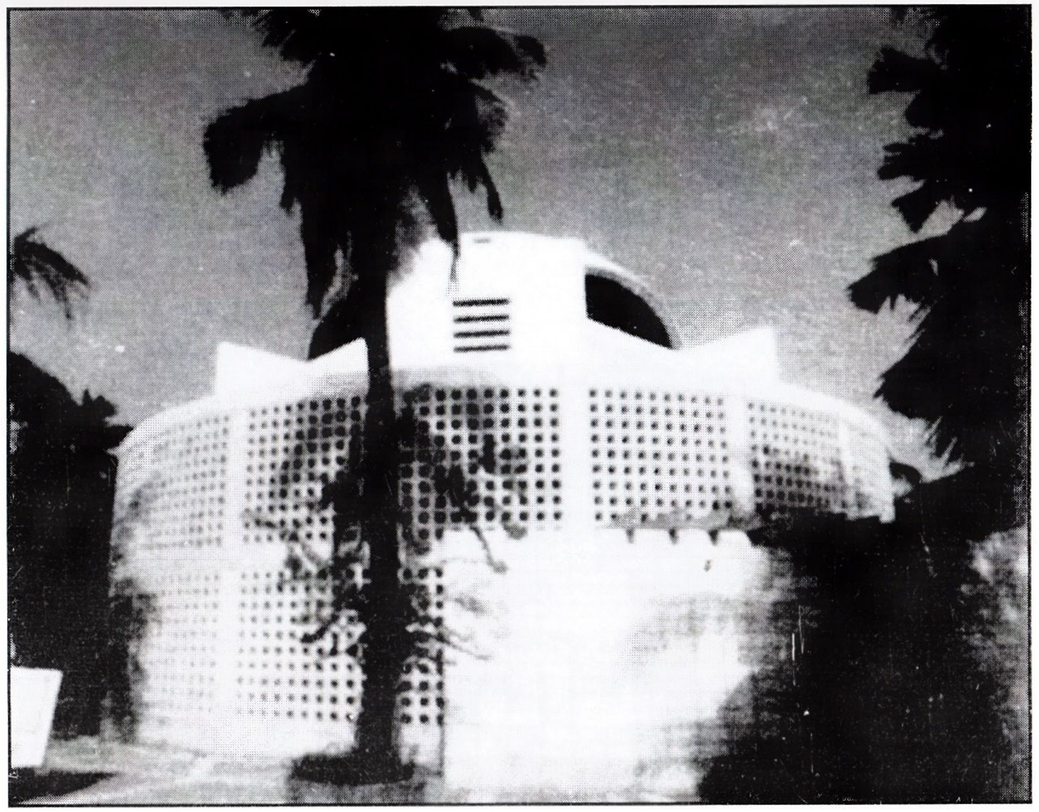
তাজউদ্দীন আহমদ
প্রথম প্রধানমন্ত্রী, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার '৭১
সাধারণ সম্পাদক, বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ



১৯৭৫ সালে ১৫ আগস্ট খুনিদের বুলেটে নিহত বঙ্গবন্ধু ও মন্ত্রী আবদুর রব সেরনিয়াবাতের পরিবারের সদস্যের মাজার, বনানী কবরস্থান



সমাধিসৌধে বঙ্গবন্ধুর মাজার, টুংগীপাড়া, গোপালগঞ্জ



টুংগীপাড়ায় বঙ্গবন্ধুর সমাধি সৌধ, নির্মাণকাল ২০০১

	ভারত	পাকিস্তান
মোট সৈন্য	৮ লাখ ২৮ হাজার মূল বাহিনী	৩ লাখ ৫০ হাজার মূল বাহিনী
সাঁজোয়া ডিভিশন	১টি	২টি
সাঁজোয়া ব্রিগেড	-	১টি
পদাতিক ডিভিশন	১৩	১২
সাবিস্টেন ব্রিগেড	১০	-
প্যাটন ট্যাংক	-	৪০০
চীনা ট্যাংক	-	২০০
টি ৪৪-৫৫ রুশ	৪৫০	২৫০
বৈজয়ন্তী ট্যাংক	৩০০	-
বিমান বাহিনী		
বিমান লোকবল	৯০০০০	১৫০০০
জঙ্গী বিমান	৬২৫	১৭০
ক্যানবেরা বোমারু	৫০	১১
বি ৫৭	৫০	১১
মিগ-১৯	-	৫ স্কোয়াড্রন
মিগ-২১	১২০	-
এফ ৮৫	-	৭ স্কোয়াড্রন
৩৩ মিজার	-	৮০
ন্যাট	১৫০	-
এম ইউ	১৪০	-
নৌবাহিনী		
নৌ সৈন্য	৪০০০০	৯৫০০
ক্রুজার	২	১
ডেস্ট্রয়ার	৪	১
সাবমেরিন	৪	৪
বিমানবাহিনী জাহান	১	-

মিত্রবাহিনী গঠন

১৯৭১ সালের ৩ ডিসেম্বর বিকেলে প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী কলকাতা জনসভায়

ভাষণ দিচ্ছিলেন। এ সময় তাকে পাকিস্তানিদের আক্রমণের কথা বলা হয়। তিনি সন্ধ্যায় দিল্লি ফিরে এসে মন্ত্রিসভার আহ্বান করেন। সভায় পাকিস্তানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালিয়ে যাওয়ার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। ১৯৭১ সালের ৩ ডিসেম্বর ভারত সরকার ও বাংলাদেশ সরকার মিত্র বাহিনী গঠনের সিদ্ধান্ত নেয়। মিত্র বাহিনীর কমান্ডার নিযুক্ত হলেন পূর্বাঞ্চলে ভারতীয় বাহিনীর কমান্ডার লে. জেনারেল জগজিৎ সিং অরোরা।

যুদ্ধ পরিচালনার জন্য মিত্র বাহিনী বাংলাদেশকে নিম্নোক্ত সেক্টরে বিভক্ত করে।

৩ ডিসেম্বর মুক্তিবাহিনীর অবস্থান

	মুক্তিবাহিনীর	কমান্ডার
পশ্চিম সেক্টর	৮ম সেক্টর	মেজর মঞ্জুর
	৯ম সেক্টর	মেজর এম এ জলিল
পশ্চিম উত্তর সেক্টর	৭ম সেক্টর	কর্নেল নুরুজ্জামান
	৬ষ্ঠ সেক্টর	গ্রুপ ক্যাপ্টেন এম কে বাশার
পূর্ব দক্ষিণাঞ্চল	১১তম সেক্টর	উইং কমান্ডার হামিদুজ্জামান
	৫ম সেক্টর	মেজর মীর শওকত আলী
	৪র্থ সেক্টর	মেজর সি আর দত্ত
	৩য় সেক্টর	ব্রিগেড কমান্ডার মেজর সফিউল্লাহ
	২য় সেক্টর	এ টি এম হায়দার
	১ম সেক্টর	মেজর রফিকুল ইসলাম ব্রিগেড কমান্ডার মেজর জিয়াউর রহমান

পশ্চিম অঞ্চলের রণাঙ্গন

পশ্চিমাঞ্চলে মিত্র বাহিনীর কমান্ডার ছিলেন লে. জেনারেল রায়না। তার সাথে ছিলেন মেজর জেনারেল এস বারার, মেজর জেনারেল দলবীর সিংহ, মুক্তিবাহিনীর মেজর মঞ্জুর, মেজর জলিল। ৪ ডিসেম্বর পশ্চিমাঞ্চলে যুদ্ধ শুরু হয়। যশোরের বয়রা ও চৌগাছা যুদ্ধে পাকবাহিনী পরাজয় বরণ করে পিছু হটে যায়। ৬ ডিসেম্বর মিত্রবাহিনী সকাল ৮টায় যশোর ক্যান্টনমেন্ট আক্রমণ করে এবং ৭ ডিসেম্বর দুপুরের মধ্যে মিত্র বাহিনী যশোর দখল করে। পাকবাহিনী দু'ভাগে

বিভক্ত হয়ে ফরিদপুর ও খুলনার দিকে পালিয়ে যায়। ৮ ডিসেম্বর বিজয়ীর বেশে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী যশোর শহরে প্রবেশ করেন। যশোর দুর্গের পতনের পর পাকবাহিনী সকল সেক্টরে পরাজিত হতে থাকে। ৮ ডিসেম্বর বরিশাল, পটুয়াখালী জেলা মুক্ত হয়।

১৪ ডিসেম্বর মিত্র বাহিনী ফরিদপুর দখল করে। ১৫ ডিসেম্বর মিত্র বাহিনী ঢাকার সন্নিকটে পৌঁছে।

উত্তর-পশ্চিম সেক্টর

মিত্র বাহিনী ৩ ডিসেম্বর ঠাকুরগাঁও, ১০ ডিসেম্বর গাইবান্ধা, ১১ ডিসেম্বর হিলি এবং ১৬ ডিসেম্বর বগুড়া দখল করে। মিত্র বাহিনী দিনাজপুর ও রংপুর বিচ্ছিন্ন করে ফেলে।

উত্তর অঞ্চল

ময়মনসিংহ, জামালপুর, টাঙ্গাইল

মিত্র বাহিনীর কমান্ডার মেজর জেনারেল গুরবক্স সিং। ৯ ডিসেম্বর মিত্রবাহিনী জামালপুর দখল করে। টাঙ্গাইলের কাদের সিদ্দিকী মিত্রবাহিনীর সহায়তায় এগিয়ে আসেন। যুদ্ধকালে গুরুবক্স আহত হলে তার স্থলে মেজর জেনারেল নাগরা কমান্ডার নিযুক্ত হন। পাকবাহিনীর সঙ্গে মিত্র বাহিনীর ভয়াবহ যুদ্ধ চলে। মিত্রবাহিনী ঢাকা ঘিরে ফেলে। ১৪ ডিসেম্বর পাকবাহিনী ও জামায়াত-রাজাকার আলবদর বাহিনী শতাধিক বুদ্ধিজীবী হত্যা করে। হত্যাকাণ্ডের নায়ক ছিলেন মেজর জেনারেল রাও ফরমান আলী।

দক্ষিণ-পূর্ব সেক্টর

মিত্র বাহিনী সিলেট, ব্রাহ্মণবাড়িয়া ও কুমিল্লায় অবস্থানরত পাক বাহিনীর বিরুদ্ধে দুর্ধর্ষ আক্রমণ চালায়। মিত্র বাহিনীর অধীনে ভারতীয় বাহিনীর ৮ ও ৫৭ মাউন্টেন ডিভিশন এবং ৩, ৪, ৫ নম্বর সেক্টরের মুক্তিবাহিনী। পাক বাহিনীর মেজর জেনারেল কাজী আবদুল মজিদ ১৪ ডিভিশন নিয়ে যুদ্ধে পরাজয় বরণ করেন। পাক বাহিনী ঢাকা পালিয়ে যাওয়ার পথে ভৈরব ব্রিজ উড়িয়ে দেয়। মিত্র বাহিনী মেঘনা নদী অতিক্রম করে ঢাকার উপকণ্ঠে পৌঁছে।

কুমিল্লা-ময়নামতি

ভারতীয় বাহিনীর ৬১ মাউন্টেন ব্রিগেড আগরতলা হতে অভিযান চালায়। তাদের সঙ্গে ছিল মুক্তিবাহিনীর ২ নম্বর সেক্টর। পাক বাহিনীর ব্রিগেডিয়ার হকি খেলোয়াড় আতিক সম্মুখ যুদ্ধে পরাজিত হয়ে ময়নামতি সেনানিবাসে আশ্রয় নেয়। ৯

ডিসেম্বর মিত্র বাহিনী কুমিল্লা শহর দখল করে। ১৬ ডিসেম্বর পাক বাহিনীর চার হাজার সৈন্য মিত্র বাহিনীর নিকট আত্মসমর্পণ করে।

লাকসাম-চাঁদপুর

মিত্র বাহিনীর নিকট পরাজিত হয়ে পাকবাহিনীর অধিনায়ক মেজর জেনারেল রহিম চাঁদপুর হতে নদী পথে নারায়ণগঞ্জে পালিয়ে যান। তার বাহিনী ময়নামতি সেনানিবাসে পালিয়ে যায়। জেনারেল রহিম নারায়ণগঞ্জ যাওয়ার পথে মেঘনায় বিমান হামলায় আহত হন। তিনি হেলিকপ্টারে রেঙ্গুন যায় এবং সেখান থেকে পশ্চিম পাকিস্তানে চলে যান।

চট্টগ্রাম-পার্বত্য চট্টগ্রাম

ভারতীয় বাহিনীর ৯৭ পদাতিক ব্রিগেডে এবং মুক্তিবাহিনীর ১ নম্বর সেক্টর পাকবাহিনীকে শুভাপুর, সীতাকুণ্ড যুদ্ধে পরাজিত করে চট্টগ্রামের দিকে অগ্রসর হতে থাকে। ১৬ ডিসেম্বর পাক বাহিনী চট্টগ্রাম সার্কিট হাউজে আত্মসমর্পণ করে। ১৭ ডিসেম্বর ১ নম্বর সেক্টরের কমান্ডার মেজর রফিকুল ইসলাম বিজয় বেশে চট্টগ্রাম শহরে প্রবেশ করেন।

বিমান যুদ্ধ

১৯৭১ সালে ৪ ডিসেম্বর ২.৪০ মিনিটে ভারতীয় বিমান বাহিনী ঢাকা বিমানবন্দর আক্রমণ করে। ৬ ডিসেম্বর ভারতীয় বিমান ঢাকা বিমানবন্দর সম্পূর্ণ ধ্বংস করে দেয়। পাকিস্তান বিমানবাহিনী সৈন্যদের বিমান সহায়তা দিতে না পারায় তাদের পরাজয় ত্বরান্বিত হয়।

নৌযুদ্ধ

পাকিস্তানের নৌশক্তির গর্ব সাবমেরিন গাজী ২১ নভেম্বর ভারতের যুদ্ধজাহাজ ভিক্রান্তকে আক্রমণের জন্য করাচি ত্যাগ করে। ৩ ডিসেম্বর ভারতের যুদ্ধ জাহাজ রাজপুত টাস্কফোর্স বিশাখাপট্টমে গাজীর সন্ধান পায়। ৪ ডিসেম্বর গাজীকে ডেপথ চার্জ করে ধ্বংস করে দেয়। ৭ ডিসেম্বর খবর পাওয়া যায় গাজী চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে সমুদ্রে তলিয়ে যায়।

ভারতের নৌবাহিনী প্রধান এডমিরাল এন কৃষ্ণার পরামর্শে ৭ খানা যুদ্ধজাহাজ নিয়ে টাস্কফোর্স গঠন করা হয়। ১৩ নভেম্বর তারা আন্দামান যাত্রা করে। তাদের উদ্দেশ্য হলো পাকিস্তানি নৌবাহিনীকে বঙ্গোপসাগরে প্রবেশ করতে না দেয়া।

ভারতীয় যুদ্ধজাহাজ ভিক্রান্ত ৪টি ফ্রিগেট এবং একটি সাবমেরিন পরিবেষ্টিত হয়ে চট্টগ্রাম-কক্সবাজার যাত্রা করে ও ভিক্রান্তের ফ্রিগেট থেকে বিমান উপকূলীয় অঞ্চলে বিমান হামলা চালায়। ১০ ডিসেম্বর ভুল ক্রমে ভিক্রান্তের সি-হক বিমান মুক্তিবাহিনীর পদ্মা ও পলাশ ডুবিয়ে দেয়। এ আক্রমণে নৌসেনা রুহুল আমিন শহীদ হন। পূর্ব পাকিস্তানে পাক বাহিনীর নৌশক্তি ছিল না। মিত্র বাহিনীকে প্রতিহত করতে তারা সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়। বঙ্গোপসাগর মিত্র বাহিনী পূর্ণ দখলে চলে আসে।

১৪ ডিসেম্বর বুদ্ধিজীবী হত্যা

পাক বাহিনী সকল সেক্টরে মিত্রবাহিনীর নিকট চরমভাবে পরাজিত হচ্ছে। এ মুহূর্তে পাকবাহিনী ও জামায়াত ইসলাম ১৪ ডিসেম্বর বুদ্ধিজীবী হত্যার পরিকল্পনা করে। তারা বুদ্ধিজীবীর বাসায় বাসায় বদর বাহিনী প্রেরণ করে। পাকিস্তানি মেজর জেনারেল রাওফরমান আলী জামায়াত নেতাদের নিয়ে হত্যার জন্য তালিকা প্রণয়ন করেন।

১৪ ডিসেম্বর রাতে তারা নিম্নলিখিত বুদ্ধিজীবীদের হত্যা করে :

১. অধ্যাপক মুনীর চৌধুরী-ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
২. অধ্যাপক মোফাজ্জল হায়দার- ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
৩. ডা. মুহাম্মদ মুর্তজা- ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
৪. অধ্যাপক আনোয়ার পাশা- ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
৫. অধ্যাপক ড. আবুল খায়ের- ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ইতিহাস
৬. অধ্যাপক গিয়াস উদ্দিন আহমদ- ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ইতিহাস
৬. অধ্যাপক সন্তোষ ভট্টাচার্য- ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ইতিহাস
৭. অধ্যাপক রশিদুল হাসান- ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, রাষ্ট্রবিজ্ঞান
৮. শহিদুল্লা কায়সার-সাংবাদিক-সাহিত্যিক
৯. সিরাজউদ্দিন হোসেন-বার্তা সম্পাদক, দৈনিক ইত্তেফাক
১০. ডা. ফজলে রাব্বী-অধ্যাপক, ঢাকা মেডিকেল কলেজ
১১. মুহাম্মদ ইয়াকুব মিয়া-আওয়ামী লীগ নেতা

পূর্ব পাকিস্তান সামরিক সরকার উচ্চপদস্থ সরকারি কর্মকর্তাদের ১৪ ডিসেম্বর হত্যার পরিকল্পনা করে এবং তারা গভর্নর হাউজে এক বৈঠকের আহ্বান করে। ১৪ ডিসেম্বর গভর্নর হাউজে একটানা বোমাবর্ষণ করলে হত্যার পরিকল্পনা ব্যর্থ হয়ে যায়।

নৌ-কূটনীতি

আমেরিকা বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ ধ্বংস করার জন্য যে সকল পদক্ষেপ নিয়েছিল

তার মধ্যে ভয়ঙ্কর ছিল বঙ্গোপসাগরে সপ্তম নৌবহর প্রেরণ। নৌবহর প্রেরণের উদ্দেশ্য ছিল–

- ভারতকে যুদ্ধবিরতি মানতে বাধ্য করা।
- মুক্তিযুদ্ধকে স্তব্ধ করে স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের মূলোৎপাটন করা।
- বাংলাদেশে যুদ্ধবিরতি স্থায়ী করে পাকিস্তানী শাসন পুনর্প্রতিষ্ঠা করা।

১৯৭১ সালে ৮ ডিসেম্বর আমেরিকার হোয়াইট হাউজে স্পেশাল অ্যাকশন গ্রুপের গোপন সভা অনুষ্ঠিত হয়। ৯ ডিসেম্বর আমেরিকার প্রেসিডেন্ট নিক্সন বঙ্গোপসাগরে সপ্তম নৌবহর প্রেরণের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। আমেরিকার টাস্কফোর্স সপ্তম নৌবহর ভিয়েতনামের টনকিন উপসাগরে অবস্থান করছিল। সপ্তম নৌবহরে ৮টি জাহাজ ছিল। দলপতি জাহাজের নাম ছিল এন্টারপ্রাইজ। প্রেসিডেন্ট নিক্সনের নির্দেশে সপ্তম নৌবহর ৯ ডিসেম্বর যাত্রা শুরু করে। ১০ ডিসেম্বর সপ্তম নৌবহর মালাক্কা প্রণালীতে একত্রিত হয়। ১২ ডিসেম্বর সপ্তম নৌবহর বঙ্গোপসাগরে প্রবেশ করে এবং ২০ ডিসেম্বর পৌঁছবে।

ভারতের আন্দামান নিকোবর কমিউনিকেশন সেন্টারের রাডার সপ্তম নৌবহরের বঙ্গোপসাগরে প্রবেশ ধরে ফেলে। সাথে সাথে ভারত সরকার সোভিয়েত ইউনিয়নকে জানিয়ে দেয়। সংবাদ পেয়েই রাশিয়ার নৌবাহিনীর ২০টি জাহাজের নৌবহর বঙ্গোপসাগরে পৌঁছে অবস্থান নেয়। বঙ্গোপসাগরের দিকে সোভিয়েত রাশিয়ার টাস্কফোর্স আসতে দেখে আধঘণ্টার মধ্যে আমেরিকা সপ্তম নৌবহর গতি পরিবর্তনের নির্দেশ দেয়। সপ্তম নৌবহর বঙ্গোপসাগরের যাওয়ার গতিপথ পরিবর্তন করে শ্রীলঙ্কার দিকে যাত্রা করে। একটি আসন্ন তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ হতে পৃথিবী রক্ষা পায়।

রাশিয়া সপ্তম নৌবহরকে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে হস্তক্ষেপ করতে দেবে না। যদি চীন ভারতের উত্তর সীমান্তে আক্রমণ চালায় তাহলে রাশিয়া চীনের সিংকিয়াম আক্রমণ করবে।

বৃটিশ সাংবাদিক এন্ডারসন বলেন, This is how the big powers danced precariouslyon the edge of the brink just before christmas as people song about peace on earth and good will toward men. যখন ক্রিসমাস সমাগত প্রায়, যখন মানুষ পৃথিবীর শান্তি এবং মানুষের জন্য ভালোবাসার গান করবে– তার পূর্ব মুহূর্তে বৃহৎ শক্তি যুদ্ধে নগ্নভাবে নৃত্য করছে।'

১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধকে ধ্বংস করার লক্ষ্যে আমেরিকার পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. হেনরি কিসিঞ্জারের পরামর্শে প্রেসিডেন্ট নিক্সন বিমানবাহী পারমাণবিক জাহাজ

এন্টারপ্রাইজের নেতৃত্বে ৮টি জাহাজ সজ্জিত টাস্কফোর্স বঙ্গোপসাগরে পাঠাবার নির্দেশ দিয়েছেন। ৯ ডিসেম্বর সপ্তম নৌবহর সিঙ্গাপুর হয়ে ভারত মহাসাগরে পৌঁছে। ১২ ডিসেম্বর নৌবহর বঙ্গোপসাগরের দিকে চলছে। কিন্তু হঠাৎ হোয়াইট হাউজের নির্দেশে সপ্তম নৌবহর শ্রীলঙ্কার দিকে গতি পরিবর্তন করে। ১৬ ডিসেম্বর সপ্তম নৌবহর শ্রীলঙ্কার উত্তর-পূর্ব কোণে সমুদ্রে এসে নোঙ্গর করে। গতি পরিবর্তনের কারণ যে, ভারত মহাসাগরে রাশিয়ার নৌবহরের উপস্থিতি। সমগ্র বঙ্গোপসাগর মুক্ত। ভারতীয় নৌবাহিনীর বিমানবাহী জাহাজ ভিক্রান্ত এককভাবে বঙ্গোপসাগরে তৎপর ছিল। এভাবে আমেরিকা নৌ-কূটনীতিতে পরাজয় বরণ করে।

জাতিসংঘ

১৯৭১ সালে জাতিসংঘের সবচেয়ে আলোচ্য বিষয় ছিল নিরাপত্তা পরিষদে চীনের সদস্য পদ লাভ এবং বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ। বিচ্ছিন্নতাবাদী সংগ্রাম দমনের নামে পাকিস্তান বাংলাদেশে লক্ষ লক্ষ লোককে হত্যা করেছে। নারীরা নির্যাতিত হয়েছে। এক কোটি মানুষ পাকবাহিনীর নিষ্ঠুর নির্যাতনের কারণে ভারতে আশ্রয় নিতে বাধ্য হয়েছে। মানবাধিকার লংঘন ও শরণার্থী সমস্যার কারণে বাংলাদেশের সমস্যা আর অভ্যন্তরীণ বিষয় ছিল না। তা আন্তর্জাতিক সমস্যা হয়ে দাঁড়ায়। জাতিসংঘ শরণার্থীদের জন্য প্রিন্স সদর উদ্দিনকে ভারতে হাইকমিশনার নিয়োগ করে। জাতিসংঘ খাদ্য ও অন্যান্য ত্রাণসামগ্রী শরণার্থীদের জন্য প্রেরণ করে। জন কেলিকে ঢাকায় UNHER-এর প্রতিনিধি নিয়োগ করে।

১৯৭১ সালের ৩ ডিসেম্বর পাকিস্তান আক্রমণ এবং ৪ ডিসেম্বর ভারত পাকিস্তান আক্রমণ করলে আমেরিকার অনুরোধে জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদের সভা বসে। ৪ ডিসেম্বর নিরাপত্তা পরিষদের সভা অবিলম্বে যুদ্ধবিরতি ও সৈন্য প্রত্যাহারের প্রস্তাব পেশ করা হয়। নিরাপত্তা পরিষদের ১৫ জন সদস্যের মধ্যে ১১ জন সদস্য প্রস্তাবের পক্ষে ভোট প্রদান করে এবং বৃটেন ও গ্রীস ভোটদানে বিরত থাকে। সোভিয়েত ইউনিয়ন ও পোল্যান্ড প্রস্তাবের বিরোধিতা করে। সোভিয়েত ইউনিয়ন প্রস্তাবের বিরুদ্ধে ভেটো প্রদান করে। ফলে যুদ্ধবিরতি প্রস্তাব বাতিল হয়ে যায়।

৫ ডিসেম্বর ৮ শক্তি পুনরায় নিরাপত্তা পরিষদে যুদ্ধবিরতির প্রস্তাব দেয়। কিন্তু সোভিয়েত ইউনিয়ন প্রস্তাবের বিরুদ্ধে ভেটো প্রয়োগ করলে প্রস্তাবটি বাতিল হয়ে যায়।

৭ ডিসেম্বর সাধারণ পরিষদের সভায় ৮ শক্তির প্রস্তাব আলোচনা করা হয়।

যুদ্ধবিরতির পক্ষে ১০৪ ভোট এবং বিপক্ষে ১১ ভোট এবং ১০টি দেশ ভোটদানে বিরত থাকে। একই দিনে সাধারণ পরিষদ বিবেচনার জন্য নিরাপত্তা পরিষদে প্রেরণ করে। নিরাপত্তা পরিষদের প্রস্তাবের বিরুদ্ধে সোভিয়েত ইউনিয়ন ১৩ ডিসেম্বর ভেটো প্রদান করে। পূর্বের ন্যায় পক্ষে ১১ ভোট, বিপক্ষে ২ ভোট এবং ২ সদস্য ভোট দানে বিরত থাকে। সোভিয়েত ইউনিয়ন তৃতীয়বারের মতো ভেটো প্রয়োগ করলে যুদ্ধবিরতি প্রস্তাব বাতিল হয়ে যায়।

১৬ ডিসেম্বর দুপুর ১২-০৫ মিনিটে নিরাপত্তা পরিষদের সভা অনুষ্ঠিত হয়। পাকিস্তান প্রতিনিধি অনুপস্থিত। ভারতের প্রতিনিধি ভারতের প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর একক যুদ্ধবিরতির ঘোষণা পাঠ করে শোনান।

ভারত কর্তৃক স্বাধীন বাংলাদেশকে স্বীকৃতি প্রদান

১৯৭১ সালের ৬ ডিসেম্বর ভারতীয় পার্লামেন্ট বাংলাদেশকে স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে স্বীকৃতি প্রদান অনুমোদন করে এবং প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী তা ঘোষণা দেন। ভারতের ঘোষণার ফলে বাংলাদেশের শরণার্থী ক্যাম্প ও মুক্তিযোদ্ধাদের মধ্যে আনন্দের বন্যা বয়ে যায়। ৮ ডিসেম্বর বাংলাদেশের অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি সৈয়দ নজরুল ইসলাম এবং প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দীন আহমদ ভারতকে কৃতজ্ঞতা জানিয়ে ভাষণ দেন।

যশোরের পতন

১৯৭১ সালের ৭ ডিসেম্বর যশোর পতনের পর পাকবাহিনী সম্মুখযুদ্ধ পরিহার করে ঢাকার দিকে পালিয়ে যেতে থাকে। অনেক স্থানে মিত্রবাহিনী তাদের ঘেরাও করে রাখে। পাক বাহিনীর বিমান নেই। নৌবাহিনী নেই। তারা প্রতিরোধ করার শক্তি হারিয়ে ফেলেছে।

৭ ডিসেম্বর সকাল ১১টায় লে. জেনারেল নিয়াজী গভর্নর এ এম মালিককে পূর্ব পাকিস্তানের যুদ্ধ পরিস্থিতি সম্পর্কে অবহিত করেন। একই দিন ১২টায় গভর্নর প্রেসিডেন্টের নিকট বার্তা প্রেরণ করেন। বার্তায় তিনি বলেন, ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে সাহায্য আসতে হবে। তা না হলে সন্ধি করতে হবে। প্রাণহানি বন্ধ করে শান্তিপূর্ণভাবে ক্ষমতা হস্তান্তর করতে হবে।

৯ ডিসেম্বর ৯-৩০ মিনিটে জেনারেল নিয়াজী পাকিস্তানের সেনাবাহিনীর চীফ অব স্টাফের নিকট বার্তা প্রেরণ করেন। তিনি জানান যে, অবস্থা খুবই সঙ্কটময়। বিমানে সৈন্য পাঠাতে অনুরোধ করেন।

১০ ডিসেম্বর

১৩ দিনের পৃথিবী কাঁপানো যুদ্ধের গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ঘটে ১০ ডিসেম্বর। মিত্র বাহিনী ঢাকা শহর ঘিরে ফেলেছে। ভারতের প্রধান সেনাপতি জেনারেল শ্যাম মানেকশ ৮ ডিসেম্বর থেকে পাকবাহিনীকে আত্মসমর্পণের নির্দেশ দিচ্ছেন। পাকবাহিনীর মনোবল ভেঙে পড়ছে। এমনি পরিস্থিতিতে ১০ ডিসেম্বর গভর্নর হাউজে গভর্নর এ এম মালেক, জেনারেল নিয়াজী, বেসামরিক প্রধান রাও ফরমান আলী এবং চীফ সেক্রেটারি মোজাফফর হোসেন উপস্থিত হন। ফরমান আলী ও মোজাফফর হোসেন প্রেসিডেন্ট ও জাতিসংঘে প্রেরণের জন্য পত্রের খসড়া প্রণয়ন করেন এবং চারজন তা অনুমোদন করেন। গভর্নর এ এম মালিক বার্তাটি প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান এবং ঢাকার জাতিসংঘের সহকারী মহাসচিব মি. পল মার্কের নিকট প্রেরণ করেন। বার্তায় প্রস্তাব করা হয়–

এক. অবিলম্বে যুদ্ধবিরতি।
দুই. সম্মানের সাথে পাকিস্তানি সেনাবাহিনীকে পশ্চিম পাকিস্তানে প্রেরণ।
তিন. পূর্ব পাকিস্তানের নাগরিক যারা পশ্চিম পাকিস্তানে ফিরে যেতে চায় তাদের প্রেরণ করতে হবে।
চার. ১৯৪৭ সাল থেকে যারা বসতি স্থাপন করেছে তাদের নিরাপত্তা।
পাঁচ. পূর্ব পাকিস্তানে কোনো ব্যক্তির বিরুদ্ধে প্রতিহিংসামূলক ব্যবস্থা না নেয়ার নিশ্চয়তা।

বার্তায় গভর্নর জাতিসংঘকে শান্তিপূর্ণভাবে ক্ষমতা হস্তান্তরের আহ্বান জানান।

জাতিসংঘের প্রতিনিধি বার্তাটি পেয়ে জাতিসংঘের মহাসচিবের নিকট প্রেরণ করেন। মহাসচিব তার অনুলিপি নিরাপত্তা পরিষদের প্রত্যেক সদস্যকে দেন।

প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান গভর্নরের বার্তাটি সংশোধন করে জাতিসংঘে প্রেরণ করেন।

১১ ডিসেম্বর জেনারেল নিয়াজী, রাওফরমান আলী পিন্ডিতে চীফ অব স্টাফকে জানান। "সকল সেক্টরে আমাদের সৈন্য প্রচণ্ড চাপের মুখে। দুর্গে তারা বিচ্ছিন্ন এবং শত্রু দ্বারা বেষ্টিত। শত্রুরা আকাশে অপ্রতিদ্বন্দ্বী। স্থানীয় জনগণ ও বিদ্রোহীরাও আমাদের সৈন্যদের নিশ্চিহ্ন করার জন্য বদ্ধপরিকর।"

জেনারেল মানেকশর আত্মসমর্পণের বার্তা

৮ ডিসেম্বর আকাশবাণী থেকে ইংরেজি, হিন্দী এবং বাংলায় জেনারেল মানেকশর পাক সৈন্যদের উদ্দেশে তার নির্দেশ প্রদান শুরু করেন এবং ১৫ ডিসেম্বর পর্যন্ত চলে। বার্তায় বলা হয়, 'হাতিয়ার ডালদো। মিত্র বাহিনী আপনার সৈন্যদের

চারদিক থেকে ঘিরে ফেলেছে। আপনার বিমানবাহিনী সম্পূর্ণ ধ্বংস। আপনি অস্ত্র সমর্পণ করুন।' এ বার্তায় আরও বলা হয়, বিজয়ী সৈন্যদের কাছে আত্মসমর্পণের ঘোষণায় কোনো লজ্জা নেই। ১৪ ডিসেম্বর এ সম্পর্কে ছাপানো প্রচারপত্র বিমান থেকে পাক সেনা ছাউনিতে ফেলা হয়।

১৩ ডিসেম্বর

জেনারেল নিয়াজী রাওয়ালপিন্ডিতে নিম্নের বার্তা প্রেরণ করেন, "সকল সেনা ছাউনি চাপের মুখে। কোনো সরবরাহ নেই। এমনকি অস্ত্রের শূন্যতা পূরণ হচ্ছে না। বিদ্রোহীরা ইতোমধ্যে শহর ঘিরে ফেলেছে। ভারতীয়রা অগ্রসর হচ্ছে। অবস্থা খুবই সঙ্কটময়। ১৪ ডিসেম্বরের মধ্যে প্রতিশ্রুতি অনুসারে সাহায্য আসতে হবে। শিলিগুড়ি নয় নেফায় আক্রমণ চালাতে হবে। শত্রুর বিমান ঘাঁটি ব্যস্ত রাখতে হবে।

১৩ ডিসেম্বর ভারতের বিমান গভর্নর হাউজে বোমাবর্ষণ করে।

১৩ ডিসেম্বর ১২-৩০ মিনিটে গভর্নর পদত্যাগ করেন। কারণ প্রেসিডেন্ট তার কথা শুনছেন না। গভর্নর, মন্ত্রী, রাওফরমান আলী রেডক্রসের সঙ্গে আলোচনা করে সবাই হোটেল ইন্টারকন্টিনেন্টালে আশ্রয় নেয়।

১৪ ডিসেম্বর

১৪ ডিসেম্বর সন্ধ্যায় জেনারেল নিয়াজী ভারতীয় সেনাবাহিনী প্রধান শ্যাম মানেকশর নিকট আত্মসমর্পণের বার্তা ঢাকার আমেরিকার কনসাল জেনারেল মি. সিপব্যাকের নিকট হস্তান্তর করেন। মি. সিপব্যাক বার্তার একটি অনুলিপি ওয়াশিংটনে প্রেরণ করেন। নিয়াজী তার সেনাবাহিনী, পাকিস্তানি নাগরিকদের পশ্চিম পাকিস্তানে নিরাপদ প্রত্যাবর্তনের শর্তে যুদ্ধবিরতিতে সম্মত হন। তিনি আরো বলেন, পূর্ব পাকিস্তানের প্রশাসন জাতিসংঘের ব্যবস্থাপনায় হস্তান্তর করা হবে।

১৫ ডিসেম্বর পাকিস্তান সেনাবাহিনী প্রধান জেনারেল হামিদ নিয়াজীকে ভারতের প্রধান সেনাপতির নির্দেশ অনুসারে যুদ্ধবিরতি গ্রহণের উপদেশ দেন।

ভারতের প্রধান সেনাপতি মানেকশা জেনারেল নিয়াজীর বার্তার উত্তর প্রেরণ করেন ১৫ ডিসেম্বর রাত ২০-৩০ মিনিটে।

১৬ ডিসেম্বর বিকেল ৩টায় ভারতীয় সেনাপতির দেয়া শর্ত গ্রহণ করার জন্য পাকিস্তান সেনাপ্রধান নির্দেশ প্রদান করেন।

অধ্যায় ২৫

পাকবাহিনীর আত্মসমর্পণ

স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয়

১৪ ডিসেম্বর গভর্নর ৯-৩০ মিনিটে গভর্নর হাউজে একটি উচ্চ পর্যায়ে জরুরি সভা আহ্বান করেন। এ সংবাদ মিত্র বাহিনী জানতে পেরে গভর্নর হাউজে বিমানে বোমা বর্ষণ করে। ফলে সভা বন্ধ হয়ে যায়। ভয়ে গভর্নর ট্রেঞ্চে আশ্রয় নেন। তিনি পদত্যাগ করে হোটেল ইন্টারকন্টিনেটালে ওঠেন।

১৫ ডিসেম্বর জেনারেল নিয়াজী জেনারেল মানেকশাকে যুদ্ধবিরতির বার্তা পাঠান। নিয়াজী উত্তর পেয়ে উভয় পক্ষ যুদ্ধবিরতি মেনে নেয়। ১৫ ডিসেম্বর ১৭০০ ঘণ্টা থেকে ১৬ ডিসেম্বর সকাল ৯টা পর্যন্ত যুদ্ধবিরতি পালন করবে। নিয়াজীর অনুরোধে যুদ্ধবিরতির সময় ১৬ ডিসেম্বর ৩টা পর্যন্ত বর্ধিত করা হয়।

১৫ ডিসেম্বর রাতে ১০১ কমিউনিকেশন্স বাহিনীর কমান্ডার মেজর জেনারেল নাগরা, টাঙ্গাইলের কাদের সিদ্দিকীর বাহিনী কালিয়াকৈর হয়ে তুরাগ নদীর পূর্ব পারে পৌঁছে। ১৬ ডিসেম্বর ৬টায় তারা দেখলেন গোলাবর্ষণ হচ্ছে। জেনারেল নিয়াজী সকল সেনা ছাউনিতে যুদ্ধবিরতির বার্তা পাঠিয়েছেন। নাগরা সিদ্ধান্ত নিলেন এই মুহূর্তে নিয়াজীর নিকট দূত পাঠাবেন। সকাল ৯টায় নাগরা বার্তা নিয়ে দূত নিয়াজীর নিকট পৌঁছে। পাকবাহিনীর ঢাকা জিওসি মেজর জেনারেল মোহাম্মদ জামসেদ নাগরাকে অভ্যর্থনা জ্ঞাপনের জন্য মিরপুর ব্রিজের পশ্চিম পাশে যান। জেনারেল নাগরা ও কাদের সিদ্দিকী সাদা ফ্লাগ উড়িয়ে মিরপুর ব্রিজের পশ্চিম পার এলেন। জামসেদ তাদের অভ্যর্থনা জানায়। তারা ইস্টার্ন আর্মির হেড কোয়ার্টারে পৌঁছে। নিয়াজী সকলের সাথে করমর্দন করেন। এ সময় কাদের সিদ্দিকী নিয়াজীর সাথে হাত মিলাতে অস্বীকার করেন। কারণ যারা নারী নির্যাতন করেছে তাদের সাথে তিনি হাত মিলাবেন না।

১৬ ডিসেম্বর দুপুর ১২টায় কলকাতায় থিয়েটার রোডে খবর এল পাক বাহিনী বিকেল তিনটায় আত্মসমর্পণ করবে। ভারতীয় বাহিনী চাচ্ছে মুক্তিবাহিনী

প্রধান কর্নেল এম এ জি ওসমানী বাংলাদেশ সরকারের প্রতিনিধিত্ব করবেন। কিন্তু ওসমানী যেতে অস্বীকার করেন। তখন প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দীন আহমদ মুক্তি বাহিনীর ডেপুটি চীফ অব স্টাফ গ্রুপ ক্যাপ্টেন এ কে খন্দকারকে ঢাকার আত্মসমর্পণ অনুষ্ঠানে প্রেরণ করেন। মিত্র বাহিনীর লে. জেনারেল জ্যাকব ও এ কে খন্দকার দুপুর ১টায় ঢাকা আর্মি হেড কোয়ার্টারে পৌঁছেন এবং আত্মসমর্পণের আয়োজন করেন। বিকেল ৪-৩০ মিনিটে মিত্রবাহিনীর কমান্ডার লে. জেনারেল জগজিৎ সিং অরোরা বিমানে ঢাকা পৌঁছেন। জেনারেল আরোরা, জেনারেল নিয়াজী, জেনারেল জ্যাকব, গ্রুপ ক্যাপ্টেন এ কে খন্দকার প্রমুখ রেসকোর্স ময়দানে পৌঁছেন। প্রথমে মিত্র বাহিনীর প্রধান লে. জেনারেল জগজিৎ সিং অরোরা আত্মসমর্পণ দলিলে স্বাক্ষর করেন এবং তারপর পাকিস্তান বাহিনী লে. জেনারেল আমির আবদুল্লাহ নিয়াজী দলিলে স্বাক্ষর করেন। স্বাক্ষরিত আত্মসমর্পণ দলিল নিম্নে উদ্ধৃত হলো :

ইংরেজি ভাষায় স্বাক্ষরিত আত্মসমর্পণ দলিলের বঙ্গানুবাদ

"পাকিস্তানের পূর্বাঞ্চলীয় সেনাপতি বাংলাদেশে অবস্থিত সকল সশস্ত্র সেনাবাহিনী নিয়ে পূর্ব রণাঙ্গনে ভারতীয় ও বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর প্রধান সেনাপতি লে. জেনারেল জগজিৎ সিং অরোরার নিকট আত্মসমর্পণ করতে সম্মত হয়। পাকিস্তানের সকল স্থল, বিমান ও নৌবাহিনী, প্যারামিলিটারি এবং বেসামরিক সশস্ত্র সেনাবাহিনী এ আত্মসমর্পণের অন্তর্ভুক্ত হবে। এ সকল সৈন্য তাদের অস্ত্র পরিত্যাগ করবে এবং লে. জেনারেল জগজিৎ সিংহের অধীনস্থ নিকটস্থ নিয়মিত বাহিনীর নিকট আত্মসমর্পণ করবে।

এ দলিল স্বাক্ষরের সাথে সাথে পাকিস্তানের পূর্বাঞ্চলীয় সেনাবাহিনী লে. জেনারেল জগজিৎ সিংহ অরোরার অধীনে চলে আসবে। নির্দেশ ভঙ্গ করলে তা আত্মসমর্পণের শর্ত ভঙ্গকরণ হিসেবে বিবেচিত হবে এবং তা যুদ্ধের রীতি ও আইন অনুসারে বিচার করা হবে। যদি আত্মসমর্পণের শর্তের সম্পর্কে কোনো সন্দেহ অথবা ব্যাখ্যার প্রয়োজন দেখা দেয় তাহলে জগজিৎ সিংহ অরোরার সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত বলে বিবেচিত হবে।

লে. জেনারেল জগজিৎ সিংহ অরোরা নিশ্চিত আশ্বাস দেন, যে সকল সৈন্য আত্মসমর্পণ করবে তাদের সাথে জেনেভা কনভেনশনের বিধির অধীনে সেনাবাহিনীর প্রাপ্যতা অনুসারে পূর্ণ মর্যাদা ও সম্মানের সাথে ব্যবহার করা হবে এবং পাকিস্তানের সৈন্য এবং প্যারামিলিটারি যারা আত্মসমর্পণ করছে তাদের নিরাপত্তা ও মঙ্গলের নিশ্চয়তা প্রদান করবে। লে. জেনারেল জগজিৎ সিংহ অরোরার অধীনের সেনাবাহিনী বিদেশী নাগরিক, জাতিগত সংখ্যালঘু এবং পশ্চিম

পাকিস্তানের নাগরিকদের নিরাপত্তা প্রদান করবে।"

জগজিৎ সিংহ অরোরা	আমীর আবদুল্লাহ নিয়াজী
লে. জেনারেল	লে. জেনারেল
পূর্বাঞ্চলীয় ভারতীয় এবং বাংলাদেশ	সামরিক প্রশাসক জোন-খ এবং
বাহিনীর প্রধান সেনাপতি	পাকিস্তানের পূর্বাঞ্চলীয় সেনাপতি
১৬ ডিসেম্বর, ১৯৭১	১৬ ডিসেম্বর, ১৯৭১

জেনারেল নিয়াজী তার ৯০ হাজার সৈন্য নিয়ে আত্মসমর্পণ করেন। তিনি তার বেল্ট ও ব্যাজ দুটো খুলে এবং ৩৮ বোরের রিভলভার অরোরার হাতে সমর্পণ করেন। তখন নিয়াজী নীরবে কাঁদছিলেন। সন্ধ্যা হয়ে আসছে। রেসকোর্স ময়দানে ১০ লাখ লোক উপস্থিত। তারা নিয়াজী ও পাক বাহিনী বিরোধী স্লোগান দিচ্ছে।

১৭ ডিসেম্বর ভারতীয় বাহিনীর মেজর তারা বঙ্গবন্ধুর পরিবারকে মুক্ত করেন।

২০ ডিসেম্বর সকালে লে. জেনারেল এ এ কে নিয়াজী, মেজর জেনারেল রাওফরমান আলী, এডমিরাল শরীফ, এয়ার কমোডোর ইনামুল হক, ব্রিগেডিয়ার বাকের সিদ্দিকী, জনসংযোগ কর্মকর্তা সিদ্দিক সালিককে যুদ্ধবন্দী হিসেবে ঢাকা থেকে কলকাতার ফোর্ট উইলিয়ামে আটক রাখা হয়। পরে মেজর জেনারেল নজর হোসেন আনসারী, কাজী মজিদ, মেজর জেনারেল জামসেদকে কলকাতায় পাঠানো হয়।

ভারতের প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর ঘোষণা

১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর পাকবাহিনীর আত্মসমর্পণের পর ভারতের প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী ভারতীয় পার্লামেন্টে বলেন, "আজ আমি একটি ঘোষণা দিচ্ছি। ঢাকায় ১৬-১৩ ঘণ্টায় আত্মসমর্পণ দলিল স্বাক্ষরিত হয়েছে।

ভারতীয় সেনাবাহিনী প্রয়োজনের চেয়ে বেশি সময় বাংলাদেশে অবস্থান করবে না।

আমরা বিশ্বাস করি নতুন জাতির পিতা শেখ মুজিবুর রহমান তার জনগণের মধ্যে সঠিক স্থান পাবেন এবং বাংলাদেশকে শান্তি, প্রগতি ও সমৃদ্ধির পথে পরিচালিত করবেন।"

প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খানের বিদায়

১৬ ডিসেম্বর পাকবাহিনীর আত্মসমর্পণের পর পশ্চিম পাকিস্তানের জনগণ ও সেনাবাহিনী প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খানের বিরুদ্ধে ক্ষুব্ধ হয়। তাকে পদত্যাগের জন্য চাপ দিতে থাকে। জনগণের দাবি– জুলফিকার আলী ভুট্টো পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট হবেন। জুলফিকার আলী ভুট্টো নিউইয়র্ক থেকে পাকিস্তানে ফিরে আসেন। প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান ২০ ডিসেম্বর পদত্যাগ করেন। একই দিনে জুলফিকার আলী পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট ও প্রধান সামরিক শাসক নিযুক্ত হন।

বাংলাদেশের রাজধানী ঢাকায় স্থানান্তরিত

১৭ ডিসেম্বর প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দীন আহমদ জাতির উদ্দেশে ভাষণ দেন।

১৮ ডিসেম্বর বাংলাদেশে বেসামরিক প্রশাসন পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয়।

১৯৭১ সালের ২২ ডিসেম্বর রাজধানী কলকাতার ৮ নম্বর থিয়েটার রোড হতে ঢাকায় স্থানান্তরিত হয়। মুজিবনগর সরকারে মন্ত্রিসভা ২২ ডিসেম্বর ঢাকায় ফিরে আসেন।

বাংলাদেশ সচিবালয়

২৩ ডিসেম্বর বাংলাদেশ সরকারের প্রথম মন্ত্রিসভার বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন ভারপ্রাপ্ত রাষ্ট্রপতি সৈয়দ নজরুল ইসলাম। সভায় সিদ্ধান্তসমূহ :

বাংলা ভাষাকে রাষ্ট্র ভাষা স্বীকৃতি প্রদান। জাতীয় মিলিশিয়া বোর্ড গঠন। মুক্তিযোদ্ধাদের নিয়ে মিলিশিয়া গঠন করা হয়।

শহীদ বুদ্ধিজীবী

১৯৭১ সালে পাকবাহিনী লক্ষ লক্ষ নিরস্ত্র বাঙালিকে হত্যা করে। লক্ষ লক্ষ শহীদের মধ্যে কয়েকজন বুদ্ধিজীবীর নাম নিম্নে স্মরণ করা হলো। এ তালিকায় সম্মুখযুদ্ধে শহীদদের নাম অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি।

নাম	পরিচয়	হত্যার তারিখ
লে. কমান্ডার মোয়াজ্জেম হোসেন	আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার ২নং আসামী	২৬ মার্চ ১৯৭১
ড গোবিন্দ চন্দ্র দেব	অধ্যাপক, দর্শন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়	২৬ মার্চ ১৯৭১
অনুদ্বৈপায়ন ভট্টাচার্য	অধ্যাপক, পদার্থ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়	২৬ মার্চ
অমল কৃষ্ণ সোম	অভিনেতা, যশোর	২৬ মার্চ
ডাঃ আজহারুল হক	ফ্রী স্কুল রোড	১৫ নভেম্বর

আব্দুর রউফ সরকার	পরিচালক, নিপা, ঢাকা	৮ ডিসেম্বর
আতাউর রহমান খান খাদিম	অধ্যাপক, পদার্থ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়	২৬ মার্চ
আ স ম গোলাম মোস্তফা	সাংবাদিক, দৈনিক আজাদ	১১ ডিসেম্বর
আনোয়ার পাশা	অধ্যাপক, বাংলা, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়	১৪ ডিসেম্বর
আনোয়ারুল আজীম	গোপালপুর, সুগার মিল	৫ মে
আব্দুল আহাদ	এডভোকেট, বাংলাদেশ সুপ্রিমকোর্ট	১৯ মে
সৈয়দ আলমগীর	ছাত্রলীগ নেতা, বরিশাল	নভেম্বর
আব্দুল আলিম	অধ্যাপক, ঝিনাইদহ ক্যাডেট কলেজ	সেপ্টেম্বর
আলতাফ মাহমুদ	একুশে গানের সুরকার	এপ্রিল
আবুল কালাম আজাদ	অধ্যাপক	১৫ ডিসেম্বর
আবুল কালাম মোঃ শাহাবুদ্দিন	প্রকৌশলী, ওয়াপদা	১৫ এপ্রিল
আমিন উদ্দীন	এমপি, পাবনা	২৯ মার্চ
আবুল খায়ের	অধ্যাপক, ইতিহাস, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়	১০ ডিসেম্বর
আব্দুর রাজ্জাক	এসডিও, পিরোজপুর	মে
আতিকুল্লাহ	সার্কেল অফিসার, পাথরঘাটা	মে
এএনএম মনিরুজ্জামান	অধ্যাপক, পরিসংখ্যান, ঢা.বি	২৫ মার্চ
ডাঃ এএফ জিয়াউর রহমান	প্রাক্তন অধ্যক্ষ, সিলেট মেডিকেল কলেজ	১৫ এপ্রিল
এএফএম লুৎফর রহমান	অধ্যাপক, ব্রাহ্মণবাড়িয়া কলেজ	১৪ ডিসেম্বর
এ কে শামসুদ্দিন সিএসপি	এসডিও, সিরাজগঞ্জ	৬ ডিসেম্বর
এ এম সাদেক	শিক্ষক, ল্যাবরেটরী স্কুল, ঢাকা	মার্চ
এটিএম জাফর আলম	ছাত্র, ইকবাল হল	২৬ মার্চ
এসএএম ফয়জুল মহী	অধ্যাপক, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়	১৪ ডিসেম্বর
এমএ মান্নান লাডু ভাই	ক্রীড়া ব্যক্তিত্ব	১৯৭১
কছিম উদ্দিন আহমেদ	পাবনা জেলা স্কুল	৪ জুন
কাজী আজিজুল ইসলাম	অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক, বরিশাল	মে
ডাঃ কাজী ওবায়দুল হক	যশোর	৫ এপ্রিল
কাজী শামসুল হক	আওয়ামী লীগ নেতা, স্বরূপকাঠি, পিরোজপুর	জুন
কামিনী কুমার ঘোষ	আইনজীবী ও সমাজ সেবক, চট্টগ্রাম	২৫ এপ্রিল
খালেদ রশীদ	অধ্যাপক, সুন্দরবন কলেজ	১৪ আগস্ট
গিয়াস উদ্দিন আহমদ	অধ্যাপক, ইতিহাস, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়	১৪ ডিসেম্বর
গণপতি হালদার	ছাত্র, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়	মে

গোলাম হোসেন	অতিরিক্ত এসপি, বরিশাল	৩ মে
জহির রায়হান	সাহিত্যিক, চলচ্চিত্রকার	৩০ জানুয়ারি
জিকরুল হক	সংসদ সদস্য, পাবনা	২৬ মার্চ
জিতেন্দ্র লাল দত্ত	এডভোকেট, বরিশাল বার	১৪ আগস্ট
জোতির্ময় গুহঠাকুরতা	অধ্যাপক, ইংরেজি বিভাগ, ঢা.বি	৩০ মার্চ
ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত	সাবেক সংসদ সদস্য, এডভোকেট কুমিল্লা	২৭ মার্চ
নজরুল ইসলাম	প্রকৌশলী, ওয়াপদা	২২ জুলাই
নিজামুদ্দীন আহমদ	সাংবাদিক, বিবিসি	১২ ডিসেম্বর
নজরুল ইসলাম	ছাত্রনেতা, বরিশাল	নভেম্বর
নূতন চন্দ্র সিংহ	কুণ্ডেশ্বরী ঔষধালয়	১৩ মে
মোহাম্মদ নাসির উদ্দিন	চীফ পার্সোনাল অফিসার, রেলওয়ে, চট্টগ্রাম	১১ মে
নুরুল আমিন সিএসপি	সাবেক ডিসি, বরিশাল	২০ মে
ফয়জুর রহমান	ডিএসপি পিরোজপুর	মে
বীরেন্দ্রনাথ সরকার	আইনজীবী, রাজশাহী	৩ এপ্রিল
মশিউর রহমান	এমএনএ, যশোর	৩০ মার্চ
মামুন মাহমুদ পিএসপি	ডিআইজি পুলিশ রাজশাহী	২৬ মার্চ
মিজানুর রহমান	ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট পিরোজপুর	মে
মজিবর রহমান কাঞ্চন	আওয়ামী লীগ নেতা, বরিশাল	মে
মোহাম্মদ শাহজাহান	পাথরঘাটা	অক্টোবর
মুজিবর রহমান কাঞ্চন	পাথরঘাটা	অক্টোবর
মীর আব্দুল কাইয়ুম	অধ্যাপক, মনোবিজ্ঞান, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়	২৫ নভেম্বর
মুনীর চৌধুরী	অধ্যাপক, বাংলা, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়	১৪ ডিসেম্বর
মুহাম্মদ আব্দুল মুকতাদির	ওয়াপদা	২৬ মার্চ
মেহেরুন্নেসা	লেখিকা	২৬ মার্চ
মোফাজ্জল হায়দার চৌধুরী	অধ্যাপক, বাংলা, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়	১৪ ডিসেম্বর
ডাঃ মোহাম্মদ ফজলে রাব্বি	অধ্যাপক, ঢাকা মেডিকেল কলেজ	১৫ ডিসেম্বর
ডাঃ মোহাম্মদ মোর্তজা	চিকিৎসক, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়	১৪ ডিসেম্বর
ডাঃ এম শফী	চিকিৎসক, চট্টগ্রাম	৭ এপ্রিল
ডাঃ যোগেশ চন্দ্র ঘোষ	সাধনা ঔষধালয়	৪ এপ্রিল
রণদা প্রসাদ সাহা	দানবীর, মির্জাপুর	১৭ মে

কবি রফিকুল ইসলাম	অধ্যাপক, দর্শনা কলেজ	২৯ জুলাই
ডাঃ রাখাল চন্দ্র দাস	চিকিৎসক ময়মনসিংহ জেলা কাউন্সিল	১২ মে
রামকৃষ্ণ অধিকারী	অধ্যাপক, বাংলা, কারমাইকেল কলেজ, রংপুর	৩০ মে
রাশিদুল হাসান	অধ্যাপক, ইংরেজি, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়	১৪ ডিসেম্বর
ডাঃ রেবতী কান্ত স্যানাল	নওগাঁ	৪ এপ্রিল
ললিত কুমার বল	আইনজীবী, সাবেক এমএলএ বরিশাল	৭ জুন
লুৎফুন্নাহার হেলেন	শিক্ষিকা, মাগুরা উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়	৫ অক্টোবর
শহীদ সাবের	সাংবাদিক, দৈনিক সংবাদ	৩১ মার্চ
ডঃ শরাফত আলী	অধ্যাপক, গণিত, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়	২৬ মার্চ
শহীদুল্লাহ কায়সার	সাংবাদিক, লেখক	১৪ ডিসেম্বর
শামসুদ্দিন	ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট, রাজশাহী	এপ্রিল
শামসুল হক পিএসপি	পুলিশ সুপার, চট্টগ্রাম	এপ্রিল
শামসুল হক খান সিএসপি	জেলা প্রশাসক, কুমিল্লা	এপ্রিল
শহিদুল ইসলাম খোকন	ছাত্র, পিরোজপুর	ডিসেম্বর
শাহ আবদুল মজিদ পিএসপি	পুলিশ সুপার, রাজশাহী	৩১ মার্চ
শফিকুল মান্নান	অধ্যাপক পাতারহাট কলেজ, বরিশাল	নভেম্বর
সন্তোষ চন্দ্র ভট্টাচার্য	অধ্যাপক, ইতিহাস, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়	১৪ ডিসেম্বর
সৈয়দ নুরুল হুদা	অধ্যাপক, ইতিহাস, বিএম কলেজ	জুন
অধ্যক্ষ সুলতান উদ্দিন আহমেদ	ফরিদপুর পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট	১১ এপ্রিল
সায়ীদুল ইসলাম	ভাসানী ন্যাপ নেতা, ঢাকা	১৮ মে
ডঃ সাদাত আলী	ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, গবেষণা ইনস্টিটিউট	২৬ মার্চ
এডভোকেট সুধীর চক্রবর্তী	বরিশাল	অক্টোবর
সুনীল বরণ চক্রবর্তী	অধ্যাপক, দর্শন কারমাইকেল কলেজ, রংপুর	৩০ মে
একেএম নুরুল হক	প্রকৌশলী টিএন্ডটি	১৪ এপ্রিল
সিরাজুল হক খান	অধ্যাপক, শিক্ষা গবেষণা ইনস্টিটিউট, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়	১৪ ডিসেম্বর
এডভোকেট সুনাহার আলী	আইনজীবী, সুনামগঞ্জ	১৯৭১
সিরাজ উদ্দীন হোসেন	সাংবাদিক	১০ ডিসেম্বর
সুখরঞ্জন সমাদ্দার	অধ্যাপক, সংস্কৃতি, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়	১৪ এপ্রিল

সৈয়দ নজমুল হক	সাংবাদিক	১১ ডিসেম্বর
সেলিনা পারভীন	লেখিকা	১৪ ডিসেম্বর
কর্নেল ডা. সৈয়দ আব্দুল হাই	যশোর সেনানিবাস	৩০ মার্চ
হরিণাথ দে	শিক্ষাবিদ, ঢাকা	২৭ মার্চ
ডা. হাসিময় হাজরা	ঢাকা মেডিকেল কলেজ	মে
লে. কর্নেল জাহাঙ্গীর	কুমিল্লা সেনানিবাস	মার্চ

যুদ্ধাপরাধীদের তালিকা

১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধকালে পাকিস্তান সেনাবাহিনীর ১৯৫ জন যুদ্ধাপরাধীকে বাংলাদেশের মাটিতে বিচারের জন্য তালিকা প্রণয়ন করা হয়। ভারতে যারা বন্দি ছিল তাদের তালিকা করা হয়েছিল। কিন্তু যারা যুদ্ধকালে পশ্চিম পাকিস্তানে চলে যায়, তাদের বিচারে তালিকাভুক্ত করা হয়নি। ১৯৫ জনের মধ্যে নিম্নে উর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের নামের তালিকা দেয়া হলো–

	কর্মকর্তাদের নাম ও পদবি	**১৯৭১ সালে অবস্থান**
১.	লে. জে. আমির আব্দুল্লাহ খান নিয়াজী	পূর্বাঞ্চলীয় কমান্ডার
২.	মেজর জে. নজর হুসেন শাহ	জিওসি, ১৬ ডিভিশন
৩.	মেজর জে. মুহাম্মদ হুসেইন আনসারী	জিওসি, ৯ম ডিভিশন
৪.	মেজর জে. মোহাম্মদ জামসেদ	ডিজি, ইপকাফ
৫.	মেজর জে. কাজী আব্দুল মজিদ খান	জিওসি, ১৪ ডিসেম্বর
৬.	মেজর জে. রাও ফরমান আলী খান	গভর্নরের বেসামরিক উপদেষ্টা
৭.	ব্রি. আব্দুল কাদির খান	৯৩, বিডিই
৮.	ব্রি. আরিফ রাজা	হেডকোয়ার্টার সিগন্যাল
৯.	ব্রি. আতা মুহাম্মদ খান মালিক	৭ বিডিই
১০.	ব্রি. বশির আহমেদ	কাফ
১১.	ব্রি. ফাহিম আহমেদ খান	হেডকোয়ার্টার ইসি
১২.	ব্রি. মঞ্জুর আহমেদ	৫৭ হেডকোয়ার্টার বিডিই
১৩.	ব্রি. মঞ্জুর হুসেইন আতিক	১৭৭ বিডিই
১৪.	ব্রি. মিয়া মনসুর মুহাম্মদ	৩৯ ডিভিশন
১৫.	ব্রি. তাসকিনউদ্দিন	৯১ বিডিই
১৬.	ব্রি. মীর আব্দুল নাইম	৩৪ হেডকোয়ার্টার বিডিই
১৭.	ব্রি. মুহাম্মদ আসলাম	৫৩ বিডিই
১৮.	ব্রি. মুহাম্মদ হায়াত	১০৭/৪০৭ বিডিই

১৯.	ব্রি. মুহাম্মদ শফি	২৩ হেডকোয়ার্টার বিডিই
২০.	ব্রি. এমএ আশরাফ	সিএসডি নাটোর জিআরসি
২১.	ব্রি. এম এ আনসারী	রংপুর জিআরসি
২২.	ব্রি. সাদউল্লাহ খান এসজে	২৭ বিডিই
২৩.	ব্রি. সৈয়দ আবীর হাসান	সিলেট ফোর্স
২৪.	ব্রি. শাহ আব্দুল কাসেম	সিসিএটিওয়াই ইসিও
২৫.	ব্রি. তোজমাল হুসেইন মালিক	২০৫ হেডকোয়ার্টার বিডিই
২৬.	এয়ার কমোডর এনামুল হক খান	পিএফ-ঢাকা
২৭.	কর্নেল ফজলে হামিদ	৩১৪ হেডকোয়ার্টার বিডিআই
২৮.	কর্নেল কে. কে. আফ্রিদী	৯ম ডিভিশন
২৯.	কর্নেল মোহাম্মদ খান	আইএসআই
৩০.	মুহাম্মদ মুশাররফ আলী	১৪ এডিএমএস ডিভিশন
৩১.	রিয়ার এডমিরাল মুহাম্মদ শরীফ	নৌবাহনী

এছাড়া যুদ্ধাপরাধীদের তালিকায় ছিল ৪৫ জন লে. কর্নেল, ৮০ জন মেজর, ৪৩ জন ক্যাপ্টেন। যুদ্ধকালে লে. জে. টিক্কা খান, লেঃ জেঃ খাদেম হোসেন রাজা, মেজর জেনারেল রহিম পশ্চিম পাকিস্তানে চলে যাওয়ায় তাদের তালিকাভুক্ত করা হয়নি। সিমলা চুক্তির আলোকে পশ্চিম পাকিস্তান থেকে বাঙালিদের ফেরত আনার জন্য পাকিস্তানী যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের দাবি বাংলাদেশ সরকারকে পরিত্যাগ করতে হয়।

উল্লেখ্য, ১৯৭১ সালে বাংলাদেশে গণহত্যা, নারী নির্যাতন ও লুণ্ঠনে ৯৩ হাজার পাকবাহিনী, জামায়াত, রাজাকার, শান্তি কমিটি প্রত্যক্ষভাবে অংশগ্রহণ করে। তারা সকলে যুদ্ধাপরাধী। তাদের বিচার দাবি অব্যাহত রয়েছে। শহীদ জননী জাহানারা ইমামের নেতৃত্বে গঠিত ঘাতক-দালাল নির্মূল কমিটি গণআদালত প্রতিষ্ঠা করে জামায়াত নেতা অধ্যাপক গোলাম আযমের বিচার করে ফাঁসির আদেশ দেয়।

যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের জন্য বঙ্গবন্ধুর সরকার নিম্নোক্ত পদক্ষেপ গ্রহণ করে–

* ১৯৭২ সালের ২৪ জানুয়ারি বাংলাদেশ দালাল আইন জারি করে– Po No VIII 1972.
* ১৯৭২ সালের ১৫ ডিসেম্বর বাংলাদেশ নাগরিকত্ব আইন জারি করা হয় এবং অনেক দালালিদের নাগরিকত্ব বাতিল করা হয়।

* ১৯৭২ সালের ৪ নভেম্বর সংবিধানের ১২ ও ৩৮ অনুচ্ছেদে ধর্ম নিয়ে রাজনীতি করা রহিত করা হয়।
* ৬৬ ও ১২২ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী দালালদের ভোটাধিকার ও সংসদ নির্বাচনে অংশগ্রহণের অধিকার বাতিল করা হয়।
* The International Crimes (Tribunals) Act. 1973.
* ১৯৭৩ সালের ৩০ নভেম্বর বঙ্গবন্ধু সাধারণ ক্ষমা ঘোষণা করেন।
* যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের জন্য ট্রাইব্যুনাল গঠন।

১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্টের পর মেজর জেনারেল জিয়াউর রহমান ১৯৭৫ সালের ৩১ ডিসেম্বর দালাল আইন বাতিল করেন। ১৯৭৬ সালে Second Proclamation জারি করে ধর্মভিত্তিক রাজনীতি করার লক্ষ্যে সংবিধানের ৩৮ অনুচ্ছেদের শর্তাদি তুলে দেয়া হয়। তিনি সংবিধান সংশোধন করে দালালদের রাজনীতি করা, ভোট প্রদানের অধিকার ও নাগরিকত্ব ফেরত পাবার অধিকার প্রদান করেন।

পাকবাহিনীর দালালদের তালিকা

১.	খাজা খায়েরউদ্দিন	মুসলিম লীগ
২.	একিউএম শফিকুল ইসলাম	মুসলিম লীগ
৩.	অধ্যাপক গোলাম আযম	জামায়াতে ইসলামী
৪.	মতিউর রহমান নিজামী	জামায়াত, বদরবাহনী প্রধান
৫.	নুরুল আমিন	প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী, পিডিপি নেতা
৬.	মাহমুদ আলী	পিডিপি
৭.	শাহ আজিজুর রহমান	কাউন্সিল মুসলিম লীগ
৮.	মওলানা সৈয়দ মোহাম্মদ মাসুম	পিডিপি
৯.	পীর মোহসেন উদ্দিন দুধু মিয়া	পিডিপি
১০.	এ এস এম সোলায়মান	ডাঃ মালেক মন্ত্রিসভার সদস্য
১১.	গোলাম সারওয়ার	দাওয়াতুল ইসলাম
১২.	আবুল কাসেম	মুসলিম লীগ
১৩.	ফজলুল কাদের চৌধুরী	মুসলিম লীগ
১৪.	রাজিয়া ফয়েজ	মুসলিম লীগ
১৫.	এডভোকেট এটি সাদী	নেজামে ইসলাম
১৬.	আব্দুল মতিন	মুসলিম লীগ
১৭.	ব্যারিস্টার আখতারউদ্দিন	মুসলিম লীগ

১৮.	এডভোকেট আতাউল হক খান	মুসলিম লীগ
১৯.	মওলানা ইউসুফ আলী	জামায়াত
২০.	মওলানা আব্বাসউদ্দিন	জামায়াত
২১.	মৌলভী ফরিদ আহমেদ	নেজামে ইসলাম
২২.	নওয়াজেশ আহমেদ	মুসলিম লীগ
২৩.	মওলানা আব্দুল মান্নান	আলবদর
২৪.	জুলমত আলী খান	মুসলিম লীগ
২৫.	হামিদুল হক চৌধুরী	পিডিপি
২৬.	ওবায়দুল্লাহ মজুমদার	মালেক মন্ত্রিসভার সদস্য
২৭.	ড. সাজ্জাদ হোসেন	ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
২৮.	ড. হাসান জামান	ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
২৯.	ড. মহর আলী	ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
৩০.	অধ্যাপক আব্দুল বারী	রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়
৩১.	আশরাফুজ্জামান খান	আলবদর
৩২.	এ বি এম খালেক মজুমদার	আলবদর
৩৩.	চৌধুরী মঈনুদ্দিন	আলবদর
৩৪.	এ জি এম সফিকুজ্জামান	মুসলিম লীগ
৩৫.	মুহাম্মদ সিরাজউদ্‌দীন	মুসলিম লীগ
৩৬.	মওলানা সিদ্দিক আহমেদ	ইত্তেহাদুল উম্মা

উপরের কয়েকজন নেতৃস্থানীয় দালালেল নাম উল্লেখ করা হয়েছে। এছাড়া আরো কয়েক হাজার দালাল তালিকাভুক্ত আছে।

অধ্যায় ২৬

পাকিস্তান কারাগার থেকে মুক্তি লাভ

প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্ব গ্রহণ

১৯৭১ সালে বঙ্গবন্ধু পাকিস্তানের মিয়ানওয়ালী জেলে আটক ছিলেন। ১৯৭১ সালের ২৬ ডিসেম্বর তাকে রাওয়ালপিন্ডির সামরিক বিমানবন্দরের নিকট একটি ঘরে আটক রাখা হয়। ২৭ ডিসেম্বর এবং ১৯৭২ সালের ৭ জানুয়ারি পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট জুলফিকার আলী ভুট্টো বঙ্গবন্ধুর সাথে আলোচনা করেন। ভুট্টো পাকিস্তানের সাথে বাংলাদেশের একটি সম্পর্ক রাখার অনুরোধ জানান। শেখ মুজিবুর রহমান জানেন না যে বাংলাদেশ স্বাধীন হয়েছে, পাকবাহিনী আত্মসমর্পণ করেছে। বঙ্গবন্ধু ভুট্টোকে বলেন, তিনি তার জনগণের সাথে আলাপ না করে কিছু বলতে পারবেন না। পাকিস্তান থেকে মুক্তিলাভ করে তিনি ১৯৭২ সালের ৮ জানুয়ারি পিআইএ বিমানে লন্ডন যাত্রা করেন। সাথে ড. কামাল হোসেন। তারা হিথ্রো বিমানবন্দরে অবতরণ করেন এবং হোটেল ক্লারিজে ওঠেন। ১০ নম্বর ডাউনিং স্ট্রিটে ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী এডওয়ার্ড হিথ তাকে উষ্ণ সংবর্ধনা জানান। ১০ জানুয়ারি বঙ্গবন্ধু ও ড. কামাল হোসেন ব্রিটিশ রয়াল এয়ার ফোর্সের কমেট বিমানযোগে দিল্লি হয়ে ঢাকা যাত্রা করেন।

১৯৭২ সালের ১০ জানুয়ারি সকালে দিল্লির পালাম বিমানবন্দরে ভারতের প্রেসিডেন্ট ভিপি গিরি ও প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী বঙ্গবন্ধুকে সংবর্ধনা জ্ঞাপন করেন। বিকেল ১টা ৪১ মিনিটে বিমান ঢাকা বিমানবন্দরে অবতরণ করলে লক্ষ লক্ষ জনতা বঙ্গবন্ধুকে সংবর্ধনা জানায়। বিমানবন্দর থেকে রমনা রেসকোর্স ময়দানে তার যেতে ৪ ঘণ্টা সময় লাগে। সেদিন তিনি ১০ লাখ মানুষের উদ্দেশে কান্নাজড়িত কণ্ঠে ভাষণ দেন।

ভাষণের এক পর্যায়ে বলেন, "ফাঁসি মঞ্চে যাওয়ার সময় আমি বলব আমি বাঙালি, বাংলা আমার দেশ। বাংলা আমার ভাষা।" তিনি লক্ষ লক্ষ শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা জানান। তিনি বাংলাদেশকে স্বীকৃতি প্রদানের জন্য আহ্বান জানান। ভাষণের পর তিনি তার পরিবারের সদস্যদের সাথে ৯ মাস পর মিলিত হন।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৭২ সালের ১০ জানুয়ারি বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ করেন। ১১ জানুয়ারি বাংলাদেশের সাময়িক শাসনতন্ত্র জারি করেন। তিনি রাষ্ট্রপতি পরিবর্তে সংসদীয় পদ্ধতির সরকার প্রবর্তন করেন। ১২ জানুয়ারি তিনি বাংলাদেশে সরকারের প্রধানমন্ত্রী নিযুক্ত হন। বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরী হলেন বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি। বঙ্গবন্ধুর মন্ত্রিসভার সদস্যরা হলেন–

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান
সৈয়দ নজরুল ইসলাম
তাজউদ্দীন আহমদ
এম মনসুর আলী
খন্দকার মোশতাক আহমদ
আবদুস সামাদ আজাদ
এ এইচ এম কামরুজ্জামান
শেখ আবদুল আজিজ
অধ্যাপক ইউসুফ আলী
জহুর আহমদ চৌধুরী
ফণী ভূষণ মজুমদার
ড. কামাল হোসেন
আব্দুর রব সেরনিয়াবাত।

১৯৭২ সালের ১৩ জানুয়ারি মন্ত্রিসভার বৈঠকে গৃহীত সিদ্ধান্ত :

- সুদসহ সকল ঋণ মওকুফ।
- জাতীয় পতাকায় বাংলাদেশের মানচিত্র থাকবে না, লাল সূর্য থাকবে।
- বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের আমার সোনার বাংলা, আমি তোমায় ভালোবাসি– কবিতার প্রথম ১০ লাইন জাতীয় সঙ্গীত হিসেবে গৃহীত হয়।
- কুচকাওয়াজের সঙ্গীত হিসেবে গৃহীত হয় বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলামের চল চল চল গানটি।
- জাতীয় ফুল শাপলা, জাতীয় পশু বাঘ, জাতীয় পাখি-দোয়েল। বাংলা সালের ১ বৈশাখ, ২১ ফেব্রুয়ারি ছুটির দিন, ২৬ মার্চ স্বাধীনতা দিবস, ১৬ ডিসেম্বর বিজয় দিবস পালনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।
- ১৭ জানুয়ারি বঙ্গবন্ধু মুক্তিযোদ্ধাদের অস্ত্র জমা দেয়ার নির্দেশ দেন।

১৯৭২ সালের ২২ জানুয়ারি মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী ভারত থেকে টাঙ্গাইলে আসেন।

রাষ্ট্রপতি আবু সাঈদ চৌধুরী ১৯৭২ সালের ১৬ ডিসেম্বর সুপ্রিমকোর্ট উদ্বোধন করেন।

বঙ্গবন্ধু সাংবাদিক ডেভিড ফ্রস্টের সাথে সাক্ষাৎকার দেন এবং তা ১৯৭২ সালের ১৮ জানুয়ারি নিউইয়র্ক টেলিভিশন থেকে প্রচারিত হয়।

১৯৭২ সালের ৬ ফেব্রুয়ারি তিনি ভারতের আহ্বানে রাষ্ট্রীয় সফরে কলকাতা গমন করেন। ভারতের প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী ও বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী ব্রিগেড প্যারেড গ্রাউন্ড মাঠে অনুষ্ঠিত স্মরণকালের বৃহত্তম জনসভায় ভাষণ দেন।

প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধুর অনুরোধে ভারতীয় সেনাবাহিনী ১৯৭২ সালের ১২ মার্চ বাংলাদেশ ত্যাগ করে।

১৯৭২ সালের ২৯ ফেব্রুয়ারি বঙ্গবন্ধু রাশিয়া সফর করেন।

১৯৭২ সালের ১৭ মার্চ ভারতের প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী বাংলাদেশে আসেন এবং বিকেলে সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে বিশাল জনসভায় ভাষণ দেন। ১৭ মার্চ উভয় দেশের মধ্যে ২৫ বছর মেয়াদী মৈত্রী সমঝোতা ও শান্তির এক ঐতিহাসিক চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। এ চুক্তি নিয়ে বঙ্গবন্ধুকে সমালোচনা করা হয়েছে। এ চুক্তি ছিল বন্ধুত্বের চুক্তি মাত্র। চুক্তিটি আর নবায়ন করা হয়নি।

বাংলাদেশের সংবিধান ১৯৭২

১৯৭০ সালের ৭ ডিসেম্বর নির্বাচিত সকল এমএনএ ও এমপিএকে নিয়ে গণপরিষদ গঠন করা হয়। এমএনএ ও এমপিদের এমসিএ বলা হয়– Member of Constituent Assembly- বাংলাদেশের সংবিধান প্রণয়নের জন্য ১৯৭২ সালের ১৩ এপ্রিল আইনমন্ত্রী ড. কামাল হোসেনকে সভাপতি করে ৩৫ সদস্যবিশিষ্ট কমিটি গঠন করা হয়। ড. কামাল হোসেন অত্যন্ত দক্ষতার সাথে অল্প সময়ের মধ্যে খসড়া সংবিধান সংসদে পেশ করেন। ১৯৭২ সালের ৪ নভেম্বর সংসদ তুমুল হর্ষধ্বনি দিয়ে খসড়া সংবিধান অনুমোদন করে এবং একই দিনে রাষ্ট্রপতি বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরী সংবিধান স্বাক্ষর করেন। ১৯৭২ সালের ১৬ ডিসেম্বর হতে সংবিধান কার্যকরী হয়। এদিনে গণপরিষদ বাতিল হয়ে যায়।

সংবিধানে ১১টি ভাগ এবং ১৫৩টি অনুচ্ছেদ আছে।

সংবিধানে ৪টি মূলনীতি অন্তর্ভুক্ত আছে। মূলনীতি হলো :

১. জাতীয়তাবাদ

২. গণতন্ত্র

৩. সমাজতন্ত্র

৪. ধর্মনিরপেক্ষতা

সংবিধানে ৭ অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে, সকল ক্ষমতার উৎস জনগণ। তাদের নির্বাচিত প্রতিনিধিরা দেশ শাসন করবে।

১৯৭৩ সালের সাধারণ নির্বাচন ও মন্ত্রিসভা

১৯৭৩ সালের ৭ মার্চ সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। আওয়ামী লীগ নৌকা প্রতীক নিয়ে ৩০০ আসনের মধ্যে ২৯৫টি আসনে জয়লাভ করে। ১৯৭৩ সালের ১৬ মার্চ বঙ্গবন্ধুকে প্রধানমন্ত্রী করে ২১ সদস্যবিশিষ্ট মন্ত্রিসভা গঠন করা হয়। মন্ত্রীরা হলেন :

শেখ মুজিবুর রহমান	প্রধানমন্ত্রী, মন্ত্রিপরিষদ, সংস্থাপন, প্রতিরক্ষা ও পরিকল্পনা
সৈয়দ নজরুল ইসলাম	শিল্প
তাজউদ্দীন আহমদ	অর্থ, পাট
এম মনসুর আলী	যোগাযোগ
খন্দকার মোশতাক আহমদ	পানিসম্পদ, বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও বিদ্যুৎ
এ এইচ এম কামরুজ্জামান	বাণিজ্য
আবদুস সামাদ আজাদ	কৃষি
শেখ আবদুল আজিজ	তথ্য ও বেতার
অধ্যাপক ইউসুফ আলী	শিক্ষা, সংস্কৃতি ও ক্রীড়া
জহুর আহমেদ চৌধুরী	শ্রম ও সমাজকল্যাণ
শ্রী ফনী ভূষণ মজুমদার	খাদ্য
ড. কামাল হোসেন	পররাষ্ট্র
আবদুল মালেক উকিল	স্বরাষ্ট্র
এম মতিয়ুর রহমান	স্থানীয় সরকার, সমবায় পল্লী উন্নয়ন
মিজানুর রহমান চৌধুরী	ত্রাণ পুনর্বাসন
সোহরাব হোসেন	পূর্ত
আবদুল মান্নান	স্বাস্থ্য পরিবার পরিকল্পনা
আবদুর রব সেরনিয়াবাত	ভূমি প্রশাসন, ভূমি সংস্কার, বন, মৎস্য ও পশু পালন
জেনারেল মোঃ আতাউল গনি ওসমানী	নৌপরিবহন, ডাক ও তার
ড. মফিজ চৌধুরী	বিজ্ঞান, কারিগরি ও আণবিক শক্তি

শ্রী মনোরঞ্জন ধর — আইন ও সংসদবিষয়ক

মন্ত্রিসভা মুক্তিযুদ্ধে ক্ষতিগ্রস্ত ও শহীদ পরিবারের পুনর্বাসনের সিদ্ধান্ত নেয়। মুক্তিযুদ্ধকালে এক কোটি লোক ভারতে আশ্রয় নেয়, ৩০ লাখ শহীদ, ২ লাখ পঞ্চাশ হাজার নারী নির্যাতিত হয়।

মুক্তিযোদ্ধাদের সম্মানিত করা

১৯৭৩ সালের ১৬ ডিসেম্বর বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধে যারা মৃত্যু নিশ্চিত জেনে সম্মুখযুদ্ধে শহীদ হয়েছেন এবং অপূর্ব সাহসিকতা প্রদর্শন করেছেন তাদের বিশেষ খেতাবে ভূষিত করেন। খেতাবপ্রাপ্তদের মধ্যে ৭ জন বীরশ্রেষ্ঠ, ৬৮ জন বীরউত্তম, ১৭৫ জন বীরবিক্রম, ৪২৬ জন বীরপ্রতীক ছিলেন।

বীরশ্রেষ্ঠরা হলেন :

শহীদ ক্যাপ্টেন মহিউদ্দিন জাহাঙ্গীর
শহীদ ফ্লাইট লে. মতিয়ুর রহমান
শহীদ ল্যান্সনায়েক মুন্সী আবদুর রব
শহীদ সিপাহী হামিদুর রহমান
শহীদ সিপাহী মোস্তফা কামাল
শহীদ ল্যান্স নায়েক নূর মোহাম্মদ
শহীদ মোহাম্মদ রুহুল আমিন

সরকারের কয়েকটি উল্লেখযোগ্য কর্মসূচি

১৯৭২ সালের ২৪ জানুয়ারি সরকার পাকবাহিনীর দালালদের বিচারের জন্য ট্রাইব্যুনাল গঠন করে।

১৯৭২ সালের ৮ এপ্রিল পৃথক সেনাবাহিনী, বিমান বাহিনী ও নৌবাহিনী গঠন করা হয়।

১৯৭২ সালের ১০ এপ্রিল শাহ আবদুল হামিদ ও মোহাম্মদ উল্লাহ যথাক্রমে গণপরিষদের স্পিকার ও ডেপুটি স্পিকার নির্বাচিত হন।

১৯৭২ সালের ১৩ জুলাই সচিব আবদুর রবকে চেয়ারম্যান করে ১৫ সদস্যবিশিষ্ট পে-কমিশন গঠন করা হয়।

১৯৭২ সালের ১০ ডিসেম্বর মওলানা ভাসানীকে সভাপতি এবং কাজী জাফরকে মহাসচিব করে ভাসানী ন্যাপ গঠন করা হয়।

সরকার ১৯৭৩ সালের ১০ জুলাই বেতন বৈষম্য দূর করে দশটি জাতীয় স্কেল ঘোষণা করে।

সংবিধানের প্রথম সংশোধন ১৯৭৩

বঙ্গবন্ধুর জীবিতকালে সংবিধানের চারবার সংশোধন করা হয়।

১৯৫ জন পাকিস্তানি যুদ্ধাপরাধীদের বিচার করার জন্য ১৯৭৩ সালের ১৫ জুলাই জাতীয় সংসদ সংবিধানের প্রথম সংশোধন করে। সংবিধানের ৪৭ অনুচ্ছেদ সংশোধন করে বলা হয় যে, মৌলিক অধিকারের ৩৫ ও ৪৪ ধারা আটক যুদ্ধাপরাধীদের জন্য প্রযোজ্য হবে না। তারা আটকাদেশ চ্যালেঞ্জ করে আদালতের আশ্রয় নিতে পারবে না। ১৯৫ জন যুদ্ধাপরাধীকে বিচারের জন্য জাতীয় সংসদে The International Crimes (Tribunals) Act 1973 পাস হয়।

সংবিধানের দ্বিতীয় সংশোধনী

১৯৭৩ সালের ১৫ জুলাই সংবিধানের ২৫ ও ৩৩ ধারা সংশোধন করে রাষ্ট্রপতিকে জরুরি অবস্থা ঘোষণার ক্ষমতা প্রদান করা হয়।

জাসদ, সর্বহারা পার্টি ও ভাসানী ন্যাপ দেশে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করে। ব্যাংক ও থানা লুট, পাঁচজন সংসদ সদস্য নিহত হয়। বাধ্য হয়ে রাষ্ট্রপতি ১৯৭৪ সালের ২৮ ডিসেম্বর জরুরি অবস্থা ঘোষণা করেন।

সংবিধানের তৃতীয় সংশোধনী

১৯৭৪ সালের ১৬ মে প্রধানমন্ত্রী শেখ মুজিবুর রহমান দিল্লি গমন করেন এবং উভয় দেশের মধ্যে সীমান্ত চুক্তি স্বাক্ষর করেন। এ চুক্তি অনুসারে ১৯৭৪ সালের ২৮ নভেম্বর সংবিধানের তৃতীয় সংশোধনী আনা হয়।

সংবিধানের চতুর্থ সংশোধনী

১৯৭৫ সালের ১৬ জানুয়ারি শাসনতন্ত্রে চতুর্থ সংশোধনী আনয়ন করা হয় এবং রাষ্ট্রপতি ও একদলীয় শাসন ব্যবস্থা প্রবর্তন করা হয়।

আওয়ামী লীগের দ্বিবার্ষিক কাউন্সিল অধিবেশন– ২০ জানুয়ারি ১৯৭৪

আওয়ামী লীগের গঠনতন্ত্র অনুসারে যারা মন্ত্রী থাকবেন তারা দলের সাংগঠনিক পদে থাকবেন না। বঙ্গবন্ধু ইতোপূর্বেই সভাপতির পদ ত্যাগ করার ঘোষণা দেন। ১৯৭৪ সালের ২০ জানুয়ারি ঢাকায় আওয়ামী লীগের দ্বিবার্ষিক কাউন্সিল অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। অধিবেশনে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্থলে এএইচএম কামরুজ্জামান সভাপতি এবং তাজউদ্দীন আহমদের স্থলে জিল্লুর রহমান সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হন।

অধ্যায় ২৭

বঙ্গবন্ধুর উন্নয়ন ভাবনা

বঙ্গবন্ধু বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন সম্পর্কে বলেন, "আমার সরকার অভ্যন্তরীণ সমাজ বিপ্লবে বিশ্বাস করে। এটা কোনো অগণতান্ত্রিক কথা মাত্র নয়– আমার সরকার ও পার্টি বৈজ্ঞানিক সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতি প্রতিষ্ঠা করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। একটি নতুন ব্যবস্থার ভিত রচনার জন্য পুরনো সমাজ ব্যবস্থা উপড়ে ফেলতে হবে। আমরা শোষণমুক্ত সমাজ গড়ব।" সমাজতান্ত্রিক সমাজ প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে বঙ্গবন্ধু ব্যাংক, বীমা, পাট, বস্ত্র প্রভৃতি জাতীয়করণ করেন। ১৯৭২ সালের ২৬ মার্চ পিও ১৬ আদেশে সকল ব্যাংক জাতীয়করণ করে ৬টি ব্যাংক প্রতিষ্ঠা করেন। পাট, বস্ত্র, ভারি শিল্প জাতীয়করণ করা হয়। সরকার কনজিউমার সাপ্লাই কপারেশন প্রতিষ্ঠা করে গ্রাম পর্যায় ন্যায্যমূল্যে নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্য সরবরাহের ব্যবস্থা করে। যুদ্ধবিধ্বস্ত বাংলাদেশকে গড়ার জন্য বাজেট প্রণয়ন করা হয়। তখন বাজেটের আকার ছোট ছিল।

সাল	রাজস্ব আয়	উন্নয়ন ব্যয়
১৯৭২-৭৩	২১৮.১৫ কোটি	৫০১ কোটি
১৯৭৩-৭৪	৫৫৯.৩৭ কোটি	৫২৫ কোটি
১৯৭৪-১৯৭৫	১৪৫৯.৩৭ কোটি	৫২৫ কোটি

প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা

প্রধানমন্ত্রী ১৯৭২ সালের ২১ জানুয়ারি বাংলাদেশ প্লানিং কমিশন গঠন করেন। কমিশনে ছিলেন–

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান	চেয়ারম্যান
ড. নুরুল ইসলাম	ভাইস চেয়ারম্যান
ড. রেহমান সোবহান	সদস্য
ড. আনিসুর রহমান	সদস্য
ড. মোশাররফ হোসেন	সদস্য

গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্র, ধর্মনিরপেক্ষতা ও জাতীয়তাবাদের ভিত্তিতে প্রথম পঞ্চবার্ষিকী ১৯৭৩-৭৮ প্রণয়ন করা হয়। মোট ব্যয় ধরা হয় ৪৪৫৫ কোটি টাকা।

প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার লক্ষ্য ছিল :

- দারিদ্র দূরীকরণ-জাতীয় উৎপাদন বৃদ্ধি;
- সার্বিক জিডিপি ৫.৫ শতাংশ বৃদ্ধি;
- জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার ৩.৩ থেকে ২.৮ হ্রাস করা;
- বেকারত্ব দূর করে চাকরির সংস্থান;
- খাদ্যশস্যের উৎপাদনে আত্মনির্ভরশীলতা অর্জন;
- মাথাপিছু আয় ২.৫ শতাংশ বৃদ্ধি করা;
- মুক্তিযোদ্ধাদের পুনর্বাসন;
- মানব সম্পদ উন্নয়ন;
- দেশে সমহারে আয় ও কর্মের সুযোগ সৃষ্টি করা।

অর্থমন্ত্রী তাজউদ্দীন আহমদের পদত্যাগ ২৬ অক্টোবর ১৯৭৪

তাজউদ্দীন আহমদ মুক্তিযুদ্ধকালে স্বাধীন বাংলাদেশ সরকারের প্রধানমন্ত্রী ছিলেন। তিনি ৯ মাস মুক্তিযুদ্ধ পরিচালনা করেন। মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসে তার অবদান উজ্জ্বল হয়ে থাকবে। একটি মহল বঙ্গবন্ধু ও তাজউদ্দীন আহমদের মধ্যে দূরত্ব সৃষ্টি করে। অন্যদিকে আমেরিকা তাজউদ্দীন আহমদের বিরোধিতা করত। প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশে তাজউদ্দীন আহমদ ১৯৭৪ সালের ২৬ অক্টোবর পদত্যাগ করেন। তাকে পদত্যাগে বাধ্য করা বঙ্গবন্ধুর ভুল সিদ্ধান্ত ছিল।

শিক্ষানীতি-১৯৭৪

বঙ্গবন্ধু সরকার ১৯৭২ সালের ২৬ জুলাই ড. মুহম্মদ কুদরত-এ-খুদাকে সভাপতি করে ১৫ সদস্য বিশিষ্ট শিক্ষা কমিশন গঠন করে। ১৯৭৪ সালের মে মাসে পূর্ণাঙ্গ রিপোর্ট প্রণয়ন করে।

জাতীয়তাবাদ, সমাজতন্ত্র, ধর্মনিরপেক্ষতা ও গণতন্ত্রের ভিত্তিতে শিক্ষানীতি প্রণয়ন করা হয়।

কমিশনের অগ্রাধিকার বিষয়

১. শিক্ষার সর্বস্তরে জাতীয়করণ, মূলনীতি চতুষ্টয়ের সার্থক প্রতিফলন সুনিশ্চিত করতে হবে।

২. সর্বস্তরে বাংলাকে শিক্ষার মাধ্যম রূপে ব্যবহার করতে হবে।

৩. প্রথম থেকে অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত শিক্ষাকে অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক করতে হবে।
৪. প্রাথমিক স্তর থেকে বিজ্ঞান এবং কৃষি শিক্ষা বিশেষ স্থান দিতে হবে।
৫. মাধ্যমিক স্তরে নবম শ্রেণী পর্যন্ত বৃত্তিমূলক শিক্ষার ব্যাপক সুযোগ সৃষ্টি করতে হবে।
৬. ১৯৮০ সালের মধ্যে দেশকে নিরক্ষরতা দূর করতে হবে।
৭. সরকারি ও বেসরকারি শিক্ষায়তনগুলোর মধ্যে বিরাজমান বৈষম্য দূর করতে হবে।
৮. শিক্ষাকে সম্পদ সৃষ্টির উপায় হিসেবে গণ্য করতে হবে।

শিক্ষার লক্ষ্য

১. শিক্ষা ব্যবস্থা একটি জাতির আশা-আকাঙ্ক্ষা রূপায়ণ এবং ভবিষ্যত সমাজ নির্মাণে হাতিয়ার।
২. দেশের সকল শ্রেণীর জনগণের জীবনে নানা গুরুত্বপূর্ণ প্রয়োজনের উপলব্ধি জাগানো।
৩. নানাবিধ সমস্যা সমাধানের যোগ্যতা অর্জন।
৪. সমাজতান্ত্রিক সমাজ সৃষ্টির প্রেরণা সঞ্চার।
৫. শিক্ষার মাধ্যমে জাতীয় নীতি চতুষ্টয়ের সার্বিক প্রতিফলন সুনিশ্চিত করতে হবে।

বঙ্গবন্ধুকে হত্যার পর ড. কুদরত-এ-খুদা শিক্ষা কমিশন রিপোর্ট বাস্তবায়ন স্থগিত হয়ে যায়।

প্রাথমিক শিক্ষকদের চাকরি জাতীয়করণ

সরকার প্রাথমিক শিক্ষাকে জাতীয়করণ করে শিক্ষকদের চাকরি সরকারিকরণ এবং বেতন বৃদ্ধি করে। সরকার ৩৬১৬৬টি প্রাথমিক বিদ্যালয় জাতীয়করণ এবং ১৫৬৭৪২ শিক্ষককের চাকরি সরকারী করেছে। অবৈতনিক প্রাথমিক শিক্ষা নিশ্চিত করার অধিকার সংবিধানের ১৭ অনুচ্ছেদে স্বীকৃতি দেয়া হয়েছে।

বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালনা আইন-১৯৭৩

বিশ্ববিদ্যালয়ের কালাকানুন বাতিল করে ১৯৭৩ সালের ১৮ ফেব্রুয়ারি বিশ্ববিদ্যালয় অর্ডিন্যান্স জারি করা হয়।

ফারাক্কা বাঁধ ও গঙ্গা নদীর পানি বণ্টন চুক্তি-১৯৭৫

ভারত সরকার গঙ্গা নদীতে ১৯৭৫ সালে ফারাক্কা বাঁধ নির্মাণ সমাপ্ত করে। ১৯৭৫ সালের ১৮ এপ্রিল বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যে গঙ্গা নদীর পানি বণ্টন চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। চুক্তি অনুসারে বাংলাদেশ সর্বনিম্ন ৪৪ হাজার কিউসেক পানি পাবে।

ইসলামিক ফাউন্ডেশন-১৯৭৫

ইসলাম ধর্মের প্রচার ও প্রসারের জন্য বঙ্গবন্ধু ১৯৭৫ সালের ২২ মার্চ এক অধ্যাদেশবলে ইসলামিক ফাউন্ডেশন প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি টঙ্গী ইস্তেমা ও কাকরাইল মসজিদকে জমি বরাদ্দ করেন।

অধ্যায় ২৮

পররাষ্ট্রনীতি

১৯৭১ সালে পাকিস্তান বাহিনী পূর্ব পাকিস্তানে গণহত্যা চালায়। পাকিস্তানের গণহত্যা সারা বিশ্বে ঘৃণার সৃষ্টি করে। বিশ্বের অধিকাংশ রাষ্ট্র বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ সমর্থন করে। বাংলাদেশে স্বাধীনতা সংগ্রামে ভারত-রাশিয়ার অবদান অবিস্মরণীয়।

স্বাধীনতার পর বাংলাদেশ নিরপেক্ষ পররাষ্ট্রনীতি অনুসরণ করে।

১৯৭২ সালের সংবিধানের মূলনীতির ২৫ নম্বর অনুচ্ছেদে পররাষ্ট্রনীতির উল্লেখ আছে।

জাতীয় সার্বভৌমত্ব ও সমতার প্রতি শ্রদ্ধা, অন্য রাষ্ট্রের অভ্যন্তরীণ বিষয় হস্তক্ষেপ না করা, আন্তর্জাতিক বিরোধের শান্তিপূর্ণ সমাধান, আন্তর্জাতিক আইন ও জাতিসংঘের সনদের প্রতি শ্রদ্ধা– এ সকল নীতি হবে আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ভিত্তি– এ সকল নীতির ভিত্তিতে রাষ্ট্র–

(ক) আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে শক্তি প্রয়োগ পরিহার এবং সাধারণ ও শান্তিপূর্ণ নিরস্ত্রীকরণের চেষ্টা করবেন।

(খ) প্রত্যেক জাতির অভিপ্রায় অনুযায়ী পথ ও পন্থার মাধ্যমে অবাধে নিজস্ব সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ব্যবস্থা নির্ধারণ ও গঠনের অধিকার সমর্থন করবেন এবং

(গ) সাম্রাজ্যবাদ, ঔপনিবেশিকবাদ ও বর্ণ বৈষম্যবাদের বিরুদ্ধে, বিশ্বের সর্বত্র নিপীড়িত জনগণের ন্যায়সঙ্গত সংগ্রামকে সমর্থন করবে।

বঙ্গবন্ধুর পররাষ্ট্রনীতির মূল ভিত্তি ছিল সকলের প্রতি ভালোবাসা, কারও প্রতি ঘৃণা পোষণ না করা। জাতীয় স্বার্থে পররাষ্ট্রনীতি পরিচালিত হবে।

ভারত সফর

১৯৭১ সালে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে ভারত সহায়ক শক্তি হিসেবে বলিষ্ঠ ভূমিকা পালন করে। ভারত এক কোটি বাঙালিকে আশ্রয় দেয়। ভারতীয় সেনাবাহিনী

মুক্তিযোদ্ধাদের সাথে একত্রিত হয়ে পাকবাহিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে বিজয় ছিনিয়ে আনে। ভারত সরকার ও জনগণের প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপনের জন্য বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৭২ সালের ৬ ফেব্রুয়ারি ২ দিনের সফরে কলকাতা গমন করেন। ভারতের প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী তাকে অভ্যর্থনা জানান। সংবর্ধনার জবাবে তিনি বলেন, বাংলাদেশ ধর্মনিরপেক্ষতা অনুসরণ করবে। ধর্মনিরপেক্ষতা চার মূলনীতির অন্যতম।

রাশিয়া সফর

১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধে সোভিয়েত রাশিয়ার অবদান অতুলনীয়। রাশিয়ার প্রতি কৃতজ্ঞতা জানাবার জন্য বঙ্গবন্ধু ১৯৭২ সালের ১ মার্চ হতে ৫ মার্চ সোভিয়েত রাশিয়া সফর করেন।

ভারতের সাথে ২৫ বছর মেয়াদী চুক্তি

ভারতের প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী ১৯৭২ সালের ১৭ মার্চ বাংলাদেশ সফর করেন। সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে উভয় নেতা ভাষণ দেন। তারা ২৫ বছর মেয়াদী চুক্তি স্বাক্ষর করেন।

সিমলা চুক্তি ও বন্দী বিনিময়

১৯৭২ সালের ২৮ জুন হতে ২ জুলাই ভারতের প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী ও পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট জুলফিকার আলী ভুট্টো বন্দী বিনিময়ের জন্য সিমলা চুক্তি স্বাক্ষর করেন এবং ১৯৫ জন যুদ্ধাপরাধী ফেরত দেয়ার সিদ্ধান্ত হয়। বাংলাদেশ-সিমলা চুক্তি সমর্থন দেয়। কারণ এ চুক্তির ফলে পাকিস্তানে আটক ৫ লাখ বাঙালি দেশে ফিরে আসতে পারবে। চুক্তি অনুসারে ১৯৭৩ সালের ১৯ এপ্রিল হতে ব্যাপক প্রত্যাবাসন চলে। এ ব্যাপারে জাতিসংঘ সহায়তা করে।

১৯৭৩ সালের ২৩ মে ঢাকায় এশীয় শান্তি সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। বঙ্গবন্ধু এ সম্মেলন উদ্বোধন করেন।

জোট নিরপেক্ষ সম্মেলন-১৯৭৩

১৯৭৩ সালের ৫-৬ সেপ্টেম্বর আলজিরিয়ার রাজধানী আলজিয়ার্সে জোট নিরপেক্ষ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। বঙ্গবন্ধু এ সম্মেলনে যোগদান করেন এবং বিশ্ব নেতাদের সাথে আলোচনায় মিলিত হন।

পাকিস্তানে ইসলামী সম্মেলন-১৯৭৪

পাকিস্তানের লাহোরে ১৯৭৪ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে ইসলামী সম্মেলন-ওআইসি অনুষ্ঠিত হয়। ওআইসি বাংলাদেশকে সম্মেলনে যোগদানের জন্য আহ্বান জানায়। বঙ্গবন্ধু জানালেন যে, পাকিস্তান বাংলাদেশকে স্বীকৃতি না দিলে তিনি সম্মেলনে যাবেন না। তখন মুসলিম দেশসমূহ পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী জুলফিকার আলী ভুট্টোকে বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেয়ার জন্য চাপ দেয়। ১৯৭৪ সালের ২২ ফেব্রুয়ারি পাকিস্তান বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেয়। ২৩ ফেব্রুয়ারি বঙ্গবন্ধু লাহোরে গমন করেন এবং সম্মেলনে যোগ দেন। মুসলিম বিশ্বে বাংলাদেশের সম্মান বৃদ্ধি পায়। ইরাক ও তুরস্ক বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেয়। ১৯৭৪ সালের ২৫ ফেব্রুয়ারি মিসরের প্রেসিডেন্ট আনোয়ার সাদাত বাংলাদেশ সফর করেন।

বঙ্গবন্ধুর জুলিও কুরি শান্তি পুরস্কার লাভ-১৯৭৩

১৯৭২ সালের অক্টোবর মাসে চিলির রাজধানী সান্তিয়াগোতে শান্তি পরিষদ সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় বাংলাদেশের প্রতিনিধি আলি আকসাদ বিশ্ব পরিষদের সভায় যোগ দেন। বাঙালি জাতির মুক্তিআন্দোলন ও বিশ্ব শান্তি প্রতিষ্ঠায় বঙ্গবন্ধুর অবদানের স্বীকৃতি হিসেবে বঙ্গবন্ধুকে জুলিও কুরি শান্তি পদক প্রদানের প্রস্তাব উত্থাপন করে। ১৪০টি দেশের ২০০ প্রতিনিধির উপস্থিতিতে বঙ্গবন্ধুকে জুলিও কুরি শান্তি পুরস্কার পদক প্রদানের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

১৯৭৩ সালের ২২-২৩ মে বাংলাদেশ জাতীয় সংসদের উত্তর প্লাজায় বিশ্ব শান্তি পরিষদের সভা অনুষ্ঠিত হয়। ২৩ মে সভায় বিশ্ব শান্তি পরিষদের মহাসচিব রমেশ চন্দ বঙ্গবন্ধুকে জুলিও কুরি শান্তি পদক পরিয়ে দিয়ে বলেন, শেখ মুজিব শুধু বঙ্গবন্ধু নন আজ থেকে তিনি বিশ্ববন্ধু বটে।

জাপান সফর ১৯৭৩

১৯৭৩ সালের ১৯ অক্টোবর ৭ দিনের সফরে বঙ্গবন্ধু জাপান গমন করেন। সাথে ছিলেন শেখ রেহানা ও শেখ রাসেল। জাপান সফরকালে তিনি জাপান সরকারের সাথে যমুনা সেতু নির্মাণের জন্য আলোচনা করেন। আলোচনা অনুসারে জাপানি বিশেষজ্ঞ দল ঢাকা আসে এবং যমুনা সেতু নির্মাণের সম্ভাব্যতা পরীক্ষা শুরু করে। বঙ্গবন্ধুর জাপান সফরের পর যমুনা সেতুর কার্যক্রম শুরু হয়। যমুনা সেতু নির্মাণের পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়।

কমনওয়েলথ সম্মেলন

প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান যুগোস্লাভিয়া ও কানাডা সফরের জন্য ১৯৭৩ সালের ২৬ জুলাই ঢাকা ত্যাগ করেন। ২৮ জুলাই তিনি যুগোস্লাভিয়ার প্রেসিডেন্ট মার্শাল টিটোর সাথে বৈঠকে মিলিত হন এবং জোট নিরপেক্ষ আন্দোলন সম্পর্কে আলোচনা করেন।

১৯৭৩ সালের ৩ আগস্ট বঙ্গবন্ধু কানাডায় অনুষ্ঠিত কমনওয়েলথ সম্মেলনে যোগ দেন এবং ৭ আগস্ট সম্মেলনে ভাষণ দেন। তিনি জাতিসংঘে বাংলাদেশের সদস্য পদ লাভের প্রতি সমর্থন প্রদানের জন্য সদস্য রাষ্ট্রের প্রতি আহ্বান জানান।

১৯৭৫ সালে ২৬ এপ্রিল বঙ্গবন্ধু জ্যামাইকার রাজধানী কিংস্টনে অনুষ্ঠিত কমনওয়েলথ সম্মেলনে যোগ দেন।

জাতিসংঘের সদস্য পদ লাভ
১৭ সেপ্টেম্বর ১৯৭৪

বিশ্বের অধিকাংশ রাষ্ট্র বাংলাদেশকে স্বীকৃতি প্রদান করে। কিন্তু চীনের ভেটোর কারণে বাংলাদেশ জাতিসংঘের সদস্য পদ লাভ করতে পারেনি। বঙ্গবন্ধুর ব্যক্তিত্ব ও কূটনীতির কারণে ১৯৭৪ সালের ১৭ সেপ্টেম্বর জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদ বাংলাদেশের সদস্য পদ গ্রহণ করে। বাংলাদেশ জাতিসংঘের ১৩৬তম সদস্য নির্বাচিত হয়।

জাতিসংঘে বঙ্গবন্ধুর ভাষণ
২৫ সেপ্টেম্বর-১৯৭৪

১৯৭৪ সালের ২৫ সেপ্টেম্বর বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের ২৯তম অধিবেশনে যোগ দেন। তিনি প্রথম বাংলা ভাষায় জাতিসংঘে ভাষণ দেন। তার পূর্বে কোনো বাঙালি জাতিসংঘে বাংলা ভাষায় ভাষণ দেয়ার সুযোগ লাভ করেনি। বাংলাদেশের অর্থনৈতিক অবস্থা, আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক পরিস্থিতি, শান্তিপূর্ণ সহঅবস্থান, উপসাগর বিবাদ নিষ্পত্তি, জাতিসংঘের ভূমিকা প্রভৃতি বিষয় উল্লেখ করে তিনি ঐতিহাসিক ভাষণ দেন। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ১৯১৩ সালে নোবেল পুরস্কার পেয়ে বাংলা ভাষাকে বিশ্বে পরিচয় করে দেন। এ ঘটনার ৫০ বছর পর বঙ্গবন্ধু বাঙালি জাতিকে বিশ্বের বুকে তুলে ধরেন।

অধ্যায় ২৯

শেখ মুজিবুর রহমানের শাসনের সাড়ে তিন বছর

কার্যাবলী ১৯৭২-৭৫

বঙ্গবন্ধু তার শাসনামলে যে সকল কাজ করেছেন তা নিম্নে উল্লেখ করা হলো :

১৯৭২

- ১৯৭২ সালের ১৬ জানুয়ারি ৩০ লাখ শহীদদের স্মরণে শোক দিবস পালিত হয়।
- ১৭ জানুয়ারি সকল মুক্তিযোদ্ধার অস্ত্র জমা দেয়ার নির্দেশ দেয়া হয়।
- ১৮ জানুয়ারি হাইকোর্ট গঠন করা হয়।
- ২১ জানুয়ারি প্রধানমন্ত্রী পরিকল্পনা কমিশন গঠন করেন।
- ২৪ জানুয়ারি পাকবাহিনীর দালালদের বিচারের জন্য বিশেষ ট্রাইব্যুনাল গঠন করা হয়।
- ৩১ জানুয়ারি মুজিব বাহিনী বঙ্গবন্ধুর নিকট অস্ত্র জমা প্রদান করে।
- ৬ ফেব্রুয়ারি সেনাপতি কর্নেল এমএজি ওসমানীকে জেনারেল পদে পদোন্নতি দেয়া হয়।
- স্বাধীনতার পর সারাদেশে হাজার হাজার গণকবর আবিষ্কৃত হয়।
- মুক্তিযুদ্ধে অবদানের জন্য বঙ্গবন্ধু ফেব্রুয়ারি মাসে ভারত ও মার্চ মাসে রাশিয়া গমন করেন।
- চট্টগ্রাম ও মংলা বন্দর থেকে পাকিস্তানিদের পোতা মাইন ও যুদ্ধবিধ্বস্ত জাহাজ সরিয়ে নেয়ার জন্য বাংলাদেশ ২২ মার্চ সোভিয়েত রাশিয়ার সাথে চুক্তি করে।
- ১৯৭২ সালের ২৬ মার্চ ব্যাংক, বীমা, বৃহৎ শিল্প প্রতিষ্ঠান জাতীয়করণ আদেশ ঘোষণা করা হয়।
- ৪ এপ্রিল বাংলাদেশ বিমানের অভ্যন্তরীণ সার্ভিস চালু হয়।

- ৭ এপ্রিল জেনারেল এম এ জি ওসমানী সেনাবাহিনী থেকে অবসর গ্রহণ করেন।
- ৮ এপ্রিল হতে সম্মিলিত বাহিনীর পরিবর্তে পৃথকভাবে সেনাবাহিনী, নৌবাহিনী ও বিমান বাহিনী গঠন করা হয়।
- ১০ এপ্রিল শাহ আবদুল হামিদ ও মোহাম্মদ উল্লাহ যথাক্রমে গণপরিষদের স্পিকার ও ডেপুটি স্পিকার নির্বাচিত হন।
- ১১ এপ্রিল খসড়া শাসনতন্ত্র প্রণয়নের জন্য ড. কামাল হোসেনের নেতৃত্বে ৩৫ সদস্যবিশিষ্ট কমিটি গঠন করা হয়।
- ১৫ এপ্রিল প্রধানমন্ত্রী ঘোড়দৌড় ও মদ্যপান নিষিদ্ধ ঘোষণা করেন।
- ১৬ এপ্রিল জিল্লুর রহমান আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হন।
- ১৮ এপ্রিল বাংলাদেশ কমনওয়েলথের সদস্য পদ লাভ করে।
- ১৭ জুন বাংলাদেশ আইএমএফের সদস্য পদ লাভ করে।
- ২১ জুলাই ছাত্রলীগ বিভক্ত হয়ে জাসদ ছাত্রলীগ প্রতিষ্ঠিত হয়।
- ৩০ জুলাই লন্ডনে বঙ্গবন্ধুর গলব্লাডার অপারেশন হয়।
- ৮ আগস্ট জাতিসংঘের সদস্য পদ লাভের জন্য বাংলাদেশ আবেদন করে।
- ২৫ আগস্ট চীনের ভেটোর কারণে বাংলাদেশের সদস্য পদ লাভের আবেদন নাকচ হয়ে যায়।
- ১৪ সেপ্টেম্বর শিক্ষা কমিশনের প্রথম সভা অনুষ্ঠিত হয়।
- ১৯৭২ সালের ২৮ সেপ্টেম্বর মওলানা ভাসানী সরকারবিরোধী আন্দোলন শুরু করেন।
- ১৯৭২ সালের ২ অক্টোবর পর্যন্ত ৪১ হাজার দালাল গ্রেফতার হয়েছে।
- ৮ অক্টোবর খসড়া শাসনতন্ত্র কমিটির ৭০তম সভা অনুষ্ঠিত হয়। ১২ অক্টোবর ড. কামাল হোসেন খসড়া শাসনতন্ত্র গণপরিষদে পেশ করেন।
- ১৮ অক্টোবর বাংলাদেশ ইউনেস্কোর সদস্য পদ লাভ।
- ২২ অক্টোবর এক হিসেবে দেখা যায়, পাকিস্তানিরা যুদ্ধকালে ৭৮৫ কোটি টাকা পশ্চিম পাকিস্তানে পাচার করেছে।
- ৩১ অক্টোবর জাসদ গঠিত হয়– সভাপতি মেজর জলিল, সাধারণ সম্পাদক আ স ম আবদুর রব।
- ৪ নভেম্বর গণপরিষদ বাংলাদেশের সংবিধান অনুমোদন করে। ১৪ ডিসেম্বর এমসিএগণ সংবিধানে স্বাক্ষর করেন। একই দিনে রাষ্ট্রপতি স্বাক্ষর করেন।
- ১৬ ডিসেম্বর হতে ১৯৭২ সালের সংবিধান কার্যকর হয়।
- ১৪ ডিসেম্বর হতে গণপরিষদ বিলুপ্ত হয়।

- ১১ নভেম্বর শেখ ফজলুল হক মনির নেতৃত্বে আওয়ামী যুবলীগ গঠিত হয়।
- ২৩ নভেম্বর বাংলাদেশের বিরুদ্ধে যুদ্ধ পরিচালনার অপরাধে পূর্ব পাকিস্তানের গভর্নর ডা. এ এম মালিক ও তার মন্ত্রীদের আজীবন কারাদণ্ড দেয়া হয়।
- ১৯৭২ সালের ৩০ নভেম্বর জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদ বাংলাদেশের সদস্য পদ লাভের সুপারিশ করে।
- ১৬ ডিসেম্বর বঙ্গবন্ধু সাভারে জাতীয় স্মৃতিসৌধের ভিত্তি স্থাপন করেন। বিজয় দিবস উপলক্ষে একই তারিখে রমনা রেসকোর্স ময়দানে ঘোষণা করেন যে, বাংলার মাটিতে যুদ্ধাপরাধীদের বিচার হবে।
- ১৭ ডিসেম্বর ১৯৭২ সালের সংবিধানের অধীনে রাষ্ট্রপতি প্রধানমন্ত্রী ও তার মন্ত্রিসভাকে শপথ পড়ান।
- ২২ ডিসেম্বর প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান মিরপুরে শহীদ বুদ্ধিজীবী স্মৃতিসৌধের ভিত্তি স্থাপন করেন।

১৯৭৩

- ১৯৭৩ সালের ৯ ফেব্রুয়ারি জাতিসংঘের মহাসচিব কুর্ট ওয়াল্ড হোম বাংলাদেশ সফরে আসেন এবং প্রধানমন্ত্রীর সাথে আলোচনায় মিলিত হন।
- ১৮ ফেব্রুয়ারি বাংলাদেশ এশিয়া উন্নয়ন ব্যাংকের (এডিবি) সদস্য পদ লাভ করেন।
- ৭ মার্চ দেশব্যাপী সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। নির্বাচনে ২৮০ আসনে আওয়ামী লীগ জয়লাভ করে।
- ১৬ মার্চ বঙ্গবন্ধু নতুন মন্ত্রিসভা গঠন করেন।
- ৭ এপ্রিল মহম্মদ উল্লাহ ও বায়তুল্লা সংসদের স্পিকার ও ডেপুটি স্পিকার নির্বাচিত হন।
- ৮ এপ্রিল বিচারপতি আবু সাঈদ বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হন।
- ২১ এপ্রিল ফ্রান্সের দার্শনিক ম্যালরফস বাংলাদেশে আসেন এবং বঙ্গবন্ধুর সাথে দেখা করেন।
- ২৪ এপ্রিল সরকার ১৯৫ জন যুদ্ধাপরাধীকে বিচার করার ঘোষণা দেয়। তারা সকলে পশ্চিম পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর সদস্য।
- ২৪ এপ্রিল সরকার নুরুল আমীন, গোলাম আযমসহ পাকিস্তানি দালালদের নাগরিকত্ব বাতিল করে।
- ১৭ মে ত্রাণমন্ত্রী মিজানুর রহমান চৌধুরী প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশে পদত্যাগ করেন।

- ৩ জুন সরকার ঘোষণা দেয় যে ১৯৭৩ সালের ১ জুলাই হতে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকরা সরকারি কর্মচারী হবেন।
- ৬ জুন সরকার কর্নেল শফিউল্লাহ ও কর্নেল জিয়াউর রহমানকে ব্রিগেডিয়ার পদে পদোন্নতি দেয়।
- ১০ জুলাই সরকার ১০টি স্কেলে সরকারী-বেসরকারী কর্মকর্তা-কর্মচারীদের বেতন স্কেল ঘোষণা দেয়।
- ৩ সেপ্টেম্বর বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে কাজ করার জন্য ন্যাপ, কমিউনিস্ট পার্টি ও আওয়ামী লীগ ত্রিদলীয় ঐক্যজোট গঠন করে।
- ৬ সেপ্টেম্বর বঙ্গবন্ধু আলজিয়ার্সে অনুষ্ঠিত জোট নিরপেক্ষ সম্মেলনে যোগ দেয়ার জন্য ঢাকা ত্যাগ করেন।
- জুলাই মাসে ১৭ দিনের সফরে বঙ্গবন্ধু যুগোস্লাভিয়া ও কানাডা গমন করেন।
- ১০ অক্টোবর প্রধানমন্ত্রী ব্রিগেডিয়ার সফিউল্লাহ ও জিয়াউর রহমানকে মেজর জেনারেল পদে পদোন্নতি দেন।
- ১৩ অক্টোবর মন্ত্রিপরিষদ প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা অনুমোদন করে।
- ২৮ আগস্ট ভারতের সিমলায় পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী জুলফিকার আলী ভুট্টো ও ভারতের প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী পাকিস্তানে আটক ৫ লাখ বাঙালি ও ভারতে বন্দী পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর স্বদেশে ফিরে যাওয়া চুক্তি স্বাক্ষর করে।
- ২১ ফেব্রুয়ারি জাতীয় সংসদে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় আইন পাস।
- ১৭ অক্টোবর বঙ্গবন্ধু তার কন্যা শেখ রেহানা ও পুত্র শেখ রাসেলকে নিয়ে জাপান সফরে যান। যমুনা সেতু নির্মাণ নিয়ে জাপান সরকারের সাথে আলোচনা হয়।
- সরকার প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ৩৫,৫৯৪ বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের ২৫ অক্টোবর হতে সরকারি কর্মচারী হিসেবে স্বীকৃতি দেয়।
- ১৯৭৩ সালের ৩০ নভেম্বর ৩৬৪০০ দালালকে ক্ষমা প্রদর্শন করে।
- ২৭ নভেম্বর প্রথম পঞ্চমবার্ষিকী পরিকল্পনা ঘোষণা
- ২৪ ডিসেম্বর রাষ্ট্রপতি আবু সাঈদ চৌধুরী পদত্যাগ করেন।

১৯৭৪

- ১৯৭৪ সালের ১৮ জানুয়ারি বঙ্গবন্ধু আওয়ামী লীগের সভাপতির পদ থেকে পদত্যাগ করেন।
- ২০ জানুয়ারি মন্ত্রী এএইচএম কামরুজ্জামান আওয়ামী লীগের সভাপতি

নির্বাচিত হন।

- ২৪ জানুয়ারি স্পিকার মহম্মদ উল্লাহ রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হন। আবদুল মালেক উকিল স্পিকার নির্বাচিত হন।
- ২৯ জানুয়ারি যুগোস্লাভিয়ার প্রেসিডেন্ট মার্শাল টিটো বাংলাদেশে আগমন করেন।
- ৫ ফেব্রুয়ারি সংসদে বিশেষ আইন পাস হয়।
- ১৯ ফেব্রুয়ারি পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের পরিবর্তে খন্দকার মোশতাক আহমদকে বাণিজ্যমন্ত্রী নিয়োগ করা হয়।
- পাকিস্তান বাংলাদেশকে স্বীকৃতি প্রদান করলে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ২৩ ফেব্রুয়ারি লাহোরের ইসলামী কনফারেন্সে যোগ দেন।
- সরকার কুমিল্লায় প্রথম মিলিটারি একাডেমী প্রতিষ্ঠা করে। বঙ্গবন্ধু ৮ মার্চ একাডেমী উদ্বোধন করেন। এ সময় জিয়াউর রহমান জিওসি ছিলেন।
- ১৯ মাচ চিকিৎসার জন্য বঙ্গবন্ধু মস্কো গমন করেন।
- ৯ এপ্রিল দিল্লিতে ভারত-পাকিস্তান ও বাংলাদেশ ত্রিদেশীয় চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। পাকিস্তানে আটক বাঙালিদের ফিরিয়ে আনার জন্য ১৯৫ জন যুদ্ধাপরাধীকে মুক্তি দিতে হয়।
- ১৯৭৪ সালের ৩১ মে বঙ্গবন্ধুর মা সায়েরা খাতুন মৃত্যুবরণ করেন।
- ১৯৭৪ সালের ৭ জুন শিক্ষা কমিশন শিক্ষা নীতির প্রতিবেদন পেশ করে।
- ১০ জুন জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদ বাংলাদেশকে জাতিসংঘের সদস্য পদ প্রদানের সুপারিশ সাধারণ পরিষদে পেশ করে।
- ১১ জুন চট্টগ্রাম আওযামী লীগ প্রেসিডেন্ট এম এ হান্নান সড়ক দুর্ঘটনায় নিহত হন। তিনি ১৯৭১ সালের ২৬ মার্চ প্রথম বঙ্গবন্ধুর স্বাধীনতা ঘোষণা কালুরঘাট বেতার কেন্দ্র থেকে পাঠ করেন।
- ১৯৭৩-৭৪ সালে বাংলাদেশ ১১৮.২২ লাখ টন খাদ্যশস্য উৎপাদন করে।
  পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী ৩ দিনের সফরে ঢাকায় আসেন।
- ১৯৭৪ সালের ১ জুলাই শ্রমমন্ত্রী জহুর আহমদ চৌধুরী ইন্তেকাল করেন। প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশে ৬ জন মন্ত্রী ও ৩ জন প্রতিমন্ত্রী পদত্যাগ করেন।
- ১৮ আগস্ট প্রধানমন্ত্রী বন্যা পরিস্থিতি মোকাবেলার জন্য জনগণকে অনুরোধ জানান।
- ১৯৭৪ সালের ১৭ সেপ্টেম্বর বাংলাদেশ জাতিসংঘের সদস্য পদ লাভ করেন।
- ১৯৭৪ সালের ২৫ সেপ্টেম্বর বঙ্গবন্ধু প্রথম বাংলা ভাষায় জাতিসংঘে ভাষণ দেন।

- ১ অক্টোবর প্রধানমন্ত্রী শেখ মুজিবুর রহমান মার্কিন প্রেসিডেন্ট জেরাল্ড ফোর্ডের সাথে হোয়াইট হাউসে দেখা করেন।
- ৩ অক্টোবর প্রধানমন্ত্রী বাগদাদ সফর করেন।
- ১৯৭৪ সালে বাংলাদেশে প্রচণ্ড খাদ্যাভাব দেখা দেয়। সারাদেশে ৪২ লাখ লোখের জন্য ৫৭৪৭টি লঙ্গরখানা খোলা হয়। এক তথ্য বিবরণীতে দেখা যায়, আগস্ট-ডিসেম্বরে দুর্ভিক্ষে ২৭ হাজার লোক মৃত্যুবরণ করে।
- ৩০ অক্টোবর আমেরিকার পররাষ্ট্র সচিব হেনরি কিসিঞ্জার বাংলাদেশ সফর করেন।
- ৪ নভেম্বর জাপানি বিশেষজ্ঞ দল যমুনা সেতু নির্মাণের আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়।
- ১৯৭৪ সালে ৫ নভেম্বর প্রধানমন্ত্রী কায়রো গমন করেন।
- ১০ নভেম্বর বঙ্গবন্ধু কুয়েত গমন করেন।
- ১৭ নভেম্বর ভাসানী ন্যাপের একটি অংশ ইউপিপি গঠন করে– ক্যাপ্টেন হালিম চৌধুরী সভাপতি এবং কাজী জাফর সম্পাদক।
- ২৩ নভেম্বর সংবিধানের তৃতীয় সংশোধনী পাস।
- ৩ ডিসেম্বর ঢাকা-দুবাই বিমান সার্ভিস চালু হয়।
- ১৮ ডিসেম্বর ৩ দিনের সফরে বঙ্গবন্ধুর আবুধাবি গমন।
- ১৯৭৪ সালে আওয়ামী লীগের ৫ জন সংসদ সদস্য চরমপন্থীদের হাতে নিহত হন। সরকার জরুরি আইন জারি করে।

১৯৭৫

- ৪ জানুয়ারি বাংলাদেশ ব্যাংক প্রকাশ করে যে, ১৯৭৪ সালের ২০ নভেম্বর দেশে ৩৮৭ কোটি ৭৩ লাখ ৭১ হাজার টাকার নোট দেশে চালু ছিল।
- ২৫ জানুয়ারি সংবিধানের চতুর্থ সংশোধনী পাস করা হয়।
- ৪ ফেব্রুয়ারি আততায়ীরা যশোরের এমপি মইনুদ্দিনকে হত্যা করে।
- ২৩ ফেব্রুয়ারি নেত্রকোনার আওয়ামী লীগ এমপি আবদুল খালেককে হত্যা করা হয়।
- ২৪ ফেব্রুয়ারি বাকশাল গঠন করা হয।
- ২৬ মার্চ সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে বঙ্গবন্ধু ঐতিহাসিক ভাষণ দেন এবং দ্বিতীয় বিপ্লবের ডাক দেন।
- ৩০ মার্চ বঙ্গবন্ধুর পিতা শেখ লুৎফুর রহমান ৯৪ বছর বয়সে টুঙ্গিপাড়ায় ইন্তেকাল করেন।

- ৩ মে কিংস্টনে অনুষ্ঠিত কমনওয়েলথ সম্মেলনে প্রধানমন্ত্রী ভাষণ দেন।
- ২১ ফারাক্কা বাঁধ উদ্বোধন। বাংলাদেশ ৪০ হাজার কিউসেক পানি পাবে।
- ৬ জুন বাকশাল গঠনতন্ত্র ঘোষণা। দেশে ৪৮টি সুতাকল প্রতিষ্ঠিত হবে।
- ১৪ জুন প্রেসিডেন্ট বঙ্গবন্ধু বেতবুনিয়া ভূ-উপগ্রহ উদ্বোধন করেন।
- ১৬ জুন সরকার ঘোষণা করে যে দেশে ৪টি পত্রিকা থাকবে।
- ১৯ জুন রাষ্ট্রপতি ৬০টি জেলা ঘোষণা করে। জেলায় একজন গভর্নর থাকবে।
- জুলাই মাসে চালের মণ প্রতি মূল্য ছিল ১৮৫ টাকা হতে ২২০ টাকা।
- ১৪ জুলাই বঙ্গবন্ধুর পুত্র শেখ কামালের বিয়ে হয় সুলতানা খুকুর সাথে।
- ১৭ জুলাই শেখ জামালের বিয়ে হয় সৈয়দা পারভিন রোজীর সাথে।
- ১৬ জুলাই ৬১জন গভর্নর নিয়োগ করা হয়।
- ২৬ জুলাই বঙ্গবন্ধু ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পিএইচডি প্রদানের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেন।
- ৩ আগস্ট জেলা বাকশাল সম্পাদক ও যুগ্ম সম্পাদক নিয়োগ করা হয়।
- ৮ আগস্ট বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরী জাহাজ নৌ-মন্ত্রী নিযুক্ত হন।
- ১৫ আগস্ট বঙ্গবন্ধুর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পরিদর্শন কর্মসূচি ছিল। ঘাতক দল তাকে প্রত্যুষে সপরিবারে হত্যা করে।
- ১৬ আগস্ট বঙ্গবন্ধুকে টুঙ্গিপাড়ায় অযত্নে দাফন করা হয়।

অধ্যায় ৩০

বাংলাদেশ কৃষক শ্রমিক আওয়ামী লীগ গঠন

বাকশাল-১৯৭৫

দ্বিতীয় বিপ্লব

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান শোষণহীন সমাজ প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে বাংলাদেশ কৃষক-শ্রমিক আওয়ামী লীগ, রাষ্ট্রপতি পদ্ধতি ও একদলীয় শাসন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার জন্য ১৯৭৫ সালের ১৬ জানুয়ারি সংবিধানের চতুর্থ সংশোধনী আনয়ন করেন।

সংশোধন আইনের কয়েকটি ধারা :

অনুচ্ছেদ-১৮ : বাংলাদেশে একজন রাষ্ট্রপতি থাকবেন। অনুচ্ছেদ-৪৯ : একজন উপরাষ্ট্রপতি থাকবে। তিনি রাষ্ট্রপতি কর্তৃক নিযুক্ত হবেন। অনুচ্ছেদ-৫৮ : মন্ত্রিপরিষদ থাকবে। অনুচ্ছেদ-১১৭ক : জাতীয় দল থাকবে। রাষ্ট্রপতি জাতীয় দল গঠন করবেন।

১৯৭৫ সালের ২৫ জানুয়ারি তিনি জাতীয় পরিষদের ভাষণ দেন।

১৯৭৫ সালের ২৫ জানুয়ারি বঙ্গবন্ধু ১৭ জন মন্ত্রী ও ৯ জন প্রতিমন্ত্রী নিয়ে রাষ্ট্রপতির মন্ত্রিসভা গঠন করেন।

রাষ্ট্রপতির মন্ত্রিসভা : ২৬ জানুয়ারি ১৯৭৫

শেখ মুজিবুর রহমান	রাষ্ট্রপতি
সৈয়দ নজরুল ইসলাম	উপরাষ্ট্রপতি
এম মনসুর আলী	প্রধানমন্ত্রী
খন্দকার মোশতাক আহমদ	বাণিজ্য
এ এইচ এম কামরুজ্জামান	শিল্প
অধ্যাপক মহম্মদ ইউসুফ আলী	শ্রম সমাজ কল্যাণ
শ্রী মনোরঞ্জন ধর	আইন
ফণীভূষণ মজুমদার	স্থানীয় সরকার
আবদুস সামাদ আজাদ	কৃষি
আবদুর রব সেরনিয়াবাত	পানি সম্পদ, বিদ্যুৎ
ড. এ আর মল্লিক	অর্থ ও পরিকল্পনা

ড. কামাল হোসেন	পররাষ্ট্র
ড. মোজাফফর আহমদ চৌধুরী	শিক্ষা
এম কোরবান আলী	তথ্য
আবদুল মোমেন	খাদ্য ও ত্রাণ
মোহাম্মদ উল্লাহ	ভূমি সংস্কার
আসাদুজ্জামান খান	পাট
মোহাম্মদ সোহরাব হোসেন	গণপূর্ত
আবদুল মান্নান	স্বাস্থ্য
আবু সাঈদ চৌধুরী	নৌ ও জাহাজ চলাচল

প্রতিমন্ত্রী

আবদুল মমিন তালুকদার	সমবায়
দেওয়ান ফরিদ গাজী	বাণিজ্য
নুরুল ইসলাম চৌধুরী	প্রতিরক্ষা
তাহের উদ্দিন ঠাকুর	তথ্য ও বেতার
মোসলেম উদ্দিন খান	পাট
নুরুল ইসলাম মঞ্জুর	যোগাযোগ
কে এম ওবায়দুর রহমান	ডাক ও তার
ডা. ক্ষিতীশ চন্দ্র মণ্ডল	ত্রাণ
রিয়াজ উদ্দিন আহমদ	বন মৎস্য ও পশু পালন
আবদুল মালেক উকিল	স্পিকার
এম বায়তুল্লাহ	ডেপুটি স্পিকার
শাহ মোয়াজ্জেম হোসেন	চীফ হুইপ
তোফায়েল আহমেদ	রাষ্ট্রপতির বিশেষ সহকারী

১৯৭৫ সালে ২৬ মার্চ বঙ্গবন্ধু ঢাকার সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে ঐতিহাসিক ভাষণ দেন এবং দ্বিতীয় বিপ্লবের কর্মসূচি ঘোষণা দেন। কর্মসূচি ছিল দুর্নীতি দমন, জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ, উৎপাদন বৃদ্ধি, সমবায় খামার প্রতিষ্ঠা।

বঙ্গবন্ধু সমাপ্তিতে বলেন,

"ভাইয়েরা, আবার দেখা হবে, কি বলেন ইনশাআল্লাহ আবার দেখা হবে। আপনারা বহুদূর থেকে কষ্ট করে এসেছেন। গ্রামে গ্রামে ফিরে যান। যেয়ে বলেন, দুর্নীতিবাজদের খতম করতে হবে। ক্ষেতে খামারে, কল-কারখানায় প্রডাকশন বাড়াতে হবে। সরকারি কর্মচারী ভাইরা আপনারাও কৃষক-শ্রমিক আওয়ামী লীগের সদস্য হবেন। আপনারা প্রাণ দিয়ে কাজ করেন। ইনশাআল্লাহ বাংলাদেশ এসেছে, বাংলাদেশ থাকবে।"

বাকশাল কমিটি গঠন

১৯৭৫ সালের ৭ জুন বঙ্গবন্ধু বাংলাদেশ কৃষক শ্রমিক আওয়ামী লীগ গঠন করেন। তিনি বাকশালের ১৫ সদস্যবিশিষ্ট কার্যনির্বাহী এবং ১১৫ জন সদস্যবিশিষ্ট কেন্দ্রীয় কমিটি গঠন করেন।

বাকশালের কার্যনির্বাহী কমিটি

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান	চেয়ারম্যান
সৈয়দ নজরুল ইসলাম	
এম মনসুর আলী	সাধারণ সম্পাদক
খন্দকার মোশতাক আহমদ	
এ এইচ এম কামরুজ্জামান	
আবদুল মালেক উকিল	
অধ্যাপক মোহাম্মদ ইউসুফ আলী	
শ্রী মনোরঞ্জন দে	
ড. মোজাফফর আহমদ চৌধুরী	
শেখ আবদুল আজিজ	
মহিউদ্দিন আহমেদ	
গাজী গোলাম মোস্তফা	
জিল্লুর রহমান	সম্পাদক
শেখ ফজলুল হক মনি	সম্পাদক
আবদুর রাজ্জাক	সম্পাদক

বাকশালের অঙ্গ সংগঠন

জাতীয় কৃষক লীগ, সাধারণ সম্পাদক, ফণিভূষণ মজুমদার
জাতীয় শ্রমিক লীগ, সাধারণ সম্পাদক, অধ্যাপক মোঃ ইউসুফ আলী
মহিলা লীগ, সাধারণ সম্পাদক, বেগম সাজেদা চৌধুরী
যুবলীগ, সাধারণ সম্পাদক, শেখ ফজলুল হক মণি
ছাত্রলীগ, সাধারণ সম্পাদক, শেখ শহীদুল ইসলাম

১৯৭৫ সালের ২৩ জুন সকল মহকুমা জেলায় উন্নীত করে ৬১টি জেলা সৃষ্টি করা হয়।

বাকশাল গঠনের উদ্দেশ :

- সকলকে নিয়ে জাতীয় ঐক্য গঠন করা হবে;
- দেশের মঙ্গলের জন্য কাজ করতে হবে;
- প্রত্যেক নির্বাচনী এলাকা থেকে ৩ বা ৪ জন বাছাই করে একজন

নির্বাচিত হবে;

- প্রত্যেক জেলায় একজন গভর্নর, ম্যাজিস্ট্রেট থাকবেন;
- শাসন ব্যবস্থা বিকেন্দ্রীকরণ করা হবে;
- সমাজে আমূল পরিবর্তন Revolution আসবে;
- আত্মসমালোচনা থাকতে হবে- তা না হলে আত্মশুদ্ধি করা যায় না;
- ইতিবাচক পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৭৫ সালের ১৯ জুন বাকশাল কেন্দ্রিয় কমিটির প্রথম বৈঠকে বলেন যে, বিদেশ থেকে কোনো ইজম বা সিস্টেম আমদানি নয়, দেশের মাটির সঙ্গে সংযোগ রক্ষা করেই শোষণহীন সমাজ গড়া হবে।

আমাদের আদর্শ হলো বাংলাদেশকে স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র হিসেবে ইজ্জত সহকারে দুনিয়াতে বাঁচিয়ে রাখা। বাংলার দুঃখী মানুষকে পেট ভরে খাবার দিয়ে শোষণমুক্ত সমাজ গঠন করা এবং এমন একটি দেশ গঠন করা যেখানে অত্যাচার-অবিচার জুলুম থাকবে না। Let us all try for that.

বঙ্গবন্ধু তাঁর ভাষণে জাতির সামনে নিম্নের কর্মসূচি দেন :

১. নতুন পদ্ধতি– ৬০ জেলার প্রত্যেক জেলায় একজন করে গভর্নর থাকবে, ২. স্বাধীন পররাষ্ট্রনীতি, ৩. একতা মঙ্গলের পথ, ৪. আত্মসমালোচনা চাই– আত্মসমালোচনা না করলে আত্মশুদ্ধি করা যায় না, ৫. ডেডিকেটেড ওয়ার্কার চাই, ৬. নতুন করে গড়তে হবে– সমবায় পদ্ধতি চালু, ৭. ১০০ বিঘার বেশি জমি থাকবে না, ৮. অর্থনৈতিক অগ্রগতি– সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতি চাই, ৯. শোষণহীন সমাজ গঠনের পথ, ১০. দুর্নীতিমুক্ত।

জনগণের মঙ্গল সাধনের জন্য দুর্নীতিমুক্ত প্রশাসন ব্যবস্থা

১৯৭৫ সালের ২১ জুলাই বাংলাদেশ কৃষক শ্রমিক আওয়ামী লীগ নতুন পদ্ধতি কার্যকরী করার জন্য নিয়োজিত গভর্নরদের প্রশিক্ষণ কর্মসূচি বঙ্গভবনে শুরু হয়। বঙ্গবন্ধু তার ভাষণে নিম্নের কর্মসূচি ঘোষণা করেন :

১. পুরাতন ঘুণেধরা সিস্টেম– চিন্তাধারার আমূল পরিবর্তন আনতে হবে, ২. দেশের শাসক নয়– দেশের সেবক হিসেবে আত্মনিয়োগ করতে হবে; ৩. জনগণের সাথে যোগাযোগ চাই– জনগণ থেকে শাসন কাঠামো বিচ্ছিন্ন। 'তোমরা গোলাম আমরা মালিক'– এ মনোভাব ত্যাগ করতে হবে, ৪. নতুন পদ্ধতি– গভর্নর নিয়োগ, ৫. গভর্নরদের দায়িত্ব– দুর্নীতির উর্ধ্বে উঠতে হবে, ৬. আইনের শাসন, ৭. নতুন বিচার পদ্ধতি, ৮. দুর্নীতি দূর করতে হবে, ৯. দ্বিতীয় বিপ্লব– উন্নয়ন, জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ, দুর্নীতির দূর, ১০. সমন্বয় ও পরিকল্পনা, ১১. গ্রামে সমবায়।

অধ্যায় ৩১

বঙ্গবন্ধু ও তাঁর পরিবারের হত্যাকাণ্ড

পনেরোই আগস্ট ১৯৭৫

দেশী-বিদেশী শত্রুরা বঙ্গবন্ধুকে হত্যার ষড়যন্ত্র করে। দেশে বাকশাল কায়েম হলে তার সরকারকে উৎখাত করা যাবে না। তাই তারা বঙ্গবন্ধুকে হত্যার জন্য ১৫ আগস্ট বেছে নেয়।

খন্দকার মোশতাক আহমদ ও মেজর জেনারেল জিয়াউর রহমানের সমর্থনে সেনাবাহিনীর একটি অংশ বঙ্গবন্ধু ও তার পরিবারকে হত্যার পরিকল্পনা করে।

জুলাই মাসে বঙ্গবন্ধুর দুই কন্যা শেখ হাসিনা ও শেখ রেহানা জার্মানির উদ্দেশে ঢাকা ত্যাগ করেন। ১৫ আগস্ট বঙ্গবন্ধু ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র-শিক্ষকদের উদ্দেশে ভাষণ দেবেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রস্তুতি চলছে। অন্যদিকে ষড়যন্ত্রকারীরা বঙ্গবন্ধুকে হত্যার পরিকল্পনা নিয়ে এগিয়ে যাচ্ছে।

পনেরোই আগস্টের ষড়যন্ত্রকারীরা

খন্দকার মোশতাক আহমদ	বঙ্গবন্ধু মন্ত্রিসভার সদস্য
তাহের উদ্দিন ঠাকুর	তথ্য মন্ত্রণালয়ের প্রতিমন্ত্রী
মাহবুব আলম চাষী	কুমিল্লা পল্লী উন্নয়ন একাডেমির মহাপরিচালক। তিনি একাডেমীতে ষড়যন্ত্রকারীদের নিয়ে সভা করেছেন।
মেজর জেনারেল জিয়াউর রহমান	সেনাবাহিনীর ডেপুটি চিফ অব স্টাফ
মেজর ফারুকুর রহমান মেজর খন্দকার আবদুর রশীদ মেজর নূর চৌধুরী	সে বঙ্গবন্ধুকে গুলি করে হত্যা করেছে।
মেজর রাশেদ চৌধুরী	মন্ত্রী আবদুর রব সেরনিবায়াত ও তার পরিবারকে হত্যা করেছে।
রিসালদার মোসলেম উদ্দিন	শেখ ফজলুল হক মণি ও তার স্ত্রী আরজু মনিকে হত্যা করেছে।

মেজর শরিফুল হক ডালিম	বেতার-টিভিতে বঙ্গবন্ধুর হত্যার ঘোষণা দেয়।
মেজর বজলুল হুদা	শেখ কামাল, কর্নেল জামিলসহ পরিবারের অনেককে হত্যা করে।

১৯৭৫ সালের ১৪ আগস্ট রাতে মেজর ফারুক এবং মেজর রশীদ প্রথম বেঙ্গল ল্যান্সার এবং দ্বিতীয় ফিল্ড আর্টিলারি ঢাকা সেনানিবাস থেকে বহর নিয়ে যায়। রাতের কুচকাওয়াজের নামে বেঙ্গল ল্যান্সার এবং ফিল্ড আর্টিলারির ৬০০ সৈন্যকে একত্রিত করে। মেজর ফারুক অপারেশনের দায়িত্বে ছিলেন। তিনি সৈন্যদের তিন ভাগে বিভক্ত করেন। এক ভাগে ৭৫ থেকে ১৫০ সৈন্য ছিল। তাদের লক্ষ্য ছিল তিনটি বাসা। ৩২ নম্বরের ধানমণ্ডি-বঙ্গবন্ধুর বাসভবন, রাষ্ট্রপতি হয়েও তিনি বঙ্গভবনে না থেকে ধানমণ্ডিতে নিজের বাসায় থাকতেন। দ্বিতীয় শেখ মনির বাসভবন এবং তৃতীয় মিন্টো রোডে আবদুর রব সেরনিয়াবাতের বাসভবন।

মেজর নুর চৌধুরী, মেজর বজলুল হুদা ও মেজর মহিউদ্দিন একদল ল্যান্সার সৈন্য নিয়ে বঙ্গবন্ধুর বাসভবনে সকাল ৫-১৫ মিনিটে পৌঁছে। সৈন্যরা বঙ্গবন্ধুর বাসভবন লক্ষ্য করে গোলাবর্ষণ করতে থাকে। বঙ্গবন্ধু ও বাসার সবার ঘুম ভেঙে যায়। তারা ভেবেছিল দুষ্কৃতকারীরা বাসা আক্রমণ করেছে। ৫টি ট্রাকে ১২০ জন্য সৈন্য বাড়ির ভিতরে প্রবেশ করে। পাহারারত পুলিশরা কালো পোশাকধারী সৈন্য দেখে আত্মসমর্পণ করে। তারা দেহরক্ষীকে হত্যা করে। সৈন্যদের দেখে শেখ কামাল নিচে নেমে আসে। তিনি ভাবছিলেন সৈন্যরা তাদের সাহায্যে এসেছে। শেখ কামালকে দেখে মেজর বজলুল হুদা তাকে লক্ষ্য করে গুলি করে। তিনি মাটিতে লুটিয়ে পড়ে মৃত্যুবরণ করেন। বঙ্গবন্ধু তার জ্যেষ্ঠ পুত্র শেখ কামালের লাশ দেখতে পান। তিনি জেনারেল সফিউল্লাহকে ফোন করে তার বাসভবন আক্রমণের কথা তাকে জানান। তিনি তার মিলিটারি সেক্রেটারি কর্নেল জামিলউদ্দিনকে জানান।

বঙ্গবন্ধু দোতলায় ছিলেন। তিনি সিঁড়ির ওপরে দাঁড়িয়ে আছেন। তার পরনে ছিল ধূসর রঙের চেক লুঙ্গি, গায়ে ছিল পাঞ্জাবি এবং হাতে ছিল পাইপ। মেজর মহিউদ্দিন তাকে হত্যার জন্য এগিয়ে যান। বঙ্গবন্ধু তাকে জিজ্ঞেস করেন, "তোমরা কী চাও। তোমরা কি আমাকে হত্যা করতে এসেছ? তা ভুলে যাও। পাকিস্তান সেনাবাহিনী তা করতে পারেনি। তোমরা কে যে তা পারবে?" মেজর মহিউদ্দিন মুখোমুখি হয়ে দুর্বল হয়ে পড়ে। এ সময় পাষণ্ড মেজর নুর চৌধুরী তার স্টেনগান দিয়ে বঙ্গবন্ধুকে গুলিবর্ষণ করে। গুলি তার ডান পাশে গর্ত করে বেরিয়ে

যায়। গুলিতে তার শরীর ঝাঁঝরা হয়ে যায়। তার দেহ কাত হয়ে সিঁড়িতে পড়ে যায়। মুখ ছিল নিচে। তখনও তার ডান হাতে পাইপ। সময় তখন ভোর ৫টা ৪০ মিনিট। বাঙালি জাতির মহান নেতার করুণ মৃত্যু হলো। বঙ্গবন্ধুকে যখন গুলি করে তখন বেগম মুজিব তাকে অনুসরণ করে। বঙ্গবন্ধুকে হত্যার পর মেজর বজলুল হুদা, মেজর মহিউদ্দিন, মেজর আজিজ পাশা ওপরে ওঠে। বেগম মুজিবকে তার শয়নকক্ষে দরজায় দেখে মেজর বজলুল হুদা তাকে গুলি করে হত্যা করে। তারপর গণহত্যা চলে। লেফটেন্যান্ট শেখ জামাল পরিবারের সদস্যদের নিয়ে বড় কক্ষে নিয়ে আসে। অফিসার ও সৈন্যরা স্টেনগান দিয়ে গুলি করে বন্ধ দরজা ভেঙে ফেলে। অতি নিকট থেকে মেজররা গুলি করে শেখ জামালকে হত্যা করে। শেখ কামালের নববিবাহিত বধূ সুলতানা ও শেখ জামালের বধূ রোজীকে গুলি করে হত্যা করে। ১০ বছরের শিশু শেখ রাসেল ফার্নিচারের মধ্যে পালিয়ে ছিল। তাকেও ধরে ফেলে। রাসেল খুনিদের অনুরোধ করে, 'আমাকে মেরো না। আমাকে মায়ের নিকট যেতে দাও।' শেখ রাসেলের কান্নায় খুনিদের হৃদয় গলেনি। তারা রাসেলকে নির্মমভাবে হত্যা করে। বঙ্গবন্ধুর কনিষ্ঠ ভ্রাতা শেখ নাসের পাশের বাথরুমে পালিয়ে ছিলেন। তাকেও তারা হত্যা করে। রক্তের স্রোত সিঁড়ি দিয়ে গড়িয়ে পড়ছে। বিশ্বে ভয়াবহ নারকীয় হত্যা। বিশ্ব অবাক হয়ে জানতে পারে স্বাধীন দেশের প্রতিষ্ঠাকে সপরিবারে হত্যা করা হয়েছে।

খুনিদের একটি দল বঙ্গবন্ধুর ভগ্নিপতি মন্ত্রী আবদুর রব সেরনিয়াবাতের বাসা আক্রমণ করে। খুনিরা আবদুর রব সেরনিয়াবাত ও পরিবারের সদস্যদের বাইরে লাইন করে দাঁড় করায়। মেজর রাশেদ চৌধুরী প্রথম আবদুর রব সেরনিয়াবাতকে গুলি করে। তার কোলে ছিল ৫ বছরের নাতি সুকান্ত বাবু। আবদুর রব সেরনিয়াবাত কোলে নাতিসহ গুলিবিদ্ধ হয়ে মারা যান। খুনিরা আবদুর রব সেরনিয়াবাতের ১১ বছরের শিশুপুত্র আরিফ, ১০ বছরের কন্যা বেবী, ভ্রাতুষ্পুত্র শহীদ সেরনিয়াবাত ও আত্মীয় রেন্টুকে হত্যা করে। খুনিরা সেরনিয়াবাতের দুই কন্যা, স্ত্রী আমেনা বেগম এবং পুত্রবধূ শাহানা আবদুল্লাহ, পুত্র খোকাকে গুলি করে গুরুতর আহত করে। তার জ্যেষ্ঠ পুত্র আবুল হাসানাত আবদুল্লাহ ছাদে পালিয়েছিলেন। খুনিরা বাসা ত্যাগ করলে তিনি আহতদের হাসপাতালে পাঠাবার ব্যবস্থা করে পালিয়ে যান। খুনিরা চেয়েছিল হাসানাতকে হত্যা করতে।

একই সময় খুনিরা রিসালদার মোসলেহ উদ্দিনের নেতৃত্বে বঙ্গবন্ধুর ভাগ্নে শেখ ফজলুল হক মনির বাসা আক্রমণ করে। রিসালদার মোসলেহউদ্দিন শেখ মনি ও তার স্ত্রী গর্ভবতী আরজু মনিকে হত্যা করে। তারা দুই শিশুপুত্র রেখে যান।

শেখ সেলিম শেখ মনি ও আরজুকে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠিয়ে দেন। শেখ মনি তখনও জীবিত ছিলেন। তিনি হাসপাতালে মারা যান। উল্লেখ্য, শেখ মনির দ্বিতীয় পুত্র ব্যারিস্টার ফজলে নূর তাপস ঢাকা-১২ আসন থেকে সংসদ সদস্য নির্বাচিত হয়েছেন।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ও তার পরিবারের হত্যাকাণ্ডে নৌ ও বিমানবাহিনী অংশ নেয়নি।

মেজর শরিফুল হক ডালিম তাড়াতাড়ি বেতার কেন্দ্রে চলে যান এবং ঘোষণা দেন স্বৈরাচার শেখ মুজিবকে হত্যা করা হয়েছে। জাতি এ সংবাদ শুনে হতবাক। অনেকে কান্নায় ভেঙে পড়েন।

খুনিরা খন্দকার মোশতাককে প্রেসিডেন্ট নিযুক্ত করে। মোশতাক ১৫ আগস্ট ১১টা ১৫ মিনিটে রেডিওতে ভাষণ দেন। তিনি বঙ্গবন্ধুর মন্ত্রিসভার মন্ত্রীদের নিয়ে মন্ত্রিসভা গঠন করেন। একমাত্র ক্যাপ্টেন মনসুর আলী, তাজউদ্দীন আহমদ, সৈয়দ নজরুল ইসলাম, এএইচএম কামরুজ্জামান খুনিদের মন্ত্রিসভায় যোগদানে অস্বীকৃতি জানান। ফলে তাদের গ্রেফতার করে ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে বন্দী করে রাখা হয়।

ঢাকার সেনানিবাসের নবম ডিভিশনের ব্রিগেড কমান্ডার কর্নেল সাফায়াত জামিল বঙ্গবন্ধু হত্যার সংবাদ শুনে মেজর জেনারেল সফিউল্লাহর সাথে কথা বলে মেজর জেনারেল জিয়াউর রহমানের বাসভবনে যান। তিনি জিয়াকে জিজ্ঞেস করেন, প্রেসিডেন্টকে হত্যা করা হয়েছে। আপনার নির্দেশ কি? জিয়া উত্তর দিলেন, যদি প্রেসিডেন্ট না থাকে ভাইস প্রেসিডেন্ট আছেন। জিয়া এ সময় দাড়ি কামাচ্ছিলেন। তিনি শান্ত। তাকে শোকাভিভূত দেখা যায়নি। সেনাবাহিনীর তিন প্রধানকে রেডিও অফিসে আনা হয়। তারা মোশতাকের প্রতি আনুগত্য ঘোষণা করেন। জেনারেল সফিউল্লাহর স্থলে মেজর জেনারেল জিয়াউর রহমানকে সেনাবাহিনীর প্রধান নিযুক্ত করা হয়। বঙ্গবন্ধুর হত্যার পর খন্দকার মোশতাক ও জিয়াউর রহমান ক্ষমতাসীন হয়েছেন। তাদের সমর্থনে খুনিরা বঙ্গবন্ধুকে সপরিবারে হত্যা করেছে।

১৫ আগস্ট সারাদিন বঙ্গবন্ধু ও তার পরিবারের সদস্যদের লাশ ৩২ নম্বর ধানমণ্ডির বাসায় অযত্নে পরে ছিল। ১৫ আগস্ট গভীর রাতে বঙ্গবন্ধু ব্যতীত সবার লাশ বনানী কবরস্থানে গণকবর দেয়া হয়। তাদের গোসল ও জানাজা পড়ানো হয়নি। বনানী গোরস্তানে বঙ্গবন্ধুর তিন পুত্র, দুই পুত্রবধূ, স্ত্রী, কনিষ্ঠ ভ্রাতা, ভাগিনা শেখ মনি, তার স্ত্রী, ভগ্নিপতি মন্ত্রী আবদুর রব সেরনিয়াবাত ও তার পরিবারের সদস্য সর্বমোট ১৮ জনকে মাটিচাপা দেয়া হয়।

বঙ্গবন্ধুকে টুঙ্গিপাড়ায় দাফন

৩২ নম্বর ধানমণ্ডি সড়কের বাসভবনে বঙ্গবন্ধুর মৃতদেহ ১৫ আগস্ট সকাল থেকে ১৬ আগস্ট দুপুর ২টা ৩০ মিনিটে পর্যন্ত অবহেলিত অবস্থায় ছিল। তাকে ঢাকায় দাফন না করে টুঙ্গিপাড়ায় দাফন করার সিদ্ধান্ত হয়। ১৬ আগস্ট বিকেলে দু'জন মেজর বঙ্গবন্ধুর লাশ হেলিকপ্টারে টুঙ্গিপাড়ায় নিয়ে যান। তাকে গোসল ও দাফনের জন্য অল্প সময় দেয়া হয়। লোকজন ভয়ে পালিয়ে যায়। হাসপাতালের সাবান দিয়ে গোসল করানো হয়। রেড ক্রিসেন্টের কাপড় পরানো হয়। কয়েকজন লোক জানাজায় উপস্থিত ছিল। বঙ্গবন্ধুর শরীরে ২৯টি ক্ষত ছিল– বুকে ২৪টি গুলির আঘাত এবং একটি বুলেট পিছন দিয়ে ঢুকে বের হয়ে যায়। বঙ্গবন্ধুকে তার পিতামাতার পাশে চিরশায়িত করা হয়।

১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট বঙ্গবন্ধুর পরিবারে যারা নিহত হয়েছেন :

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান (৫৫)
বেগম ফজিলাতুন্নেসা-স্ত্রী (৪৫)
শেখ নাসের-ভাই (৪৭)
শেখ কামাল-জ্যেষ্ঠ পুত্র (২৭)
শেখ জামাল-দ্বিতীয় পুত্র (২১)
শেখ রাসেল-কনিষ্ঠ পুত্র (১০)
সুলতানা কামাল-কামালের স্ত্রী (২২)
রোজী-জামালের স্ত্রী (১৮)
আবদুর রব সেরনিয়াবাত-মন্ত্রী-ভগ্নিপতি (৫৪)
শেখ ফজলুল হক মনি-ভাগ্নে (৩৬)
আরজু মনি-শেখ মনির স্ত্রী (২৬)
নুরুন্নেসা বেবী-সেরনিয়াবাতের কন্যা (১৩)
আরিফ-সেরনিয়াবাতের পুত্র (১২)
কর্নেল জামিল উদ্দিন আহমদ (৪২)
সুকান্ত বাবু-সেরনিয়াবাতের নাতি (৫)
শহীদ সেরনিয়াবাত-মন্ত্রী আবদুর রব-এর ভ্রাতুষ্পুত্র (৩৫)
আবু নঈম রেন্টু-আত্মীয়। বরিশাল অপসোনিনের মালিক ক্যাপ্টেন সবুরের কনিষ্ঠ ভ্রাতা। (২০)

বঙ্গবন্ধু ও তার পরিবারের হত্যাকারী

লে. কর্নেল বরখাস্ত সৈয়দ ফারুকুর রহমান

লে. কর্নেল অব্যাহতিপ্রাপ্ত খন্দকার আবদুর রশীদ
লে. কর্নেল (অব্যাহতিপ্রাপ্ত) শাহরিয়ার রশীদ খান
মেজর (অব) বজলুল হুদা
লে. কর্নেল (অব) এ কে এম মহিউদ্দিন আহমদ
লে. কর্নেল এস এইচ এস বি নূর চৌধুরী
লে. কর্নেল (অব) মহিউদ্দিন আহমদ
লে. কর্নেল অব্যাহতিপ্রাপ্ত শরিফুল হক ডালিম
লে. কর্নেল অব্যাহতিপ্রাপ্ত এ এম রাশেদ চৌধুরী
লে. কর্নেল (অব্যাহতিপ্রাপ্ত) আবদুল আজিজ পাশা
ক্যাপ্টেন অনারারি (অব) আবদুল ওহাব জোয়ারদার
রিসালদার মোসলেম উদ্দিন
মেজর অব্যাহতিপ্রাপ্ত আহমদ শরফুল হাসান
ক্যাপটেন (অব) কিসমত হাশেম
ক্যাপটেন অনারারি (অব) নাজমুল হোসেন আনসারী
ক্যাপেটেন (অব) আবদুল মাজেদ
দফাদার মারফত আলী শাহ
এ্যাসিস্ট্যান্ট ল্যান্স দফাদার আবুল হাশেম মৃধা
রিসালদার সৈয়দ সারওয়ার হোসেন
ক্যাপ্টেন এম মোস্তফা আহমেদ

অধ্যায় ৩২

কেন্দ্রীয় কারাগারে জাতীয় চার নেতার হত্যা

জেনারেল খালেদ মোশাররফের নেতৃত্বে ক্যু

বাংলাদেশের ইতিহাসে করুণ ঘটনা ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগার জাতীয় চার নেতাকে নির্মমভাবে হত্যা। তারা হলেন মুজিবনগর সরকারের অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি সৈয়দ নজরুল ইসলাম, প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দীন আহমদ, মন্ত্রী এম মনসুর আলী, মন্ত্রী কামরুজ্জামান। তারা মোশতাক সরকারে যোগদানে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করলে তাদেরকে গ্রেফতার করে ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে আটক রাখা হয়।

১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট হতে সেনাবাহিনীর শৃঙ্খলা ভেঙে পড়ে। সেনা কর্মকর্তাগণ জেনারেল জিয়াউর রহমানকে সেনাবাহিনীতে শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনার জন্য অনুরোধ জানান। কিন্তু কৌশলে তিনি বিরত থাকেন। ব্রিগেডিয়ার খালেদ মোশাররফ, কর্নেল নুরুজ্জামান ও নবম ডিভিশনের জিওসি কর্নেল সাফায়াত জামিল সামরিক অভ্যুত্থানের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। ১৯৭৫ সালের ২ নভেম্বর রাতে খালেদ মোশারফের নেতৃত্বে ক্যু হয়। ৩ নভেম্বর ভোরে জেনারেল জিয়াকে তার বাসভবনে গ্রেফতার করে আটক করা হয়। খালেদ মোশাররফ দেশের কর্তৃত্ব গ্রহণ করেন। প্রেসিডেন্ট খন্দকার মোশতাক আহমদ ৩ নভেম্বর সকালে গ্রেফতার করা হয়। খালেদ মোশাররফ মেজর জেনারেল পদে উন্নীত হন। তিনি সেনবাহিনী প্রধান হন। খালেদ মোশাররফ সমঝোতা করে ১৭ খুনী মেজরকে ব্যাঙ্ককে নির্বাসনে প্রেরণ করেন। খুনী মেজররা দেশত্যাগের পূর্বে জেলখানায় জাতীয় চার নেতাকে হত্যা করে।

কীভাবে জাতীয় চার নেতাকে হত্যা করা হয়

ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে আইজি প্রিজন নুরুজ্জামান এবং ডিআইজি প্রিজন কেএ আউয়ালকে ৩ নভেম্বর রাত ৩টায় বঙ্গভবনের নির্দেশে জেলে আসতে হয়। বঙ্গভবন থেকে লে. কর্নেল খন্দকার আবদুর রশীদের নির্দেশে তারা রিসালদার মোসলেমউদ্দিন, দফাদার মারফত আলীসহ এলডি আবুল হাশেম মৃধাকে জেলে

প্রবেশ করতে দেন। তারা ৩ নভেম্বর ভোর ৪টায় জেলগেটে স্বাক্ষর করে প্রবেশ করে। তারা বন্দী সৈয়দ নজরুল ইসলাম, তাজউদ্দীন আহমদ, এম মনসুর আলী এবং কামরুজ্জামানকে দেখিয়ে দিতে বলে। এ সময় আইজি প্রিজন নুরুজ্জামান প্রেসিডেন্ট খন্দকার মোশতাকের সাথে কথা বলতে চান। তিনি মোশতাকের সাথে কথা বলেন। মোশতাক তাকে কর্নেল রশীদের নির্দেশমতো কাজ করতে বলেন। কয়েক মিনিটের মধ্যে রিসালদার মোসলেমউদ্দিনসহ ৪ জন সেনা সদস্য অফিসে ঢুকে পড়ে। তারা বন্দিদের নিকট চলে যায়। চার নেতাকে এক কক্ষে আনা হয়। রিসালদার মোসলেমউদ্দিন ও তার সাথীরা চার নেতাকে গুলি করে হত্যা করে।

৩ নভেম্বর সকাল ১০টায় খালেদ মোশাররফ জেল হত্যার সংবাদ পেয়ে শঙ্কিত হয়ে পড়েন। চার নেতার লাশের ময়না তদন্ত করা হয় এবং ৪ নভেম্বর রাতে লাশ আত্মীয়স্বজনের নিকট ফেরত দেয়া হয়। ৫ নভেম্বর সৈয়দ নজরুল ইসলাম, তাজউদ্দীন আহমদ, এম মনসুর আলীর লাশ বনানী কবরস্থানে দাফন করা হয়। এ এইচ এম কামরুজ্জামানের লাশ হেলিকপ্টারে রাজশাহী পাঠিয়ে দেয় এবং তাকে পারিবারিক গোরস্তানে দাফন করা হয়।

১৯৭৫ সালের ৩ নভেম্বর হতে ৬ নভেম্বর বাংলাদেশে কোনো সরকার ছিল না। মেজর জেনারেল খালেদ মোশাররফ অপরিকল্পিত ক্যু করেছেন। তিনি বেতার টিভিতে এসে দেশবাসীকে ক্যু সম্পর্কে অবহিত করেননি। তিনি ক্ষমতালিপ্সু ছিলেন না। এ সুযোগে তার বিরুদ্ধে মিথ্যা গুজব ছড়ানো হয়। কর্নেল তাহের সিপাহী ও জাসদ নেতাকর্মীদের সংগঠিত করেন।

৪ নভেম্বর বাকশাল নেতাকর্মী ও ছাত্রলীগ জাতির জনকের হত্যার প্রতিবাদে শোক দিবস পালন করেন।

৬ নভেম্বর সকালে খন্দকার মোশতাক আহম্মদের স্থলে প্রধান বিচারপতি আবু সাদাত মোহাম্মদ সায়েমকে বাংলাদেশের প্রেসিডেন্ট নিয়োগ করা হয়।

১৯৭৫ সালের ৬ নভেম্বর মধ্যরাতে সাধারণ সৈন্যরা লে. কর্নেল তাহেরের নেতৃত্বে উচ্ছৃঙ্খল হয়ে পড়ে। তারা গৃহবন্দি মেজর জেনারেল জিয়াউর রহমানকে মুক্ত করে। জিয়াউর রহমান নিজেকে প্রধান সামরিক শাসক ঘোষণা করেন। তার প্রেরিত সৈন্যরা জেনারেল খালেদ মোশাররফ, কর্নেল এ টি এম হায়দার ও কর্নেল কে এন হুদাকে শেরে বাংলানগরে ধরে ফেলে। তাদেরকে এক লাইনে দাঁড় করিয়ে গুলি করে হত্যা করা হয়। তিন বীর মুক্তিযোদ্ধাকে সেনানিবাসে দাফন করা হয়।

জেল হত্যা মামলা

১৯৯৭-২০০১ সালে জেল হত্যা মামলা শুরু হলেও বিভিন্ন অজুহাতে বিচার বিলম্বিত হয়।

২০০৪ সালের প্রথম দিকে ঢাকা জেলা জজ মতিয়ুর রহমান নাজিমউদ্দিন রোডে একটি ভবনে বিচার কাজ সমাপ্ত করেন।

২০০৪ সালের ২০ অক্টোবর জেল হত্যা মামলার রায় ঘোষণা করা হয়। রায়ে ৩ জনের মৃত্যুদণ্ড, ১২ জনকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড এবং ৫ জনকে খালাস দেয়া হয়।

মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্তরা হলো :

রিসালদার মোসলেমউদ্দিন
দফাদার মারফত আলী শাহ
এলডি আবুল হাশেম মৃধা

যাবজ্জীবন কারাদণ্ডপ্রাপ্তরা হলেন :

লে. কর্নেল সৈয়দ ফারুকুর রহমান
লে. কর্নেল সুলতান শাহরিয়ার রশীদ খান
লে. কর্নেল মহিউদ্দিন আহমদ
লে. কর্নেল খন্দকার আবদুর রশীদ
মেজর বজলুল হুদা
লে. কর্নেল শরিফুল হক ডালিম
লে. কর্নেল মহিউদ্দিন আহমদ
লে. কর্নেল এম এইচ এমবি নুর চৌধুরী
লে. কর্নেল এ এম রাশেদ চৌধুরী
মেজর শরিফুল হোসেন
ক্যাপ্টেন কিসমত হাশেম

খালাসপ্রাপ্তরা হলো : শাহ মোয়াজ্জেম হোসেন, তাহের উদ্দিন ঠাকুর, কে এম ওবায়দুর রহমান, নুরুল ইসলাম মঞ্জুর, মেজর শামসুজ্জোহা।

এ রায়ের বিরুদ্ধে হাইকোর্ট আপীল করা হলে একজন ব্যতীত সবাই খালাস পায়। একমাত্র রিসালদার মোসলেম উদ্দিনের মৃত্যুদণ্ড বহাল রাখে। দেশবাসী এ রায় প্রত্যাখ্যান করেছে। ২০০৯ সালে মহাজোট সরকার ক্ষমতায় এসে জেলহত্যার রায়ের বিরুদ্ধে আপীল করেছে। জেলহত্যা মামলা বিচারাধীন আছে।

অধ্যায় ৩৩

বঙ্গবন্ধু ও তাঁর পরিবারের হত্যার বিচার

১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান নিহত হওয়ার পর খন্দকার মোশতাক আহমেদ বেআইনিভাবে প্রেসিডেন্ট নিযুক্ত হন। তিনি হত্যাকারীদের রক্ষার জন্য ১৯৭৫ সালের ২৫ সেপ্টেম্বর ইনডেমনিটি অধ্যাদেশ জারি করেন। ২১ বছরে বঙ্গবন্ধুর হত্যার বিচার হয়নি।

১৯৯৬ সালের ১২ জুন নির্বাচনে জয়লাভ করে শেখ হাসিনা ২৩ জুন সরকার গঠন করেন। তিনি ক্ষমতায় এসে বঙ্গবন্ধু ও তার পরিবারের হত্যার বিচার কাজ শুরু করেন। ১৯৯৬ সালের ১২ নভেম্বর জাতীয় সংসদে ইনডেমনিটি অর্ডিন্যান্স বাতিল বিল গৃহীত হয়। ১৪ নভেম্বর রহিতকরণ বিল রাষ্ট্রপতির সম্মতি লাভ করে।

ইনডেমনিটি অধ্যাদেশ ১৯৭৫-এর রহিতকরণ আইন ১৯৯৬ বঙ্গবন্ধু হত্যার বিচারের দ্বার খুলে দেয়।

১৯৯৬ সালের ২ অক্টোবর ধানমণ্ডি থানায় বঙ্গবন্ধুর বাসভবনের সাবেক পিএ আ ফ ম মহিতুল ইসলাম বঙ্গবন্ধু ও তার পরিবারের সদস্যদের হত্যা মামলা দায়ের করে। ১৯৯৭ সালের ১৫ জানুয়ারি পুলিশ মামলার অভিযোগনামা দায়ের করে। আসামিদের মধ্যে ছিল ৭ জন গ্রেফতারকৃত এবং পলাতক ১৩ জন। মোট ২০ জন আসামির বিরুদ্ধে আদালতে সাক্ষ্য-প্রমাণের মাধ্যমে বিচারকার্য অনুষ্ঠিত হয়।

গ্রেফতারকৃত আসামিরা হলো :

লে. কর্নেল সৈয়দ ফারুকুর রহমান
লে. কর্নেল শাহরিয়ার রশীদ খান
তাহের উদ্দিন ঠাকুর
লে. কর্নেল মহিউদ্দিন আহমেদ-আর্টিলারী
অনারারি ক্যাপ্টেন আবদুল ওহাব জোয়ারদার
জোবায়দা রশীদ
মেজর বজলুল হুদা

বঙ্গবন্ধু হত্যা মামলায় ৭৩ জনকে সাক্ষী হিসেবে নাম অন্তর্ভুক্ত ছিল।

ঢাকা জেলা জজ কাজী গোলাম রসুল প্রাপ্ত সাক্ষ্য পর্যালোচনা করে ১৯৯৮ সালের ৮ নভেম্বর ১৫ জন আসামিকে ফায়ারিং স্কোয়াডে অথবা ফাঁসি দিয়ে মৃত্যুদণ্ডাদেশ প্রদান করেন। ৪ জনকে খালাস দেয়ার নির্দেশ দেয়।

মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত আসামিরা হলো :

লে. কর্নেল সৈয়দ ফারুক রহমান
লে. কর্নেল সুলতান শাহরিয়ার রশীদ খান
লে. কর্নেল মহিউদ্দিন আহমেদ আর্টিলারি
লে. কর্নেল আবদুর রশীদ
মেজর বজলুল হুদা
লে. কর্নেল শরিফুল হক ডালিম
মেজর শরিফুল হোসেন ওরফে শরিফুল হোসেন
কর্নেল এ এম রাশেদ চৌধুরী
কর্নেল মহিউদ্দিন আহমেদ লান্সার
লে. কর্নেল এমএইচএসবি নুর চৌধুরী
লে. কর্নেল আজিজ পাশা
ক্যাপ্টেন মোঃ কিসমত হাশেম
ক্যাপ্টেন নাজমুল হোসেন
ক্যাপ্টেন আবদুল মাজেদ
রিসালদার মোসলেম উদ্দিন

আসামিরা ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট আনুমানিক ভোর ৫টায় ধানমণ্ডির নিজ ৬৭৭ নম্বর বাসভবনে তৎকালীন রাষ্ট্রপতি বঙ্গবন্ধু, তার পরিবারবর্গকে ষড়যন্ত্র ও পূর্বপরিকল্পনা মোতাবেক গুলি করে হত্যা করার অপরাধে তাদের বিরুদ্ধে দণ্ডবিধি ৩০২/৩৪ এবং দণ্ডবিধি ১২০ক ধারায় অভিযোগ সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হওয়ায় উপরোক্ত ১৫ জন আসামিকে মৃত্যুদণ্ড প্রদান করা হয়।

আসামি তাহের উদ্দিন ঠাকুর, অনারারি ক্যাপটেন আবদুল ওহাব জোয়ারদার ও মারফত আলী, এলডি আবুল হাশেম মৃধার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ প্রমাণিত না হওয়ায় তাদেরকে খালাস দেয়া হয়।

বঙ্গবন্ধু হত্যা মামলা বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্টের আপীল বিভাগে বিচারাধীন ছিল। জোট সরকারের আমলে আপীল শুনানি বিলম্বিত হয়। ২০০৯ সালে মহাজোট সরকার ক্ষমতায় এলে বিচার কাজ সমাপ্ত হয়।

সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি তফাজ্জল ইসলাম হাইকোর্টের দেয়া ১২ জন আসামির মৃত্যুদণ্ড বহাল রাখে। মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত আসামিদের মধ্যে ৫ জনের ২০১০ সালের ২৭ জানুয়ারি ফাঁসি কার্যকর করা হয়।

তারা হলো :

কর্নেল (অব) সৈয়দ ফারুক রহমান

লে. কর্নেল সুলতান শাহরিয়ার রশীদ খান

মেজর (অব) বজলুল হুদা

মেজর (অব) একেএম মহিউদ্দিন আহমেদ

মেজর (অব) এ কে এম মহিউদ্দিন আহমেদ আর্টিলারি

মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত আসামি মেজর মোহাম্মদ আজিজ পাশা জিম্বাবুয়েতে মৃত্যু হয়েছে।

মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত ৬ জন আসামি বিদেশে পলাতক আছে।

তারা হলো :

কর্নেল (অব) খন্দকার রশীদ-লিবিয়া

লে. কর্নেল (অব) শরিফুল হক ডালিম-কানাডা

লে. কর্নেল এ এম রাশেদ চৌধুরী-দক্ষিণ আফ্রিকা

মেজর (অব) এম এইচ বি এস নুর চৌধুরী-আমেরিকা

রিসালদার মোসলেমউদ্দিন-আমেরিকা

ক্যাপটেন (অব) আবদুল মাজেদ-কেনিয়া

সুপ্রিমকোর্টের রায়ের ফলে ৩৪ বছর পর জাতি কলঙ্কমুক্ত হলো।

সুপ্রিমকোর্টের আপীল বিভাগের বিচারপতি ছিলেন

তফাজ্জুল ইসলাম–প্রধান বিচারপতি

বিচারপতি মোঃ আবদুল আজিজ

বিচারপতি মোকাম্মেল হোসেন

বিচারপতি সুরেন্দ্র কুমার সিনহা

এ মামলায় সরকার পক্ষে কৌঁসুলি ছিলেন আনিছুল হক। তার পিতা মরহুম এডভোকেট সিরাজুল হক জজকোর্টে বঙ্গবন্ধু হত্যা মামলা পরিচালনা করেন। পিতাপুত্র এ মামলা পরিচালনা করে ইতিহাসে স্মরণীয় হয়ে আছেন।

বঙ্গবন্ধুকে কেন হত্যা করা হলো

ঘাতক দল ও নেপথ্য নায়করা কেন জাতির পিতাকে হত্যা করলো।

অভিযোগ হলো– তিনি গণতন্ত্র হত্যা করে বাকশাল বা একদলীয় শাসন প্রতিষ্ঠা করেছেন।

দ্বিতীয় অভিযোগ– তার সময় ইসলাম ধর্ম পালন করতে পারেনি।

তৃতীয়– তিনি ভারতপন্থী ছিলেন।

এ সকল অভিযোগ মিথ্যা ও ভিত্তিহীন। তিনি গণতন্ত্রকে তৃণমূল পর্যায় প্রতিষ্ঠিত ও শোষণহীন সমাজ প্রতিষ্ঠা করার জন্য বাকশাল গঠন করেন।

তিনি ধর্মনিরপেক্ষ ছিলেন। তিনি ইসলাম ধর্ম প্রচার ও প্রসারের জন্য ইসলামিক ফাউন্ডেশন প্রতিষ্ঠা করেন।

তিনি ভারতপন্থী ছিলেন না। তিনি ভারতের বন্ধু ছিলেন।

ভারত ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধকালে সহায়তা করেছিল।

মুক্তিযুদ্ধবিরোধী শক্তি ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট বঙ্গবন্ধুকে সপরিবারে হত্যা করেছে।

অধ্যায় ৩৪

বঙ্গবন্ধুকন্যা শেখ হাসিনার রাজনীতিতে প্রবেশ

দিল্লিতে নির্বাসিত জীবন–১৯৭৫-১৯৮১

১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট শেখ হাসিনা ও শেখ রেহানা জার্মানিতে ছিলেন। সে কারণে বঙ্গবন্ধুর দু'কন্যা বেঁচে যান। শেখ হাসিনা তার স্বামী ড. ওয়াজেদ, পুত্র সজীব ওয়াজেদ জয়, কন্যা পুতুলকে নিয়ে ১৯৭৫ সালের ২৫ আগস্ট থেকে ১৯৮১ সালের ১৬ মে পর্যন্ত ভারতের রাজধানী দিল্লিতে অন্তরীণ ছিলেন। শেখ হাসিনা প্রথমে দিল্লি ও পরে লন্ডনে ছিলেন।

১৯৭৫ সালে ড. এমএ ওয়াজেদ মিয়া জার্মানিতে অবস্থান করছিলেন। শেখ হাসিনা পুত্র, কন্যা ও বোনকে নিয়ে জার্মানি পৌঁছেন। জার্মানিতে তখন বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত ছিলেন হুমায়ুন রশীদ চৌধুরী। ১৫ আগস্ট শেখ হাসিনা বেলজিয়ামে বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত সানাউল হকের বাসভবনে অবস্থান করছিলেন। সেখানে ড. ওয়াজেদ ঢাকায় বঙ্গবন্ধু ও তার পরিবারের সদস্যদের হত্যার সংবাদ পেলেন। শেখ হাসিনা ও রেহানাকে হত্যার সংবাদ জানানো হয়নি। তারা বেলজিয়াম থেকে জার্মানিতে ফিরে আসেন।

জার্মানির রাষ্ট্রদূত হুমায়ুন রশীদ চৌধুরী ভারতের সাথে আলোচনা করে বঙ্গবন্ধুর কন্যাদের দিল্লিতে থাকার ব্যবস্থা করেন। তারা জার্মানি থেকে দিল্লিতে আসেন। শেখ হাসিনা, ড. ওয়াজেদ ভারত সরকারের নির্দেশে দিল্লির ডিফেন্স কলোনিতে আশ্রয় গ্রহণ করেন। তারা নিজেদের পরিচয় গোপন রাখেন। শেখ হাসিনা ও ড. ওয়াজেদ ইন্দিরা গান্ধীর সঙ্গে দেখা করেন। ইন্দিরা গান্ধীর নির্দেশে একজন কর্মকর্তা তাদের জানান যে, ১৫ আগস্টের ঘটনায় বঙ্গবন্ধুর পরিবারের কেউ বেঁচে নেই। শেখ হাসিনা এতদিন পিতামাতা, ভাই, আত্মীয়-স্বজনের খবর জানতেন না। শেখ হাসিনা কান্নায় ভেঙে পড়েন। ইন্দিরা গান্ধী শেখ হাসিনাকে জড়িয়ে ধরে সান্ত্বনা দেন। তিনি বলেন, "যা হারিয়েছ তা কোনোভাবেই পূরণ হবে না। তোমার পুত্র-কন্যা আছে। তাদেরকে তোমার বাবা ও মা হিসেবে ভাবতে হবে।"

১৯৭৫ সালের সেপ্টেম্বর মাসে শেখ হাসিনা নয়াদিল্লির ইন্ডিয়ান গেটের নিকট পান্ডারা রোডের একটি সরকারি বাসভবনে দোতলায় একটি ফ্ল্যাটে ওঠেন। ১৯৭৫ সালের ১ অক্টোবর ভারতীয় আণবিক শক্তি কমিশন থেকে ড. ওয়াজেদকে ফেলোশিপ প্রদান করা হয়।

১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্টের পর খন্দকার মোশতাক, জেনারেল জিয়া সরকার আওয়ামী লীগের ওপর নির্যাতন শুরু করে। ১৯৭৫ সালের ২৪ আগস্ট জেনারেল সফিউল্লাহকে অপসারণ করে মেজর জেনারেল জিয়াউর রহমানকে সেনাপ্রধান নিযুক্ত করা হয়। খন্দকার মোশতাক ১৯৭৫ সালের ১৬ অক্টোবর জাতীয় সংসদের সভা আহ্বান করেন। কিন্তু সাড়া না পাওয়ায় সভা বন্ধ হয়ে যায়।

১৯৭৫ সালের ৩ নভেম্বর ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে জাতীয় ৪ নেতাকে হত্যা করা হয়। ৭ নভেম্বর জেনারেল খালেদ মোশাররফকে হত্যা করে জিয়াউর রহমান রাষ্ট্রক্ষমতা দখল করেন।

১৯৭৭ সালের ২২ এপ্রিল রাষ্ট্রপতি সায়েম জেনারেল জিয়াকে রাষ্ট্রপতি নিয়োগ করতে বাধ্য হন।

১৯৭৭ সালের ২২ এপ্রিল রাষ্ট্রপতি জেনারেল জিয়া অধ্যাদেশবলে ১৯৭২ সালের শাসনতন্ত্রের মূলনীতিতে ধর্মনিরপেক্ষতা, সমাজতন্ত্র, জাতীয়তাবাদ সংশোধন করে ইসলাম ধর্ম, বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদ অন্তর্ভুক্ত করেন।

১৯৭৬ সালের ১৭ জুলাই সামরিক ট্রাইব্যুনালের বিচারে কর্নেল তাহেরকে ফাঁসি দিয়ে হত্যা করা হয়।

১৯৭৭ সালের ১৬ ডিসেম্বর জেনারেল জিয়াউর রহমান জাতীয়তাবাদী গণতন্ত্রী দল (জাগদল) গঠনের ঘোষণা দেন।

১৯৭৬ সালের ৪ নবেম্বর বাকশাল আওয়ামী লীগের নামে দল গঠনের অনুমতি লাভ করে। ১৯৭৭ সালের এপ্রিল মাসের ৩-৪ তারিখে ঢাকার ইডেন হোটেলে আওয়ামী লীগের কাউন্সিল অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। বেগম জোহরা তাজউদ্দীনকে আওয়ামী লীগের আহ্বায়ক নির্বাচিত করা হয়। ১৯৭৮ সালের ৩-৫ মার্চ ঢাকায় আওয়ামী লীগের দ্বিবার্ষিক কাউন্সিল অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। সম্মেলনে আবদুল মালেক উকিলকে সভাপতি এবং আবদুর রাজ্জাককে সম্পাদক নির্বাচিত করা হয়।

১৯৭৭ সালের ৩০ মে গণভোট হ্যাঁ-না ভোট অনুষ্ঠিত হয়। প্রেসিডেন্ট জিয়া আস্থা ভোট অর্জন করেন।

১৯৭৭ সালের ১ অক্টোবর জেনারেল জিয়াউর রহমানের বিরুদ্ধে ক্যু হয়।

জিয়া বিরোধীদের কঠোরভাবে দমন করেন এবং ১৩৪৩ জন সৈন্যকে ফাঁসি দিয়ে হত্যা করেন।

১৯৭৮ সালের ৩ জুন রাষ্ট্রপতির নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। আওয়ামী লীগ প্রার্থী জেনারেল এম এ জি ওসমানীকে পরাজিত করে জিয়া প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হন।

১৯৭৯ সালের ১৮ ফেব্রুয়ারি জাতীয় সংসদের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। বিএনপি জয়লাভ করে।

১৯৭৯ সালের ৫ এপ্রিল জাতীয় সংসদে সংবিধানের পঞ্চম সংশোধনী গৃহীত হয়।

১৯৮১ সালের ১৩-১৫ ফেব্রুয়ারি ঢাকায় আওয়ামী লীগের দ্বিবার্ষিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সম্মেলনে শেখ হাসিনাকে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত করা হয়।

শেখ হাসিনার ঢাকায় ঐতিহাসিক প্রত্যাবর্তন

দিল্লিতে ৫ বছর নির্বাসনের পর ১৯৮১ সালের ১৭ মে শেখ হাসিনা ঢাকায় আগমন করেন। লাখ লাখ জনতা তাকে স্বাগত জানায়। তিনি ঢাকায় মানিক মিয়া এভিনিউতে ১০ লাখ মানুষের বিশাল জনসভায় কান্নাজড়িত কণ্ঠে ভাষণ দেন।

১৮ মে তিনি টুঙ্গিপাড়ায় বঙ্গবন্ধুর মাজার জিয়ারত করেন। শেখ হাসিনা রাজনীতিতে প্রবেশ করায় দেশবাসীর মধ্যে আশার সঞ্চার হয়। আওয়ামী লীগ শক্তিশালী হতে থাকে।

জেনারেল জিয়াউর রহমানের হত্যা ৩০ মে ১৯৮১

১৯৮১ সালের ৩০ মে রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান চট্টগ্রাম সার্কিট হাউজে সেনাবাহিনীর হাতে নির্মমভাবে নিহত হন। জিয়ার বিরুদ্ধে অভিযোগ ছিল তিনি রাজাকারদের পুনর্বাসিত করেছেন। তিনি মুক্তিযোদ্ধাদের হত্যা করেছেন। তিনি বঙ্গবন্ধুকে হত্যার জন্য দায়ী। বিদ্রোহী সেনা অফিসারদের মধ্যে মতিয়ুর রহমান বীরবিক্রম, কর্নেল ফজলে হোসেন, কর্নেল মাহবুবুর রহমান, কর্নেল দেলওয়ার হোসেন সার্কিট হাউজ আক্রমণ পরিচালনা করেন। বিদ্রোহীদের নেতা ছিলেন মেজর জেনারেল এম মঞ্জুর। কর্নেল মতিয়ুর রহমান বিশ্বাস করতেন বঙ্গবন্ধুকে হত্যার জন্য জেনারেল জিয়া দায়ী। তাই কর্নেল মতিয়ুর রহমান নিজের স্টেনগান দিয়ে জিয়াকে গুলি করে হত্যা করেন। গুলিতে জিয়ার শরীর ক্ষতবিক্ষত হয়ে পড়ে। কর্নেল মতিয়ুর রহমান ক্রসফায়ারে নিহত হন। জেনারেল মঞ্জুরকে হত্যা

করা হয়। বিচারপতি আবদুস সাত্তার ভারপ্রাপ্ত রাষ্ট্রপতি এবং জেনারেল হুসেইন মুহম্মদ এরশাদ প্রধান সেনাপতি হন। বিদ্রোহী সেনা কর্মকর্তাদের সামরিক আদালতে বিচার হয়। বিচারে ১৩ জন আসামির ফাঁসি হয়। তারা মুক্তিযোদ্ধা ছিলেন। তারা অনেকে নির্দোষ ছিলেন। তারা হলেন–

ব্রিগেডিয়ার মহসীন আহমেদ বীরবিক্রম
কর্নেল নওয়াজেশ উদ্দিন
কর্নেল এম এ রশীদ বীরপ্রতীক
লে. কর্নেল দেলওয়ার হোসেন বীরপ্রতীক
লে. কর্নেল শাহ মোঃ ফজলে হোসেন
লে. কর্নেল এ ওয়াই এম মাহবুবুর রহমান
মেজর এ জেড গিয়াস উদ্দিন আহমেদ
মেজর রওশন ইয়াজদানী ভূঁইয়া বীরপ্রতীক
মেজর মুজিবুর রহমান
মেজর কাজী মুমিনুল হক
কর্নেল আবদুস সাত্তার
ক্যাপটেন জামিল হক
লে. রফিকুল হাসান খান

১৩ জন আসামিকে কারাদণ্ড দেয়া হয়। অনেকে চাকরিচ্যুত হন।

১৯৮১ সালের ১৫ নভেম্বর রাষ্ট্রপতি নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। নির্বাচনে আওয়ামী লীগ প্রার্থী ড. কামাল হোসেনকে ভোট কারচুপি করে হারানো হয়। বিচারপতি আবদুস সাত্তার বিএনপির প্রার্থী হিসেবে প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হন।

শেখ হাসিনার নেতৃত্বে গণতান্ত্রিক আন্দোলন

১৯৮২ সালের ২৪ মার্চ ক্যু করে জেনারেল হুসেইন মুহম্মদ এরশাদ ক্ষমতা দখল করেন।

১৯৮৬ সালের ৭ মে সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। এরশাদের জাতীয় পার্টি-জাপা নির্বাচনে ভোট ডাকাতি করে জয়লাভ করে। শেখ হাসিনা বিরোধী দলের নেত্রী নির্বাচিত হন। আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে ১৫ দল এবং বিএনপির অধীনে ৭ দল এরশাদের স্বৈরাচারবিরোধী আন্দোলন করে। ১৯৯০ সালের ৬ ডিসেম্বর রাষ্ট্রপতি এরশাদ পদত্যাগ করেন। বিচারপতি সাহাবুদ্দীন আহমদ তত্ত্বাবধায়ক সরকারের ভারপ্রাপ্ত রাষ্ট্রপতির দায়িত্ব গ্রহণ করেন।

১৯৯১ সালের ২৭ ফেব্রুয়ারি নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। নির্বাচনে বিএনপি সূক্ষ্ম

কারচুপি করে জয়লাভ করে। শেখ হাসিনা পুনরায় বিরোধী দলের নেত্রী হলেন। রাজনৈতিক মতপার্থক্যের কারণে ড. কামাল হোসেন আওয়ামী লীগ থেকে পদত্যাগ করেন। তিনি গণফোরাম নামে একটি রাজনৈতিক দল গঠন করেন। তার আওয়ামী লীগ ত্যাগ করা সঠিক হয়নি।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ১৯৯৬-২০০১

১৯৯৬ সালের ১২ জুন সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। নির্বাচনে আওয়ামী লীগ জয়লাভ করে। শেখ হাসিনা প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্বভার গ্রহণ করেন। তিনি ক্ষমতা গ্রহণ করে ইনডেমনিটি আইন রদ করে বঙ্গবন্ধু হত্যার বিচার শুরু করেন। বিচারে ১৫ জন সেনা কর্মকর্তার ফাঁসির আদেশ হয়।

শেখ হাসিনার শাসন আমলে গঙ্গা নদীর পানি চুক্তি, পার্বত্য চট্টগ্রাম শান্তিচুক্তি, যমুনা নদীতে বঙ্গবন্ধু সেতু নির্মাণ সমাপ্ত হয়।

বঙ্গবন্ধুর সমাধি সৌধ-২০০১

শেখ হাসিনার উদ্যোগে ১৭ কোটি ১২ লাখ টাকা ব্যয়ে টুঙ্গিপাড়ায় বঙ্গবন্ধুর সমাধি সৌধ নির্মিত হয়। ২০০১ সালের ১০ জানুয়ারি শেখ হাসিনা সৌধটি উদ্বোধন করেন।

বঙ্গবন্ধু জাদুঘর-১৯৯৪

ঢাকার ৩২ নম্বর সড়কের ৬৭৭ নম্বর বঙ্গবন্ধুর বাসভবনে ১৯৯৪ সালের ১১ এপ্রিল বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান মেমোরিয়াল ট্রাস্ট গঠন করা হয়। ১৯৯৪ সালের ১৪ আগস্ট শেখ হাসিনা জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান স্মৃতি জাদুঘরের শুভ উদ্বোধন করেন।

অধ্যায় ৩৫

পারিবারিক জীবন

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের পারিবারিক জীবন ছিল গৌরবময়, আনন্দঘন ও বিষাদময়। শেখ পরিবারের উজ্জ্বল নক্ষত্র, শতাব্দীর মহানায়ক জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ও তার কন্যা শেখ হাসিনা দীর্ঘদিন বাঙালি জাতির নেতৃত্ব দিয়েছেন।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ১৯২০ সালের ১৭ মার্চ টুঙ্গিপাড়ায় জন্মগ্রহণ করেন। তার ডাকনাম খোকা। শেখ পরিবারের আত্মীয় স্বজনের মধ্যে বিবাহপ্রথা প্রচলিত ছিল। বঙ্গবন্ধুর পিতা শেখ লুৎফর রহমান চাচাত বোন সায়েরা খাতুনকে বিয়ে করেন। দশ বছর বয়সে শেখ মুজিবুর রহমানকে ৩ বছরের চাচাত বোন শেষ ফজিলাতুন্নেছা রেণুর সাথে বিয়ে দেয়া হয়। শেখ ফজিলাতুন্নেসা রেণু ১৯২৮ সালের ৮ আগস্ট টুঙ্গিপাড়ায় জন্মগ্রহণ করেন। তার পিতার নাম শেখ জহিরুল হক এবং মাতার নাম হোসনে আরা বেগম। তারা ছিলেন দু বোন। বড় বোন জিন্নাতুন্নেসা। তারও বাল্যকালে চাচাত ভাই শেখ মুসার সাথে বিয়ে হয। তিন বছর বয়সে ফজিলাতুন্নেসা পিতা এবং পাঁচ বছর বয়সে মাতাকে হারান। ফজিলাতুন্নেসার দাদা শেখ কাশেম বাল্যকালে তার নাতনিকে শেখ মুজিবের সাথে বিয়ে দিয়েছিলেন। পিতৃ-মাতৃহারা রেণুকে শেখ মুজিবের পিতামাতা কোলে তুলে নেন। শেখ মুজিব ও তার ভাইবোনদের সাথে একই পরিবারে ফজিলাতুন্নেসা বড় হতে থাকেন। শিশুকালে খেলার সাথী থেকে তিনি হয়েছিলেন বঙ্গবন্ধুর জীবন সাথী। মৃত্যুকালে স্বামী-স্ত্রী একত্রে ঘাতকের বুলেটে নিহত হয়েছেন। বঙ্গবন্ধুর ১৯ বছর বয়সে ১০ বছরের ফজিলাতুন্নেসার আনুষ্ঠানিক বিয়ে হয়েছিল। ফজিলাতুন্নেসা গৃহে বাল্যশিক্ষা ও গোপালগঞ্জ মিশন স্কুলে প্রাথমিক শিক্ষা লাভ করেন। উচ্চ শিক্ষা তিনি গ্রহণ করতে পারেননি। শেখ হাসিনা স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে তার মা সম্পর্কে লিখেছেন, "মনে প্রাণে তিনি ছিলেন একজন আদর্শ নারী, অত্যন্ত বুদ্ধিমতী এই রমণী অসীম ধৈর্য ও সাহস নিয়ে যে কোনো পরিস্থিতি মোকাবেলা করতেন। জীবনে তার কোনো চাহিদা বা মোহ ছিল না। তার

স্মরণশক্তি ছিল খুবই প্রখর। তিনি অত্যন্ত দানশীল ছিলেন। ৬ দফা আন্দোলনের সময় তিনি নিজের অলঙ্কার বিক্রি করে সংগঠনের জন্য আর্থিক সাহায্য করেছেন। স্বামী শেখ মুজিব ১২ বছর জেলে কাটিয়েছেন। বন্দীকালে ফজিলাতুন্নেসা সংসারের ভার বহন করেছেন। ছেলেমেয়েদের সুশিক্ষার ব্যবস্থা করেছেন, আওয়ামী লীগ ও ছাত্রলীগের সাংগঠনিক দায়িত্ব পালন করেছেন। শত শত কর্মীদের খবরাখবর রেখেছেন এবং দুস্থ কর্মীদের সহায়তা করেছেন।"

১৯৪৭ সালের নভেম্বর মাসে শেখ মুজিবুর রহমান কলকাতা থেকে এসে পুরনো ঢাকায় থাকতেন। ঢাকা কোর্টের পিছনে একটি বাড়িতে খন্দকার আবদুল হামিদ ও মোল্লা জালালউদ্দিনকে নিয়ে তিনি একটি ভাড়া বাড়িতে বাস করতেন। শেখ মুজিবের মেজ ফুফুর পুত্র মমিনুল হক খোকা থাকতেন ৮/৩ রজনী বোস লেনের দোতলা বাসায়। ১৯৫৩ সালে শেখ মুজিব মমিনুল হক খোকার রজনী বোস লেনের বাসায় ওঠেন। ১৯৫৩ সালে শেখ মুজিব তার পরিবারের সদস্যদের টুঙ্গিপাড়া থেকে রজনী বোসের বাসায় নিয়ে আসেন। তৎকালীন সময় রজনী বোসের বাসভবন বিরোধী রাজনীতির অন্যতম কেন্দ্র ছিল। ১৯৫৪ সালে প্রাদেশিক মন্ত্রী নিযুক্ত হলে তিনি মিন্টো রোডের বাসায় চলে আসেন। পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় সরকার ১৯৫৪ সালে ৯২-ক ধারা জারি করে হক-মন্ত্রিসভা ভেঙ্গে দেয় এবং শেখ মুজিবকে গ্রেফতার করে। তার পরিবার নাজিরা বাজারে মুহাম্মদ হানিফ (মেয়র)-এর বাসায় ওঠেন। ১৯৫৪ সালে বন্যায় নাজিরা বাজার প্লাবিত হলে আওয়ামী লীগ নেতা হাফেজ মোহাম্মদ মুসার আরমানিটোলার বাড়িতে বেগম মুজিব ছেলেমেয়েদের নিয়ে ওঠেন। শেখ রেহানা এ বাড়িতে জন্মগ্রহণ করেন। ১৯৫৬ সালে শেখ মুজিব পুনরায় প্রাদেশিক শিল্পমন্ত্রীর দায়িত্ব গ্রহণ করার পরে ১৫ নম্বর আব্দুল গণি রোডে সরকারি বাসভবনে ওঠেন। ১৯৫৭ সালে শেখ মুজিবুর রহমান দলের নির্দেশে মন্ত্রিত্ব ত্যাগ করেন। তাঁকে টি বোর্ডের চেয়ারম্যান নিযুক্ত করা হলে তিনি পরিবারের সদস্যদের নিয়ে সেগুনবাগিচায় টি বোর্ডের বাসায় ওঠেন। তার ফুফাত ভাই মমিনুল হক খোকা শেখ মুজিবের সাথে ছিলেন। বঙ্গবন্ধুর পরিবারের সুখে-দুঃখে মমিনুল হক সাথে থাকতেন। এ মহান হৃদয়ের মানুষটি বঙ্গবন্ধুর পরিবারের নিবেদিত আপনজন ছিলেন।

শেখ মুজিবের রাজনৈতিক শিক্ষাগুরু ছিলেন হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী। তিনি বঙ্গবন্ধুকে বীমা কোম্পানিতে চাকরি দিয়েছিলেন। দলের কাজ করার জন্য গাড়ি দিয়েছেন। তিনি বঙ্গবন্ধুকে রাজনৈতিকভাবে প্রতিষ্ঠিত করেছেন।

১৯৫৮ সালের অক্টোবর মাসে সামরিক আইন জারি এবং শেখ মুজিবের গ্রেফতারের পরে তার পরিবারকে সেগুনবাগিচার বাসা ছেড়ে দিতে হয়। বেগম

মুজিব ছেলেমেয়েদের নিয়ে শান্তিনগরে একটি নির্মাণাধীন বাসভবনে আশ্রয় নেন। কিন্তু বাসাটি বাসযোগ্য ছিল না। কেএসপি নেতা সৈয়দ আজিজুল হক নান্না মিয়ার সহযোগিতায় তারা সেগুনবাগিচায় এক জজ সাহেবের বাসা ভাড়া করেন এবং ১৯৬১ সাল পর্যন্ত সে বাসায় ছিলেন। ১৯৬১ সালের ১ অক্টোবর বেগম মুজিব সন্তানদের নিয়ে ধানমণ্ডির ৩২ নম্বর সড়কে নতুন বাসভবনে ওঠেন।

বঙ্গবন্ধুর দাম্পত্য জীবন সুখের। ছেলেমেয়েদের প্রতি ছিল তার অপার স্নেহ। ১৯৫২ সালে বেগম মুজিবের নিকট লেখা পত্রে তার ছেলেমেয়েদের প্রতি স্নেহ-মমতা ফুটে উঠেছে।

স্ত্রী ফজিলাতুন্নেসার নিকট শেখ মুজিবের লেখা পত্র

রাধিকা মোহন বসাক লেন
১১-৫-১৯৫২ইং

রেণু

তোমার চিঠি পেলাম। সকলে ভাল আছ শুনে সুখী হলাম। আমার শরীর এখন অনেকটা ভালো। আমি শীঘ্রই করাচী যাব। খোদা করলে ঈদের সময় তোমার সাথে বাড়ি যাব। কখনো মন খারাপ করিও না। শরীরের প্রতি যত্ন নিও। খোদা দিন দিবেই। হাসিনা, কামালকে বুঝাইয়া রাখিও। হাসুকে বলিও বাড়ি যাবার সময় পুতুল আনবো যদি মন দিয়া পড়ে। কামালের কাজে বাধা দিও না। ওদের কিছু বলিও না। আব্বা-মা যাহাতে কষ্ট পায় তাহা করিয়া লাভ কি? মুসা ভাইকে সালাম দিও। তোমার বোন, তার ছেলেমেয়ে কেমন? বাড়ির সকলকে আমার সালাম দিও। খুকু আর জেলীর কথা মাঝে মাঝে মনে পড়ে। মেঝো বুজির ছেলেমেয়েরা কেমন আছে? চেষ্টা করিও একটু একটু করে পড়তে। আমি বাসা বদল করিয়াছি। কোন অসুবিধা হয় নাই। আমাকে মাঝে মাঝে চিঠি দিও। দেরী করে লিখ না। প্রাণভরা ভালোবাসা নিও।

ইতি
শেখ মুজিব

শেখ মুজিবুর রহমান ও শেখ ফজিলাতুন্নেসার প্রথম সন্তান শেখ হাসিনা ১৯৪৭ সালের ২৮ সেপ্টেম্বর জন্মগ্রহণ করেন। তখন বঙ্গবন্ধু কলকাতা ইসলামিয়া কলেজের বিএ পরীক্ষা দেন। জন্মের এক মাস পরে পিতা শেখ মুজিব বাড়ি এসে কন্যাকে কোলে তুলে নেন। শেখ হাসিনার ডাক নাম হাসু। পিতা তাঁকে হাসু বলে ডাকতেন। তাঁদের দ্বিতীয় সন্তান শেখ কামাল ১৯৪৯ সালের ৫ আগস্ট এবং

দ্বিতীয় পুত্র শেখ জামাল ১৯৫৪ সালের ২৮ এপ্রিল টুঙ্গিপাড়ায় জন্মগ্রহণ করেন। চতুর্থ সন্তান শেখ রেহানা ১৯৫৭ সালের ১৩ সেপ্টেম্বর এবং পঞ্চম সন্তান শেখ রাসেল ১৯৬৪ সালের ১৮ অক্টোবর ঢাকায় জন্মগ্রহণ করে। দু কন্যা ও তিন পুত্র পিতা-মাতার অত্যন্ত প্রিয় ছিলেন।

কামাল ও জামালকে শাহীন স্কুলে ভর্তি করা হয়। শেখ হাসিনা নারী শিক্ষা মন্দির হতে কামরুন্নেসা স্কুলে ভর্তি হন। সেগুনবাগিচা হতে ৩২ নম্বর ধানমণ্ডি এলে শেখ হাসিনাকে আজিমপুর গার্লস স্কুলে ভর্তি করা হয়। তিনি আজিমপুর গার্লস স্কুল থেকে ১৯৬৫ সালে মেট্রিক পাস করেন। নাট্যকার আবুল খায়ের শেখ হাসিনা ও শেখ কামালকে পড়াতেন। শেখ হাসিনা ইডেন কলেজ থেকে ১৯৬৭ সালে আইএ পাস করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলায় অনার্সে ভর্তি হন। ১৯৭২ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বিএ পাস করেন।

পুত্র শেখ কামাল মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন এবং প্রধান সেনাপতি জেনারেল এমএজি ওসমানীর এডিসি ছিলেন। লে. কামাল স্বাধীনতার পর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় হতে এমএ ডিগ্রি লাভ করেন। তিনি একজন ক্রীড়াবিদ ছিলেন। তিনি আবাহনী ক্রীড়াচক্র প্রতিষ্ঠা করেন। দ্বিতীয় পুত্র শেখ জামাল সেনাবাহিনীতে যোগ দেন এবং লন্ডনে সেন্ট হার্স্টে সামরিক শিক্ষা গ্রহণ করছিলেন। কন্যা শেখ হাসিনার প্রখ্যাত বিজ্ঞানী ড. মোহাম্মদ ওয়াজেদ মিয়ার সাথে ১৯৬৭ সালের ১৭ নভেম্বর বিয়ে হয়। শেখ হাসিনা ইডেন গার্লস কলেজের ভিপি এবং ড. ওয়াজেদ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফজলুল হক হলের ভিপি ছিলেন।

১৯৭৫ সালের ১৪ জুলাই শেখ কামালের সাথে বিশিষ্ট মহিলা ক্রীড়াবিদ সুলতানা খুকুর বিয়ে হয়। ১৯৭৫ সালের ১৭ জুলাই বঙ্গবন্ধুর ছোট ভগ্নিপতি সাঈদ হোসেনের মেয়ে পারভীন রোজির সাথে শেখ জামালের বিয়ে সম্পন্ন হয়। ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট রাতে একদল সন্ত্রাসী সেনাবাহিনী বঙ্গবন্ধু ও তার পরিবারের সদস্যদের নির্মমভাবে হত্যা করে। ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট শেখ হাসিনা ও রেহানা বিদেশে থাকায় বেঁচে যান। ঘাতকরা ১৫ আগস্ট বঙ্গবন্ধু, তার স্ত্রী ফজিলাতুন্নেসা, ৩ পুত্র– শেখ কামাল, শেখ জামাল, শেখ রাসেল, ছোট ভাই শেখ নাসেরকে নির্মমভাবে হত্যা করে। হত্যা করেছে তার ভাগিনা শেখ ফজলুল হক মনি, ভগ্নিপতি মন্ত্রী আবদুর রব সেরনিয়াবাত ও তার পরিবারের সদস্যদের।

শেখ হাসিনা ১৯৮১ সালে আওয়ামী লীগের সভানেত্রী নির্বাচিত হন। তিনি ১৯৮৬-৮৭ সাল এবং ১৯৯১-৯৫ সাল পর্যন্ত বাংলাদেশ সংসদে বিরোধী দলের নেত্রী ছিলেন। গণতন্ত্র উদ্ধারের সংগ্রামে তিনি কয়েকবার কারাবরণ করেন। ১৯৯৬ সালের ১২ জুনের নির্বাচনে আওয়ামী লীগ জয়লাভ করে এবং শেখ

হাসিনা বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী নিযুক্ত হন। ১৫ আগস্ট হত্যার তদন্ত শুরু হয়। খুনিদের অনেকে গ্রেফতার হয় এবং কয়েকজন বিদেশে পালিয়ে আছে। বিচারে ১৫ জন খুনির ফাঁসির আদেশ হয়।

শেখ মুজিব ১২ বছর কারাবাসকালে ছেলেমেয়ে পিতার স্নেহ থেকে বঞ্চিত ছিলেন। তিনি যখন মুক্ত ছিলেন তখন দলীয় নেতাকর্মী ও সম্মেলন নিয়ে ব্যস্ত থাকতেন। শেখ মুজিবুর রহমানের জীবনে প্রধান অবলম্বন ছিলেন তার স্ত্রী এবং আত্মবিশ্বাস। স্ত্রীকে তিনি গভীরভাবে ভালোবাসতেন। "আকৈশোর গৃহিণী" বেগম মুজিব সংসারের ভরণ-পোষণের দায়িত্ব পালন করতেন। সর্বগুণে গুণান্বিতা ফজিলাতুন্নেসার সাহায্য ও সহযোগিতা না পেলে বঙ্গবন্ধুর পক্ষে রাজনীতি করা সম্ভব হতো না। বেগম মুজিব সারা জীবন অত্যন্ত ধৈর্যের সাথে স্বামীকে বাঙালিদের মুক্তি আন্দোলনে উৎসাহ ও প্রেরণা দিয়েছেন। শেখ মুজিবুর রহমান রাজনীতি নিয়ে নিমগ্ন থাকলেও পরিবারের ভরণ পোষণের দায়িত্ব পালন করতেন। তিনি কয়েক বছর আলফা বীমা কোম্পানী এবং ইস্টার্ন ইন্স্যুরেন্স কোম্পানির উপদেষ্টা হিসেবে কাজ করেন। বীমা ও গ্রামের বাড়ির আয় থেকে পরিবারের ভরণ পোষণ নির্বাহ করতেন। ১৯৬১ সালে বসবাসের জন্য ধানমণ্ডির ৩২ নম্বর সড়কে ভবন নির্মাণ করেন। শেখ মুজিবের রাজনৈতিক সাফল্যের অন্তরালে বেগম মুজিব ও হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর অবদান সবচেয়ে বেশি। শেখ মুজিব দীর্ঘদিন কারাভোগ করেছেন। কিন্তু মুজিব কোনদিন ভেঙ্গে পড়েননি। তিনি ছিলেন সাহসী ও স্বাধীনচেতা। ১৯৬৯ সালে প্রেসিডেন্ট আইয়ুব খান শেখ মুজিবুর রহমানকে প্যারোলে লাহোর বৈঠকে যোগদানের অনুমতি দেন, তখন বেগম মুজিব বলেছিলেন তার স্বামী মুক্ত মানুষ হিসেবে বৈঠকে যোগ দেবেন, প্যারোলে নয়।

ফজিলাতুন্নেসা ছিলেন অত্যন্ত ধৈর্যশীল ও সংবেদনশীল মহিলা। রাজনীতির ক্ষেত্রে স্বামীকে উৎসাহ প্রেরণা দেয়া নারীদের সংখ্যা খুব কম। মিসেস ফজিলাতুন্নেসা ছিলেন এক অনন্য নারী। তার সহযোগিতা ও বাংলাদেশের স্বাধীনতার প্রতি নিবেদিতপ্রাণ না হলে বঙ্গবন্ধুর পক্ষে স্বাধীনতা অর্জন করা সম্ভব হতো না। ওল্ড টেস্টামেন্টে বর্ণিত "A virtuous women is a crown to her husband"- একজন পুণ্যবতী রমণী তার স্বামীর মাথার মুকুট। Behind every greatman there is a women- প্রত্যেক মহৎ ব্যক্তির পিছনে একজন নারী আছেন। স্ত্রী ফজিলাতুন্নেসা ৬ দফা আন্দোলনের সময় দৃঢ়তা, লাহোর গোলটেবিল বৈঠকে প্যারোলে না যেতে দেয়া, ভুট্টোর সাথে ৬ দফা নিয়ে সমঝোতা না করার জন্য তিনি ছিলেন অনমনীয়। বাংলাদেশের স্বাধীনতায় তার

ভূমিকা ছিল অতুলনীয়। তাই জাতি তাঁকে বঙ্গজননীর আসনে বসিয়েছে।

১৯৫৬ সালে শেখ হাসিনাকে টিকাটুলির নারীশিক্ষা মন্দির স্কুলে ভর্তি করে হয়। ১৯৫৮ সালে সামরিক আইনে বন্দী হলে বঙ্গবন্ধুর পরিবার সেগুনবাগিচায় ওঠে। ১৯৬০ সালে ধানমণ্ডি ৩২ নম্বর সড়কে বাসভবনের এক তলা নির্মিত হয় এবং ১৯৬১ সালের ১ অক্টোবর নতুন ভবনে বসবাস শুরু করেন। ১৯৬৬ সালে দোতলা নির্মিত হয়। শেখ মুজিবুর রহমান একজন সফল বীমা ব্যক্তিত্ব ছিলেন। তিনি আলফা ইন্স্যুরেন্স কোম্পানির উপদেষ্টা ছিলেন। জীবন বীমার আয় ও ঋণের টাকা দিয়ে ধানমণ্ডির ৩২ নম্বর সড়কে ভবন নির্মিত হয়। ১৯৭৫ সালের পর দেনার দায়ে ভবনটি নিলামে উঠেছিল।

১৯৬৪ সালের আগস্ট মাসে ধানমণ্ডিস্থ ৩২ নম্বর সড়কের ৬৭৭ নম্বর বাড়িটি নির্মাণের জন্য বেগম ফজিলাতুন্নেসা গৃহনির্মাণ সংস্থা থেকে ৩২ হাজার টাকা ঋণ গ্রহণ করেন এবং ঋণের গ্রান্টার হয়েছিলেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। ১৯৭৫ সাল পর্যন্ত বেগম মুজিব নিয়মিত কিস্তি পরিশোধ করেন। ১৫ আগস্ট নির্মম হত্যাকাণ্ডের পর ঋণের কিস্তি পরিশোধ করা হয়নি। গৃহনির্মাণ সংস্থা যথানিয়মে দৈনিক ইত্তেফাক ও দৈনিক বাংলা পত্রিকায় ১৯৮৩ সালের জুন মাসে অন্যান্য অনেকের বাড়ির সাথে বঙ্গবন্ধুর বাড়িটি নিলামে বিক্রির বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করে। বিজ্ঞপ্তিটি ছিল– "ফজিলাতুন্নেসা, স্বামী শেখ মুজিবুর রহমান, রোড নম্বর ৩২, বাড়ি নম্বর ৬৭৭, ধানমণ্ডি, ঋণ কেসঃ ঢাকা-২১০৪।" বিজ্ঞপ্তিটি দেখে খবর পত্রিকার সম্পাদক মিজানুর রহমান মিজান হাউস বিল্ডিং করপোরেশনের জেনারেল ম্যানেজার সৈয়দ সিদ্দিকুর রহমানকে জানান। গৃহনির্মাণ সংস্থা থেকে বলা হলো, কর্মকর্তাদের অজান্তে বাড়িটি নিলামের তালিকায় উঠেছে। তারা এ ব্যাপারে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করছে।

গৃহনির্মাণ সংস্থার ব্যবস্থাপনা পরিচালক ছিলেন ঢাকার সাবেক ডেপুটি কমিশনার মুক্তিযোদ্ধা কামালউদ্দিন আহমেদ। তিনি ছিলেন বঙ্গবন্ধুর স্নেহসিক্ত। ১৯৮৪ সালের ২৯ ফেব্রুয়ারি বোর্ডের সভায় কামালউদ্দিন আহমেদের উদ্যোগে বঙ্গবন্ধুর পরিবারের নিকট পাওনা ২৪,৪৯৯.৫৮ (চব্বিশ হাজার নিরানব্বই টাকা আটান্ন পয়সা) মওকুফ করে দেয়ার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। ১৯৮৪ সালের ১ মার্চ কামালউদ্দিন আহমেদ অবসর গ্রহণ করেন। তিনি যে সাহসী পদক্ষেপ নিয়েছিলেন এ জন্য জাতি তাঁকে স্মরণ করবে। পরবর্তী এমডি খাজা জহুরুল হক ১৯৮৫ সালের ১৬ সেপ্টেম্বর বঙ্গবন্ধুর বাড়ির দলিল তার জ্যেষ্ঠ কন্যা শেখ হাসিনার নিকট অর্পণ করেন। শেখ হাসিনা নিজে গৃহনির্মাণ সংস্থার অফিসে দলিল গ্রহণ করেন।

শেখ হাসিনা ১৯৬৫ সালে আজিমপুর গালস স্কুল হতে এসএসসি এবং ইডেন গার্লস কলেজ থেকে ১৯৬৭ সালে এইচএসসি পাস করেন। তিনি ইডেন কলেজের ভিপি ছিলেন। তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলায় বিএ অনার্সে ভর্তি হন। ১৯৬৮ সালে তার বিশিষ্ট বিজ্ঞানী ড. ওয়াজেদ মিয়ার সাথে বিয়ে হয়। তখন বঙ্গবন্ধু আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলায় বন্দী ছিলেন। শেখ হাসিনা ১৯৬৬ সালে ৬ দফা ও ১৯৬৯ সালে গণআন্দোলনে যোগ দেন। ১৯৭১ সালের ২৬ মার্চ পাকবাহিনী ধানমণ্ডির ৩২ নম্বর সড়কে বঙ্গবন্ধুর বাসভবন আক্রমণ করে এবং তাঁকে বন্দী করে ৯ মাস পশ্চিম পাকিস্তান জেলে আটক ছিলেন। টুঙ্গিপাড়ায় তার বাস ভবন। যে স্থানে তার জন্ম হয়েছে সে ঘরটি পুড়ে ফেলে। ঘর থেকে তার বৃদ্ধ পিতা ও মাকে বের করে ঘর পুড়ে ফেলে। ১৯৭১ সালে শেখ হাসিনা তার মা, বোন ও ছোট ভাই রাসেল ও স্বামীসহ গৃহবন্দী ছিলেন। বন্দী অবস্থায় তার প্রথম পুত্র জয়ের জন্ম হয়। ১৭ ডিসেম্বর তিনি ও পরিবারের সদস্যগণ মুক্তি পান। ধানমণ্ডির ৩২ নম্বর বাড়িটি বাংলার সকল আন্দোলনের কেন্দ্র ছিল। বঙ্গবন্ধু প্রধানমন্ত্রী ও রাষ্ট্রপতি হয়েও ৩২ নম্বর ধানমণ্ডিতে বাস করতেন। ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট এ বাড়িতে তিনি সপরিবারে নিহত হন। ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট হতে ১৯৮১ সাল পর্যন্ত ভবনটি তালাবদ্ধ ছিল। ১৯৮১ সালের ১২ জুন শেখ হাসিনা ভারপ্রাপ্ত রাষ্ট্রপতি আবদুস সাত্তারের নিকট থেকে ভবনটি বুঝে নেন। এ ভবনে শেখ হাসিনা কয়েকবার বন্দী ছিলেন।

বঙ্গবন্ধুর দু'কন্যা শেখ হাসিনা ও শেখ রেহানা জার্মানিতে থাকায় ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট মৃত্যুর হাত থেকে বেঁচে যান। শেখ হাসিনা তার পুত্র জয়, কন্যা পুতুল, স্বামী ড. ওয়াজেদ মিয়া ও বোন রেহানাকে নিয়ে ১৯৭৫ সালের ২৫ আগস্ট ভারতের রাজধানী দিল্লিতে চলে আসেন এবং ভারতে ৬ বছর নির্বাসিত জীবন যাপন করেন। ড. ওয়াজেদকে ভারতের আণবিক শক্তি কেন্দ্রে ফেলোশিপ প্রদান করা হয়। শেখ হাসিনাকে দিল্লির ইন্ডিয়া গেটের নিকট পান্ডারা সড়কের একটি ফ্ল্যাট বরাদ্দ দেয়া হয়। তাদের পরিচয় গোপন রাখার জন্য নির্দেশ ছিল। তাঁদের বাসভবনে স্বাধীনভাবে চলাফেলা করা যেত না। আর্থিক কষ্টে তাঁদের সংসার চলতো। শেখ হাসিনা প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর সাথে সাক্ষাত করে জানতে পারেন যে, তার পিতা-মাতা, ভাই, আত্মীয়স্বজন নিহত হয়েছেন। ইন্দিরা গান্ধী শেখ হাসিনাকে সান্ত্বনা প্রদান করেন। শেখ রেহানা এসএসসি পরীক্ষার্থী ছিলেন। ১৯৭৬ সালের ২৪ জুলাই ড. শফিক সিদ্দিকীর সাথে শেখ রেহানার লন্ডনে বিয়ে হয়। বিয়ের পর শেখ রেহানা লন্ডনে বাস করতে থাকেন। তিনি একটি লাইব্রেরিতে চাকরি করে সংসার চালাতেন। শেখ হাসিনা পুত্র ও কন্যাকে

দিল্লির স্কুলে ভর্তি করে দেন। বাংলাদেশে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা ও পিতামাতার হত্যার বিচারের দাবিতে তিনি লন্ডনে কয়েকটি সভায় যোগ দেন। ১৯৮১ সালের ১৩-১৫ ফেব্রুয়ারি আওয়ামী লীগের দ্বি-বার্ষিক সম্মেলনে সর্বসম্মতিক্রমে শেখ হাসিনাকে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের সভানেত্রী নির্বাচিত করা হয। ১৯৭৮ সালে আওয়ামী লীগ পুনরুজ্জীবিত হয় এবং আব্দুল মালেক উকিল দলের সভাপতি হন। কিন্তু দলের মধ্যে ঐক্য ফিরে আসেনি। তাই দেশে গণতান্ত্রিক আন্দোলনকে শক্তিশালী করার লক্ষ্যে বাংলাদেশে বঙ্গবন্ধুকন্যা শেখ হাসিনার উপস্থিতি একান্তভাবে কামনা করে। ১৯৮১ সালের ১৭ মে শেখ হাসিনা ভারতে ছ'বছর নির্বাসিত জীবন যাপনের পর স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করেন। প্রায় ১০ লক্ষ মানুষ তাঁকে স্বাগত জানায়। কান্নাজড়িত কণ্ঠে তিনি বঙ্গবন্ধুর স্বপ্ন বাস্তবায়নের অঙ্গীকার করেন। বাংলাদেশে আসার ১৩ দিন পর ১৯৮১ সালের ৩০ মে প্রেসিডেন্ট জেনারেল জিয়াউর রহমান চট্টগ্রাম সার্কিট হাউসে সেনাবাহিনীর হাতে নিহত হন। ১৯৮১ সালের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে আওয়ামী লীগের প্রার্থী হলেন ড. কামাল হোসেন। বিএনপির প্রার্থী হলেন বিচারপতি আব্দুস সাত্তার। নির্বাচনে ব্যাপক কারচুপির মাধ্যমে বিচারপতি সাত্তার প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হন। ১৯৮২ সালের ২৪ মার্চ জেনারেল হুসেইন মুহম্মদ এরশাদ ক্ষমতা দখল করেন। গণতন্ত্র উদ্ধারের জন্য শেখ হাসিনা ১৫ দলীয় ঐক্যজোট গঠন করে আন্দোলন শুরু করেন। ১৯৮৬ সালের সাধারণ নির্বাচনে আওয়ামী লীগের জয় সুনিশ্চিত হয়; কিন্তু জালিয়াতি ও মিডিয়া ক্যুর মাধ্যমে জেনারেল এরশাদের জাতীয় পার্টি জয়লাভ করে। শেখ হাসিনা বিরোধী দলের নেত্রী নির্বাচিত হন। পুনরায় তিনি সকল বিরোধী দল নিয়ে জেনারেল এরশাদের সামরিক সরকারের বিরুদ্ধে প্রবল আন্দোলন গড়ে তোলেন। আওয়ামী লীগের হাজার হাজার কর্মী গ্রেফতার হন। শেখ হাসিনা একাধিকবার গ্রেফতার হয়েছেন। অবশেষে প্রেসিডেন্ট এরশাদ পদত্যাগ করতে বাধ্য হন। ১৯৯১ সালের নির্বাচনে সূক্ষ্ম কারচুপি করে বিএনপি জয়লাভ করে। গণতন্ত্র সেনানিবাস থেকে মুক্ত হলো না। আন্দোলন চলতে থাকে। শেখ হাসিনার প্রধান দাবি নিরপেক্ষ সরকারের অধীনে নির্বাচন অনুষ্ঠান। কেয়ারটেকার সরকার প্রতিষ্ঠার দাবি জনগণের দাবিতে পরিণত হয়। প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়া ১৯৯৬ সালের ৩০ মার্চ পদত্যাগ করতে বাধ্য হন। বিচারপতি হাবিবুর রহমান তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান নিযুক্ত হন। ১৯৯৬ সালের ১২ জুন নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। নির্বাচনে আওয়ামী লীগ একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করে। ১৯৯৬ সালের ২৩ জুন শেখ হাসিনা বাংলাদেশ সরকারের প্রধানমন্ত্রী নিযুক্ত হন। শেখ হাসিনার সরকার ইনডেমনিটি আইন বাতিল করে বঙ্গবন্ধু হত্যার বিচারের

ব্যবস্থা করে এবং শেষ পর্যন্ত খুনীদের ফাঁসির আদেশ হয়। শেখ হাসিনা ও শেখ রেহানা ধানমন্ডির ৩২ নম্বর সড়কের বাসভবন বঙ্গবন্ধু স্মৃতি জাদুঘরকে দান করেছেন। বঙ্গবন্ধু স্মৃতি জাদুঘর এখন জনগণের সম্পদ। শেখ হাসিনা স্বামী ড. ওয়াজেদ মিয়ার ৫ নম্বর ধানমন্ডির সুধা ভবনে বাস করেন। প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্ব গ্রহণ করে তিনি সরকারি ভবনে বাস করছেন। শেখ হাসিনা বঙ্গবন্ধুর স্বপ্ন যমুনা নদীর ওপর বঙ্গবন্ধু সেতুর নির্মাণ কাজ সমাপ্ত করেছেন। শেখ হাসিনার নেতৃত্বে ফারাক্কা পানিচুক্তি ও পার্বত্য চট্টগ্রামে শান্তি চুক্তি সম্পাদিত হয়েছে। বঙ্গবন্ধুর ছবি সকল অফিস, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শোভা পাচ্ছে– স্বাধীনতার ইতিহাস পাঠ্যপুস্তকে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। ফলে বঙ্গবন্ধু সারা বিশ্বে সম্মানিত হয়েছেন।

২০০১ সালে অক্টোবর নির্বাচনে বিএনপি জামায়াত ক্ষমতায় এসে সারাদেশে নির্যাতন চালায়। ২০০৪ সালে ২১ আগস্ট শেখ হাসিনাকে হত্যার উদ্দেশ্যে বঙ্গবন্ধু এভিনিউতে আওয়ামী লীগ সমাবেশে গ্রেনেড হামলা চালিয়ে সন্ত্রাসীরা চব্বিশ জনকে হত্যা করে। শেখ হাসিনা অল্পের জন্য প্রাণে বেঁচে যান। ২০০৭ সালে তত্ত্বাবধায়ক সরকার তাঁকে ১১ মাস কারারুদ্ধ করে রাখে। ২০০৮ সালের ২৯ ডিসেম্বরের নির্বাচনে তিনি জয়লাভ করেন। তিনি ২০০৯ সালের ৬ জানুয়ারি দ্বিতীয় বার দেশের প্রধানমন্ত্রী নিযুক্ত হন।

শেখ হাসিনার স্বামী বিখ্যাত পরমাণু বিজ্ঞানী ড. ওয়াজেদ মিয়া ২০০৯ সালের ৯ মে মৃত্যুবরণ করেন। তাদের পুত্র সজীব ওয়াজেদ জয় এবং কন্যা সায়মা ওয়াজেদ পুতুল। সজীব ওয়াজেদ একজন কম্পিউটার প্রকৌশলী আমেরিকায় কর্মরত। ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ায় তিনি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছেন। তার স্ত্রী ক্রিস্টিনা একজন আইনজীবী। সায়মা ওয়াজেদ একজন বিশিষ্ট মনোবিজ্ঞানী– অটিজম– বুদ্ধি প্রতিবন্ধী আন্দোলনে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে নেতৃত্ব দিচ্ছেন। তিনি স্বামীর সাথে কানাডায় বাস করেন।

অধ্যায় ৩৬

বঙ্গবন্ধুর চরিত্র ও কৃতিত্ব

শেখ মুজিবুর রহমান বাংলার ইতিহাসে প্রবাদ পুরুষ। মুজিব একটি জাদুশক্তি। মুজিব ভুবনমোহিনী নাম। Mujib is a magic word, Mujib is a miracle name. মুজিব আজ তার যে ব্যক্তিত্বের জন্য বিশ্বের দরবারে সুপ্রতিষ্ঠিত তাহলো একজন জাতীয়তাবাদী নেতা হিসেবে, তার আন্তর্জাতিক খ্যাতি, লাঞ্ছিত-বঞ্চিত মানবতার মুক্তির জন্য তার সংগ্রামও বিপ্লবী ভূমিকা। এমন বিশ্বজোড়া খ্যাতি পৃথিবীর মাত্র কয়েকজন রাজনীতিবিদের জীবনে অর্জিত হয়েছে।

লন্ডনের গার্ডিয়ান পত্রিকা বঙ্গবন্ধুকে বাংলার মুকুটহীন সম্রাট বলেছে। যুদ্ধসঙ্কটে জর্জরিত ইংল্যান্ডবাসীর কাছে স্যার উইলিয়াম চার্চিল, ফরাসিদের কাছে দ্য গলে, ইন্দোনেশিয়ার কাছে সুকর্ন, কিউবার কাছে ক্যাস্ট্রো যেমন, তেমনি বাংলার শোষিত জনগণের কাছে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। বাংলাদেশের পটভূমিকায় শেখ মুজিব বাংলাদেশের মানুষের সমষ্টি। তিনি এ দেশের মুক্তির উজ্জ্বল প্রতীক। তার জীবন একটি আদর্শ– সত্য, ন্যায় সংগ্রামের অগ্নিশিখা– যা যুগ যুগ ধরে বাঙালি জাতিকে পথ প্রদর্শন করবে।

শেখ মুজিব সাধারণ বাঙালির চেয়ে লম্বা ছিলেন। তার উচ্চতা ছিল ৫ ফুট ১১ ইঞ্চি। তার মাথায় ছিল ধূসর রঙের চুল, ঘন গোঁফ এবং তীক্ষ্ণ কান-চোখ।

শেখ মুজিব ব্যক্তিস্বার্থের ঊর্ধ্বে দাঁড়িয়ে বাংলার মানুষের কল্যাণে সেবা করে গেছেন। তিনি জাতীয় নেতা হতে আন্তর্জাতিক মর্যাদা লাভ করেন।

শেখ মুজিবের সংগ্রামী জীবনকে জোসেফ স্টালিন, সানইয়াত সেন, ভিয়েতনামের হো চি মিনের সাথে তুলনা করা চলে। তুলনা করা চলে কঙ্গোর লৌহমানব লুবুম্বা, কেনিয়ার জোমো কেনিয়াত্তা, কিউবার ফিদেল ক্যাস্ট্রো, দক্ষিণ আফ্রিকার নেলসন ম্যান্ডেলা এবং আলজেরিয়ার বেনবেল্লার সাথে। শেখ মুজিব একমাত্র বাঙালি জাতির পিতা নন। তিনি ছিলেন বিশ্বের শান্তিকামী মানুষের চেতনার মূর্তপ্রতীক। বাংলাদেশের স্থপতি শেখ মুজিবের সমগ্র জীবন

ঘিরে ছিলেন হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী। তিনি মহাত্মা গান্ধীর অনুসারী ছিলেন। সোহরাওয়ার্দীর আশীর্বাদে শেখ মুজিব বাঙালিদের মুকুটহীন রাজা থেকে বঙ্গবন্ধু হলেন।

শেখ মুজিবের ব্যক্তিচরিত্রের একটি প্রধান গুণ হলো তিনি অন্যায়কে কখনো প্রশ্রয় দেননি। তিনি নীতির প্রশ্নে কখনও আপোস করেননি। এ কারণে তিনি বাংলার অনেক নেতার সঙ্গে দ্বিমত পোষণ করে ৬ দফার প্রশ্নে অটল রয়েছেন। শত প্রলোভন সত্ত্বেও তিনি আইয়ুব-ইয়াহিয়া খানের কাছে নতি স্বীকার করেননি বা বাংলার স্বার্থ বিলিয়ে দেননি।

তার ব্যক্তি চরিত্রে ছিল বিদ্রোহী সত্তা। তার মতো বিদ্রোহী বাঙালি এ ভূখণ্ডে জন্মগ্রহণ করেননি।

মানুষের প্রতি ছিল তার সীমাহীন বিশ্বাস। তিনি মহৎ গুণের অধিকারী ছিলেন। তিনি চেয়েছিলেন বাংলাদেশে একটি উদার সমাজতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থা গড়ে তুলতে।

তিনি ছিলেন কোমল হৃদয়ের মানুষ। তিনি ছিলেন পরিচ্ছন্ন ও সরল মনের অধিকারী। তার হৃদয় ছিল দুর্জয় সাহসী। গভীর আত্মবিশ্বাস ও বিরাট ব্যক্তিত্ব ছিল তার চরিত্রের মহান স্তম্ভ। বঙ্গবন্ধু ব্যক্তিজীবনে একজন ভদ্র, নম্র, স্নেহময় ও সদালাপী ব্যক্তি ছিলেন। সারা জীবন তিনি পিতামাতা গুরুজনদের ভক্তি শ্রদ্ধা করতেন। তিনি দয়ালু স্বভাবের ছিলেন। তিনি রূপসী বাংলার মুখ। তিনি ছিলেন মানবতাবাদী এবং বিশ্বের শান্তিকামী মানুষের চেতনার প্রতীক।

তিনি শিশুদের ভালবাসতেন। কবি-সাহিত্যিকদের ভালবাসতেন। ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধকালে তিনি সাত কোটি বাঙালির হৃদয়ে জাগ্রত ছিলেন। তার নেতৃত্বে বাংলাদেশ স্বাধীন হয়েছে। তিনি বাঙালি জাতির ত্রাণকর্তা। আমেরিকার ইতিহাসবিদ স্ট্যানলি অলপার্ট শেখ মুজিবকে বলেছেন, The Nation Saviour Hiro of Bangladesh বাংলাদেশের জাতির রক্ষাকারী বীর।

জাতির জনক

শেখ মুজিবুর রহমান বাংলাদেশের স্থাপতি। তিনি বাংলার মানুষকে ঐক্যবদ্ধ করে বাঙালি জাতীয়তাবাদ সুদৃঢ় করেন। বাঙালি জাতীয়তাবাদের ভিত্তিতে তিনি স্বাধীন বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি বাঙালি জাতির জনক।

স্বাধীন বাংলাদেশের মূল নীতি হলো গণতন্ত্র। ১৯৪৮ সালের ভাষা আন্দোলন, ১৯৫২ সালে রাষ্ট্রভাষা আন্দোলন, ১৯৫৪ সালে যুক্তফ্রন্টের নির্বাচন, ১৯৬৬ সালের ৬ দফা আন্দোলন, ১৯৬৯ সালের আগরতলা ষড়যন্ত্র

মামলা, গণঅভ্যুত্থান, ১৯৭০ সালের নির্বাচনে আওয়ামী লীগের বিজয় পেরিয়ে ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধ। ৯ মাস যুদ্ধের পর ১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর পাকবাহিনীর আত্মসমর্পণ ও স্বাধীন বাংলাদেশের আত্মপ্রকাশ।

বাংলাদেশের অপর নাম বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ভাষায় বলতে হয়, 'মুজিব তুমি সুরের আগুন ছড়িয়ে দিলে সবখানে।' এবং 'আমি তোমাদেরই লোক'। বঙ্গবন্ধু চিরঞ্জীব। তার মৃত্যু হয়নি। তিনি মরতে পারেন না।

"যতদিন রবে পদ্মা মেঘনা গৌরী যমুনা বহমান
ততদিন রবে কীর্তি তোমার শেখ মুজিবুর রহমান"

–অন্নদা শংকর রায়

ইতিহাসের মূল লক্ষ্য– একটি সমাজ ও জাতি। কিন্তু কোনো সমাজে এমন একজন ব্যক্তির আবির্ভাব ঘটে যার কার্যকলাপ সে সমাজ ও জাতিকে নবজন্ম দেয়। তবে যে কোনো ব্যক্তির ব্যক্তিত্বও একটি সমাজে প্রতিবিম্বিত হয়। সমাজে ব্যথা-বেদনা ও আশা-আকাঙ্ক্ষা তার ব্যক্তিত্বে লালিত হয় বলে তিনি সমাজের প্রতিভূ। বাংলার ইতিহাস ও শেখ মুজিব অবিচ্ছিন্ন সত্তা। এ কথা সত্য যে, কোনো নেতা এককভাবে একটি জাতি বা দেশ গড়তে পারে না। তার পিছনে শত শত নেতা, হাজার হাজার কর্মী, লক্ষ কোটি জনতার অবদান থাকে। তেমনি বাঙালি জাতির জনক শেখ মুজিবুর রহমান হলেও তার সাথে রয়েছে আমাদের বহু নেতা, কবি, সাহিত্যিক, মুক্তিযোদ্ধা ও বুদ্ধিজীবী। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে যখন জাতির জনক বলা হয় তখন স্বাধীনতা সংগ্রামে উৎসর্গীকৃত সকল রাজনৈতিক দল, নেতা, কর্মী, মুক্তিযোদ্ধা ও ৩০ লাখ শহীদ ও তিন লাখ নির্যাতিত মা-বোনের অবদানের কথাও শ্রদ্ধার সাথে স্বীকার করি। তাদের অবদানের ফলেই শেখ মুজিবুর রহমান বাঙালি জাতির মুক্তি সংগ্রামে জয়ী হয়েছেন। শেখ মুজিবুর রহমানের ব্যক্তিচরিত্র একটি অখণ্ড সংগ্রামের ইতিহাস। তার রাজনৈতিক জীবন, ব্যক্তিগত জীবন ও ধারাবাহিক জীবন ছিল একটি দর্শন।

স্বাধীন বাংলাদেশ গড়ার পিছনে রয়েছে বঙ্গবন্ধুর ১৯৪৭ সাল থেকে অবিরাম সংগ্রাম। তার সংগ্রামের মাধ্যম ছিল ১৯৪৮ সালে গঠিত ছাত্রলীগ এবং ১৯৪৯ সালে গঠিত আওয়ামী লীগ। তার রাজনৈতিক গুরু ছিলেন হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী ও মওলানা আব্দুল হামিদ খান ভাসানী। ১৯৪৮ ও ১৯৫২ সালে ভাষা আন্দোলনের ফলে বাঙালি জাতি সংগঠিত হতে থাকে। ১৯৫৪ সালে ২১ দফার ভিত্তিতে সাধারণ নির্বাচনে যুক্তফ্রন্টের বিজয় বাঙালি

জাতীয়তাবাদের বিজয়ের সূচনা করে। ১৯৫৪ সালের ৩ এপ্রিল শেরে বাংলা এ কে ফজলুল হকের নেতৃত্বে যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রিসভা গঠন করা হয়। শেখ মুজিবুর রহমান হক মন্ত্রিসভার সদস্য ছিলেন। ১৯৫৬ সালের ৬ সেপ্টেম্বর আওয়ামী লীগের প্রাদেশিক মন্ত্রিসভায় তিনি শিল্প-বাণিজ্য ও দুর্নীতি দমন বিভাগের মন্ত্রী ছিলেন। কেন্দ্রে আওয়ামী লীগ সভাপতি হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী ১৯৫৬ সালে ১২ সেপ্টেম্বর প্রধানমন্ত্রী নিযুক্ত হন। কেন্দ্রে ও পূর্ব বাংলায় আওয়ামী লীগ মন্ত্রিসভার নেতৃত্বে পূর্বাঞ্চল উন্নয়নে এগিয়ে যায়। সেনাবাহিনী, কেন্দ্রীয় চাকরি, শিল্প ও বাণিজ্য ক্ষেত্রে দু'অঞ্চলের মধ্যে সংখ্যাসাম্য নীতির আলোকে বৈষম্য দূর করার জন্য উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়।

যুক্তফ্রন্ট ও আওয়ামী লীগ মন্ত্রিসভা বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা, ২১ ফেব্রুয়ারি ও পহেলা বৈশাখ ছুটি দিবস এবং মুখ্যমন্ত্রীর বাসভবনকে বাংলা একাডেমী ঘোষণা করে। এ সময় শহীদ মিনার নির্মাণ করা হয়। ১৯৫৫ সালের শাসনতন্ত্র প্রণয়নকালে গণপরিষদে শেখ মুজিবুর রহমান পূর্ব পাকিস্তানের নাম পূর্ব বাংলা রাখার প্রস্তাব করেন। ১৯৫৬ সালে গৃহীত শাসনতন্ত্রে স্বায়ত্তশাসনের অঙ্গীকার না থাকায় শেখ মুজিব শাসনতন্ত্রের বিরোধিতা করেছিলেন। ১৯৫৬ সালে পশ্চিম পাকিস্তানের সকল প্রদেশ নিয়ে এক ইউনিট গঠন ও বাংলাকে পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষা হিসেবে গৃহীত হয়। উভয় অঞ্চলে বৈষম্য দূর করার জন্য শাসনতন্ত্রে সংখ্যাসাম্য নীতি গ্রহণ করা হয়। পাকিস্তানের ৮ বছরের শাসনকালে প্রথমবার আংশিক হলেও পূর্ব বাংলার দাবি স্বীকৃতি পায়। সংখ্যাসাম্য নীতির ভিত্তিতে পাকিস্তান সেনাবাহিনীর বাঙালিদের সংখ্যা বৃদ্ধি পায় এবং কেন্দ্রীয় চাকরিতে পূর্ব পাকিস্তান অনেক আসন লাভ করে। পূর্ব পাকিস্তানের প্রতি বৈষম্য দূরীকরণে ও অর্থনৈতিক উন্নয়নে শেরে বাংলা এ কে ফজলুল হক, হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর সাথে শেখ মুজিবও নেতৃত্ব দিয়েছেন। প্রধানমন্ত্রী হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর অন্যতম অবদান পাকিস্তানে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা। প্রকৃত গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার জন্য তিনি পাকিস্তানে হিন্দু-মুসলমানের পৃথক নির্বাচনের স্থলে যুক্ত নির্বাচনপ্রথা প্রবর্তন করেন। ১৯২১ সাল থেকে ১৯৫৬ সাল পর্যন্ত পাকিস্তানে পৃথক নির্বাচনপ্রথা চালু ছিল। শহীদ সোহরাওয়ার্দী জাতীয় ঐক্য প্রতিষ্ঠার জন্য জাতীয় পরিষদে যুক্ত নির্বাচন পদ্ধতির অনুমোদন লাভ করেন। পশ্চিম পাকিস্তানে এক ইউনিট প্রতিষ্ঠা করে তিনি লাহোর প্রস্তাবের ভিত্তিতে পূর্বাঞ্চলে স্বায়ত্তশাসনের দাবি সুপ্রতিষ্ঠিত করেন। ১৯৫৭ সালে শেখ মুজিবুর রহমান এবং মহিউদ্দীন আহমেদ পূর্ব পাকিস্তান আইনসভায় স্বায়ত্তশাসনের প্রস্তাব পেশ করেন এবং তা প্রাদেশিক

আইন সভায় অনুমোদন লাভ করে।

জেমস নোভাক বঙ্গবন্ধুর রাজনৈতিক সাফল্য আলোচনা করতে যেয়ে লিখেছেন–

"Thus all those factors- a tremendous desire for social change, a hunger for identity and resentment against the Pakistan Government and the Beharis- rumbled beneath the surface of East Pakistan. Meanwhile the central government, more than a thousand miles away, across India, failed to sense the depth of the unrest. The outcome was inevitable. a new political movement had to emerge.

Form the passing of Suhrawardy until his own death, however, the man of the era of the rising against Pakistan undoubtedly was Sheikh Mujib the heir to Hoq- Suhrawardy and Abul Hashim. Emotinoally and unconsciously, for he was not a regorous intellectual. Mujib sometimes seemed to be a Bengali rather than a Bangladeshi nationalist, as the latter ultimately came to mean. Muslim Bengal alone... Moreover, he represented a nationalist, socialist and secularist tradition that traced back to Bose. Basically he was an intuitive force, one whose personality and action inspired the pit of the Bangladesh mind. His desire for independence radiated as much from the people as it did from his own intellectual outlook. He proved to be a vessel through which the people's desires were to flow."

এ সকল কারণে সমাজ পরিবর্তনের একটি প্রচণ্ড আকাঙ্ক্ষা, জাতীয় পরিচিতির জন্য তীব্র বাসনা, পাকিস্তান সরকার ও বিহারীদের বিরুদ্ধে তীব্র ক্ষোভ পূর্ব পাকিস্তানের সর্বত্র আলোড়ন সৃষ্টি করে। ভারতের ভিতর দিয়ে এক হাজার মাইল দূরে অবস্থিত কেন্দ্রীয় সরকার অশান্ত পরিস্থিতির গভীরতা উপলব্ধি করতে ব্যর্থ হয়। পরিণতি অবশ্যম্ভাবী হয়ে পড়ে। একটি নতুন রাজনৈতিক আন্দোলন শুরু হয়ে যায়।

নিঃসন্দেহে সোহরাওয়ার্দীর অন্তর্ধানের পর হতে তার (মুজিব) নিজের মৃত্যু পর্যন্ত পাকিস্তানের বিরুদ্ধে আন্দোলন যুগের ব্যক্তি ছিলেন শেখ মুজিব। তিনি ছিলেন হক, সোহরাওয়ার্দী ও হাশেমের উত্তরসূরি। আবেগে অচেতনভাবে তিনি কখনও একনিষ্ঠ বুদ্ধিজীবী ছিলেন না। অনেক সময় মুজিব বাংলাদেশী

জাতীয়তাবাদী থেকে বাঙালি ছিলেন; কারণ বাংলাদেশ বলতে মুসলিম বাংলা বোঝায়। অধিকন্তু তিনি ছিলেন জাতীয়তাবাদী, সমাজতান্ত্রিক ও ধর্ম নিরপেক্ষতার প্রতিনিধি। এদিক দিয়ে সুভাষ চন্দ্র বসুর সাথে তার মিল রয়েছে। মূলত তিনি ছিলেন স্বভাবজাত শক্তি, তার ব্যক্তিত্ব এবং কর্মসূচি বাঙালির মনকে প্রভাবিত করে। তার স্বাধীনতার স্পৃহা যেমন তার নিজের বুদ্ধিদীপ্ত দৃষ্টি তেমনি জনগণ থেকে উৎসারিত হয়েছে। তিনি নিজকে প্রমাণ করলেন যে, তিনি জনগণের আশা-আকাঙ্ক্ষা প্রবাহিত হওয়ার নৌকা।

বাঙালি জাতীয়তা আন্দোলনে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের অবদানের মূল্যায়ন করে জেমস নোভাক লিখেছেন–

"What is remarkable about the rise of Bengali Nationalism is that Muslim feeling declined and Islam ultimately was put on the defensive. This change had been implicit in the founding of the Awami League, a party that while never anti-Muslim. had not countenanced communalism...."

"As for the Sheikh, hard work shaped his style, Indefatigable, he visited district and subdistrict towns, walked across fields from village to village, and mingled with the people, sharing their tea, rice, dal and salt, remembering names, praying at mosques, sweating in fields, visiting flood sites, weeping at funerals and milads, services for the dead, intellectually lazy, he empathized mightily, intuited sympatheticaly and reached our and touched-not golf chubs and club chairs but the peoples sweaty and grimy hands.. By ever returning to the hustings, he impibed the people's feelings and aspiration, so that when away among from them he could gauge with superhuman accuracy their reactions to events. He knew what they belived because he could explain things not only in terms they could understand but also in ones they respected. Knowing that, they believed he did not need to lie. They spoke to him honestly, as he spoke to them."

"Meanwhile the Sheikh, who had grown to political maturity in the age of Bose, unconsciously preached the doctrine of that great Bengali's nationalism. The two differed only in that Bose

always was an aristocrat, whereas Mujib spoke the language of the people . Still, both apealed to the deeper wells of Bengali nationalism that go beyond communalism to a sense of brotherhood in race, tribe and language. Thus it was that Hindus and Muslims worked together in the Awami League under the guise of secularism and socialism, but more deeply as blood brothers.

Mujib's Awami Leage differed from the Congress party model Suhrawardy had created. For the Sheikh the party become more like the Bengal party under Boses leadership, whereas under Suhrawardy it had imitated the more open generous party of Nehru. Thus Nehru and Bose represented two strands in the Bengal Politics of the 1930's while Suhrawardy and Mujib represented those same strand in the 1950's and 1960's in East Pakistan."

বাঙালি জাতীয়তাবাদের জাগরণের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো মুসলমানী চেতনার পতন এবং পরিশেষে ইসলাম ধর্ম সীমিত হয়ে পড়ে। এ পরিবর্তন আওয়ামী লীগের প্রতিষ্ঠার মধ্যে লক্ষণীয় ছিল। আওয়ামী লীগ কখনও মুসলমানবিরোধী ছিল না এবং সাম্প্রদায়িকতাকে উৎসাহিত করেনি...।

কঠোর পরিশ্রম শেখ মুজিবের জীবনধারা গঠন করেছে। ক্লান্তিহীনভাবে তিনি জেলা, মহকুমা শহর ভ্রমণ করেছেন। মাঠ পেরিয়ে তিনি এক গ্রাম থেকে আর এক গ্রামে ঘুরেছেন, জনগণের সাথে মিশেছেন। তাদের সাথে ভাত, চা, ডাল, লবণ খেয়েছেন। তাদের নামসমূহ স্মরণ রাখতে পারতেন। মসজিদে নামাজ পড়েছেন। মাঠে ঘর্মাক্ত হয়েছেন। বন্যাপ্লাবিত এলাকা পরিদর্শন করেছেন। মৃত ব্যক্তিদের জানাজা ও মিলাদে কেঁদেছেন। বুদ্ধিজীবী হিসেবে অলস, তিনি অন্যের আবেগে অভিভূত হতেন, আদর করে ডাকতেন, তিনি গলফ ক্লাব বা ক্লাবের চেয়ারে হাত বাড়িয়ে দিতেন না; তিনি মানুষের ঘর্মাক্ত শক্ত হাত স্পর্শ করতেন। জনসভায় তিনি জনগণের অনুভূতি ও আশা-আকাঙ্ক্ষা উদ্বুদ্ধ করতেন। সুতরাং তাদের কাছ থেকে দূরে থাকাকালে তিনি অতি মানবীয় দৃষ্টিশক্তি দিয়ে প্রত্যেকটি ঘটনায় জনগণের প্রতিক্রিয়া বুঝতে পারতেন। তিনি জানতেন জনগণ তাকে বিশ্বাস করে, কারণ তিনি তাদের কথা বুঝাতে পারেন এ কারণেই নয়, তারা যা সম্মান করতেন তার তিনি ব্যাখ্যা করতেন। তারা জানত যে, তার মিথ্যা বলার প্রয়োজন নেই। তিনি জনগণের সাথে যখন কথা বলতেন, তারাও তার সাথে আন্তরিকতার সাথে কথা বলতেন।

ইতোমধ্যে শেখ মুজিব সুভাষ বসুর রাজনৈতিক পরিপক্বতা লাভ করেন। অবচেতনভাবে তিনি সেই মহান বাঙালি জাতীয়তাবাদ প্রচার শুরু করেন। দুজনের মধ্যে মাত্র এক বিষয়ে পার্থক্য ছিল, তা হলো সুভাষ বসু সর্বদা অভিজাত ছিলেন, অন্যদিকে মুজিব জনগণের ভাষায় কথা বলতেন। তবুও উভয়ই বাঙালি জাতীয়তাবাদের গভীরে প্রবেশ করে জনগণকে উদ্বুদ্ধ করেছিলেন। এ জাতীয়তাবাদ সাম্প্রদায়িকতার ঊর্ধ্বে উঠে গোত্র, বর্ণ ও ভাষা নির্বিশেষে ভ্রাতৃত্বের বন্ধন সৃষ্টি করে। এভাবে এ সকল হিন্দু ও মুসলমান যারা ধর্মনিরপেক্ষতার এবং সমাজতন্ত্রের ছদ্মবেশে থেকে আওয়ামী লীগে একত্রে কাজ করেছে, কিন্তু তার চেয়ে গভীরভাবে রক্তের ভাই হিসেবে কাজ করেছে।

মুজিবের আওয়ামী লীগ সোহরাওয়ার্দীর কংগ্রেসের আদর্শে গঠিত আওয়ামী লীগ থেকে ভিন্ন ছিল। বসুর নেতৃত্বে বাংলা পার্টির ন্যায় শেখের দল গড়ে ওঠে।

অন্যদিকে সোহরাওয়ার্দীর অধীনে আওয়ামী লীগ নেহরুর উন্মুক্ত ও উদার কংগ্রেসকে অনুকরণ করেছিল। এভাবে নেহরু এবং বসু ১৯৩০-এর দশকে বাংলার রাজনীতিতে দুটি ধারার প্রতিনিধিত্ব করেছিলেন। একইভাবে সোহরাওয়ার্দী ও মুজিব পূর্ব পাকিস্তানে পঞ্চাশ এবং ষাটের দশকে একই সময় প্রতিনিধিত্ব করেন।

ভারতের বিশিষ্ট সাংবাদিক শঙ্কর ঘোষ তার 'হস্তান্তর' গ্রন্থে শেখ মুজিব ও বাংলাদেশ সৃষ্টি সম্পর্কে বলেছেন, "পূর্ব পাকিস্তানের নতুন নেতা (শেখ মুজিব) কিন্তু রাজনীতিতে ভুট্টোর মতো নবাগত ছিলেন না। বঙ্গ বিভাগের আগেই এই কলকাতায় তার রাজনীতিতে হাতেখড়ি হয়েছিল। ইসলামিয়া (বর্তমান মাওলানা আবুল কালাম আজাদ) কলেজের ছাত্র শেখ মুজিবুর রহমান মুসলিম লীগ ছাত্র সংগঠনের নেতা ছিলেন। তখন থেকে তিনি সুরাবর্দ্দির (সোহরাওয়ার্দী) অনুগামী। সুরাবর্দ্দিকে অনুসরণ করে পূর্ব পাকিস্তানে তিনি লীগ বিরোধী আন্দোলনে শামিল হন এবং পরবর্তীকালে আওয়ামী লীগের অপ্রতিদ্বন্দ্বী নেতা হন। এই শতকের (বিশ শতক) প্রথমার্ধে এই উপমহাদেশের সবচেয়ে বড় রাজনৈতিক-ভৌগোলিক ঘটনা যদি হয় দেশ বিভাগ ও ভারত এবং পাকিস্তান নামে দুটি স্বাধীন রাষ্ট্রের জন্ম; তাহলে এই শতকের (বিশ) দ্বিতীয়ার্ধে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ঘটনা পাকিস্তানের বিভক্তি এবং এই উপমহাদেশের তৃতীয় একটি স্বাধীন রাষ্ট্রের আবির্ভাব। সেই রাষ্ট্রের স্রষ্টা শেখ মুজিবুর রহমান।

মুজিব তার প্রজাতন্ত্রকে চারটি স্তম্ভের ওপর দাঁড় করিয়েছিলেন–

জাতীয়তা, সমাজতন্ত্র, ধর্মনিরপেক্ষতা ও গণতন্ত্র। ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট যে আন্তর্জাতিক চক্রান্ত মুজিবকে হত্যা করেছিল, তার উদ্দেশ ছিল বাংলাদেশকে ধর্মনিরপেক্ষতার আদর্শ থেকে বিচ্যুত করা।

এখন মনে হয় গান্ধীজি সুরাবর্দ্ধিকে তার কাছে টেনে নিয়েছিলেন এবং জীবনের শেষ বছর দেড়েক যে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি প্রতিষ্ঠিত হয় তিনি আত্মনিয়োগ করেছিলেন। তার একটি বিশেষ সঙ্কটকালে তিনি সুরাবর্দ্ধিকে তার সহযোগী হিসেবে বেছে নিয়েছিলে বলেই সুরাবর্দ্ধি পাকিস্তানে সাম্প্রদায়িকতা বিরোধী রাজনীতিতে নেতৃত্ব দিতে পেরেছিলেন। তার সেই নয়া রাজনীতি বোধেরই পরিণাম মুজিবুর রহমানের প্রতিষ্ঠিত ধর্ম নিরপেক্ষ বাংলাদেশ। আমরা সুরাবর্দ্ধিকে তার প্রাপ্য দিইনি। এমনকি মাউন্টব্যাটেন যখন গান্ধীজিকে ওয়ান ম্যান বাউন্ডারি ফোর্স বলে অভিনন্দন জানিয়েছিলেন, তখন তার সহকারী হিসেবে যে সুরাবর্দ্ধির উল্লেখ করেছিল, তা যেন ভুলে যেতে চেয়েছি।"

১৯৫৮ সালের অক্টোবরে পাকিস্তানে সামরিক শাসন জারি হয়। দীর্ঘ দশ বছর শেখ মুজিবুর রহমান আইয়ুব খানের সামরিক শাসনের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করেছেন। তার নেতৃত্বে ৬ দফা আন্দোলন ও সশস্ত্র বিপ্লবের পরিচালিত হয়। ৬ দফা ও আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার ফলে ঊনসত্তরের গণআন্দোলন শুরু হয়। ১৯৬৯ সালে গণআন্দোলনের ফলে আইয়ুব খানের সামরিক শাসনের অবসান ঘটে। ১৯৭০ সালে সাধারণ নির্বাচনে জাতীয় পরিষদে আওয়ামী লীগ পূর্ব বাংলায় ২টি আসন বাদে সকল আসনে জয়লাভ করে। নির্বাচনে জাতীয় পরিষদ ও প্রাদেশিক পরিষদে জয়লাভ করে শেখ মুজিব পাকিস্তানের অবিসংবাদিত নেতার আসনে সমাসীন হন। কিন্তু জেনারেল ইয়াহিয়া খান জনপ্রতিনিধির হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর না করে ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ বাঙালিদের ওপর আক্রমণ চালায় এবং হাজার হাজার লোক হত্যা করে। শেখ মুজিবুর রহমানকে গ্রেফতার করে পশ্চিম পাকিস্তানে নিয়ে যায়। ১৯৭১ সালের ১০ এপ্রিল শেখ মুজিবুর রহমানকে রাষ্ট্রপতি করে মুজিব নগরে স্বাধীন বাংলাদেশ সরকার গঠিত হয়। রাষ্ট্রপতি শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে পাকিস্তান সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে ৯ মাসব্যাপী যুদ্ধ চলে এবং ৩০ লাখ শহীদের প্রাণের বিনিময়ে ১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর বাংলাদেশ বিজয়লাভ করে। স্বাধীনতা সম্পর্কে বলা হয়, "If blood is the price of a people's right to independence, Bangladesh overpaid"– যদি রক্তই হয় জনগণের স্বাধীনতা লাভের মূল্য, তাহলে বাংলাদেশ অধিক মূল্য দিয়েছে।

১৯৭২ সালের ১০ জানুয়ারি শেখ মুজিব পাকিস্তানের কারাগারে মৃত্যুর হাত থেকে মুক্তি পেয়ে বাংলাদেশে ফিরে আসেন এবং দেশ শাসনের দায়িত্বভার গ্রহণ করেন। বঙ্গবন্ধুর বাংলাদেশে প্রত্যাবর্তন ও রাষ্ট্র পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণের মাধ্যমে বাংলাদেশ রাষ্ট্র হিসেবে ও জাতি হিসেবে পূর্ণতা লাভ করে। বাঙালি জাতির তিন হাজার বছরের ইতিহাসে সর্বশ্রেষ্ঠ সন্তান বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বাঙালি জাতির জনকের কৃতিত্বের একক অধিকারী। অতীতে রাজা শশাংক, গোপাল, ধর্মপাল, শামসুদ্দিন ইলিয়াস শাহ, বারভূঁইয়া, শেরেবাংলা এ কে ফজলুল হক, হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী, শরৎচন্দ্র বসু, আবুল হাশিম বাংলার ভূখণ্ডকে ঐক্যবদ্ধ করে একটি স্বাধীন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করেছিলেন; কিন্তু তারা তাদের সংগ্রামে সফল হননি। হাজার বছরের ইতিহাসের সংগ্রামে বিজয়লাভ করেছেন একমাত্র বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান।

বাংলাদেশে ফিরে বঙ্গবন্ধু যুদ্ধবিধ্বস্ত বাংলাদেশকে পুনর্গঠনের কর্মসূচি গ্রহণ করেন। তিনি বিশ্বাস করতেন দেশ গঠনের জন্য একটি দক্ষ মন্ত্রিসভা প্রয়োজন। সে কারণে তিনি ত্যাগী ও দেশপ্রেমিক নেতাদের নিয়ে মন্ত্রিসভা গঠন করেন। মন্ত্রিসভার প্রথম বৈঠকেই জাতীয় পতাকা, জাতীয় সঙ্গীত গ্রহণ করে। যুদ্ধকালে এক কোটি মানুষ ভারতে আশ্রয় নিয়েছিল। বঙ্গবন্ধুর সরকার এক কোটি মানুষের পুনর্বাসন, ৩০ লক্ষ শহীদ পরিবার এবং তিন লক্ষ নির্যাতিত মা-বোনের পুনর্বাসনেও বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ করে। বঙ্গবন্ধু প্রত্যেক শহীদ পরিবারকে নগদ অর্থ ও নিজ স্বাক্ষরে সহানুভূতি জানিয়ে পত্র প্রেরণ করেন। যুদ্ধবিধ্বস্ত সড়ক, পুল, বিদ্যুৎ কেন্দ্র, টেলিফোন এক্সচেঞ্জ পুনর্নির্মাণ করেন। পাকবাহিনী কর্তৃক ধ্বংসপ্রাপ্ত ভৈরব ও হার্ডিঞ্জ ব্রিজ স্বল্প সময়ের মধ্যে পুনর্নির্মাণ করা হয়। ৪৬৭টি সেতু নির্মাণ ও মেরামত, ৭টি ফেরি, ১৮৫১টি রেলওয়ে ওয়াগন, ৬০৫টি স্টেশন ও ৩টি পুরনো বিমান চালু করে অভ্যন্তরীণ যোগাযোগ ব্যবস্থা চালু করেন। ক্ষতিগ্রস্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, অফিস, শিল্প প্রতিষ্ঠান পুনরায় চালু করা হয়। পরিত্যক্ত শিল্প প্রতিষ্ঠানের ভার সরকার নিজ হাতে গ্রহণ করে। ভারী শিল্প-কলকারখানা, ব্যাংক, বীমা জাতীয়করণ করা হয়। পাকসেনারা আত্মসমর্পণের পূর্বে ব্যাংক নোট জালিয়ে দিয়ে যায়। নতুন সরকার ভারতের সহায়তায় অর্থনীতিকে সচল রাখার জন্য নোট ছাপিয়ে বাজারে সরবরাহ করে। দেশের ভৌত অবকাঠামো পুনরুদ্ধার করা হয়।

যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশের পুনর্বাসন ও পুনর্গঠনের দায়িত্ব বঙ্গবন্ধু সরকার সাফল্যজনকভাবে মোকাবিলা করে। বিভিন্ন দেশ বাংলাদেশকে আর্থিক, খাদ্য ও প্রয়োজনীয় দ্রব্য দিয়ে সাহায্য করেছে। যুদ্ধের পর দেশে খাদ্যাভাব দেখা

দেয়। কারণ ১৯৭১ সালে বাংলার কৃষক সমাজ কৃষি কাজ করতে পারেনি। তারা মুক্তিযুদ্ধে লিপ্ত ছিল। অনেকে পালিয়েছিল এবং এক কোটি মানুষ ভারতে আশ্রয় নিয়েছিল। ফলে কৃষি ও শিল্প উৎপাদন মারাত্মকভাবে ব্যাহত হয়। সরকার গ্রামাঞ্চলে ৪ কোটি ৭৫ লাখ মণ খাদ্যসামগ্রী বিনামূল্যে বিতরণ করে।

সরকার অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে প্রথমে পুনর্বাসন ও পুনর্গঠন করে এবং পরে পরিকল্পিতভাবে বিভিন্ন খাতে উন্নয়ন কর্মসূচি গ্রহণ করে। দেশে পশ্চিম পাকিস্তানিদের পরিত্যক্ত ৫০০ শিল্প প্রতিষ্ঠান জাতীয়করণ ও উৎপাদনক্ষম করে লক্ষ লক্ষ শ্রমিকের কর্মসংস্থান করে। চট্টগ্রাম ও মংলা সামুদ্রিক বন্দর যুদ্ধের ফলে অচল হয়ে পড়েছিল। সরকার রাশিয়া ও জাতিসংঘের সহায়তায় উভয় বন্দর হতে মাইন সরিয়ে বন্দর আবার চালু করে।

বঙ্গবন্ধুর সরকার দক্ষ মন্ত্রিসভা গঠনের সাথে প্রশাসন পুনর্গঠন করে। অধিকাংশ কর্মকর্তার প্রাদেশিক সরকার পরিচালনার অভিজ্ঞতা ছিল। কিন্তু একটি কেন্দ্রীয় সরকার পরিচালনার অভিজ্ঞতা তাদের ছিল না। বাঙালি কর্মকর্তাগণ পশ্চিম পাকিস্তানে আটক। এমতাবস্থায় তার সরকার বৈদেশিক মন্ত্রণালয়সহ সকল মন্ত্রণালয়, দপ্তর, বিডিআর, পুলিশ, সেনাবাহিনী পুনর্গঠন করে। স্বাধীনতার পরে বঙ্গবন্ধুর ডাকে মুক্তিযোদ্ধাগণ অস্ত্র জমা দেন। ভারতীয় সেনাবাহিনী তিন মাসের মধ্যে বাংলাদেশ ত্যাগ করে চলে যায়। কিন্তু বামপন্থী দলগুলো বিশেষ করে সিরাজ সিকদারের সর্বহারা, হক-তোয়াহা ও মতিনের কমিউনিস্ট দলের কর্মীরা অস্ত্র জমা দেয়নি। ওদিকে মুজিব বাহিনীর নেতা সিরাজুল আলম খান, শাহজাহান সিরাজ, আ স ম রব এবং তাদের অনুগত মুক্তিবাহিনীর লোকজন অস্ত্র জমা না দিয়ে আওয়ামী লীগ বিরোধী সমাজতান্ত্রিক দল গঠনের ষড়যন্ত্র করে। আইন-শৃঙ্খলার অবনতি দেখে সরকার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে যে, নিয়মিত পুলিশ অস্ত্রধারীদের দমন করতে পারবে না। তাই রক্ষীবাহিনী গঠন করা হয়। রক্ষীবাহিনী গঠন নিয়ে রাজনৈতিক দলগুলো আওয়ামী লীগ সরকারের বিরুদ্ধে কঠোর সমালোচনা শুরু করে। সরকারের প্রশাসনের সফলতা ও ব্যর্থতা উভয় ছিল এবং যুদ্ধবিধ্বস্ত ও উন্নয়নশীল দেশের প্রশাসন সর্বক্ষেত্রে বিভিন্ন কারণে সফল হতে পারে না। সে জন্য বঙ্গবন্ধুকে এককভাবে দায়ী করা যায় না। তার দেশপ্রেম, সততা, নিষ্ঠা ছিল প্রশ্নাতীত। তিনি দীর্ঘ ৯ মাসে ক্ষতিগ্রস্ত প্রশাসন ও অর্থনীতিকে পুনর্গঠনের জন্য রাত দিন কঠোর পরিশ্রম করেছেন।

বাংলাদেশের জনগণের জন্য শোষণহীন সমাজ ও মানবাধিকার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে তিনি ১৯৭২ সালে শাসনতন্ত্র প্রণয়ন করেন। ১৯৪৭ সালে পাকিস্তান

সৃষ্টির পরে ৯ বছরেও শাসনতন্ত্র প্রণয়ন করতে পারেনি। কিন্তু বঙ্গবন্ধু মাত্র এক বছরের মধ্যে জাতিকে এবং আগামী প্রজন্মকে গণতান্ত্রিক শাসনতন্ত্র উপহার দিয়েছেন। শাসনতন্ত্রে মূলনীতি– মৌলিক অধিকার, সার্বভৌম সংসদ, মন্ত্রিপরিষদ শাসিত সরকার, স্বাধীন বিচার বিভাগ অন্তর্ভুক্ত আছে। শাসনতন্ত্র চারটি স্তম্ভের ভিত্তিতে রচিত– তা হলো গণতন্ত্র, জাতীয়তাবাদ, সমাজতন্ত্র ও ধর্ম নিরপেক্ষতা। শাসনতন্ত্রে বলা হয়েছে, জাতি হিসেবে বাংলাদেশের জনগণ বাঙালি। শাসনতন্ত্রের ৭ অনুচ্ছেদে বর্ণিত আছে, "জনগণ সকল ক্ষমতার উৎস এবং নির্বাচিত পার্লামেন্টের মাধ্যমে জনগণ তাদের ক্ষমতা প্রয়োগ করবে। জনগণকে খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান, শিক্ষা ও স্বাস্থ্যের নিশ্চয়তা প্রদান করা হয়েছে। আইনের শাসন, মানবাধিকার, নারী-পুরুষের সমান অধিকার নিশ্চিত করা হয়েছে। একমাত্র জনগণ সরকার পরিবর্তন করতে পারে। কোনো সামরিক শক্তি নির্বাচিত সরকার উৎখাত করতে পারে না। ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট বঙ্গবন্ধুকে সমপরিবারে হত্যা করে ক্ষমতায় দখল ছিল সম্পূর্ণ অবৈধ।

জেনারেল জিয়া সামরিক আইনের বলে শাসনতন্ত্রে জাতীয়তা 'বাঙালি' পরিবর্তে 'বাংলাদেশী' অন্তর্ভুক্ত করেন। সমাজতন্ত্র ও ধর্ম নিরপেক্ষতা সংশোধন করে ন্যায়ভিত্তিক সমাজ ও আল্লাহর ওপরে বিশ্বাস অন্তর্ভুক্ত করেন। জেনারেল এরশাদ ইসলাম ধর্মকে রাষ্ট্র ধর্ম ঘোষণা করেন। এমনিভাবে ১৯৭২ সালের শাসনতন্ত্রের অনেক মৌলিক পরিবর্তন করা হয়।

জাতির জনক শোষণহীন সমাজ প্রতিষ্ঠা ও কৃষক-শ্রমিকদের মুক্তির জন্য স্বাধীনতা সংগ্রাম করেছেন। তাই তিনি ব্যাপক ভূমি ও কৃষি সংস্কার করেন। এ ব্যাপারে ভূমিমন্ত্রী আবদুর রব সেরনিয়াবাত অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন। ভূমি মন্ত্রণালয়ের নাম পরিবর্তন করে ভূমি প্রশাসন ও ভূমি সংস্কার মন্ত্রণালয় করা হয়। ইজারাপ্রথা বাতিল করে হাটবাজারে জনগণের নির্বাচিত কমিটি ও জলমহাল মৎস্যজীবীদের নিকট বন্দোবস্ত দেয়া হয়। বকেয়া ভূমি রাজস্ব মওকুফ ও ২৫ বিঘার রাজস্ব চিরতরে মওকুফ করা হয়। খাসজমি ভূমিহীন ও মুক্তিযোদ্ধাদের নিকট অগ্রাধিকার ভিত্তিতে বন্দোবস্ত দেয়া হয়। খায়খালাসী ও চুক্তিভিত্তিক কবালার জমি মালিকদের নিকট ফেরত প্রদান করে ঋণগ্রস্ত কৃষকদের মুক্ত করেছেন। ২৫ বিভাগ জমির খাজনা বাতিল করার ফলে কৃষকদের খাজনার দায় নিলামে আর বিক্রি হবে না। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি সৃষ্টি রাজস্ব বোর্ড বাতিল করে দেন। প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের চাকরি সরকারি করেন। বিনামূল্যে পাঠ্যপুস্তক ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে বিতরণ করেন। ৩৬ হাজার নতুন শিক্ষক নিয়োগ করেন। ৫টি সরকারী কলেজকে বিশ্ববিদ্যালয়

কলেজে উন্নীত করেন। ১৯৭৩ সালে ঢাকা, রাজশাহী, চট্টগ্রামে বিশ্ববিদ্যালয়ের কালাকানুন বাতিল করে নতুন আইন প্রণয়ন করেন। শিক্ষা সংস্কারের জন্য ড. কুদরত-এ-খুদার নেতৃত্বে শিক্ষা কমিশন গঠন করেন। কমিশন ১৯৭৪ সালে শিক্ষা রিপোর্ট দাখিল করে।

শেখ মুজিব নারী ও শিশু উন্নয়নের জন্য কর্মসূচি গ্রহণ করেন। তিনি নারী পুনর্বাসন বোর্ড ও মুক্তিযোদ্ধা কল্যাণ ট্রাস্ট গঠন করেন। তিনি পাকিস্তান থেকে ৫ লক্ষ বাঙালিকে দেশে ফেরত আনেন এবং ৭ লাখ পাকিস্তানিকে পশ্চিম পাকিস্তানে পাঠিয়ে দেন।

আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে শেখ মুজিবুর রহমান খ্যাতি অর্জন করেন। ১৯৭১-৭৫ পর্যন্ত তিনি ছিলেন বিশ্বে সবচেয়ে আলোচিত ব্যক্তিত্ব। বিশ্বের ১৪০টি দেশ বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দিয়েছে। চীন ও সৌদি আরব বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেয়নি। কিন্তু চীন সরকার বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দানের জন্য সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছিল। হয়তো এক সপ্তাহের মধ্যে স্বীকৃতি পেত। চীনের ভেটো প্রয়োগ সত্ত্বেও বাংলাদেশ ১৯৭৪ সালের ১৭ সেপ্টেম্বর জাতিসংঘের সদস্য পদ লাভ করে। ইতিপূর্বে বাংলাদেশ কমনওয়েলথ ও ১১টি আন্তর্জাতিক সংস্থার সদস্য হয়েছে। ১৯৭৪ সালের ২৫ সেপ্টেম্বর বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান প্রথম বাংলা ভাষায় জাতিসংঘে ভাষণ প্রদান করেন। তিনি আলজিয়ার্সে জোটনিরপেক্ষ জোটের সম্মেলনে যোগ দেন। বঙ্গবন্ধু ছিলেন বিশ্বের নিপীড়িত, শোষিত মানুষের কণ্ঠস্বর। তার কণ্ঠে উচ্চারিত হয়েছে মুক্তিকামী মানুষের দাবি।

ইতিহাসবিদ উলপার্ট মুজিব-ভুট্টোর তুলনা করে বলেছেন—

Mujib's popularity throughout the East was far greater than Zulfi's in the West; for there was 10 million more people in the East and all of them speak and understood Bengali. And Mujib was stirring an orator in Bengali as Zulfi was in Sindhi, English or Urdu. সমগ্র পূর্বাঞ্চলে মুজিবের জনপ্রিয়তা জুলফিকার পশ্চিমের তুলনায় অনেক বেশি ছিল। কারণ পূর্বাঞ্চলে এক কোটি লোক বেশি। তারা সকলেই বাংলায় কথা বলে এবং বোঝে। মুজিব বাংলা ভাষণে একজন অপ্রতিদ্বন্দ্বী বাগ্মী। তেমনিভাবে জুলফি সিন্ধি, ইংরেজি অথবা উর্দু ভাষায় বাগ্মী ছিলেন। বক্তা হিসেবে মুজিবের শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার করে ভুট্টো নিজেই বলেছেন, Sheikh Mujibur Rahman was spell-binding orator. He used his political skill with a mastery that no Bengali leader to this day has rivalled or surpassed. শেখ মুজিবুর

রহমান সম্মোহনী বাগ্মী ছিলেন। তিনি তার রাজনৈতিক কৌশল আধিপত্য নিয়ে ব্যবহার করেছেন। এক্ষেত্রে আজ পর্যন্ত কোনো বাঙালি নেতা তার সমকক্ষ বা তাকে অতিক্রম করতে পারেননি।

শিল্প-সাহিত্যে শেখ মুজিব

শিল্প-সাহিত্যের প্রতি বঙ্গবন্ধু ছিলেন অত্যন্ত শ্রদ্ধাশীল। কবি, সাহিত্যিক ও শিল্পীদের প্রতি তার ছিল সুদৃষ্টি ও সচেতনতা। রবীন্দ্র সঙ্গীতকে তিনি জাতীয় সঙ্গীতের মর্যাদা দিয়েছেন। নজরুলের কবিতাকে করেছেন বাংলাদেশের রণগীতি। বিদ্রোহী কবি নজরুল ইসলামকে নিয়ে এসেছেন কলকাতা থেকে ঢাকায়। তাকে বাসভবন ও ভাতা প্রদান করেছেন। কবির নামানুসারে ঢাকার একটি সড়কের নাম দিয়েছেন কাজী নজরুল ইসলাম এভিনিউ।

যুদ্ধোত্তর সময় কবি ফররুখ আহমেদকে অনুদান, শিল্পী কমল দাশগুপ্তকে রেডিওতে, কবি জসিমউদ্‌দীনকে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক হিসেবে নিয়োগ, অসুস্থ কবি হুমায়ুন কাদির, আবুল হাসান, মহাদেব সাহাকে সুচিকিৎসার জন্য বিদেশে প্রেরণ করেন। মৌলবাদীদের ওপর লেখার কারণে কবি দাউদ হায়দারকে নিরাপত্তা দিয়ে কলকাতায় পাঠান। তিনি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে লেখেন–

'তুমি আছো বলে অমোঘ পুরস্কার
নিয়ে বেঁচে আছে কবি ও কবিতার দাউদ হায়দার।'

তিনি জেলখানা থেকে মুক্তি দিয়ে কবি আল মাহমুদকে চাকরি দিলেন। নাটকের ওপর থেকে প্রমোদ কর ও সেন্সর প্রথা সহজতর করে সংস্কৃতি চর্চার দ্বার প্রসারিত করেন।

বঙ্গবন্ধু প্রাদেশিক মন্ত্রী থাকাকালে ১৯৫৭ সালের ৩ এপ্রিল আইন সভায় বাংলা একাডেমী আইন পাস হয়। ১৯৫৫ সালের ৩ ডিসেম্বর বাংলা একাডেমী প্রতিষ্ঠিত হয়। বাংলাদেশে চলচ্চিত্র শিল্পের প্রতিষ্ঠাতা শেখ মুজিবুর রহমান। পূর্ব পাকিস্তানে শিল্পমন্ত্রী থাকাকালে তিনি ১৯৫৭ সালের ৪ এপ্রিল প্রাদেশিক আইন পরিষদে চলচ্চিত্র উন্নয়ন সংস্থা বিল উত্থাপন করেন। তিনি বাংলাদেশে ছায়াছবি নির্মাণের গোড়াপত্তন করেন। সংস্থা গঠনের দেড় মাসের মধ্যে ফতেহ লোহানী 'আসিয়া' ছবি নির্মাণ শুরু করেন।

অসমাপ্ত আত্মজীবনী

শেখ মুজিবুর রহমান ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে বন্দী থাকাকালে ১৯৬৭ সালে তিনি তার আত্মজীবনী লেখা শুরু করেন। তিনি শৈশবকাল থেকে ১৯৫৪ সাল পর্যন্ত তার জীবনের ইতিহাস লিখেছেন। তার এ অসমাপ্ত আত্মজীবনী হারিয়ে

যায়। তার কন্যা শেখ হাসিনা হারিয়ে যাওয়া আত্মজীবনী উদ্ধার করে ২০১২ সালে প্রকাশ করেন। তার আত্মজীবনী বাংলার ইতিহাসে এক অমূল্য দলিল।

আন্তর্জাতিক সাহিত্য সম্মেলন

১৯৭৪ সালের ১৪ ফেব্রুয়ারি বাংলা একাডেমীতে এক আন্তর্জাতিক সাহিত্য সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সম্মেলনে সোভিয়েত ইউনিয়ন, জার্মানি, হাঙ্গেরি, মঙ্গোলিয়া ও ভারত থেকে কবি, সাহিত্যিকরা অংশগ্রহণ করেন। সম্মেলনটি উদ্বোধন করেন প্রধানমন্ত্রী শেখ মুজিবুর রহমান। নিম্নে তার গুরুত্বপূর্ণ ভাষণ উদ্ধৃত হলো :

"দীর্ঘকালব্যাপী নানা শোষণ এবং বঞ্চনার ফলে রাজনৈতিক দিক থেকে আজ আমরা দরিদ্র, ক্ষুধার্থ ও নানা সমস্যায় জর্জরিত।

কিন্তু আমরা সাহিত্য, সাংস্কৃতিক ও ঐতিহ্যের দিক থেকে দরিদ্র নই। আমাদের ভাষার দুই হাজার বছরের একটি গৌরবময় ইতিহাস আছে। আমাদের সাহিত্যের যারা সাধনা করেছেন, তাদেরকে দেশে জনজীবনের সঙ্গে গভীর যোগসূত্র রক্ষা করে অগ্রসর হতে হবে। দেশের জনগণের চিন্তা-ভাবনা, আনন্দ-বেদনা তাদের এবং সামগ্রিক অর্থে তাদের জীবন প্রবাহ আমাদের সাহিত্য-শিল্পে অবশ্যই ফুটিয়ে তুলতে হবে। সাহিত্য-শিল্পে ফুটিয়ে তুলতে হবে এ দেশের দুঃখী মানুষের আনন্দ-বেদনার কথা, সাহিত্য-শিল্প কাজে লাগতে হবে তাদের কল্যাণে। আজ আমাদের সমাজের রন্ধ্রে রন্ধ্রে যে দুর্নীতি শাখা-প্রশাখা বিস্তার করছে আপনাদের লেখনীর মাধ্যমে তার মুখোশ খুলে ধরুন।

জনগণই সব সাহিত্য-শিল্পের উৎস, জনগণ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে কোনোদিন কোনো মহৎ সাহিত্য বা শিল্পকর্ম সৃষ্টি হতে পারে না।...

১৯৭৫ সালের ২৫ মার্চ স্বাধীনতা দিবসের প্রাক্কালে বাংলাদেশের ১৮ জন এবং ভারতীয় ৪ জন বিশিষ্ট শিল্পী, সংস্কৃতিসেবী ও বেতার কর্মীর জন্য বঙ্গবন্ধু স্বর্ণপদক ঘোষণা করা হয়। পদকপ্রাপ্তগণ হলেন, শহীদ আলতাফ মাহমুদ, রাজু আহমেদ, সর্দার আলাউদ্দিন, আবুল কাশেম সন্দ্বীপ, বেলাল মোহাম্মদ, আবদুল্লাহ আল ফারুক, রেজাউল করিম চৌধুরী, রাশিদুল হাসান, আমিনুর রহমান, কাজী হাবিবউদ্দিন, শফিকুজ্জামান, সৈয়দ আব্দুস শাকের, গাজী মাজহারুল ইসলাম, এম আর আখতার মুকুল, রথীন্দ্রনাথ রায়, সমর দাশ, মুস্তফা আলম এবং ভারতের দেব দুলাল বন্দ্যোপাধ্যায়, গৌরী প্রসন্ন মজুমদার, অংশুমান রায় এবং প্রণব ঘোষ। ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্টের পর স্বর্ণপদক প্রদান স্থগিত রাখা হয়।

বঙ্গবন্ধু শোষণমুক্ত সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতি প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে ১৯৭৩-৭৮

সালের জন্য পঞ্চমবার্ষিকী পরিকল্পনা প্রণয়ন করেন। তিনি বাংলাদেশে পরিকল্পিত অর্থনীতির জনক। ১৯৭৪ সালের বন্যায় অধিকাংশ জেলার ফসল বিনষ্ট হওয়া সত্ত্বেও ১৯৭২-৭৫ সালে বাংলাদেশে বার্ষিক প্রবৃদ্ধির হার ছিল ৭ ভাগ। ১৯৭৫-৯৫ সালের ক্ষমতাসীন সরকারগুলোর আমলে প্রবৃদ্ধির হার ছিল ৪ ভাগ। তৎকালীন আওয়ামী লীগ সরকারের আমলে গরিব লোকের সংখ্যা ছিল ৫০ ভাগ। জনপ্রতি খাদ্য গ্রহণের পরিমাণ ছিল ২০৯৪ ক্যালরি। চালের দাম দ্রুত হ্রাস পেতে থাকে। বঙ্গবন্ধুর মৃত্যুর পূর্বে চালের দাম ছিল সেরপ্রতি ৩ থেকে ৪ টাকা। বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে দেশ যখন সমৃদ্ধির পথে এবং জাতি যখন তার দ্বিতীয় বিপ্লবের বাস্তবায়নে অঙ্গীকারাবদ্ধ, তখন ঘাতক দল তাকে নির্মমভাবে হত্যা করেছে।

অধ্যায় ৩৭

সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের কৃতিত্ব তিনি একটি ভাষাভিত্তিক অসম্প্রদায়িক স্বাধীন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করেছেন। পৃথিবীর ইতিহাসে স্বাধীন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠায় যারা নেতৃত্বে দিয়েছেন তাঁরা হলেন– ইটালিতে ম্যাটসিনি, গ্যারিবল্ডি, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে জর্জ ওয়াশিংটন, ভারতের মহাত্মা গান্ধী, ইন্দোনেশিয়ার সুকর্ন প্রমুখ। তারা সকলে বিশ্বের মহানায়ক। সশস্ত্র যুদ্ধের মাধ্যমে স্বাধীন বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠা করেছেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। বাংলাদেশের স্বাধীনতাযুদ্ধে ৩০ লাখ লোক প্রাণ দিয়েছেন। এত রক্ত পৃথিবীর কোনো রাষ্ট্র বা জাতিকে দিতে হয়নি। এ দিক দিয়ে বাংলাদেশের ইতিহাস অনন্য।

বঙ্গবন্ধু সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি

২০০৪ সালের লন্ডনস্থ বিবিসি শ্রেষ্ঠ বাঙালিদের এক সমীক্ষা পরিচালনা করে। তাদের জরিপে প্রথম ১০ জন সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি হলেন :

সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালির নাম	ঘোষণার তারিখ
১. সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি-বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান	১৪-৪-২০০৪
২. দ্বিতীয় শ্রেষ্ঠ বাঙালি কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	১৩-৪-২০০৪
৩. তৃতীয় শ্রেষ্ঠ বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলাম	১২-৪-২০০৪
৪. চতুর্থ শ্রেষ্ঠ বাঙালি শেরে বাংলা এ কে ফজলুল হক	১১-৪-২০০৪
৫. পঞ্চম শ্রেষ্ঠ নেতাজী সুভাষ চন্দ্র বসু	১০-৪-২০০৪
৬. ষষ্ঠ শ্রেষ্ঠ বেগম রোকেয়া	৯-৪-২০০৪
৭. সপ্তম শ্রেষ্ঠ স্যার জগদীশ চন্দ্র বসু	৮-৪-২০০৪
৮. অষ্টম শ্রেষ্ঠ ঈশ্বর চন্দ্র বিদ্যাসাগর	৭-৪-২০০৪
৯. নবম শ্রেষ্ঠ মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী	৬-৪-২০০৪
১০. দশম শ্রেষ্ঠ অতীশ দীপংকর	৫-৪-২০০৪

বঙ্গবন্ধুর রাজনৈতিক জীবন বিস্ময়কর। তিনি রাজনীতি শুরু করেছেন মুসলিম লীগের পতাকাতলে। হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী তার রাজনৈতিক আদর্শ। ১৯৪৬ সালের দাঙ্গার পর সোহরাওয়ার্দী সাম্প্রদায়িক রাজনীতি থেকে সরে আসতে থাকেন। ১৯৪৭ সালে সোহরাওয়ার্দী বাঙালি জাতীয়তাবাদের ভিত্তিতে স্বাধীন বৃহত্তর বাংলা দাবি করেন। এ সময় শেখ মুজিবুর সাম্প্রদায়িক রাজনীতি ত্যাগ করে ধর্মনিরপেক্ষ রাজনীতির আদর্শ গ্রহণ করে ছাত্রলীগ ও আওয়ামী লীগ গঠনে আত্মনিয়োগ করেন।

১৯৫৪ সালে পূর্ব পাকিস্তানের গভর্নর মেজর জেনারেল ইসকান্দার মির্জা শেখ মুজিবুর রহমান সম্পর্কে গভর্নর জেনারেল গোলাম মহম্মদের নিকট গোপন প্রতিবেদন দেন। তিনি লিখেছেন, Sheikh Mujibur Rahman has been in prison several times. Is a remarkably good organizer. Has guts. Hold extreme views in Politics, is an experienced agitator. May be described as the stormy petrel of Awami League. A dangerous gentleman who is best in jail.

"শেখ মুজিবুর রহমান অনেকবার জেলে ছিলেন। তিনি একজন বিখ্যাত সংগঠক। তার ব্যক্তিত্ব আছে। রাজনীতিতে তিনি চরম মতাদর্শের লোক। তিনি একজন অভিজ্ঞ বাগ্মী। তাকে আওয়ামী লীগের ঝড়ের পাখি হিসেবে বর্ণনা করা যায়। একজন ভয়ঙ্কর ভদ্রলোক যার উপযুক্ত স্থান হলো জেলখানা।" ১৯৫৪ সালে পাকিস্তান সরকার পূর্ব পাকিস্তানের যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রিসভা ভেঙে কেন্দ্রীয় সরকারের শাসন প্রবর্তন করে। মেজর জেনারেল ইসকান্দার মির্জা শেখ মুজিবুর রহমানসহ শত শত রাজনৈতিক নেতাদের বন্দী করে। পাকিস্তান সরকার শেখ মুজিবকে ভীষণ ভয় করত। তাই তাকে ১২ বছর জেলে বন্দী রেখেছে।"

একজন মানুষ হিসেবে তার মহত্ত্ব হলো তিনি বাঙালি জাতির মুক্তির জন্য সংগ্রাম করেছেন। তিনি বাংলা ভাষাভিত্তিক একটি স্বাধীন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি চেয়েছিলেন বাংলার মানুষ যেন খেয়ে পরে সুখে-শান্তিতে থাকতে পারে। বঙ্গবন্ধুর মনের ঐশ্বর্য, চিত্তের উদারতা, নিরহংকারতা, এসব বৈশিষ্ট্য তুলনাহীন। তাঁর চরিত্রের দৃঢ়তা, ব্যক্তিত্ব অতুলনীয়। তিনি সকলের ঊর্ধ্বে ছিলেন। কি উচ্চতার, কি চিত্তের বৈভবের বিপুলতায়। একাধারে তিনি সাহসী বিনয়ী মানুষ ছিলেন। তিনি সর্বযুগের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি। তিনি হলেন বিরাট মাপের মানবতাবাদী। তিনি বিশ শতাব্দীর একজন শ্রেষ্ঠ রাজনীতিবিদ ও রাষ্ট্রনায়ক।

চিলির প্রেসিডেন্ট আলেন্দেকে সোভিয়েত রাশিয়া রক্ষা করতে পারেনি। বঙ্গবন্ধুকেও রাশিয়া ভারত নিরাপত্তা দিতে পারেনি।

বঙ্গবন্ধু ছিলেন– 'মোর নাম এই বলে খ্যাত হোক
আমি তোমাদের লোক।'

স্বাধীন বাংলাদেশের স্থপতি

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সর্বোচ্চ কৃতিত্ব বাঙালি জাতীয়তাবাদের ভিত্তিতে স্বাধীন-সার্বভৌম বাংলাদেশ রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা। স্বাধীন বাংলাদেশের প্রধান স্তম্ভ জাতীয়তাবাদ। জাতীয়তাবাদ বলতে বোঝায় সামাজিক ও অর্থনৈতিক বিবর্তনের মাধ্যমে ধীরে ধীরে কোম থেকে গোত্র, গোত্র থেকে গোষ্ঠী এবং গোষ্ঠী থেকে একটি জাতির সৃষ্টি। জাতি অভিন্ন চেতনার ফল। একটি নির্দিষ্ট ভৌগোলিক সীমার সহাবস্থান, একই ভাষা, সাংস্কৃতিক, সমাজ ও রাজনৈতিক চেতনা প্রভৃতির ঐক্য জাতীয়তাবাদের ভিত্তি। পরাধীন থাকলে স্বাধীনতার জন্য সংগ্রাম ও জাতীয় সংগ্রামী চেতনার প্রয়োজন। জাতীয়তাবাদের সবগুলো বৈশিষ্ট্য বাংলাদেশে ছিল এবং জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের প্রথম অগ্রনায়ক দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ ও এ কে ফজলুল হক। জাতীয়তাবাদী চেতনা বিকশিত হয় মওলানা ভাসানী ও হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর নেতৃত্বে। একটি জাতি গঠনের উপকরণ বাংলাদেশে ছিল, তাঁরা এক ভূখণ্ডের অধিবাসী, এক ভাষাভাষী জনগোষ্ঠী এবং অভিন্ন জাতীয় চেতনার। আবুল কাশেম ফজলুল হক, হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী ও মওলানা ভাসানী জাতীয় চেতনা সৃষ্টি করেছেন। কিন্তু তারা জাতিকে ঐক্যবদ্ধ করে স্বাধীনতা অর্জন করে যেতে পারেননি।

বাঙালি জাতির আত্মপ্রতিষ্ঠার সংগ্রাম রাজা শশাঙ্কর আমল থেকে শুরু হয়। কিন্তু এ সংগ্রামে তারা সফল হতে পারেনি। কারণ তারা ঐক্যবদ্ধ হয়ে স্বাধীন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করতে ব্যর্থ হয়। পাল রাজারা রাষ্ট্র গঠন করতে পারেনি। গৌড়ের সুলতানগণ বাঙালি জাতিকে একটি রূপ দিতে সক্ষম হয়। কিন্তু তখনও পুরোপুরি একটি স্বাধীন জাতি হিসেবে প্রতিষ্ঠা লাভ করতে পারেনি। মোগল সম্রাটগণ বাঙালিদের ওপর ফার্সি ও ইংরেজগণ ইংরেজি ভাষা চাপিয়ে দেয়ার চেষ্টা করে। বিদ্রোহী বাঙালিরা যেমন সেনদের সংস্কৃত ভাষা গ্রহণ করেনি, তেমনিভাবে তারা ফার্সি ও ইংরেজি ভাষাকেও গ্রহণ করেনি। ইতিহাসের গতি থেমে থাকেনি। আত্মপ্রতিষ্ঠার সংগ্রাম শশাঙ্ক থেকে পলাশী, পলাশী থেকে ১৯৭১ সাল পর্যন্ত চলে। জাতি হিসেবে আত্মপ্রতিষ্ঠার সংগ্রামে

আমাদের মহান নেতা আবুল কাশেম ফজলুল হক, হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী ও মওলানা ভাসানী ঐতিহাসিক ভূমিকা পালন করেন। শেরে বাংলা বাঙালিদের শিক্ষা আলো ঘরে ঘরে পৌঁছে দিয়ে জাতীয় চেতনার উন্মেষ ঘটান, সামাজিক-অর্থনৈতিক মুক্তির লক্ষ্যে ভূমি সংস্কার করেন। তিনি একটি স্বাধীন দেশ প্রতিষ্ঠার জন্য ১৯৪০ সালে লাহোর প্রস্তাবের মাধ্যমে পূর্বাঞ্চলে একটি সার্বভৌম রাষ্ট্রের প্রস্তাব পেশ করেন। হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী ১৯৪৭ সালে স্বাধীন বৃহত্তর বাংলাদেশ দাবি করেন। ১৯৫৪ সালে ২১ দফার ভিত্তিতে নির্বাচনের মাধ্যমে ফজলুল হক, হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী ও মওলানা ভাসানী বাঙালি জাতিকে ঐক্যবদ্ধ করেন। বাংলা ভাষা রাষ্ট্র ভাষা হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করে। জাতীয় চেতনা উদ্বুদ্ধ যুক্তফ্রন্ট ও আওয়ামী লীগ সরকার ক্ষমতা দখল করে। হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী সংখ্যাসাম্য নীতি সমর্থন করে বাঙালিদের চাকরি, ব্যবসা ও শিল্পায়নে সুযোগ করে দেন। সংখ্যাসাম্যনীতির ভিত্তিতে হাজার হাজার বাঙালি; সেনাবাহিনী ও কেন্দ্রীয় চাকরিতে সুযোগ লাভ করেন এবং তারা অনেকে ১৯৭১ সালের স্বাধীনতাযুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন।

আমাদের মহান তিন নেতার সৃষ্ট জাতীয় আন্দোলনে পরিপূর্ণতা এনেছিলেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান তার ৬ দফা দাবির মাধ্যমে। আওয়ামী লীগের ৬ দফার আন্দোলন ছিল মূলত বাঙালি জাতির স্বাধীনতার দাবি। বাংলার স্বাধীনতা অর্জনের জন্য বাংলার একদল দামাল ছেলে সেনাবাহিনীর মধ্যে বাংলাদেশ লিবারেশন ফোর্স গঠন করে। পাকিস্তান সরকার তাদের বিরুদ্ধে তথাকথিত আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা দায়ের করে। ৬ দফা ও আগরতলা মামলাকে কেন্দ্র করে ১৯৬৯ সালে গণঅভ্যুত্থান সূচিত হয়। আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা বাঙালির জাতীয়তাবাদী আন্দোলনকে ৫০ বছর এগিয়ে নিয়ে যায়। ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলনের শহীদের রক্তের পিচ্ছিল পথ অতিক্রম করে ১৯৫৪ সালে যুক্তফ্রন্টের বিজয়, ১৯৬৬ সালের ৬ দফা, ১৯৬৯ সালের আগরতলা মামলা এবং গণঅভ্যুত্থান শেখ মুজিবের বাঙালি জাতীয়তাবাদের সফল ও সার্থক পরিণতির পথ প্রস্তুত করে। ১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর জাতি ও দেশ হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করে। এ জাতীয়তাবাদ শেখ মুজিবের চিন্তা ও চেতনার ফল। জাতীয় ঐক্য দৃঢ় করার জন্য তিনি স্বাধীনতা অর্জনের পরও শাসনতন্ত্রের ৪টি মূল নীতির মধ্যে জাতীয়তাবাদকে অন্তর্ভুক্ত করেন। তার স্লোগান ছিল, "পদ্মা-মেঘনা-যমুনা তোমার আমার ঠিকানা।" তাঁর চার মূলনীতিকে মুজিববাদ বলা হতো।

বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের প্রেরণা যোগাচ্ছে সমাজতান্ত্রিক কর্মসূচি। জনগণ যদি তাদের অর্থনৈতিক মুক্তির সূচনা না দেখে তবে তারা জাতীয়তাবাদী আন্দোলন অংশ নেয় না। জনগণের সার্বিক উন্নয়নে সমাজতন্ত্র কর্মসূচি। জনগণের সার্বিক উন্নয়নে সমাজতন্ত্র হলো একটি সহজ দ্রুত পথ; তাই শাসনতন্ত্রে সমাজতন্ত্র অন্তর্ভুক্ত করা হয়। সমাজতন্ত্রের লক্ষ্য অর্জনের জন্য তিনি পরিকল্পনা কমিশন গঠন ও পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা প্রণয়ন করেন। ব্যাংক, বীমা, পাটকল, বস্ত্রকল ও ভারী শিল্প রাষ্ট্রায়ত্ত করা হয়। ২৫ বিঘা ভূমির খাজনা মওকুফসহ অনেক গণমুখী কর্মসূচি নেয়া হয়। হাজার বছর ধরে অবহেলিত বাঙালির সমাজ জীবনে ও অর্থনীতি ক্ষেত্রে পুঁজিবাদ গড়ে ওঠে। ধনী আরো ধনী হয়, গরিব আরো গরিব হয়। তাই বঙ্গবন্ধু ঘুণে ধরা সমাজ ব্যবস্থা ভেঙে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার জন্য দ্বিতীয় বিপ্লবের ডাক দেন। দ্বিতীয় বিপ্লবের উদ্দেশ্য ছিল দুর্নীতি দমন, কৃষি-শিল্প উৎপাদন বৃদ্ধি, জনসংখ্যা রোধ, নিরক্ষরতা দূরীকরণ ও অর্থনীতির সুষম বণ্টন।

ধর্ম নিয়ে রাজনীতি মানব ইতিহাসে অনেক রক্তপাত ঘটিয়েছে। শেখ মুজিবুর রহমানের রাজনীতি শুরু হয়েছিল ধর্মকে ভিত্তি করে। তাই এ রাজনীতি সম্পর্কে তার অভিজ্ঞতা ছিল। বাংলাদেশের শতকরা ১২ ভাগ সংখ্যালঘু হিন্দু, বৌদ্ধ ও খ্রিস্টান। ধর্মভিত্তিক রাষ্ট্র হলে তারা দ্বিতীয় শ্রেণীর নাগরিকে পরিণত হবে। তাই শেখ মুজিব জাতীয় ঐক্য সুদৃঢ় করার জন্য শাসনতন্ত্রে ধর্মনিরপেক্ষতা অন্তর্ভুক্ত করেন। ধর্মনিরপেক্ষতা মানে ধর্মহীনতা নয়। প্রত্যেক সম্প্রদায় তাদের ধর্ম স্বাধীনভাবে পালন করতে পারবে। ইসলাম অর্থ শান্তি এবং শান্তির ধর্মকে রাজনীতিতে না এনে তিনি ধর্মনিরপেক্ষতার নীতি অবলম্বন করেন।

বাংলাদেশের চতুর্থ মূলনীতি– গণতন্ত্র। বাংলার মানুষ দীর্ঘ ২৪ বছর ধরে গণতন্ত্রের জন্য সংগ্রাম করেছে। শোষণ ও অর্থনেতিক নিপীড়নের হাত হতে মুক্তি পাওয়ার পথ গণতন্ত্র। জনগণের প্রতিনিধি তাদের মঙ্গলের জন্য দেশ শাসন করবে। তাই গণতন্ত্র শাসনতন্ত্রের অন্তর্ভুক্ত করা হয়। জনগণ সকল ক্ষমতার উৎস– জনগণ তাদের নির্বাচিত পার্লামেন্টের মাধ্যমে দেশ পরিচালনা করবে– এ মূলনীতি শাসনতন্ত্রের ৭ নম্বর অনুচ্ছেদে অন্তর্ভুক্ত আছে।

১৯৪৭ সাল থেকে ১৯৭১ সাল পর্যন্ত তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তান তথা পূর্ব বাংলার ঘটনাপ্রবাহ একজন ব্যক্তিকে কেন্দ্র করে একটি সুষ্ঠু পরিণতির পথে এমনভাবে অগ্রসর হয়েছে, তার যদি ইতিহাস লেখা হয় তবে যে মহানায়ককে পাওয়া যায় তিনি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। অনেক কবি, সাহিত্যিক,

নেতার অবদানেও বাংলাদেশ গৌরবময়। বাংলার জাতীয়তাবাদী আন্দোলনে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ, কাজী নজরুল ইসলাম, এ কে ফজলুল হক, হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী ও মওলানা ভাসানী বিশিষ্ট ভূমিকা পালন করেছেন। কিন্তু এ দেশ যার অবদানে জন্মলাভ করেছে তিনি বঙ্গবন্ধু। তার সাথে কারো তুলনা হয় না। তাই তাকে সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি বলা হয়। ভবিষ্যতে অনেকে আসবেন, তবে জন্মদাতা একজনই থাকবেন– তিনি বাংলার সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ মানব বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান।

সহায়ক গ্রন্থ

১. শেখ মুজিবুর রহমান- অসমাপ্ত আত্মজীবনী, দি ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, ২০১২
২. খন্দকার মোহাম্মদ ইলিয়াস- মুজিববাদ ১৯৭২
৩. অলি আহাদ- জাতীয় রাজনীতি ১৯৪৫-৭৫
৪. এম আর আখতার মুকুল- বঙ্গবন্ধু, ১৯৯৭
৫. হাসান হাফিজুর রহমান-বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ দলিলপত্র, তথ্য মন্ত্রণালয়, ১৯৮৪
৬. শেখ হাসিনা- শেখ মুজিব আমার পিতা, ১৯৯৯
৭. ড. এমএ ওয়াজেদ মিয়া-বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবকে ঘিরে কিছু ঘটনা ও বাংলাদেশ, ১৯৯৩
৮. বেলাল মোহাম্মদ- স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র
৯. বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান জীবন ও রাজনীতি- সম্পাদক : মোনায়েম সরকার, বাংলা একাডেমী, ১ম ও ২য় খণ্ড, ২০১০
১০. বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান, ভাস্কর প্রকাশনী, ২০১০, ইসলামিক ফাউন্ডেশন
১১. মেজর রফিকুল ইসলাম (অব.) বীরউত্তম- লক্ষ প্রাণের বিনিময়
১২. এম আর আখতার মুকুল- আমি বিজয় দেখেছি, ১৯৮৪
১৩. সিরাজ উদ্‌দীন আহমেদ- শেরেবাংলা এ কে ফজলুল হক, ভাস্কর প্রকাশনী, ১৯৯৭
১৪. সিরাজ উদ্‌দীন আহমেদ-হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী, ভাস্কর প্রকাশনী, ১৯৯৭
১৫. সিরাজ উদ্‌দীন আহমেদ-প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দীন আহমেদ, ভাস্কর প্রকাশনী
১৬. মাযহারুল ইসলাম, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান, বাংলা একাডেমী, ১৯৭৪
১৭. James J. Novak- Bangladesh Reflection on Water UPL, Dhaka 1993
১৮. Hasan Zaheer- The Separation of East Pakistan, UPL, Dhaka, 1994
১৯. Stanely Wolpert- Zulfi Bhutto of Pakistan, 1993
২০. Lt. Gen AAK Niazi- The Betrayal of East Pakistan, 1998
২১. Z. R. Iqbal- Speeches of Sheikh Mujib, Pakistan Parliament, 1990
২২. Anthony Mascarenchas-Bangladesh-A Legacy Blood, London, 1986
২৩. Altaf Gauhar- Ayub Khan Pakistan's First Military Ruler, UPL, Dhaka, 1996
২৪. Siddik Salik- Witnes to Surrender, UPL, Dhaka, 1997
২৫. Major General Rao Forman Ali Khan- How Pakistan Got Devided, 1992
২৬. Lt. General JFR Jacob- Surrendar at Dacca. Birth of a Nation, UPL, Dhaka, 1997.

নির্ঘণ্ট

অ

অতীশ দীপংকর–৩৩০
অন্নদাশংকর রায়–৩১৬
অরোরা, জেনারেল–২৫২
অলি আহাদ–৬৫, ৭৮, ৮৭, ১১৪
অহিদুজ্জামান–২৫, ১৩০
অসহযোগ আন্দোলন–১৭০
অজিত গুহ–৬৫, ৯২
অপারেশন সার্চ লাইট–১৮৪

আ

আই আই চুন্দ্রিগড়–৫৯
আইয়ুব খান, প্রেসিডেন্ট–১২৬, ১২৭
আওয়ামী লীগের জন্ম–৭১-৭৫
আগরতলা মামলা–১৪৪–১৪৮
আ ফ ম মহিতুল ইসলাম–২৯৬
আজম খান, লে. জেনারেল–১২৬, ১২৭
আজিজ আহমেদ, চীফ সেক্রেটারী–৬০, ৯০
আলমাস আলী–৭৪
আজিজ আহমদ–৬২
আতাউর রহমান খান–৭৪, ৮৭, ১১৪, ১১৭
আঁদ্রে গ্রোমিকো–২৩০
আনোয়ার হোসেন–৪৬
আবদুল আজিজ–৬২
আবদুল আলিম–১১৮
আবদুল মতিন–৭৮
আবদুল করিম–৬০
আবদুল হামিদ, জেনারেল–২২১
আবদুল কুদ্দুস চৌধুরী–৬২
আবদুল হামিদ চৌধুরী–৬১
আসাদ–১৫৫
আবদুল কুদ্দুস মাখন–১৭০
আবদুল কাদের সিদ্দিকী–২৫১
আবদুল আউয়াল–৭৪
আবদুল জব্বার–৯১
আবদুল গাফ্‌ফার চৌধুরী–৯৩
আবদুল খালেক, আইজি–২৯১, ২২৪
আবদুল জলিল, সার্জেন্ট–১৪৮
আজিজুর রহমান মল্লিক, ড.–২২৯
আবদুস সামাদ আজাদ–২২৮
আবদুল লতিফ বিশ্বাস–১০৩
আনোয়ারা বেগম–৮৭
আনোয়ারুল হক খান–৮৭
আবদুস সালাম খান–৭৪, ১৪০
আবদুল মোমিন–১৬৪
আবদুল মান্নান–১৬৯
আবদুল মতিন–৮৭
আবদুল মোনায়েম খান–১৩৪
আবদুল মালেক উকিল–১৪১
আবদুল মান্নান এমএনএ–২২৫
আবদুল মজিদ খান, মে. জেনারেল–২৫৮
আবদুল লতিফ–৯৩
আবুল কালাম আজাদ–৫৩
আবুল হাশিম–৪২, ৪৩, ৪৭, ৫৬, ৮৭
আবুল কাশেম–৬৪
আবু হোসেন সরকার–১১০
আবু তাহের, কর্নেল–২০২
আবু ওসমান চৌধুরী–২০২
আবু সাঈদ চৌধুরী, বিচারপতি–২০১
আবদুল অদুদ–৬৬
আবুল খায়ের, ড.–২৫৪-৫৬
আবদুস সামাদ–১৪৭
আবুল মনসুর আহমদ–১০৩, ১১৪
আবদুর রহমান চৌধুরী–৬২
আবদুর রহমান–৮১, ১১৭
আবদুর রব সিরনিয়াবাদ–২০৪, ২৬৫
আবদুর রহিম এমএনএ–২০৪
আবদুর রউফ–১৫৪
আবদুর রাজ্জাক, ফ্লাইট সার্জেন্ট–১৪৭
আবদুর রাজ্জাক–২৪৮
আখতার উদ্দিন আহমদ–৮৭
আবদুল হামিদ–৬০
আবদুর রউফ চৌধুরী এমপিএ–২০৪
আবদুর রউফ, লে.–১৫৪
আবদুস সামাদ আজাদ–২৬৫
আমেনা বেগম–১৪১
আমীর-উল ইসলাম, ব্যারিস্টার–১৬৯
আনোয়ারা খাতুন–৭৪

জাতির জনক বঙ্গবন্ধু–২২

আলতাফ উদ্দিন মহম্মদ–৭৭
আলতাফ মাহমুদ–৯৩
আলমগীর কবির–২২৫
আলী আমজাদ খান–৭৪
আলী আহম্মদ খাঁ–৭৪
আশরাফ আলী চৌধুরী–১০৬
আরবাব, ব্রিগেডিয়ার–১৪৬
আশরাফুল ইসলাম, এমপিএ–২০৪
আসমত আলী সিকদার–১৩৬
আহম্মদ ফজলুর রহমান–১৪৭
আ স ম আবদুর রব–১৭০
আহমদ হোসেন–৭৪
আসাদ–১১৮
আওয়ামী মুসলিম লীগ–৭১

এ

এম এ জি ওসমানী, কর্নেল–১৯৬, ১৯৭
এএম মালেক, ডা.–৭৯
এ কে খান–১০২, ১০৬
এম এ খালেক–১১৮
এনডিএফ–১৩২
২১ দফা–১০৫, ১০৬
এএইচএম কামরুজ্জামান–১৯৬, ১৯৭
এডওয়ার্ড হিথ–২৬২
এএম রাশেদ চৌধুরী, কর্নেল–২৯২
এএইচ দেলদার আহমদ–১১৮
এম আর আখতার মুকুল–৯০
এম এ রব, কর্নেল–২০০, ২০৪
এটিএম হায়দার–১৪৬
এ কে খন্দকার, উইং কমান্ডার–১৮৪, ২২৩, ২৫২
এ রহিম খান, এয়ার ভাইস মার্শাল–১৮৪
একুশ দফা–১০৩, ১০৪
১১ দফা–১৫৩, ১৫৪
এমএ হান্নান–১৮৭
এ কে ব্রোহী–১০২
এম এ গুরমানি–১০২
এম এ জলিল, মেজর–২০২
এ এম মালেক–২১৯, ২২০
এএনএম মনিরুজ্জামান, ড.–১৮৮
এম কে বাশার, উইং কমান্ডার–২০২
এম মতিয়ুর রহমান–২০৪, ২৬৫
এমএ হান্নান চৌধুরী–২২৪
এ কে কে নিয়াজী, লে. জেনারেল–১৮০, ১৮৫
এনায়েত করিম চৌধুরী–৭১, ২২৭
এ বি আলেকজান্ডার–৫১
এ কে এম রফিকুল ইসলাম–৭৪
এম আর সিদ্দিক–২২৮
এমএস আহসান, এডমিরাল–১৬৯
এম আর সিদ্দিক–২২৮

ও

ওয়াসেক–২৬
ওয়ালি খান–১৫৯
ওমর, জেনারেল–১৯৯
ওয়াজেদ মিয়া, ড.–৩০৮, ৩১৩
ওসমান চৌধুরী, মেজর–২০২
ওবায়দুর রহমান–২৮৪

ই

ইয়াহিয়া খান, জেনারেল, প্রেসিডেন্ট–১৭০, ২১৮, ২৩৯
ইউসুফ আলী–২০১, ২৫৩, ২৮৩
ইন্দিরা গান্ধী–২৩২, ২৫৩
ইউসুফ আলী চৌধুরী–৫১, ৫২
ইত্তেফাক–৭৫, ৭৬
ইয়াহিয়া-শেখ মুজিব আলোচনা–১৪৮
ইসলামিয়া কলেজ–৪২-৫০
ইয়ার মোহাম্মদ খান–৭২, ৭৩, ৭৪
ইলা মিত্র–৭৭
ইব্রাহিম খান, বিচারপতি–১২৬
ইসলামিক ফাউন্ডেশন–২৭১
ইস্কান্দার মির্যা–১২৬

ও

ওয়ার্কার্স ক্যাম্প–৬১

ক

কলকাতা দাঙ্গা–৫২-৫৪
কবি কাজী নজরুল ইসলাম–৩৩১
কপ–১৩৬
কফিল উদ্দিন চৌধুরী–১১৭

কাগমারী সম্মেলন–১২১
কাদের সিদ্দিকী–২৫১
কামরুদ্দিন আহমদ–৭২, ৭৩
কামরুজ্জামান–১০২
কাজী গোলাম মাহবুব–৭২, ৮৬, ৯২
কাউন্সিল মুসলিম লীগ–৭১
কারা জীবন–৮০-৮৫
কামাল হোসেন, ড.–২৬৩, ২৬৫
কিবরিয়া এএমএস–২২৭
কিরন শংকর রায়–৫৬
কে এফ রুস্তমজী–১৯৫
কে কে পন্নী–৭১, ২২৭
কোসিগিন, আলেক্সি–২৩৩
ক্যাবিনেট মিশন–৫১, ৫২
কে এম সফিউল্লাহ, মেজর–২০২
কৃষ্ণা, এডমিরাল–২৪৪
কুদরত-এ-খুদা, ড.–২৬৯
কৃষক-শ্রমিক পার্টি–১০৩

খ

খন্দকার নাজমুল হুদা, কর্নেল এন হুদা–১৪৮
খন্দকার আসাদুজ্জামান–২২৪
খন্দকার মোশতাক আহমদ–১৬৪, ১৯৬
খন্দকার আবদুর রশীদ, কর্নেল–২৯২
খয়রাত হোসেন–৮৭
খাজা নাজিমউদ্দিন–৪৩, ৪৪, ৬০, ৭৯
খাজা আহমেদ–৭৮
খাজা খায়েরউদ্দিন–২১৯, ২৬০
খাজা শাহাবুদ্দিন–৪৪, ৭৯
খান বাহাদুর আবদুল গোফরান–৫১
খান বাহাদুর এএফএম আবদুর রহমান–৫১
খানা বাহাদুর মোহাম্মদ আলী–৫১
খালেদ মোশাররফ, মেজর–২০০, ২৯৩
খালেদ মোহাম্মদ আলী–১৫৪
খাদেম হোসেন রাজা লে. জে.–১৮৪
খালেক নেওয়াজ–৬২
খুরশিদ উদ্দিন আহমদ, ক্যাপ্টেন–১৪৮
খান এম শামসুর রহমান–১৪৭
খান সাহেব ওসমান–৭২

গ

গণহত্যা–২১৭-২২২
গণতন্ত্রী দল–১০০
গোবিন্দা চন্দ্র দেবনাথ–১৮৮
গাজীউল হক–৯০
গোলাম মোহাম্মদ–৭৯, ১০১
গোলাম আযম, অধ্যাপক–২৬০
গোলাম মুহাম্মদ–৫৯
গোলক মজুমদার–১৯৫
গুর বক্স সিং, মে. জেনারেল–২৩৯
গুল হাসান, জেনারেল–২৩৪
গৌরচন্দ্র বালা–১১৭
গৌরী প্রসন্ন মজুমদার–৩২৯
গাজী গোলাম মোস্তফা–২৮৫

চ

চিত্তরঞ্জন দত্ত, মেজর–২০২
চৌধুরী খালেকুজ্জামান–১৩৩
চৌধুরী মুহাম্মদ আলী–১১৪
চৌ এন লাই–৯৯

ছ

ছয় দফা–১৩০-১৪০
ছাত্রলীগের জন্ম–৬২-৬৭
ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ–১৫৩

জ

জওহরলাল নেহরু–৫৭
জহুরুল হক, সার্জেন্ট–১৪৭, ১৫৭
জগজিৎ সিং অরোরা–২৫২, ২৫৩
জহুর আহমদ চৌধুরী–২০৪, ২৬৫
জহিরউদ্দিন–১১৮
জব্বার–৯১
জামাল হায়দার–১৫৪
জামিল উদ্দিন, কর্নেল–২৯১
জিল্লুর রহমান–২৪৮
জুলিও কুরি–২৩৭
জুলফিকার আলী ভুট্টো–১২৭, ১৬৯
জহির রায়হান–২৫৫
জিএম গিল, লে. জেনারেল–২৩৯
জ্যাকব, জেনারেল–২৩৯
জিয়াউর রহমান, মেজর–২০২, ৩০২
জেড এ খান, কর্নেল–১৮৯

জ্যোতির্ময় গুহঠাকুরতা, ড.–১৮৮
জেমস নোভাক–৩১৮, ৩১৯

ট

টমাস উইলিয়াম–১৪৯
টিক্কা খান–২১৭, ২১৮
টি এন রায়না, লে. জেনারেল–২৪০

ড

ডাক্তার খান সাহেব–১১৮
ডাক (DAC)–১৫৩

ত

তমিজউদ্দিন খান–৪৫
তফাজ্জল হোসেন মানিক মিয়া–১৬১
তারকানাথ মুখার্জি–৫১
তোফাজ্জল আলী–১০২
তফাজ্জল ইসলাম, প্রধান বিচারপতি–২৯৮
তাজুল ইসলাম, সুবেদার–১৪৮
তেলিয়াপাড়া–১৮৯
তোফায়েল আহমদ–১৫৪, ১৫৮
তৌফিক এলাহী চৌধুরী–১৯৫
তমুদ্দিন মজলিশ–৬৩, ৬৪
তাজউদ্দীন আহমদ–১৪০, ১৯৫, ১৯৬, ২২৩, ২৬০, ২৬৯

থ

থাপ্পা, মে. জেনারেল–২৩৯

দ

দেওয়ান ফরিদ গাজী–২০৪
দিল্লি কনভেনশন–৫০, ৫১
দ্বারকানাথ বাড়ৈ–৫২

ধ

ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত–৬৩, ১১৭

ন

নইমুদ্দিন আহমদ–৬২
নবাবজাদা নসরুল্লাহ খান–১৫৯
নওয়াব আলী–৬৩
নাজমুল করিম, অধ্যাপক–৬২
নাজিম কামরান–১৫৪
নাদেরা বেগম–৬৯
নিয়াজী এ এ কে, জেনারেল–২৫১, ২৫৩
নিক্সন, প্রেসিডেন্ট–১৯৩, ২২১
নূর মোহাম্মদ, ল্যান্স নায়েক–২৬৬
নুরুল ইসলাম, ড.–২৬৮
নূর চৌধুরী, এইচএমবি, মেজর–২৯২
নূরুদ্দিন আহমদ–৪৬
নুরুল কাদের–২০১
নুরুজ্জামান কাজী, মেজর–২০২, ২৪২
নুরুল আমিন–৯০, ১৫৯, ২৬০
নুরুল কবির–৬২
নূর মোহাম্মদ এলএস–২৬৬
নুরুর রহমান–১১৮
নূরে আলম সিদ্দিকী–১৭০
নুরুল ইসলাম চৌধুরী–২০৩
ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি, ন্যাপ–১২৩
নাগরা, মেজর জেনারেল–২৫১
ন্যাপ ওয়ালী–১৭০
নেজামে ইসলাম–১০৩
নৌ-কূটনীতি–২৪৫-২৪৬

প

পিডিএম–১৪৩
পীর মোহসিন উদ্দিন দুদু মিয়া–২৬০
পাকিস্তান আওয়ামী লীগ–৯৭
পাকিস্তান পিপলস পার্টি–১৩০
প্রবাসি বাঙালি–২০১

ফ

ফণীভূষণ মজুমদার–২০৪
ফজলুর রহমান–৫৯
ফাতিমা জিন্নাহ–৬৭
ফজলুল কাদের চৌধুরী–২৬১
ফকির শাহাবুদ্দিন–২২৮
ফজিলাতুননেছা–৫৪, ২৯১
ফিরোজ খান নূন–১১৮
ফজলুর রহমান সিএসপি–১৪৭
ফারল্যান্ড–২৩১
ফারুকুর রহমান, মেজর–২৯১
ফজলে রাব্বি, ডা.–২৫৬

ব

বরকত–৯১
বঙ্গবন্ধু–১৫৮, ১৫৯
বজলুল হুদা, মেজর–২৯৬
বাকশাল–২৮৩
বিধানকৃষ্ণ সেন–১৪৭
বিএ সিদ্দিকী–২১৭
বেকার হোস্টেল–৪১, ৪২
বেলাল, মেজর–১৮৯
ব্যারোজ, গভর্নর–৪৬
বদরুন্নেসা–১৬৫
বৈদ্যনাথ তলা–১৯৭
বৃহত্তর বাংলা–৫৫, ৫৬

ভ

ভূপেনকুমার দত্ত–৬৩
ভূপতি ভূষণ চৌধুরী–১৪৭

ম

মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী–৬৩, ৭৪, ৭৬, ৮৬, ৯৬, ১১৪
মওলানা আবদুর রশিদ তর্কবাগীশ–৯৬
মওলভী ফরিদ আহমেদ–২৬০
মনোরঞ্জন ধর–২১৭, ২৮৩
মঞ্জুর কাদের–১২৭
মনি সিংহ–২২৮
মজিবর রহমান–১৪০
মহাত্মা গান্ধী–৫৮
মতিয়ুর রহমান নিজামী–২৬০
মতিয়ুর রহমান এমএনএ–১২০৪
মমিনুল হক–৩০৬
মশিউর রহমান–১১৭
মফিজউদ্দিন আহমদ–৬০
মহিউদ্দীন আহমদ–৮৯, ৯৪
মমতাজ বেগম–৮৬
মতিয়া চৌধুরী–১৮৪
মঞ্জুর কাদের–১২৭
মজিবুর রহমান, স্টুয়ার্ড–১৪৬
মজিবুল হক–৮৭
মহিউদ্দিন জাহাঙ্গীর, ক্যাপ্টেন–২৬৬
মঞ্জুর, মেজর–২০২
মনসুর আলী–১০৩, ১৪০, ১৯৬
মহম্মদ আলী–১৩০
মতিয়ুর রহমান, ফ্লাইট লে.–২৬৬
মাহমুদুল হক ওসমানী–১১২
মাহবুব উল্লাহ–১৪৪
মাহফুজুল বারী–১৪৭
মাউন্ট ব্যাটেন–৫৬
মাহমুদ আলী–১১৭
মির্জা গোলাম হাফিজ–৮৭
মিজানুর রহমান চৌধুরী–১৪১, ১৬৫
মিত্রবাহিনী–২৩৯, ২৪০
মীর শওকত আলী, মেজর–২০২
মুনীর চৌধুরী–২৫৫
মুন্সী আব্দুর রব, ল্যান্স নায়েক–২৬৬
মুজিবর রহমান, হাবিলদার ক্লার্ক–১৪৬
মুহাম্মদ সুলতান–১০০
মাজেদ. ক্যাপ্টেন–১৯৫
মাও সে তুং–৯৯
মতিয়ুর রহমান শহীদ–১১৭
মোকাম্মেল হোসেন, বিচারপতি–২৯৮
মালিক ফিরোজ খান নুন–৭৯, ৮২
মাহবুবুল আলম চাষী–২৫০
মাহবুবুল হক দোলন–১১৭
মুহাম্মদ তোয়াহা–৬৫
মুহাম্মদ হাবিবুল্লাহ বাহার চৌধুরী–
মুহাম্মদ আলি জিন্নাহ–৫৯, ৬০, ৬৭, ৬৮
মোঃ আবদুল আজিজ, বিচারপতি–
মোয়াজ্জেম হোসেন, লে. কমান্ডার–১৪৬, ২৫৪
মোহাম্মদ ফজলুল হক, ফ্লাইট সার্জেন্ট–১৪৭, ১৫৭
মোহাম্মদ আবদুল মোতালিব, ক্যাপ্টেন–১৪৮
মোহাম্মদ আলী রেজা–১৪৮
মোস্তফা কামাল–২৬৬
মুনির চৌধুরী, অধ্যাপক–৫৯, ২০৭
মোহাম্মদ মাহবুব উদ্দিন চৌধুরী–১৪৮
মোহাম্মদ খুরশীদ–১৪৭
মোফাজ্জল হায়দার চৌধুরী, অধ্যাপক–২৫৭
মোনায়েম খান–১৬৬
মোজাফফর আহমদ, অধ্যাপক–১৩৩
মোহাম্মদ আলী–১৩০
মহম্মদ উল্লাহ–১১৪

মোয়াজ্জেম উদ্দিন হোসেন–১০৬
মোয়াজ্জেম হোসেন, লে. কমান্ডার–১৮৮
মোশাররফ উদ্দিন–৯৩, ১৮৮
মোজাফফর আহমদ চৌধুরী, ড.–২৮৪, ২৮৫
মোমিনুল হক–৩০৬
মোসলেম উদ্দিন, রিসালদার–২৮৭
মোহাম্মদ ইয়াকুব মিয়া–২৫৭
মোহাম্মদ তোয়াহা–৮৭
মোহাম্মদ হানিফ–২৬৯
মীর শওকত আলী, মেজর–২০২
মোশাররফ হোসেন, ড.–১৬৮
মৌলভী ফরিদ আহমদ–২৫১
মোগলটুলি ওয়ার্কার্স ক্যাম্প–৫১
মোল্লা জালালউদ্দিন–১৪১
ম্যানেক শা, জেনারেল–২৩৮
মুর্তজা, ডা.–২৫১
মুসলিম লীগ–২৫৭
মুজিব বাহিনী–৭২, ২২৭

র

রহিম খান, মে. জেনারেল–২৪৪
রফিক শহীদ–৯১
রসরাজ মণ্ডল–১১৮
রফিকুল ইসলাম, মেজর–২০২
রাশেদ চৌধুরী, মেজর–২৫৯২
রাজা গজনফর আলী খান–৫৯
রাও ফরমান আলী–১৮৪, ২১৮
রাজ্জাকুল হায়দার চৌধুরী–১০৩, ১০৬
রোকেয়া, বেগম–৩৩০
রুহুল আমিন–২৬৬
রুহুল কুদ্দুস–১৪৭
রেহমান ছোবহান, ড.–২৬৮
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, কবি–২৬৩, ৩৩১
রশিদুল হাসান, ড. অধ্যাপক–২৫৭

ল

লচম্যান সিং, মেজর জেনারেল–২৩৯
লুইস মাউন্ট ব্যাটেন–৫৯
লিয়াকত আলী খান–৫৯, ৭৮

শ

শরৎচন্দ্র বসু–৫৬
শরিফুল হক ডালিম, মেজর–২৯২
শরৎচন্দ্র মজুমদার–১১৭
শফিক–৯১
শংকর ঘোষ–৩২১
শওকত আলী মীর, মেজর–১৬৫, ২০২
শরণ সিং–২৩০
শহীদ বুদ্ধিজীবী–২৫৪-১৫৮
শহিদুল্লাহ কায়সার–২৫৭
শারাফত আলী–১৮৮
শফিক–৯১
শওকত আলী মিয়া, ক্যাপ্টেন–১৪৮
শওকত আলী–৬৬, ৮৭
শামসুল হক–৬২, ৬৬, ৭২, ৭৪, ৮৬
শামসুল হক চৌধুরী–৮৭
শামসুল আলম–৮৭
শামসুল হক, সার্জেন্ট–১৪৭
শাহরিয়ার রশীদ খান, কর্নেল–২৯২
শাহ আজিজুর রহমান–২৬০
শামসুজ্জোহা, ড.–১৫৭, ১৫৮
শামসুর রহমান খান, এমএনএ–২০৪
শামসুজ্জোহা–৭৮
শাজাহান সিরাজ–১৭০, ৩২৪
শামসুজ্জোহা, ড.–১৫৭-৫৮
শামসুদ্দিন আহমদ–৩৫
শেখ আবদুল আজিজ–৬২, ২৬৫
শেখ বংশ–১৭-২০
শেখ মুজিবুর রহমান, বঙ্গবন্ধু–১৭, ৭৪-১০০, ১০১-২০০, ২০১-৩৩৫
শেখ আওয়াল–১৭, ১৮, ২০
শেখ লুৎফর রহমান–১৮, ১৯, ২০
শেখ নাসের–২০, ১৯১
শেখ হাসিনা–২০, ৩০০, ৩১১
শেখ রেহানা–২০, ৩১১
শেখ কামাল–২০, ২৯১
শেখ জামাল–২০, ২৯১
শেখ রাসেল–২০, ২৯১
শেখ ফজলুল হক মনি–২৮৫, ২৯১
শেখ শহীদ–২৮৫

শেরে বাংলা একে ফজলুল হক–২৪, ৪২, ৭৩, ১০৬
শান্তি মিশন–৯৯

স

সর্দার আবদুর রব নিস্তার–৭৩
সর্দার বাহাদুর খান–৭৯
সত্য রঞ্জন বকশী–৫৬
সবুর খান–১৩০
সজীব ওয়াজেদ জয়–৩১৩
সর্দার আমীর আজম খান–১১৮
সর্দার ফজলুল করিম–৬৬
সফিউল্লাহ, মেজর–২০২
৭ মার্চের ভাষণ–১৭২-১৭৫
৭ জুন–১৪২
সাইফুদ্দিন আহমদ–১৫৪
সাঁওতাল বিদ্রোহ–৭৭
সাহাবুদ্দিন, বিচারপতি–১২৯
সালাম–৯১
সালাম খান–৭৪
সায়মা ওয়াজেদ–৩১৩
স্বাধীনতা ঘোষণা–১৮৫-১৯৪
স্বাধীনতা ঘোষণাপত্র–১৯৮
সাখাওয়াত হোসেন–৭৪
সিরাজুল আলম খান–৩২৪
সফিউল্লাহ, মেজর–২০২
সিরাজ উদ্‌দীন হোসেন–২৫৭
সিমলা চুক্তি–২৭৩
সিরাজ সিকদার–৩২৪
সিদ্দিক সালিক, মেজর–১৯০
সুরেন্দ্র কুমার সিনহা, বিচারপতি–২৯৮, ৩০০
সুভাষচন্দ্র বসু–৪২, ৪৮
সুলতান উদ্দিন আহমদ এলএস–১৪৬
সৈয়দ আমজাদ আলী–১১৮
সৈয়দ আবদুস সুলতান–২২৮
সেলিনা বানু–১১৪
সৈয়দ আজিজুল হক–১০৬
সৈয়দ মোহাম্মদ আফজাল–৬০
সৈয়দ নজরুল ইসলাম–১৪০, ১৫৯, ১৯৬
সৈয়দ মাহবুব মোরশেদ–১৬০
সৈয়দ নুরুল আলম–৮৭
সোহরাব হোসেন–২৬৫
স্যার মুহাম্মদ জাফরউল্লাহ–৭৯
স্যার ফ্রেডারিক বোর্ন–৬০
স্যার প্যাথিক লরেন্স–৫১
স্যার স্টাফোর্ড ক্রিপস–৫১
স্টানলি উলপার্ট–৩২৬

হ

হামিদ মাস্টার–২২
হলওয়েল–২৬
হামুদুর রহমান, বিচারপতি–১২৯
হামিদ, জেনারেল–১৪৬
হামিদুর রহমান, সিপাহী–২৬৬
হাফেজ মুসা–১৪১
হাজী মোহাম্মদ দানেশ–১০০
হামিদুল্লাহ, উইং কমান্ডার–২০২
হাবিবুর রহমান–১২৭
হাফিজুর রহমান–১২৭
হামিদুল হক চৌধুরী–১২৭, ১৩৩
হুমায়ুন রশীদ চৌধুরী–৩০০
হেনরি কিসিঞ্জার–২৩১, ২৪৬
হোসাইন মোহাম্মদ এরশাদ, জেনারেল–৩০৩
হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী–৪৩, ৪৪, ৪৬, ৫১, ৫৫
হোসেন আলী–২০০
হোসেন তওফিক ইমাম–২০১
হেদায়েত হোসেন চৌধুরী–৮৭

য

যোগেন্দ্রনাথ মণ্ডল–৫৯
যুবলীগ–৭৮-৮০
যুক্তফ্রন্ট–১০৩-১১৬
যুদ্ধাপরাধীদের তালিকা–২৫৮-২৬১